सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

একাদশ শ্রেণির ইতিহাস পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ

ত্রিপুরা সরকার

এন সি ই আর টি
অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ

এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ইতিহাস
একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

(এন সি ই আর টি-র Themes in World History পাঠ্যবইয়ের ২০১৭ সালের অনূদিত সংস্করণ)

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ, ২০১৯
পুনর্মুদ্রণ :
মার্চ, ২০২০

প্রকাশক : রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ ত্রিপুরা।

মূল্য : ১৮০ টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস
প্রসাদ স্বরূপ রায়

মুদ্রণ : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উপদেষ্টা

ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক, এন ই আর আই ই (এন সি ই আর টি), শিলং
ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক, আর আই ই (এন সি ই আর টি), ভুবনেশ্বর

অনুবাদক

- ড: রুমা ভট্টাচার্য্য
- সুকান্ত চক্রবর্তী
- বিপাশা ব্যানার্জী
- সুজাতা পাল
- সঞ্জীব দেব
- চন্দ্রিমা চৌধুরী

ভাষা পরিমার্জনা

- সুধীর কান্তি ভূষণ
- প্রবুদ্ধ সুন্দর কর
- শুক্লা সিংহ
- সোনালী ভট্টাচার্য্য

প্রাক্‌কথন

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা (২০০৫)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, শিশুদের স্কুলজীবন ও স্কুলের বাইরের জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকা খুব প্রয়োজন। তার কারণ, শিশুদের শিক্ষা যদি শুধুমাত্র স্কুল এবং পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকে, তাহলে সেইসব শিশুদের স্কুল, বাড়ি এবং সম্প্রদায়— এই তিন জায়গার শিক্ষায় একটি বড়ো ফাঁক থাকার সম্ভাবনা রয়ে যায়। মূলত এই শূন্যস্থানটাকে পূরণ করার লক্ষ্যেই জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখার উপর ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যক্রম ও নতুন ধরনের পাঠ্যবই তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে. এর ফলে শিশুদের মুখস্থ করা এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়গুলোকে প্রকোষ্ঠবদ্ধ করার প্রবণতা বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও আশা করা হচ্ছে যে, এই পরিবর্তন জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তবে এই ধরনের প্রচেষ্টার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উপরে, যাঁরা শিশুদের শিখন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং বিভিন্ন কাজে শিশুদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবেন। আমাদের এটা মনে রাখা খুব জরুরি, শিশুরা যদি সময়, স্থান এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে বড়োদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নিয়ে তারা নতুন অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারবে। একমাত্র পাঠ্যবই পড়েই পরীক্ষায় পাস করা যায় - মূলত এই ধারণার ফলেই শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলো সর্বদা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ তখনই সম্ভব, যখন আমরা ওদের এই গোটা শিখন প্রক্রিয়ার কেবলমাত্র গ্রহীতা না ভেবে একটা পূর্ণ অংশীদার মনে করব।

তবে এই লক্ষ্যপূরণ করতে গেলে স্কুলের দৈনন্দিন কার্যসূচি ও ব্যবস্থাপনায় অনেক ধরনের পরিবর্তন আশা অনিবার্য। স্কুলের দৈনন্দিন সময় সূচি যেমন নমনীয় হওয়া উচিত, ঠিক তেমনই বার্ষিক কার্যসূচি এমনভাবে তৈরি হওয়া প্রয়োজন যাতে শিক্ষাদানের দিনগুলোর সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন না আসে। তবে বাস্তবে এই নতুন পাঠ্যবই শিশুদের কতটুকু কাজে লাগবে, ওদের স্কুলজীবন কতটা সমৃদ্ধ করবে কিংবা ওদের স্কুলজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে কিনা, সবটাই নির্ভর করছে শিক্ষক/শিক্ষিকারা কী পদ্ধতি অবলম্বন করে এই বইটি স্কুলে পড়াবেন এবং কীভাবে সেই পড়ার মূল্যায়ন

করবেন। বিগত দিনগুলোর ন্যায় শিশুদের যাতে পাঠ্যবইয়ের বোঝা বইতে না হয়, এই নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময় এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তার জন্য শিক্ষাদানের প্রদত্ত সময় এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি স্তরের পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিশুদের নানারকম প্রশ্ন করা, নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, তর্ক-বিতর্ক, ছোটো ছোটো গ্রুপ বানিয়ে আলোচনা করা এবং হাতে-কলমে শিক্ষা এইসব কিছুর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পাঠ্যবই উন্নয়ন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কঠোর পরিশ্রম করে এই বইটি রূপায়ন করেছেন তাঁদেরকে এন সি ই আর টি প্রশংসা জানাচ্ছে। এই কমিটির কার্যকলাপকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক হরি বাসুদেবন এবং এই পাঠ্য বইয়ের মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক যোগেন্দ্র যাদব এবং অধ্যাপক সুহাস পাল মহোদয়গণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই পাঠ্যবই পুনর্গঠনের পিছনে বহু শিক্ষক/শিক্ষিকার অবদান অনস্বীকার্য।

আমরা সেইসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পাঠ্যবই তৈরির ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন তাঁদের বহুমূল্য সম্পদ, উপাদান এবং লোকবল নিয়ে কাজ করার অনুমতি দিয়ে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (এম এইচ আর ডি) চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মৃণাল মিরি এবং অধ্যাপক জি পি দেশপান্ডের তত্ত্বধানে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত জাতীয় পর্যবেক্ষণ সমিতির সদস্যদের বহুমূল্য সময় ও অবদানের জন্য পর্যদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নিজেদের প্রকাশনা এবং ব্যবস্থাপনার গুণগত মান সংস্কারের কাজে নিরন্তর নিয়োজিত থাকা এন সি ই আর টি কর্তৃপক্ষ সর্বদা পাঠকদের মতামত এবং পরামর্শকে স্বাগত জানায়, যাতে ভবিষ্যতে পাঠ্যবই সংশোধনী প্রক্রিয়াগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

নিউ দিল্লি
২০ ডিসেম্বর ২০০৫

অধিকর্তা
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ
(এন সি ই আর টি)

বিশ্ব ইতিহাস পাঠ

যে কেউ জিজ্ঞেস করতেই পারেন, যে এক বছরের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস পড়া কি সম্ভব? বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা ঘটনা ঘটে গেছে, আর সেই সঙ্গে প্রতিটি দেশেই বিভিন্ন বিষয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। তাহলে এই বিশাল বিষয় থেকে কীভাবে আমরা মাত্র কয়েকটা উল্লেখযোগ্য অংশ খুঁজে নেব?

এখানে প্রতিটি প্রশ্নই যথাযথ এবং অর্থবহ। বিশ্ব ইতিহাসের ওপরে যেকোনো বই পড়ার আগেই এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। একটা পাঠ্যক্রমে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত বহন করা উচিত যে কীভাবে এই পুরো ব্যাপারটার বিন্যাসকরণ ঘটেছে। আমরা কী পড়তে চলেছি এবং কেন? এই ব্যাখ্যা দেওয়া যেকোনো ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইতিহাস পাঠে কিংবা ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা সবসময়েই কত গুলো বিষয় নির্বাচনে নিমগ্ন থাকেন। এটা সেই বিশেষ দিক যা আজ থেকে কয়েক দশক আগেই এইচ. কার নথিভুক্ত করে গেছেন। তাঁর অত্যন্ত ছোটো অথচ বিশ্লেষণাত্মক বই "What is History" তে। স্যাঁতস্যাঁতে মহাফেজখানায় স্তূপীকৃত দলিল দস্তাবেজ বাছতে বাছতে একজন ঐতিহাসিক সেই সমস্ত ঘটনা নথিভুক্ত করেন যেগুলো তাঁর কাছে যথাযথ ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রাপ্ত উপলব্ধি বিষয়গুলোকে তিনি অন্য উপাদান এবং প্রামাণ্য দস্তাবেজের সঙ্গে যাচাই করেন, যা অধিগৃহীত হয়েছে অন্য কোনো মহাফেজ খানা বা অন্য কোনো সূত্র থেকে। তিনি হয়ত যা পড়েন বা যা পড়েছেন, তা সবই নোট আকারে লিখে রাখতে পারেন না; সংগৃহীত সব প্রমাণও হয়তো তিনি তার কাজে ব্যবহার করতে পারেন না। যে সমস্ত প্রামাণ্য বিষয় ঐতিহাসিকের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না, তা উল্লিখিত হয় না। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্য কোনো ঐতিহাসিক আবার হয়তো একই তথ্য, একই প্রামাণ্য দস্তাবেজ পড়েন, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে, এ নিয়ে তার মনে নতুন কোনো প্রশ্ন জাগে। তিনি তখন আবিষ্কার করেন সেই সমস্ত প্রমাণ যেগুলো আগে উল্লিখিত হয়নি। তার ফলে, প্রামাণ্য সূত্রের নতুন ব্যাখ্যা হয়, স্থাপন করা হয় নতুন যোগাযোগ, পারস্পারিকতা এবং লেখা হয় নতুন ইতিহাস।

ইতিহাস লেখা এই বেছে নেওয়া কিংবা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে চলতে পারে না। তাই ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমাদের বোঝা উচিত, কোন্ কোন্ ঘটনা ঐতিহাসিকের চোখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে এবং সেগুলোকে তিনি কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই পরিসরে আমাদের বোঝা দরকার, সেই তার্কিক পরিসর যা ঐতিহাসিকগণ তৈরি করে চলেছেন এবং সেই বিস্তৃত চিন্তন পরিকাঠামো যার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ঘটনার অর্থ এবং মান নির্ণয়ের চেষ্টা তিনি করে গেছেন।

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস বলতে আমরা যা পড়ে এসেছি, তা ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য বিশ্বের উত্থানের এক আখ্যান বিশেষ। সেটা ছিল মূলত বিকাশ এবং উন্নয়নের ধারার ক্রম বিশ্লেষন ও নতুন চেতনার সংজ্ঞায়ন। বিজ্ঞান,প্রযুক্তিবিদ্যা, বাণিজ্য, বাজার,মনন ও যৌক্তিতার স্বাধীনতা ও মুক্তির জয় গাথা। তুলনামূলকভাবে ছোটোখাট ঘটনার ইতিহাস প্রায়শই ঢুকে যেত পাশ্চাত্য দুনিয়ার সুবিন্যস্তভাবে রচিত এই ইতিহাসের পরিমণ্ডলে। পশ্চিমি দুনিয়া বরাবরই নিজেদের উপস্থাপিত করেছে উন্নয়নের অগ্রদূত হিসেবে: সারা বিশ্বকে সভ্য করা, অবস্থার সংস্কার সাধন করা (reform), মানুষজনকে শিক্ষিত করে তোলা, শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, এই গল্পেরই কয়েকটা উল্লেখযোগ্য দিক।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা কি এই ধারণার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেব না? আমরা কি বলব না যে পৃথিবীর ইতিহাস আবার অন্য চোখে দেখা হোক যেখানে আমরা একে একে পার হয়ে যাব দীর্ঘ সময় সারণি, শুধু শুধু এই টুকু দেখতে যে আমরা ইতিহাসকে কোনো নতুন আলোকে দেখতে পাই কিনা। "বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা" আমাদের এই যাত্রায় সাহায্য করবে। (এই সাহায্য আসে মূলত তিনটি দিক থেকে)।

প্রথমত : এটা আমাদের সামনে উন্মোচিত করবে সেই সব অনালোকিত ইতিহাস প্রসঙ্গ যেগুলো চাপা পড়ে গিয়েছিল বিকাশ এবং উন্নয়নের চাকচিক্যপূর্ণ আখ্যানের আড়ালে। আমরা দেখতে পাবো যে পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে যে দক্ষিণ আমেরিকাতে পশ্চিমি সম্প্রদায় এবং অন্যান্য বিদেশিদের আগমণ শুধুমাত্র সেই দেশে পশ্চিমি বাণিজ্য এবং সংস্কৃতির দরজা খুলে দেয়নি, তা একই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ভয়াবহ সব রোগের মিছিল, প্রাচীন সব সভ্যতার বিনষ্টিকরণ প্রক্রিয়া এবং স্থানীয় সব জনসংখ্যার হ্রাস পাওয়ার মত সুদুর প্রসারী প্রভাব (অষ্টম অধ্যায়)। পরবর্তীকালে যখন শ্বেতাঙ্গারা উত্তর আমেরিকায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় চলে এল তার ফলে আমরা যা পাই তা শুধু উন্নয়ন নয়। আমরা জানি, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের উন্নয়নের পেছনে লুকিয়ে আছে অনেক দু:খ জনক গল্প, কখনও তা স্থানীয় অধিবাসীদের বিতারিত হওয়ার আখ্যান আবার হয়ত কখনও গণহত্যার মত ঘৃণ্য স্বৈরী আস্ফালন।

দ্বিতীয়ত : আমরা যখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের উত্থান প্রসঙ্গে জানবো, তখন দেখব যে নাটকের পালাবদল শুধুমাত্র রোমেই হয়নি (তৃতীয় অধ্যায়)। যা কিনা ইউরোপে, সেইসঙ্গে একই রকম নাটকের পালাবদল

হয়েছে মধ্য প্রাচ্যের ইসলামি রাষ্ট্রে (চতুর্থ অধ্যায়) এবং মঙ্গোল শাসিত অঞ্চলে (পঞ্চম অধ্যায়)। এই অধ্যায়গুলো পড়ে আমরা বুঝতে পারবো কীভাবে সমাজ এবং রাষ্ট্রনীতির ইতিহাস এইসব ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ধারায় বয়ে চলেছে।

তৃতীয়ত : চতুর্থ অধ্যায় পড়লে আমরা দেখতে পাবো যে আধুনিকতায় পৌঁছানোর রাস্তাগুলোর মধ্যেও ভিন্নতা আছে। একটা সময় ছিল যখন বিশ্বাস করা হত যে শিল্পায়ন প্রথমে ঘটেছে ব্রিটেনে এবং পরবর্তী সময় অন্যান্য দেশ এই মডেলটিকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করেছে, তাই সবদেশেই উন্নয়ন এবং বিকাশের ধারা বিচার করা হত ব্রিটিশ মডেলের আদলে। এই ধরনের তার্কিক অবস্থিতি চিহ্নায়িত করে যে পশ্চিমই ছিল বিশ্বের উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল। কিন্তু আজ আমরা জানি, এটা সর্বৈব সত্য নয় যে সব মনন এবং সৃজনশীলতাই বয়ে এসেছে পশ্চিম দুনিয়া থেকে। বিপরীত দিকে এটা বলা হচ্ছে না যে অন্যান্য জায়গায় যা ঘটে চলেছে তার উপর পশ্চিমি দুনিয়ার কোনো প্রভাবই নেই কিংবা প্রতিটি দেশের ঐতিহাসিক উন্নয়নের ধারা শুধুমাত্র তার নির্দিষ্ট পরিসরেই সীমাবদ্ধ। যা বলতে বোঝায় যে আমরা শুধু উন্নয়নের স্থানিক শিকড় সন্ধানের মধ্যেই আমাদের ইতিহাস চর্চাকে পরিসীমিত রাখব। এই রকম ভাবাটা হবে একধরনের সংকীর্ণ এবং অপ্রশ্রস্থ মানসিকতার সামিল, একধরনের বৌদ্ধিক সীমাবদ্ধতা। অন্যদিকে আমাদের স্বীকার করা উচিত যে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী লোকেরা নিয়ত মৌলিকভাবে কাজ করে চলে তার পারিপার্শ্বিক জীবন এবং জীবনচর্চার উন্নয়নের জন্য। আর এই সব উন্নয়নের প্রভাব ঘটে তার পাশ্ববর্তী এবং দূররর্তী দেশগুলোতে, অন্য কোনো মহাদেশে, এমনকি ইউরোপেও। সপ্তম অধ্যায়ের সাহায্যে আমরা দেখতে পাবো যে কীভাবে ইউরোপীয় রেনেসাঁ-সৃষ্ট সাংস্কৃতিক এবং কৃষ্টিগত উন্নয়ন ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের উন্নয়ন স্রোতে প্রভাবিত হয়েছিল।

ইতিহাস পরিক্রমায় আমাদের যাত্রা শুরু করা উচিত প্রাচীন মানব সভ্যতায় সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সেখান থেকে আমরা ছুঁয়ে যাব নগরজীবনের উন্নয়নকে। এই পথে আমরা দেখতে পাবো, কীভাবে বড়ো রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্য বিভিন্ন সময় গড়ে উঠেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এবং এই ক্ষেত্রে সমাজ গঠনের মূলসূত্র। পরের অধ্যায়ে নিবিড় দৃষ্টিপাত আবশ্যক এই সত্য বুঝতে যে কীভাবে নবম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজ এবং সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ এবং পরিবর্তন ঘটেছে। এই অধ্যায়টা আমাদের আরও দেখাবে দক্ষিণ আমেরিকার জনগোষ্ঠীর ওপর ইউরোপীয় আগ্রাসনের প্রভাব কেমন ছিল (তৃতীয় ভাগ) সবশেষে আমরা পড়ব আধুনিক বিশ্বের ক্রমবিকাশের জটিল ধারার বিবরণ (চতুর্থ ভাগ)। এই বিভিন্ন বিষয়গুলো আমাদের এক তার্কিক পরিসরে প্রবেশ করতে উদ্দীপিত করবে এবং সেই সঙ্গে দেখাবে যে ঐতিহাসিকরা কেন ক্রমাগতভাবে পুরোনো বিষয়বস্তুগুলোকে নিয়ে নতুন করে ভেবে বলেন।

এই পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে একটি সূচনা এবং সময়তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই সময়তালিকা আমাদের পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করতে হবে না। এই সময়তালিকার উদ্দেশ্য হল বিশ্বে কোথায় কোন্ সময় কী কী ঘটনা ঘটেছিল, সেই সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা দেওয়া । এই সময়তালিকার মাধ্যমে বিশ্বের এক প্রান্তের ইতিহাসের সঙ্গে সময়ের মাধ্যমে অন্য জায়গায় ঘটে যাওয়া বিষয়ে আমরা কোনো না কোনো যোগসূত্র খুঁজে বের করতে পারব।

একটি সময়তালিকা তৈরি বরাবরই এক কষ্টসাধ্য কাজ। একটি সময়তালিকার অন্তর্ভুক্ত সময়কাল বা তারিখগুলো আমরা কীভাবে নির্বাচন করব? এই নির্বাচন প্রক্রিয়াটি নিয়ে হয়তো সব ঐতিহাসিকদের মতের মধ্যে বিভিন্নতা থাকতে পারে। আমরা যদি বিভিন্ন বইয়ে দেওয়া একই সময়কালের বিভিন্ন সময়তালিকাগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখবো যে ওই সব সময়তালিকায় আলাদা আলাদা বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই একজন সুদক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সময়তালিকাগুলো অধ্যয়ন করা উচিত। আমাদের দেখা উচিত, একটি সময়তালিকা কোন্ কোন্ ঘটনাবলির উপর মনোনিবেশ করছে বা কোন্ কোন্ ঘটনাবলিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে না। তাতে বিধৃত ঘটনাবলি এক সময়রেখা ও ভিন্নমাত্রায় ইতিহাস রচনার সহায়তা করে।

এই বছর আমরা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস পড়বো না। সামনের বছর আমরা যে বই পড়বো, তার অভিমুখ ভারতীয় ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এই দুই বছরে আমরা শুধু পৃথিবীর ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির ও তাদের প্রক্রিয়া সম্পর্কেই জানব না, আমরা নতুন করে বুঝতে চেস্টা করব, কেমনভাবে ঐতিহাসিকরা অতীতের ঘটনাবলি জানতে পেরেছেন বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে চেস্টা করব, তার্কিক পরিসরে পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে ইতিহাসের অভিজ্ঞান কীভাবে অন্য এক আলোকদীপ্ত মাত্রা পায়।

নীলাদ্রি ভট্টাচার্য
মুখ্য উপদেস্টা, ইতিহাস,

TEXTBOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

CHAIRPERSON, ADVISORY GROUP FOR TEXTBOOKS IN SOCIAL SCIENCE FOR THE SECONDARY STAGE

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, Calcutta University, Kolkata

CHIEF ADVISOR

Neeladri Bhattacharya, *Professor,* Centre for Historical Studies, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

ADVISOR

Narayani Gupta, *Professor* (Retd), Department of History, Jamia Millia Islamia, New Delhi (Theme 10)

MEMBERS

Jairus Banaji, *Visiting Professor,* Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 3)

Arup Banerji, *Professor,* Department of History, Delhi University, Delhi (Theme 9)

Bhaskar Chakravarty, *Professor,* Department of History, Calcutta University, Kolkata (Theme 7)

Rajat Datta, *Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 6)

Najaf Haider, *Associate Professor,* Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 4)

Sunil Kumar, *Associate Professor,* Department of History, Delhi University, Delhi (Theme 5)

Shereen Ratnagar, *Professor* (Retd), Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Theme 2)

Anil Sethi, *Professor,* DESS, NCERT, New Delhi

Reetu Singh, *Assistant Professor,* DESS, NCERT, New Delhi

Beeba Sobti, *Sr Teacher,* Modern School, New Delhi

Chitra Srinivasan, *Sr Teacher,* Sardar Patel Vidyalaya, New Delhi

Lakshmi Subramanian, *Professor,* Centre for the Study of Social Sciences, Kolkata (Theme 8)

Brij Tankha, *Professor,* Department of East Asian Studies, Delhi University, Delhi (Theme 11)

Supriya Verma, *Associate Professor,* Department of History, University of Hyderabad, Hyderabad (Theme 1)

MEMBER–COORDINATOR

Pratyusa Kumar Mandal, *Professor,* DESS, NCERT, New Delhi

ACKNOWLEDGEMENTS

Many individuals contributed to the production of this book, by way of providing written and pictorial material, reading chapters, visualising its design, and with editing and proofreading.

Kumkum Roy helped in many different ways in the preparation of the book. Niharika Gupta gave crucial inputs and literary references. Alan Mayne, Dan O' Connor, Jaya Menon, Partho Datta, Peter Mayer and Philip Oldenburg offered comments on specific chapters.

Shinjini Chatterjee and Shyama Warner gave unstintingly of their time for copy-editing, and Devika Sethi helped with the preparation of the maps. The typesetting and design were done with good humour and patience by Animesh Roy and Ritu Topa of Arrt Creations. Achin Jain and Albinus Tirkey worked on the corrections with speed and efficiency.

Those who gave generously of their time to do arduous proofreading include Akhila Yechury, Anish Vanaik, Dipasree Baul, Pallavi Raghavan and Parth Shil. In the recent edition of the book, 'The Story of Korea' has been added. For this, we thank Lee War Bom, *Professor* of Politics, Center for International Affairs, The Academy of Korean Studies, Seoul, Republic of Korea, and Cho Young Jun, *Professor* of Economics, Center for International Affairs, The Academy of Korean Studies, Republic of Korea.

Our grateful thanks to all of them.

PICTURE CREDITS

William A. Turnbaugh, Robert Jurmain, Lynn Kilgore, Harry Nelson, *Understanding Physical Anthropology and Archaeology*, Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, 2002 (for visuals on pp. 1, 9, 11, 19 and 28)

J. Boardman, J.Griffin, O.Murray, *Oxford History of the Classical World*, Oxford University Press,1991 (for visuals on pp. 61, 63, 66 and 69)

Barbara Brend, *Islamic Art,* British Museum Press, 1991 (for visuals on pp. 80 and 96)

Bernard Lewis, *Islam*, Thames and Hudson, 1992 (for visuals on pp. 79, 91, 92 and 97)

M.Hattstein and P.Delius (eds) *Islam: Art and Architecture*, Konemann, 2000 (for visuals on pp. 90, 95, 100, 101, 121)

P. Gay and the Editors of Time-Life Books, *Age of Enlightenment*, Amsterdam, 1985 (for visuals on pp. 186 and 187)

P.B. Ebrey, *The Cambridge Illustrated History of China,* Cambridge University Press, 1996 (for visual on p. 244)

Jonathan D. Spence, *The Search for Modern China,* Century Hutchinson, 1990 (for visuals on pp. 247, 250 and 252)

J.Colton and the Editors of Time-Life Books, *Twentieth Century*, Amsterdam, 1985 (for visuals on pp. 186 and 187)

Library of Congress Prints and Photographs Division Washington D.C. (for visuals on pp. 224, 139)

National Geographic, December 1996, February 1997 (for visuals on pp. 108, 110, 113, 116, 121)

সূচিপত্র

প্রাক্‌কথন — VII

বিশ্ব ইতিহাস পাঠ — IX

ভাগ I প্রারম্ভিক সমাজ

সূচনা — 2

সময়তালিকা-১ (৬ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে ১ খ্রিস্টপূর্ব) — 4

বিষয় ১ : সময়ের সূচনালগ্ন থেকে — 8

বিষয় ২ : লিখনশৈলী এবং নগর জীবন — 29

ভাগ II সাম্রাজ্য

সূচনা — 50

সময়তালিকা-২ (খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) — 54

বিষয় ৩ : তিনটি মহাদেশ জুড়ে একটি সাম্রাজ্য — 58

বিষয় ৪ : ইসলামের কেন্দ্রভূমি — 77

বিষয় ৫ : যাযাবর সাম্রাজ্য — 104

ভাগ III ঐতিহ্যের পরিবর্তন

সূচনা — 124

সময়তালিকা-৩ (১৩০০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ) — 128

বিষয় ৬ : তিনটি শ্রেণি — 132

বিষয় ৭ : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিবর্তন — 152

বিষয় ৮ : সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব — 168

ভাগ IV আধুনিকতার অভিমুখে

সূচনা — 186

সময়তালিকা-৪ (১৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ — 189

বিষয় ৯ : শিল্পবিপ্লব — 196

বিষয় ১০ : দেশীয় অধিবাসীদের বিতাড়ন — 213

বিষয় ১১ : আধুনিকতার পথে — 231

উপসংহার — 260

Suggested Reading — 263

I

প্রারম্ভিক সমাজ

সময়ের সূচনা লগ্ন থেকে
লিখনশৈলী এবং নগরজীবন

প্রারম্ভিক সমাজ

EARLY SOCIETIES

এই অধ্যায়ে, আমরা প্রারম্ভিক সমাজ সম্পর্কিত দুটি বিষয় প্রসঙ্গে পড়ব। প্রথমত, সুদূর অতীতে লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে মানব জাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানব। তোমরা জানতে পারবে যে, সর্বপ্রথম আফ্রিকাতে কবে মানবজাতির আবির্ভাব হয়েছিল, এবং কিভাবে প্রত্নতত্ত্ববিদরা আদিমপর্বের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ বা অধ্যয়ন করেছিল হাড় ও পাথরের সরঞ্জামের সহায়তায়।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা আদিম মানবগোষ্ঠীর জীবন সম্পর্কে পুনঃনির্মাণ করার প্রয়াস করেছেন, প্রত্নতত্ত্ববিদরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন যে, মানবগোষ্ঠীরা কীরকম ঘরে বসবাস করত, কীভাবে তারা জন্তু জানোয়ারদের শিকার করত ও ফসল উৎপাদন করে কীভাবে খেত, এবং কী উপায়ে তারা নিজেদের ভাব প্রকাশ করত। তোমরা এটা ও লক্ষ করবে যে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ক্রমবিকাশ ভাষার প্রয়োগ ও আগুনের ব্যবহারের ফলে হয়েছিল এবং পরিশেষে, তোমরা দেখতে পাবে বর্তমান সময়ে ও যারা শিকার এবং উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত খাদ্য সামগ্রী দিয়ে নিজেদের ভরণ পোষণ করছে, তাদের জীবন ধারণ প্রণালী, আমাদেরকে অতীত বুঝতে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় বিষয়ে কিছু প্রাচীন নগরী যেমন, মেসোপটেমিয়া (বর্তমানে ইরাক নামে পরিচিত) এর কিছু নগরের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই নগর গুলির বিকাশ মন্দিরের আশপাশে হয়েছিল, এবং যেটা শহরের সুদূর বানিজ্য কেন্দ্রস্থল ছিল। প্রত্নতাত্বিক সাক্ষ্য অনুযায়ী পুরানো জনবসতির অবশিষ্টাবলি এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া লিখিতের সহায়তায়, তখনকার সময়ের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় যেমন শিল্পী, লেখক শ্রমিক, পুরোহিত, রাজা রানি প্রভৃতিদের জীবনের পুণনির্মাণ করার প্রয়াস করা হয়েছে। এখানে তোমরা লক্ষ্য করবে যে, কীভাবে সেই সব নগরের পশুচালক সম্প্রদায়ের লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই সম্পর্কে একটি চিন্তা করার প্রশ্ন আছে, যদি লিখিত কৌশলের বিকাশ না ঘটত, তাহলে বিভিন্ন নগরে হওয়া ক্রিয়া কাণ্ডগুলো কীভাবে সম্ভব হত।

তোমরা এইটা জেনে অবাক হবে যে, কীভাবে লক্ষ লক্ষ বৎসর পর্যন্ত জঙ্গালে, গুহায় অথবা অস্থায়ী ঘরে এবং প্রস্তরের ছাউনিতে থাকা মানুষ পরবর্তী সময়ে গ্রাম এবং অনেক ঘটনার সাথে সম্পর্ক যুক্ত, বা শহর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৫০০০ হাজার বছর পূর্বের ঘটনা।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রম পরিবর্তনের মধ্যে একটি ছিল ধীরে ধীরে যাযাবর জীবনযাপন ছেড়ে কৃষি কার্যের তাগিদে স্থায়ীভাবে বসবাস, যা শুরু হয়েছিল প্রায় ১০,০০০ (দশহাজার) বৎসর আগে। যেমন তোমরা প্রথম বিষয়ে দেখবে যে, কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করার পূর্বে মানুষ তার খাদ্যের উৎস হিসেবে বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে ফল সংগ্রহ করত। ধীরে ধীরে তারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ সম্পর্কে আরও জানতে পারল, যেমন উদ্ভিদ গুলি কোথায় জন্মায়, কোন্ ঋতুতে গাছগুলির মধ্যে ফল ধরে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখান থেকে তারা গাছ লাগানো এবং তা বড়ো করে তোলার কৌশল শিখে নিয়েছিল। পশ্চিম এশিয়াতে, গম এবং যব, মটর এবং বিভিন্ন প্রকারের ডাল উৎপাদন করা হত। পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে শস্য জাতীয় দ্রব্য জোয়ার, বাজরা এবং ধানের ফসলের চাষ খুব সহজে করা হত। জোয়ার বাজরা আফ্রিকাতেও উৎপাদন করা হত। ঠিক একই সময় মানুষ ভেড়া, ছাগল, গবাদি পশু, শুকর এবং গাধা এর মতো প্রাণীদের পোষ মানানো শিখেছিল। তখন উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত তন্তু জাতীয় বস্তু যেমন কার্পাস, শন এবং পশুদের শরীরের নির্গত আঁশ, যেমন-পশম প্রভৃতি দিয়ে কাপড় বোনা হতো। কিছুটা সময়, গরু, মহিষ, গাভিদের দিয়ে চাষবাস ও মাল গাড়ীর পরিবহণে তাদের ব্যবহার করা হত।

এই ঘটনাবলির ফল স্বরূপ আরও অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। যখন মানুষ ফসল উৎপাদন করতে জানল, তখন তাদের ফসল পাকা পর্যন্ত এক জায়গায় থাকতে হত। সুতরাং স্থায়ী ভাবে জীবন যাপন করা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল। এর সঙ্গে, মানুষ নিজের বসবাসের জন্য আরও মজবুত কাঠামো নির্মাণ করতে লাগল।

এই সময় কিছু সম্প্রদায়ের মানুষ মাটির পাত্র তৈরি করা শিখেছিল। তারা খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য উৎপাদিত ফসল মজুত করার জন্য এবং নতুন উৎপাদিত শস্য থেকে বিভিন্ন রকমের খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য এই মাটির পাত্রের ব্যবহার করা হত। প্রকৃতপক্ষে, তারা খাদ্য বস্তুকে অধিকমাত্রায় সুস্বাদু এবং সহজে পরিপক্ক বানানোর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করার পদ্ধতির উপর অধিক মনোযোগী হয়েছিল।

এবং তার সাথে পাথরের যন্ত্রপাতি তৈরির পদ্ধতির ও পরিবর্তন ঘটে। যদিও পূর্বেকার (আগের) পাথরের যন্ত্রপতি তৈরির পদ্ধতি ও চালু ছিল। কিন্তু কিছু যন্ত্রপাতি ও উপকরণ গুলোকে ঘর্ষণের বিশদ প্রক্রিয়ার দ্বারা মসৃণ ও সুন্দর করা হয়েছিল। অনেক নতুন উপকরণ তৈরিকরা হয়েছিল, যেমন খাদ্য বস্তুকে প্রক্রিয়াকরণ ও পেষনের জন্য হামানদিস্তার ব্যবহার করা হত। আবার কুড়ালের ব্যবহার হতো চাষের জমি সাফাই এর জন্য এবং বীজ বপনের জন্য নিড়ানী দিয়ে মাটি কর্ষণ করা হত।

কিছু কিছু জায়গায়, মানুষ ধাতব আকরিকের ব্যবহার করত যেমন- তামা ও টিনের প্রয়োগ করা শিখেছিল। কখনো কখনো তামার ধাতব আকরিককে সংগ্রহ করা হত, তাদের নীলাভ সবুজ রং এর স্বতন্ত্রতার জন্য। পরবর্তীকালে ব্যাপক ভাবে ধাতব বস্তু থেকে গহনা ও বিভিন্ন সাজ সরঞ্জামের বস্তু তৈরির রাস্তা পাওয়া গিয়েছিল।

দূরত্ববর্তী অঞ্চল (এবং সমুদ্র) থেকে উৎপন্ন হওয়া কিছু অন্য প্রকার বস্তু সম্পর্কে তাদের পরিচিতি আরও বেড়ে চলেছিল। এই বস্তু গুলির মধ্যে ছিল, কাঠ, পাথর, হীরা মণিমুক্তা, ধাতু সমূহ, এবং শঙ্খের জিনিস, ও কাঁচের মতো দেখতে কঠিন এক জাতীয় (Obsidian) অগ্নেয় শিলা বস্তু। স্পষ্টত মানুষেরা এই প্রকার বস্তু ও তাদের সম্পর্কে ধারণা সমৃদ্ধির জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছিল এবং বস্তু সমূহের প্রসার করছিল।

এইভাবে বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটছিল, গ্রাম ও শহরের বিকাশ হচ্ছিল, মানুষের চলাচলের যাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলশ্রুতি স্বরূপ পুরানো ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠী থেকে ছোটো ছোটো রাজ্য গঠিত হয়। যদিও এই পরিবর্তন ধীর গতিতে হয়েছিল, এবং এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে অনেক হাজার বৎসর লেগেছিল কিন্তু যখন প্রথম শহর স্থাপিত হয় এবং নগর বিকাশ হচ্ছিল তখন এই পরিবর্তনও তীব্রতর হচ্ছিল। এছাড়াও এই পরিবর্তন গুলির একটি সুদূর প্রসারী ফলাফল দেখা দিয়েছিল। কিন্তু জ্ঞানী জনেরা একে 'বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেছিল। কেননা মানুষের জীবন যাপনের সম্ভবতঃ এত পরিবর্তন চলে এসেছিল, যে তাদের চেনা মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। তোমরা প্রারম্ভিক ইতিহাসের দুটি বিপরীতমুখী ধারাকে নিয়ে অনুসন্ধান করলে দেখবে যে, পরিবর্তন গুলির পেছনে একটা ধারাবাহিকতা ছিল।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রারম্ভিক সমাজকে অধ্যয়নের জন্য নির্ধারিত কিছু উদাহরণ রয়েছে। এছাড়াও আরও অনেক প্রকার প্রারম্ভিক সমাজ ছিল, যেমন কৃষক সম্প্রদায় এবং পশুপালক, শিকারী সংগ্রাহক সম্প্রদায় এবং নগরে বসবাসকারী লোক।

সময় তালিকা-১
TIMELINE I

(৬ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে ১ খ্রিষ্টপূর্ব)

এই সময়সারণিতে মানবজাতির উদয়, গাছপালা উৎপাদন ও পশুপালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখানে কিছু মুখ্য প্রযুক্তিগত বিকাশের উপর আলোকপাত করা হয়েছে, যেমন আগুনের আবিষ্কার, ধাতুর প্রয়োগ, জমিতে লাঙ্গালের প্রয়োগ এবং চাকার আবিষ্কার প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়, এছাড়াও এই প্রক্রিয়ায় নগরের উদ্ভব এবং লিখন পদ্ধতির প্রয়োগের সম্পর্কেও বলা হয়েছে। এখানে তোমরা কিছু প্রাচীনতম সাম্রাজ্যের উল্লেখ পাবে, যার বিষয়বস্তু বিস্তারিত ভাবে সময়সারণি-II তে পাওয়া যাবে।

সময়সারণিকে কিভাবে অধ্যয়ন করব

তোমরা এই সময়সারণি, বই এর প্রত্যেকটি অধ্যায়ে পাবে। প্রত্যেক সময়সারণিতে পৃথিবীর ইতিহাসের মুখ্য প্রক্রিয়া এবং ঘটনা গুলিকে নির্দেশিত করা হবে।

সময়সারণি অধ্যয়নের সময় তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে—

- রাজাদের মধ্যে হওয়া যুদ্ধ সাপেক্ষ সেইসব প্রক্রিয়া বা ঘটনা, যার দ্বারা সাধারণ নারী এবং পুরুষের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল, সেই সময়কালকে নিরূপণ করা অনেক কঠিন ছিল।
- কিছু সময়কালে প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার অবস্থাকে নির্দেশিত করে বা তার পরিণতিতে পৌঁছানোর অবস্থাকে নির্দেশিত করে।
- ঐতিহাসিকেরা প্রতিনিয়ত নতুন-নতুন সাক্ষ্য এর সহায়তায় সময়কালের সংশোধনী করছে, অথবা পুরানো সময়কালের নির্ধারণ করার জন্য নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হচ্ছে।
- যদিও আমরা সুবিধার জন্য ভৌগোলিক ভিত্তির উপর সময়সারণি কে বিভাজন করব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক বিকাশ প্রায়ই এই বিভাজনগুলোকে অতিক্রম করে।
- ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতে সময়সারণি প্রায়ই উপর নীচে বা অতিব্যাপিত (Overlapping) হয়ে থাকে।
- মানব ইতিহাসের কিছু যুগান্তকারী ঘটনাকে এখানে দেখানো হয়েছে-এই সব প্রক্রিয়ার বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে, যেগুলোর আলাদা সময়সারণিও আছে।
- এখানে তোমরা একটি * দেখতে পাবে, যেখানে তোমরা দেখবে চিত্রটি স্তম্ভের (Column) মধ্যে দেওয়া তারিখের সাথে সম্পর্ক যুক্ত।
- সময়সারণিতে দেওয়া শূন্য জায়গাগুলোর অর্থ এটা নয় যে, সেই সময় কিছুই ঘটেনি, কখনো এই গুলি আমাদের বলে দেয়, তখন কী ঘটেছিল তা এখনো পর্যন্ত আমাদের অজানা।
- পরবর্তী বৎসর আমরা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এবং বিশেষভাবে ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে বিশদ আকারে অধ্যয়ন করব। দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে দেওয়া নির্ধারিত তারিখগুলো সেই উপমহাদেশের মধ্যে হওয়া কিছু বিকাশকে নির্দেশিত করে।

সময়পঞ্জি	আফ্রিকা	ইউরোপ
৬ লক্ষ বর্ষপূর্ব ৫০০,০০০ বর্ষ বর্তমান থেকে পূর্ব	অস্ট্রেলোপিথোকাসের জীবাশ্ম (বর্তমান থেকে 56 লক্ষ বর্ষপূর্বে) আগুনের ব্যবহারের সাক্ষ্য পাওয়া যায় (বর্তমান থেকে 1.4 লক্ষ বর্ষপূর্বে)	
৫০০,০০০-১৫০,০০০ বর্ষ বর্তমান থেকে পূর্বে	(হোমোসেপিয়ান্স) এর জীবাশ্ম (১৯৫,০০০ বর্তমান থেকে পূর্বে)	আগুনের ব্যবহারের সাক্ষ্য ৪০০,০০০ বর্তমান থেকে পূর্বে
১৫০,০০০-৫০,০০০ বর্ষ বর্তমান থেকে পূর্বে		মানুষের প্রাচীন প্রজাতি (হোমো সেপিয়ান্স) এর জীবাশ্ম (৪০,০০০)
৫০,০০০-৩০,০০০		
৩০,০০০-১০,০০০	গুহায় বা প্রস্তরের ছাউনিতে বসবাসকারী আদিবাসীদের চিত্রাঙ্কন (২৭,৫০০)	গুহায় / প্রস্তরের ছাউনিতে বসবাসকারী আদিবাসীদের চিত্রাঙ্কন (বিশেষ করে ফ্রান্স ও স্পেন এর মধ্যে)
৮০০০-৭০০০ খ্রি:পূ:	গবাদি পশু এক এক কুকুরদের পোষ মানানো হয়েছিল।	
৬০০০-৫০০০		গম ও যব এর চাষ (গ্রিস)
৫০০০-৪০০০		
৪০০০-৩০০০	গাধাকে পোষ মানানো হয়েছিল, জোয়ার-বাজরা প্রভৃতির চাষ, তামার প্রয়োগ।	তামার প্রয়োগ (ক্রিট)
৩০০০-২০০০	লাঙ্গল দ্বারা কৃষি, প্রথম রাজবংশ, শহর, পিরামিড, ক্যালেন্ডার, চিত্রাক্ষর, প্যাপিরাসের উপরে লিখিত হস্তলিপি (মিশর)	ঘোড়াকে পোষ মানানো হয়েছিল (পূর্ব ইউরোপ)
২০০০-১৯০০		নগর, প্রাসাদ, ব্রোঞ্জের প্রয়োগ কুসোরের চাকা, বানিজ্যের বিকাশ (ক্রিট)
১৯০০-১৮০০		
১৮০০-১৭০০		
১৭০০-১৬০০		লিপির বিকাশ (ক্রিট)
১৬০০-১৫০০		
১৫০০-১৪০০	কাচের বোতলের প্রয়োগ (মিশর)	
১৪০০-১৩০০		
১৩০০-১২০০		
১২০০-১১০০		
১১০০-১০০০		লোহার ব্যবহার শুরু হয়
১০০০-৯০০		
৯০০-৮০০	পশ্চিম এশিয়ার ফোনিশিয়ানবা লোকের উত্তর আফ্রিকাতে কার্থেজ নগরের সূচনা করেন, ভূ-মধ্য সাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যের বিস্তার।	
৮০০-৭০০	লোহার ব্যবহার (সুদান)	প্রথম অলিম্পিক খেলা (গ্রিস ৭৭৬ খ্রি;
৭০০-৬০০	লোহার ব্যবহার (মিশর)	
৬০০-৫০০		মুদ্রার ব্যবহার (গ্রিস) রোম গনরাজ্যের স্থাপনা/ সূচনা (৫১০ খ্রি:পূ:)
৫০০-৪০০	পারসিকদের দ্বারা মিশর আক্রমন।	এথেন্সে 'গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (গ্রিস)
৪০০-৩০০	মিশরে আলেকজান্দ্রিয়ার (alexandria) প্রতিষ্ঠা (১৩২খ্রি.পূ.) এটা শিখনের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়েছিল।	ম্যাসিডন প্রদেশের (Macedonia) আলেকজেন্ডার মিশর এর পশ্চিম এশিয়ার এলাকাগুলো জয় করেছিল (৩৩৬—৩২৩ খ্রি.পূ.)
৩০০-২০০		
২০০-১০০		
১০০-১ খ্রি:পূ:		

সময়পঞ্জি	এশিয়া	দক্ষিণ এশিয়ার
৬ লক্ষ বর্ষপূর্ব ৫০০,০০০ বর্ষ বর্তমান থেকে পূর্বে	আগুনের ব্যবহার (৭০০,০০০ বর্তমান থেকে পূর্ব, চিন)	রিওয়াতে প্রস্তরযুগের স্থান (১,৯০০,০০০ বর্তমান থেকে পূর্ব, পাকিস্তান)
৫০০,০০০-১৫০,০০০ বর্ষ বর্তমান থেকে পূর্বে		
১৫০,০০০-৫০,০০০ বর্ষ বর্তমান থেকে পূর্বে	প্রাচীন মানুষের (*Homo sapiens*) জীবাশ্ম (১০০,০০০ বর্তমান থেকে পূর্ব, পশ্চিম এশিয়া)	
৫০,০০০-৩০,০০০		
৩০,০০০-১০,০০০	কুকুরদের পোষ মানানো হয়েছিল (১৪,০০০, পশ্চিম এশিয়া)	ভীমবেটকা (Bhiwbetka) গুহা চিত্র (মধ্যপ্রদেশ) হোমো সেপিয়াশ এর জীবাশ্ম (২৫,৫০০ বর্তমান থেকে পূর্ব শ্রীলঙ্কা)
৮০০০-৭০০০ খ্রি:পূ:	ছাগল ও ভেড়াদের পোষ মানানো হয়, গম এবং যব এর চাষ (পশ্চিম এশিয়া)	
৭০০০-৬০০০	শুকর এবং গবাদি পশুদের পোষ মানানো হয়েছিল (পশ্চিম এশিয়া)	প্রারম্ভিক কৃষি বসতি (বালুচিস্তান)
৬০০০-৫০০০	পাখির ছানা পালন, জোয়ার বাজরা এবং মিষ্টি আলুর (yam) চাষ (পূর্ব এশিয়া)	
৫০০০-৪০০০	কার্পাসের চাষ (দক্ষিণ এশিয়া) তামার ব্যবহার (পশ্চিম এশিয়া)	
৪০০০-৩০০০	কুমোরের চাকার প্রয়োগ, (৩৬০০ খ্রি.পূ.) লিখনের প্রয়োগ (৩২০০ খ্রি.পূ. মেসোপটেমিয়া), ব্রোঞ্জের ব্যবহার	তামার ব্যবহার
৩০০০-২০০০	কৃষিতে লাঙ্গালের ব্যবহার, নগর (মেসোপটেমিয়া) রেশমবস্ত্র তৈরি (চিন) ঘোড়াদের পোষ মানানো হয়। (মধ্য এশিয়া) - ধান চাষ (দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া)	হরপ্পা সভ্যতা সময়, লিপির প্রয়োগ (প্রায় ২৭০০ খ্রি.পূ.)
২০০০-১৯০০	জলে বসবাসকারী বিশেষ একপ্রকার মহিষদের পোষ মানানো হয়েছিল (পূর্ব এশিয়া)	
১৯০০-১৮০০		
১৮০০-১৭০০		
১৭০০-১৬০০		
১৬০০-১৫০০	নগর, লিখন, রাজ্য (সুঙ্গা রাজ্যকেশের সাম্রাজ্য) ব্রোঞ্জের ব্যবহার (চিন)	
১৫০০-১৪০০	লোহার ব্যবহার (পশ্চিম এশিয়া)	ঋকবেদের রচনা
১৪০০-১৩০০		
১৩০০-১২০০		
১২০০-১১০০		লোহার ব্যবহার, বৃহদাকারের প্রস্তর (megaliths) (দাক্ষিণাত্য (deccan) এবং দক্ষিণ ভারত)
১১০০-১০০০	এক কুঁজওয়ালা উটদের পোষ মানানো হয়েছিল (আরব)	
১০০০-৯০০		
৯০০-৮০০		
৮০০-৭০০		
৭০০-৬০০		
৬০০-৫০০	মুদ্রার ব্যবহার (তুর্কী) পারস্য সাম্রাজ্য (৫৪৬ খ্রি. পূ.) যার রাজধানী পার্সিপোলিস ছিল; চিনা দার্শনিক কনফুসিয়াস (প্রায় ৫৫১ খ্রি.পূ.)	বিভিন্ন স্থানে নগর এবং রাজ্যের প্রতিষ্ঠা প্রথম বার মুদ্রার প্রয়োগ জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার
৫০০-৪০০		
৪০০-৩০০		মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (প্রায় ৩২১ খ্রি.পূ.)
৩০০-২০০ ২০০-১০০	চিনে একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (২২১ খ্রি.পূ.) চিনের বিশাল প্রাচীরের নির্মান কাজ আরম্ভ	
১০০-১ খ্রি:পূ:		

সময়পঞ্জি	আমেরিকা	অস্ট্রেলিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ
৬ লক্ষ বর্ষপূর্ব ৫০০,০০০ বর্ষ বর্তমান থেকে পূর্বে		
৫০০,০০০-১৫০,০০০ বর্ষ		
বর্তমান থেকে পূর্বে		
১৫০,০০০-৫০,০০০ বর্ষ বর্তমান থেকে পূর্বে		
৫০,০০০-৩০,০০০		হোমো সেপিয়ান্সের (বর্তমান মানুষের প্রাচীন প্রজাতি) জীবাস্ম, সমুদ্র যাত্রার প্রাচীনতম সঙ্কেত (৪৫,০০০ বর্ষ বর্তমান থেকে পূর্বে)
৩০,০০০-১০,০০০	হোমো সেপিয়ান্সের জীবাশ্ম (১২,০০০ বর্ষ বর্তমান থেকে পূর্বে)	চিত্রাঙ্কন (২০,০০০ বর্ষ বর্তমান থেকে পূর্বে)
৮০০০-৭০০০ খ্রি:পূ:		
৭০০০-৬০০০	স্কোয়াশের চাষ	
৬০০০-৫০০০		
৫০০০-৪০০০	শিমের চাষ	
৪০০০-৩০০০	কার্পাস এবং লাউ এর চাষ	
৩০০০-২০০০	গিনিপিগ এবং টার্কি পাখিদের (বিশালাকার এক প্রকার পাখি ব্রিটেন এবং আমেরিকায় পাওয়া যায়) পোষ মানানো হয়, ভুট্টার চাষ।	
২০০০-১৯০০	আলু, মরিচ, কাসাভা, চিনাবাদামের চাষ, লামা এবং আলপাকা জন্তুদের লোম দিয়ে ওলের জিনিষ তৈরি হয়) পোষ মানানো হয়।	
১৯০০-১৮০০		
১৮০০-১৭০০		
১৭০০-১৬০০		
১৬০০-১৫০০		
১৫০০-১৪০০		
১৪০০-১৩০০		
১৩০০-১২০০		
১২০০-১১০০	মেক্সিকো উপসাগরের কাছাকাছি ওলামকদের বসতি স্থাপন, প্রাচীন মন্দির এবং মূর্তি শিল্প	পলিনেশিয়া এবং মাইক্রোনেশিয়ার মধ্যে বসতি স্থাপন।
১১০০-১০০০		
১০০০-৯০০	চিত্রাত্মক (hieroglypic) লিপির বিকাশ	
৯০০-৮০০		
৮০০-৭০০		
৭০০-৬০০		
৬০০-৫০০		
৫০০-৪০০		
৪০০-৩০০		
৩০০-২০০		
২০০-১০০		
১০০-১ খ্রি:পূ:		

কার্যকলাপ

প্রত্যেক ছক থেকে একটি সময়কাল বাছাই করো এবং সেই অঞ্চলে বসবাসকারী পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য সেই সময়ের প্রক্রিয়া ঘটনার কী তাৎপর্য ছিল, তার উপর আলোচনা করো।

বিষয়
১

সময়ের সূচনালগ্ন থেকে

FROM THE BEGINNING OF TIME

এই অধ্যায়ে মানবজাতির অস্তিত্ব কি ভাবে শুরু হয়েছে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটা ছিল ৫৬ লক্ষ বর্ষ পূর্বে যখন সর্বপ্রথম মানুষের মত প্রাণীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। এর পর মানবজাতির বিভিন্ন রূপের পরিবর্তন হয় এবং কালের অন্তরে তার অবলুপ্তি ঘটে। আজ আমরা মানব জাতিকে যে রূপে দেখতে পাই (যাকে 'আধুনিক মানুষ' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল) তাদের উৎপত্তি প্রায় ১,৬০,০০০ বৎসর আগে হয়েছিল। মানব ইতিহাসের এই দীর্ঘকালীন সময়ে, তারা খাদ্য পেত হয় মৃত পশুর মাংস থেকে না হয় পশু শিকার করে এবং গাছপালা উৎপাদনের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে তারা পাথর থেকে যন্ত্রপাতি তৈরী এবং একে অপরের সাথে আদান প্রদান করতে শিখেছে।

তথাপি খাদ্য গ্রহণ করার অন্য উপায় পরবর্তী সময়ে আয়ত্ত করা হয়, কিন্তু তখন ও শিকার এবং সংগ্রহণ অব্যাহত ছিল। এক শ্রেণির শিকারী সংগ্রাহক সমাজ (Hunter-Gatherer Society) আছে যারা শিকার এবং সংগ্রহের মাধ্যমে নিজেদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে। বর্তমান সময়ের শিকারী সংগ্রাহকদের জীবন-শৈলী আমাদের অতীত সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দেয়।

প্রাচীন মানুষের ইতিহাসকে আমরা জানতে পারি, মানবদেহের জীবাশ্ম, পাথরের যন্ত্রপাতি, এবং বিভিন্ন গুহা চিত্র থেকে। প্রত্যেক আবিষ্কারেরই নিজস্ব একটি ইতিহাস আছে। যখন এইসব অনুসন্ধান সর্বপ্রথম করা হয়েছিল তখন অধিকাংশ পণ্ডিতেরা এটা মানতে অস্বীকার করেছিলেন যে, জীবাশ্ম গুলো প্রাচীন মানুষের ছিল। প্রাচীন মানুষের দ্বারা পাথরের উপকরণ তৈরি এবং গাছপালা উৎপাদনের সক্ষমতা নিয়ে পণ্ডিত সমাজের মধ্যে সংশয় ছিল। অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এইসব অনুসন্ধানের তাৎপর্য উপলব্ধি করা হয়।

জীবাশ্ম হল খুব পুরানো উদ্ভিদ, প্রাণী বা মানুষের অবশেষ বা ছাপ যা পাথরে পরিণত হয়েছে। এইগুলো প্রায়ই পাওয়া যায় শিলার মধ্যে এবং এইগুলো শিলার মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে প্রায় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে।

'প্রজাতি' হল এমন একটি প্রাণীর সম্প্রদায় যেখানে স্ত্রী এবং পুরুষ মিলে তাদের সন্তানের জন্ম দিতে পারে। একটি প্রজাতির সদস্য অন্য একটি প্রজাতির সদস্যের সাথে মিলে সন্তানের জন্ম দিতে পারত না।

মানববিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায় মানব প্রজাতির জীবাশ্ম থেকে যা আজ প্রায় অবলুপ্ত। জীবাশ্মগুলোর কালের নির্ধারণ প্রত্যক্ষ রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অথবা পরোক্ষ ভাবে কাল নির্ধারিত হয়, সেই জায়গায় এই গুলো সমাধিত অবস্থায় পাওয়া যায়। একবার জীবাশ্মগুলোর কাল নির্ধারণ করার পর, মানব বিবর্তনের ক্রম নির্ধারণের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

প্রায় ২০০ বৎসর আগে, যখন সর্বপ্রথম এই রকম অনুসন্ধান করা হয়, তখন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিরা এটা মানতে অনিচ্ছুক ছিলেন যে, খনন কার্যের ফলে পাওয়া জীবাশ্ম এবং পাথরের যন্ত্রপাতি ও অঙ্কিত বস্তু বাস্তবে মানুষের প্রাচীন রূপের সাথে সম্পর্কিত। পণ্ডিত ব্যক্তিদের এই অনিচ্ছা সাধারণত বাইবেলের পুরানো নিয়মে উল্লেখিত ধর্ম বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। বাইবেল অনুসারে ধারণা করা হয় যে, মানুষের উৎপত্তি ছিল ঈশ্বরের সৃষ্ট একটি কাজ। উদাহরণ স্বরূপ, আগস্ট ১৮৫৬ জার্মানির ডুসেলডর্ফ শহরের কাছাকাছিতে যখন শ্রমিকেরা নিয়াণ্ডার উপত্যকায় (মানচিত্র-২ এবং পৃষ্ঠা নং-১৮-১৯ দেখো) চুনাপাথরের খনির খোদাই করছিল, তখন তারা একটি মাথার খুলি এবং কিছু কঙ্কালের টুকরো পেয়েছিল। সন্ধানকৃত এই বস্তুসমূহ স্থানীয় একজন স্কুল শিক্ষক কার্ল ফুলরেটের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল, যিনি একজন প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক ছিলেন, এবং পরবর্তী সময়ে তিনি অনুধাবন করলেন যে, সন্ধানের ফলে পাওয়া কঙ্কাল সমূহ আধুনিক মানুষের ছিল না। এর পরবর্তী

সময়ে তিনি প্লাস্টারের মাধ্যমে সেই খুলি ও কঙ্কাল সমূহের একটি ছাঁচ বানিয়েছিলেন এবং সেইগুলো বুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক হরমন সাফহোসেন এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। পরের বছর তারা যৌথভাবে একটি দলিল প্রকাশ করেন, যার মধ্যে দাবি করা হয়েছিল যে এই খুলি ও কঙ্কাল সমূহ এই রূপ মানুষের ছিল যা বর্তমানে অবলুপ্ত। কিন্তু সমসাময়িক পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই ধারণাকে স্বীকার করার পরিবর্তে ঘোষণা করলেন যে প্রাপ্য মাথার খুলি ও কঙ্কাল সমূহ অতি সম্প্রতি কালের কোন এক ব্যক্তি বিশেষের মাত্র।

জীবাশ্মের পুনরুদ্ধার করা একটি কঠিন প্রক্রিয়া। সন-তারিখ নির্ণয়ের জন্য আবিষ্কারের সুনির্দিষ্ট স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ

উপরের দেওয়া ছবিটিতে এমন উপকরণ দেখানো হয়েছে, যেটা সন্ধানকৃত বস্তু সমূহের অবস্থান জানার জন্য প্রয়োগ করা হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদের বাঁ দিকে যে বর্গাকার কাঠামো (Frame) দেখানো হয়েছে, সেটা ১০ সেমি বর্গে বিভক্ত একটি জালি। এই বর্গাকার কাঠামোটিকে সন্ধানকৃত বস্তুর জায়গার মধ্যে স্থাপন করলে সেই বস্তুর অনুভূমিক অবস্থান জানা যায়। ছবির ডান দিকে দেখানো ত্রিভুজাকার উপকরণটি বস্তুর উল্লম্ব অবস্থান বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উপরের ছবিটিতে দেখানো হয়েছে পার্শ্ববর্তী পাথর থেকে কিভাবে জীবাশ্মের টুকরো সংগ্রহ করা হয় এক্ষেত্রে বিভিন্ন চুনাপাথরের উপর জীবাশ্মের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। তোমরা দেখতে পারছ যে, এই কাজে কতটুকু দক্ষতা ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়।

১৮৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর যখন চার্লস ডারউইনের মানুষের উৎপত্তি সংক্রান্ত পুস্তক "on the origin of species" প্রকাশিত হয়, তখন মানুষের ক্রম বিবর্তনের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ১২৫০টি প্রতিলিপি একদিনেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এই পুস্তকের মধ্যে চার্লস ডারউইন দাবি করেছিলেন যে, মানুষ বহুকাল আগে পশু থেকে ক্রমবিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপে এসেছে।

কার্যাবলি -১

অধিকাংশ ধর্মীয় গ্রন্থে মানবজাতির উৎপত্তি সম্পর্কিত গল্প বর্ণিত আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাথে তাদের মিল পাওয়া যেতনা প্রায়ই। এই রকম কিছু ধর্মীয় গল্প খুঁজে বের করো এবং তার সাথে এই অধ্যায়ে বর্ণিত মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের তুলনা করো।

নিয়ানডারথাল মানুষের মাথার খুলি। কিছু ব্যক্তিবর্গ এই মাথার খুলির প্রাচীনতাকে অস্বীকার করেছে এবং বলা হয়েছে যে, এই খুলিটি 'মূর্খ' বা 'জড়বুদ্ধি' সম্পন্ন বন্য প্রাণীর।

মানুষের ক্রমবিবর্তনের কাহিনি

(ক) আধুনিকমানুষেরপূর্বপুরুষ

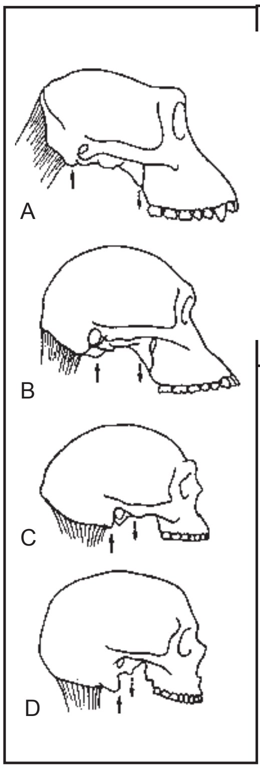

এই চারটি মাথার খুলির দিকে তাকাও।

A তে যে খুলিটি দেওয়া হয়েছে, সেটি উল্লুকের বা বানর জাতীয় প্রাণীর।

B- তে যেই খুলিটি দেখানো আছে, সেটি অস্ট্রালোপিথকাস নামক প্রজাতির (নিচে)।

C- তে যেই খুলিটি দেখানো আছে, সেটি হল হোমা-ইরেক্টাস নামক প্রজাতির (সম্পূর্ণরূপে সোজা হয়ে হাঁটতে পারে এমন মানুষ)।

D- তে যে খুলিটি দেখানো আছে, সেটি হল হোমোসেপিয়ান্স নামক প্রজাতির (চিন্তাশীল / জ্ঞানীব্যক্তি) বর্তমান যুগের মানব সম্প্রদায় এই প্রজাতিভুক্ত।

এই চারটি চিত্র দেখার পর যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। এই ক্ষেত্রে তোমরা প্রথমে খুলি, চোয়াল এবং দাতেঁর গঠন ভালো ভাবে লক্ষ কর।

চিত্রতে দেখানো মাথায় খুলিগুলোর গঠনের মধ্যে যেই পার্থক্য লক্ষ করছো, তা হল মানুষের বিবর্তনের ফলস্বরূপ কিছু পরিবর্তন। মানুষের ক্রমবিবর্তনের কাহিনি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং জটিল একটি প্রক্রিয়া। এমন অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলোর উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি এবং নতুন নতুন প্রাপ্ত তথ্য এবং সামগ্রী থেকে প্রতিনিয়ত পুরানো ধ্যানধারনার সংশোধন এবং পরিবর্তন করতে হচ্ছে। এসো কিছু ঘটনাবলি তথা পরিবর্তন ও তার প্রভাবকে আরও বিশদভাবে জানতে চেস্টা করি।

মানুষের বিকাশের ক্রমবিবর্তনের ধারাকে ৩৬০ থেকে ২৪০ লক্ষ বছরের আগে থেকে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। কখনো কখনো আমাদের জন্য এই দীর্ঘ সময়ের প্রক্রিয়া কল্পনা করা ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যদি তোমরা বই এর একটি পৃষ্ঠাকে ১০,০০০ বছরের কাছাকাছি ধারনা করো, তবে ১০ পৃষ্ঠা হবে ১ লক্ষ বছরের কাছাকাছি, এবং একশত পৃষ্ঠা হবে ১০ লক্ষ বৎসরের কাছাকাছি। এই রকমভাবে ৩৬০ লক্ষ বৎসরের সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য তোমাদের ৩৬০০ পৃষ্ঠার একটি বই এর কল্পনা করতে হবে। এটা সেই সময় ছিল যখন এশিয়া এবং আফ্রিকায় স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মধ্যে বনমানুষ (primates) শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। এরপর প্রায় ২৪০ লক্ষ বছর আগে বনমানুষ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত এক উপগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল যাকে হোমিনিয়ডস (Hominiods) বলা হত। এই উপগোষ্ঠীর মধ্যে বানর অথাৎ শিম্পাঞ্জি, গরিলা এই গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং অনেক সময় পরে প্রায় ৫৬ লক্ষ বৎসর আগে, আমরা প্রথমে হোমিনিডস প্রাণির অস্তিত্বের প্রমাণ পাই।

স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোষ্ঠীর অর্ন্তগত এক উপগোষ্ঠী হল বনমানুষ (Primates)। এই বনমানুষ উপগোষ্ঠীর অর্ন্তগত হল বানর, উল্লুক এবং মানুষ। তাদের শরীরের মধ্যে চুল থাকে, বাচ্চা জন্মানোর অনেক আগে থেকেই দীর্ঘ সময় ধরে বাচ্চা মায়ের গর্ভে থাকে। বাচ্চাদেরকে দুধ পান করানোর জন্য মায়েদের শরীরে একধরনের গ্রন্থি থাকে। বনমানব গোষ্ঠী প্রাণির দাঁতের গঠন ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, এবং শরীরে অনবরত তাপমাত্রা ধরে রাখার ক্ষমতা আছে এই প্রজাতিগুলোর।

হোমিনিডস বর্গ হোমিনিয়ডস উপগোষ্ঠী থেকে বিকশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক সাধারণ সাদৃশ্য পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্যও ছিল। হোমিনিয়ডসদের তুলনায় হোমিনিডসদের মস্তিষ্কের আকৃতি ছোট ছিল। তারা (Hominiods) ছিল চতুস্পদ, অর্থাৎ চারটি পায়ের সাহায্যে হাঁটতে পারত। কিন্তু তাদের শরীরের অগ্রভাগ এবং অগ্রপদ নমনীয় (Flexible) ছিল। বিপরীত দিকে, হোমিনিডস বর্গ সোজা হয়ে চলাচল করতে পারত এবং দুই পা এর সাহায্যে তারা হাঁটতে পারত। তাদের হাতের গঠন বিশেষ রকমের হতো, যার সাহায্যে তারা বিভিন্ন বস্তুতেরি এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে পারত। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে, তাদের তৈরি করা উপকরণ এবং এই গুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করব। দুটি তথ্য থেকে জানতে পারি যে, হোমিনিডসদের উদ্ভব আফ্রিকাতেই হয়েছিল। প্রথমত আফ্রিকার বানর শ্রেণির (Ape) সাথে হোমিনিডদের একটা গভীর মিল খুজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, সবচেয়ে প্রাচীনতম হোমিনিডস জীবাশ্ম, যা অস্ট্রালোপিথলস বংশের (Genus) তা পূর্ব আফ্রিকাতে পাওয়া গেছে এবং যার সময়কাল মোটামুটি ৫৬ লক্ষ বছর পূর্বে ছিল এটা ধারণা করা হয়। এর বিপরীতে বলা হয়, আফ্রিকার বাইরে থেকে যে জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তা ১৮ লক্ষ বৎসরের বেশি পুরোনো নয়।

THE EVOLUTION OF THE HAND

ক) A- চিত্রটিতে শিম্পাঞ্জির হাতের শিথিল মুঠোকে দেখানো হয়েছে।

খ) B-তে হোমিনিডদের হাতের শিথিল মুঠোকে স্পষ্ট ভাবে দেখানো হয়েছে।

গ) C- তে মানুষের হাতের শক্তিশালী মুঠোকে দেখানো হয়েছে।

হাতের শক্তিশালী মুঠোর বিবর্তন সম্ভবত শিথিল মুঠোর ঠিক আগে হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

শিম্পাঞ্জির হাতের শিথিল মুঠোর সাথে মানুষের হাতের মুঠোর তুলনা করো।

একটি তালিকা তৈরি করো যে যে কাজে তোমরা শিথিল মুঠোর প্রয়োগ করে থাক এবং আর কোন কোন কাজ করতে গিয়ে তোমরা শক্ত মুঠোর প্রয়োগ করে থাক।

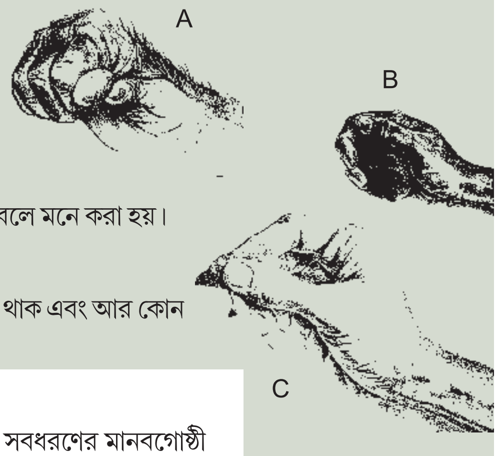

‘হোমিনিড’ গোষ্ঠী হোমিনিডয় নামক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, এই পরিবারের মধ্যে সবধরণের মানবগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত। হোমিনিডসদের অনেক রকমের বিভিন্নতা ছিল, যেমন বিশাল আকৃতির মস্তিষ্ক, সোজাভাবে চলাচল করা, দু পায়ে চলাফেরা, এবং হাতের গঠনের বিশেষত্ব।

হোমিনিডসদের আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে, যারা জিনস্ (Genus) নামে পরিচিত। এই শাখাগুলোর মধ্যে অস্ট্রলোপিথিকাস এবং হোমো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রত্যেকটি শাখার মধ্যে আবার কয়েক রকমের প্রজাতি আছে। মস্তিষ্কের আকার, চোয়াল এবং দাঁতের গঠন দিয়ে অস্ট্রলোপিথিকাস এবং হোমো-র মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। অস্ট্রলোপিথিকাসের মস্তিষ্কের আকৃতি হোমোদের মস্তিষ্কের আকৃতি অপেক্ষা অনেক বড়, চোয়াল অনেক ভারী এবং দাঁতও অনেক বড় আকারের হয়।

হোমিনিয়ডরা বানরদের চাইতে বিভিন্ন দিক থেকে আলাদা ছিল। হোমিনিয়ডদের দীর্ঘাকৃতির শরীর এবং তাদের কোন লেজ ছিল না। পাশাপাশি হোমিনিয়ডদের বিকাশ এবং নির্ভরতার সময়ও অনেক দীর্ঘ ছিল।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রজাতি সমূহের যে সমস্ত নাম বৈজ্ঞানিকরা দিয়েছেন, তা সবগুলো ‘ল্যাটিন’ এবং ‘গ্রীক’ শব্দ থেকে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ, অস্ট্রলোপিথিকাস নামটি ল্যাটিন শব্দ অস্ট্রাল (Austral) থেকে এসেছে, যার অর্থ হল ‘দক্ষিনী’ এবং গ্রীক শব্দ ‘পিথকাস’ যার অর্থ হল বানর প্রজাতি (Ape)। এই নামগুলো এ জন্য দেওয়া হয়েছিল যে মানুষের গঠনের মধ্যে এই বানরের (Ape) অনেক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যেমন হোমোদের তুলনায় মস্তিষ্কের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়া, মুখের পেছন দিকের দাঁত বড় হওয়া এবং হাতের সীমিত ক্ষমতা। তাদের সোজা হয়ে হাঁটার ক্ষমতাও বেশি ছিল না, তারা বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করত

এই দৃশ্যটি হল পূর্ব আফ্রিকার অল্ডুভাই জর্জের, রিফ্ট উপত্যকা অঞ্চলের। এটি সেই এলাকার মধ্যে একটি, যেখানে আদিম মানুষের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। (মানচিত্র ১(খ) পৃষ্ঠা নং ১৪তে দেখো) ছবিটির কেন্দ্রস্থলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের অবস্থান লক্ষ করো। প্রত্যেকটি স্তর একটি স্বতন্ত্র ভূতাত্ত্বিক পর্যায় নির্দেশ করে।

গাছের মধ্যে। গাছের মধ্যে জীবন যাপনের জন্য তাদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থেকে গেছে। যেমন- দীর্ঘাকৃতির পা, বাঁকা হাত, পায়ের হাড়, এবং পায়ের গোড়ালির গঠন। পরবর্তী সময়ে উপকরণ তৈরি এবং দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে চলার প্রক্রিয়া যত এগিয়েছে, ততই মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ক্রমাগত বিকাশ ঘটেছে।

অস্ট্রলোপিথকাসের অনুসন্ধান, অল্ডুভাই জর্ড, ১৭ জুলাই ১৯৫৯

অল্ডুভাই জর্জের প্রথম অনুসন্ধান (পৃষ্ঠা নং14 তে দেখো) বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জার্মানির একজন প্রজাপতি সংগ্রাহকের দ্বারা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অল্ডুভাই জর্জকে মেরী এবং লুইস লেকী এর নামের সাথে জানা যায়, যারা এখানে প্রায় ৪০ বছরের ও অধিক কাজ করেছিলেন। মেরী লেকীই ছিলেন একমাত্র প্রত্নতত্ত্ববিদ যিনি অল্ডু ভাই এবং লেওতোলি (Leatoli) তে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের পরিচালনা করেছিলেন এবং তিনি কিছু বিস্ময়কর অনুসন্ধানের বর্ণনা এই ভাবে দিয়েছিলেন!

সেদিন সকালে যখন আমি ঘুম থেকে উঠি তখন আমার মাথা ব্যথা এবং সামান্য জ্বর অনুভূত হচ্ছিল। অনিচ্ছাহেতু আমাকে সেই শিবিরে থাকতে হয়েছিল। যেহেতু আমি সেদিন কাজে যাইনি, সেহেতু মেরীর কাজে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। আমাদের কাজ সম্পন্ন করার জন্য মাত্র সাত সপ্তাহ সময় পাওয়া গিয়েছিল। এই সময়টা খুব দ্রুত চলে যাচ্ছিল। সেই জন্য মেরী তার দুটি কুকুর সেলী এবং টুটস এর সাথে ল্যান্ড-রোভারে (জীপ গাড়ির মতো) করে খনন কার্যের জন্য বেরিয়ে গিয়েছিল। এবং আমি অস্থির অবস্থায় শিবিরে দিনটি কাটাচ্ছিলাম।

কিছুটা সময়ের পরে সম্ভবত আমার তন্দ্রা ভাব কেটে যাওয়ার পর আমি শুনতে পাই ল্যান্ড রোভার গাড়ীটি খুব দ্রুত গতিতে শিবিরের দিকে আসছে। মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছিল আমি স্বপ্ন দেখছি। মনে হচ্ছিল মেরীকে শত কাকড়াবিছা কামড়ে দিয়েছে, না হলে কোন বিষাক্ত সাপ দংশন করেছে, যেটা কুকুর দুটির নজর এড়িয়ে গিয়েছিল।

ল্যান্ড রোভার গাড়ীটি ঘর্ঘর শব্দ করে এসে থামে। আমি শুনতে পাই মেরী ক্রমাগত উচ্চস্বরে বলছিল— "আমি তাকে পেয়েছি! আমি তাকে পেয়েছি! আমি তাকে পেয়েছি!" তখন ও আমি মাথা ব্যথায় অস্থির ছিলাম, তাই আমি তার কথার অর্থ বুঝতে পারছিলাম না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম "কি পেয়েছ তুমি? তুমি কি চোট পেয়েছ?" তখন মেরী বলল, "এই সেই লোকটা! আমাদের লোক! যাকে আমরা দীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরে খুঁজ ছিলাম। তাড়াতাড়ি এসো, আমি তার দাঁত খুঁজে পেয়েছি।

'ফাইন্ডিং দ্য ওয়ার্ল্ড আরলিয়েস্ট ম্যান' থেকে নেওয়া, লেখক এল. এস. বি. ল্যাকি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, ১১৮(সেপ্টেম্বর ১৯৬০)

আদিম মানুষের অবশেষগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। হাড়ের গঠনের উপর নির্ভর করে এই প্রজাতি সমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, প্রাচীন প্রজাতির মানুষের মাথার খুলির আকৃতি এবং চোয়ালের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে তাদের কে পৃথক করা হয়েছে (পৃষ্ঠা নং ১০ এর চিত্রটি দেখো) এই বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যসমূহ হতে পারে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি।

ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি

THE POSITIVE FEEDBACK MECHANISM

বাক্সের দিকে নির্দেশক তিরগুলো সেই প্রভাব গুলোকে নির্দেশ করছে যার জন্য বিশেষ কয়েকটি বিকাশ ঘটেছিল।

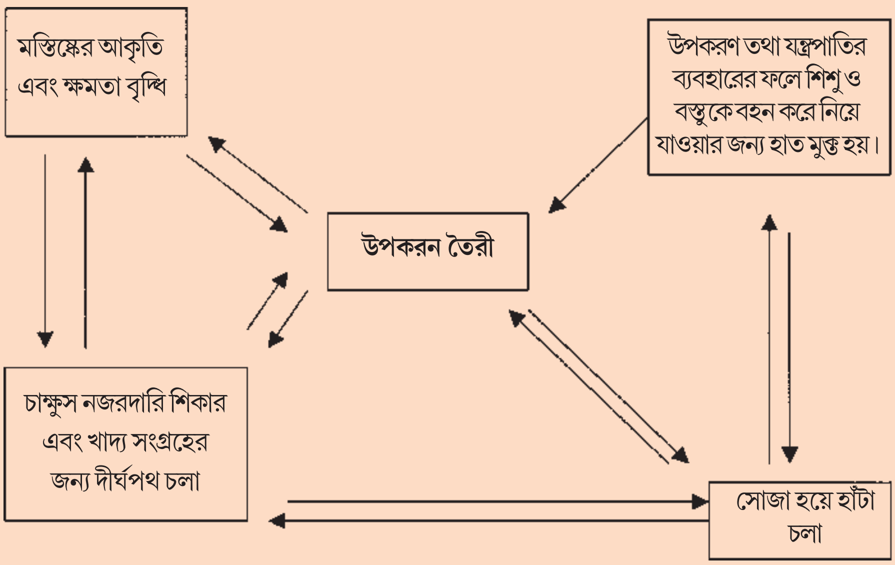

বাক্সের দিকে নির্দেশিত করা তিরগুলো এটা বোঝাচ্ছে যে, বাক্সের মধ্যে লেখা বিকাশের ধারাগুলো অন্য প্রক্রিয়াগুলোকে কিভাবে প্রভাবিত করছে।

উদাহরণ স্বরূপ, দু' পায়ে চলার ক্ষমতা আয়ত্ত করার ফলে বাচ্চা এবং কোন জিনিসকে বহন করার জন্য হাত মুক্ত হয়। যতই হাতের ব্যবহার বাড়তে থাকে, ততই দু' পায়ের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করার সামর্থ্যও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। হাত মুক্ত হওয়ার ফলে বিভিন্ন প্রকারের কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছিল। পাশাপাশি চতুষ্পদ প্রাণীদের তুলনায় দ্বিপদী প্রাণীদের শারীরিক শক্তির ক্ষয়ও কম হত। কিন্তু দৌড়ানোর ক্ষেত্রে তার ফল হয়েছিল বিপরীত। পরোক্ষভাবে 36 লক্ষ বছর আগে দ্বিপদী প্রাণীদের অস্তিত্বের কিছু তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। হোমিনিডদের পদচিহ্নের জীবাশ্মগুলো তানজিনিয়ার লেওতোলীতে পাওয়া গিয়েছে (এই অধ্যায়ের আহরণ পৃষ্ঠাতে দেখো)। ইথিয়োপিয়ার হাদার থেকে প্রাণীদেহের হাড়ের যে জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যায় সেই সময় দ্বিপদী প্রাণীদের অস্তিত্ব ছিল।

প্রায় ২৫ লক্ষ বছর আগে হিমবাহ যুগের শুরুতে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ বরফে ঢেকে যায়, তখন জলবায়ু এবং গাছপালার মধ্যে এক বিশাল ধরনের পরিবর্তন লক্ষিত হয়। তাপমাত্রা হ্রাস এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হওয়ার ফলে বনভূমি হ্রাস পায়। এবং তৃণভূমির পরিসর বেড়ে যায়, যার ফল স্বরূপ অস্ট্রালোপিথুকাস (যারা জঙ্গালে থাকতে অভ্যস্ত ছিল) ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকে, এই জায়গায় অন্যধরনের প্রজাতির উদ্ভব ঘটে যারা এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে শুরু করে। এর মধ্যে জেনাস (Genus) হোমোর সবচেয়ে পুরানো প্রতিনিধি সামিল ছিল।

হোমো একটি ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ হল 'মানুষ'। শব্দটির দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই বোঝায়। বিজ্ঞানীরা হোমোর বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন এবং প্রজাতিগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাদের আলাদা আলাদা নামও দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা জীবাশ্ম দেখে তিন শ্রেণির হোমোকে চিহ্নিত করেছেন। এই গুলো হল হোমো হেবিলিস (যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক), হোমো ইরেক্টাস (পায়ের উপর ভর দিয়ে চলতে পারে এমন মানুষ), এবং হোমো সেপিয়ান্স (পণ্ডিত বা চিন্তাশীল মানুষ)।

হোমো হেবিলিসের জীবাশ্ম ইথিয়োপিয়ার ওমোতে এবং তানজেনিয়ার অল্ডুভাই জর্জে পাওয়া গিয়েছে। আফ্রিকা এবং এশিয়াতে হোমো ইরেক্টাসের প্রাচীন জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে। যথা ঃ কেনিয়ার কোবি ফোরা (Koobifora) পশ্চিম তোরকানাতে, এবং জাভার মোদজোকার্তো এবং সাঙ্গিরানে (Modjokerto & Sangiran) পাওয়া গিয়েছে। আফ্রিকাতে পাওয়া জীবাশ্মগুলোর তুলনায় এশিয়াতে পাওয়া জীবাশ্মগুলো অনেক পরবর্তীকালের। তাই বলা যেতে পারে যে, হোমিনিডসরা পূর্ব আফ্রিকা থেকে এসে দক্ষিণ এবং উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ তথা পূর্বোত্তর এশিয়া এবং সম্ভবত ইউরোপে 20 থকে 15 লক্ষ বছর আগে এসেছিল। হোমিনিডস প্রজাতি মোটামুটি ভাবে দশলক্ষ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিল।

মানচিত্র 1 (ক) আফ্রিকা

মানচিত্র ১ (খ) পূর্ব আফ্রিকার রিফট উপত্যকা।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিশেষ ধরনের জীবাশ্ম প্রথম পাওয়া গেছে সেই জায়গার নাম ঐ জীবাশ্মের নাম অনুসারে হয়েছে। যেমন জার্মানির হাইডালবার্গ শহরে জীবাশ্মটি পাওয়া গেছে, তা হোমো হাইডেলবার্গ জেনসিস (Homoheidelberggensis) নামে পরিচিত। তেমন ভাবে নিয়ানডার উপত্যকায় যে জীবাশ্মটি পাওয়া গেছে তাকে হোমো নিয়ানডার থেলেনসিস গোষ্ঠীর মধ্যে রাখা হয়েছে। (১৮ নং পৃষ্ঠায় দেখো)

ইউরোপে সবচেয়ে প্রাচীন যে জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তা হোমো হাইডেল বার্গ জেনসিস এবং নিয়ানডার থেলেনসিস প্রজাতির। এই উভয় প্রজাতি প্রাচীনতম হোমো সেপিয়ান্স গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। হোমো হাইডেলবার্গ জেনসিসের জীবাশ্ম ৪ লক্ষ পূর্ব থেকে ১ লক্ষ বছর পূর্ব পর্যন্ত (BCE) অনেক দূরে বিস্তৃত ছিল। এই জীবাশ্ম আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপে পাওয়া গেছে। নিয়ানডারথাল প্রজাতি আনুমানিক ভাবে ১,৩০, ০০০ থেকে ৩৫,০০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপ এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়াতে বসবাস করত। তারা পশ্চিম ইউরোপ থেকে আনুমানিক ৩৫,০০০ বৎসর আগে হঠাৎ করে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সাধারণত, অস্ট্রালোপিথিকাসের তুলনায় হোমোদের মস্তিষ্কের আকার অনেক বড় হতো, চোয়াল বাইরের দিকে কম বেড়িয়ে থাকত এবং দাঁত ছোট হত (১০নং পৃষ্ঠায় চিত্রটি দেখো)। মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বাড়তে থাকে। চোয়াল এবং দাঁতের পরিবর্তন সম্ভবত তাদের খাওয়া দাওয়ার ভিন্নতা হেতু হয়েছিল।

বিশ্বে মানবজাতির আবাসস্থল

কখন	কোথায়	কে
৫ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ বছর পূর্বে	আফ্রিকার অন্তর্গত সাহারা অঞ্চলের আশেপাশের প্রদেশ সমূহ।	অস্ট্রালোপিথকাস, প্রারম্ভিকহোমো, হোমো ইরেক্টাস
১ লক্ষ বছর থেকে ৪০,০০০ বছর পূর্বে	আফ্রিকা, এশিয়া এক ইউরোপের মধ্য অক্ষাংশ অঞ্চল।	হোমো ইরেক্টাস, অতিপুরনো হোমো সেপিয়ান্স, নিয়ানডারথালস্, হোমোসেপিয়ন্স সেপিয়েন্স/আধুনিক মানুষ।
৪৫,০০০ বছর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত	অস্ট্রেলিয়া	আধুনিক মানুষ
৪০,০০০ বছর থকে বর্তমান সময় পর্যন্ত	ইউরোপের উচ্চ অক্ষাংশ এবং এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ সমূহ।	পরবর্তীকালের নিয়ানাডারথাল, আধুনিক মানুষ।
	উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার মরুভূমি এবং বৃষ্টি অরণ্য	

কার্যাবলি -২

বিশ্বের মানচিত্রের মধ্যে উপরে যে সারণিটি দেওয়া আছে, তার পরিবর্তন দেখাও। তিনটি সময় সারণিকে ভিন্ন ভিন্ন রঙের মাধ্যমে দেখাও। মহাদেশের তালিকাগুলোকে রঙের ব্যবহারের মাধ্যমে দেখাও (ক) একটি মাত্র রঙ (খ) দুই ধরণের রঙ (গ) দু'এর অধিক রঙ।

মানুষের ক্রমবিবর্তনের কাহিনি
(খ) আধুনিক মানুষ

আধুনিক মানুষের প্রাচীনতম জীবাশ্ম

কোথায়	কখন
ইথিওপিয়া ওমোকিবিশ	১,৯৫,০০০ থেকে ১,৬০,০০০
দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ডার গুহা ডাই কেলডারস ক্লাসিস নদীর মোহনা	১২০,০০০ থেকে ৫০,০০০
মরোক্কো ডার এস সুলতান	৭০,০০০ থেকে ৫০,০০০
ইজরায়েল কফজেহ স্কুল	১,০০,০০০ থেকে ৮০,০০০
অস্ট্রেলিয়া মুঙ্গো হ্রদ	৪৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০
বর্ণিয়ো নিয়াহ গুহা	৪০,০০০
ফ্রান্স ক্রো-ম্যাগনন, লেস্-আইডিসের পাশে	৩৫,০০০

তোমরা যদি এই তালিকাটিকে লক্ষ কর, তাহলে দেখবে হোমোসেপিয়ান্সের অস্তিত্বের প্রাচীনতম সাক্ষ্য প্রমাণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। এই ক্ষেত্রে তাহলে প্রশ্ন উঠে যে, মানুষের উৎপত্তির কেন্দ্রস্থল কোথায় ছিল? উৎপত্তির কেন্দ্রস্থল কি একটি ছিল না একাধিক?

আধুনিক মানুষের উৎপত্তি কোথায় হয়েছিল এই নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। এই বিষয়ে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে, যা একে অন্যের বিপরীত। তার মধ্যে প্রথম মতবাদ হিসাবে আঞ্চলিক ধারাবাহিকতা মডেলকে ধরা হয়, এই মতবাদ অনুসারে একাধিক অঞ্চলের মধ্যে পৃথক-পৃথক মানুষের উৎপত্তি হয়েছিল। দ্বিতীয় মতবাদ হিসাবে প্রতিস্থাপন মডেলকে সমর্থন করা হয় এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষের উৎপত্তি একমাত্র আফ্রিকাতেই হয়েছিল।

আঞ্চলিক ধারাবাহিকতা মডেল অনুযায়ী, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীনতম হোমো সেপিয়েন্সরা ধীরে ধীরে বিভিন্ন গতিতে আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্যের আঞ্চলিক বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে হয়েছিল। যারা এই মতকে সমর্থন, করে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই বৈসাদৃশ্য, তার কারণ হল একই অঞ্চলে প্রাক বিদ্যমান হোমো ইরেক্টাসে এবং হোমো হেইডেলকারজেনসিস গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া বিভিন্নতার জন্য।

প্রতিস্থাপন এবং আঞ্চলিক ধারাবাহিকতার নকশা

প্রতিস্থাপন নকশা তত্ত্ব দ্বারা দেখা যায় সর্বত্র আদি মানবের সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন করে আধুনিক মানবজাতির উদয় হয়। এই ধারণার সমর্থনে প্রমাণ হল, আধুনিক মানবজাতির জন্মগত এবং শারীরিক সাদৃশ্য। যারা এই ধারনা পোষণ করে তারা যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, আধুনিক মানবজাতির মধ্যে সাংঘাতিক মিলের কারণ হল, একই অঞ্চলের সমগোত্রের জনসংখ্যা থেকে তাদের আবির্ভাব— সেই অঞ্চলের নাম ছিল আফ্রিকা। আধুনিক মানবজাতির আদি জীবাশ্মের (ইথিওপীয়ার ওমো থেকে পাওয়া) চিহ্ন তথা নজিরও এই প্রতিস্থাপন নকশাকে সমর্থন করে। তারা সুপারিশ করেন যে বর্তমানে মানবজাতির যে দৈহিক বিভিন্নতা দেখা যায়, তা জনগণের অভিযোজনের (হাজার বছর সময়কাল ধরে) ফলে হয়েছে যারা নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে অভিযোজন করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।

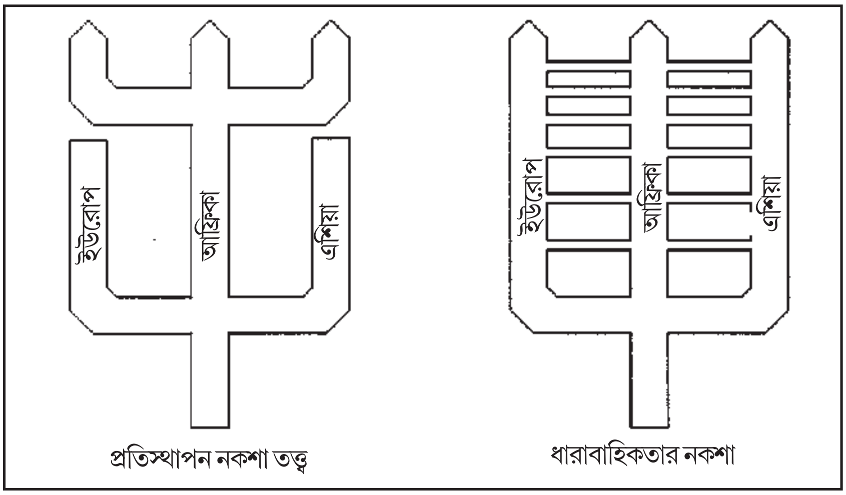

আদি মানব: খাদ্য অর্জন করার কৌশল বা উপায়

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কংকালের অবশেষ এবং মহাদেশ জুড়ে মানুষের গতিবিধির ইতিহাস পুনর্গঠনে তার ব্যবহারকেই প্রমাণ নজির হিসেবে ব্যবহার করেছি। কিন্তু পাশাপাশি মানুষের জীবনের অন্যান্য দিকও বিদ্যমান। চলো দেখি, কিভাবে তার অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

আদি মানবজাতি হয়তো বিভিন্ন উপায়ে খাদ্য হস্তগত করতো। যেমন— সংগ্রহ করা, শিকার, চরে খাওয়া এবং মাছ ধরা। সংগ্রহের মধ্যে ছিল উদ্ভিদজাত খাবার যথা বীজ, বাদাম, বেরি, ফল এবং কন্দ। এই সংগ্রহ পদ্ধতি সাধারণত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বদলে আরোপ করা হত — কারণ এর সপক্ষে সঠিক যুক্তি খুব কম। যদিও আমরা জীবাশ্ম হাড় প্রয়োজনীয় পরিমাণে পেয়ে থাকি, কিন্তু জীবাশ্ম উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ অপেক্ষকৃত বিরল। উদ্ভিদের ভোজনের সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার একমাত্র উপায় হতে পারে যদি দুর্ঘটনা বশত উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে অঙ্গারে পরিণত (carbonization) হয়। এই পদ্ধতিতে জৈব পদার্থ একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষিত হয়। যাই হোক না কেন, এখন পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই প্রাচীন যুগের কার্বনযুক্ত বীজের যথেষ্ট প্রমাণ পাননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিকার শব্দটি পন্ডিত তথা গবেষকদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। ক্রমবর্ধমানে প্রস্তাব করা হয় যে, আদি হোমিনিডরা (hominids) শিকারীদের দ্বারা নিহত অথবা স্বাভাবিক ভাবে মৃত প্রাণীর মৃতদেহ থেকে মাংস ও মজ্জা সাফ করত অথবা তার থেকে মাংস সংগ্রহ করত। আবার হতে পারে, আদি হোমিনডরা স্তন্যপায়ী প্রাণী, যথা- তীক্ষ্ণ দন্ত যুক্ত প্রাণী, পাখী (এবং তাদের ডিম), সরীসৃপ, এমনকী পোকামাকড় (যেমন উইপোকা) আদি হোমিনিডরা খেয়ে ফেলেছিল।

ফোরজ কথাটির অর্থ খাবারের খোঁজ করা।

সম্ভবত ৫,০০,০০০ বছর পূর্বে শিকার কার্যাদি শুরু হয়েছিল। ইচ্ছাকৃত, পরিকল্পিত শিকার এবং বহুসংখ্যক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কসাই খানার প্রাচীনতম নজির দুটি স্থান থেকে পাওয়া যায়ঃ দক্ষিণ ইংল্যান্ডের বক্সগ্রোভ (৫,০০,০০০ বছর আগে) এবং জার্মানির স্কনিনজেন (Schoningan) (৪,০০,০০০ বছর আগে) মেপ

দেখ। বিভিন্ন স্থানে মাছের কাঁটার নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয় যে মাছ ধরা ও গুরুত্বপূর্ন কাজ বলে বিবেচিত হত।

চিত্র ২: ইউরোপ

৩৫,০০০ বছর আগে থেকে ইউরোপ অঞ্চলে পরিকল্পিত শিকারের নিদর্শন মেলে। কিছু স্থান আদি মানবজাতি ইচ্ছাকৃতভাবে বেছে নিয়েছিল বলে মনে হয়। যেমন ডোলনি ডেস্টোনাস (চেক রিপাবলিক্ -এ,২ নং ম্যাপ দেখ) যা একটি নদীর নিকটবর্তী ছিল। শরৎ ও বসন্ত কালে অভিপ্রয়ানকালে যাযাবর পশুর দল যেমন, বল্গাহরিণ এবং ঘোড়া সম্ভবত নদী অতিক্রম করার সময় বহুল পরিমাণে নিহত হত। এরকম স্থান পছন্দ করা থেকে মনে হয় মানব জাতি এসব প্রাণীদের গতিবিধি সম্পর্কে সজাগ ছিল এবং কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক জন্তুকে মারা যায় সেই কৌশল সম্বন্ধে ও তারা অবগত ছিল।

জমায়েত করা, সাফ করা, শিকার করা এবং মাছ ধরার ক্ষেত্রে কি পুরুষ ও মহিলাদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ছিল? আমরা সত্যিই তা জানি না। বর্তমানে আমরা এমন সমাজ দেখি, যেখানে মানুষ শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে, যেখানে মহিলা এবং পুরুষ বিভিন্ন ধরণের কাজ গ্রহণ করে। আমরা এই অধ্যায়ের পরের দিকে দেখতে পাব যে, অতীতের সাথে সব সময় সমান্তরাল পরমার্শ সম্ভব নয়।

আদি মানবজাতি
গাছ থেকে গুহায় এবং খোলা আকাশের নিচে।

আদি মানবজাতির বাসস্থানের নকশার পুনর্গঠনের তথ্যাবলির প্রমাণ সম্বন্ধে আমরা অনেকটাই নিশ্চিত হতে পারি। এ কাজ করার একটি উপায় হল হাতে বানানো নকশাকে ভাগ করে আলাদা আলাদা টুকরো করা। হাজার হাজার ফলকের সরঞ্জাম এবং হস্ত কুঠার ক্যানিয়ার কিলোম্বে এবং ওলোরগেসেইলি তে খনন করা হয়েছে। এই প্রাপ্ত জিনিসগুলোর তারিখ নির্ণয় করা হয়েছে ৭,০০,০০০ এবং ৫,০০,০০০ বছরের মধ্যবর্তী সময়ে।

বাঁদিকের চিত্র: ওলোরগেসেইলি তে খনন কার্য। ম্যারি এবং লুইস লীকী নামে দুজন খননকারী এই জায়গাটির চারদিকে একটি ক্যাটওয়াক্ (পায়ে হাঁটার রাস্তা) তৈরি করেছিলেন যাতে পর্যটকদের কাছ থেকে দেখতে সুবিধে হয়।

উপরের চিত্র: খননকার্যে পাওয়া কিছু সরঞ্জাম/জিনিসপত্র এর চিত্র (ক্লোজ-আপ শট্) এখানে অনেক কুঠারও পাওয়া গেছে।

এই সরঞ্জাম গুলো কীভাবে একই অঞ্চলে বার বার পরিদর্শন করা হয়েছে। সেসব অঞ্চলে মানুষ তাদের হস্তনির্মিত বস্তু সহ অন্যান্য কার্যকলাপের নিদর্শন হয়তো ছেড়ে এসেছিল। জমানো জিনিসপত্র ভূভাগের ওপর প্যাচের মতন দৃশ্যমান হয়। যেসব অঞ্চল কম পরিদর্শন করা হয়েছিল যেখানে যে জিনিষপত্র ভূখন্ডের উপরিভাগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা ছিল।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, হোমোনিড, অন্যান্য বনমানুষ এবং মাংসাশী প্রাণী সবাই একই স্থল ব্যবহার করেছিল। কীভাবে তা কাজ করত সেটা বোঝার জন্য নীচের নকশা দেখ।

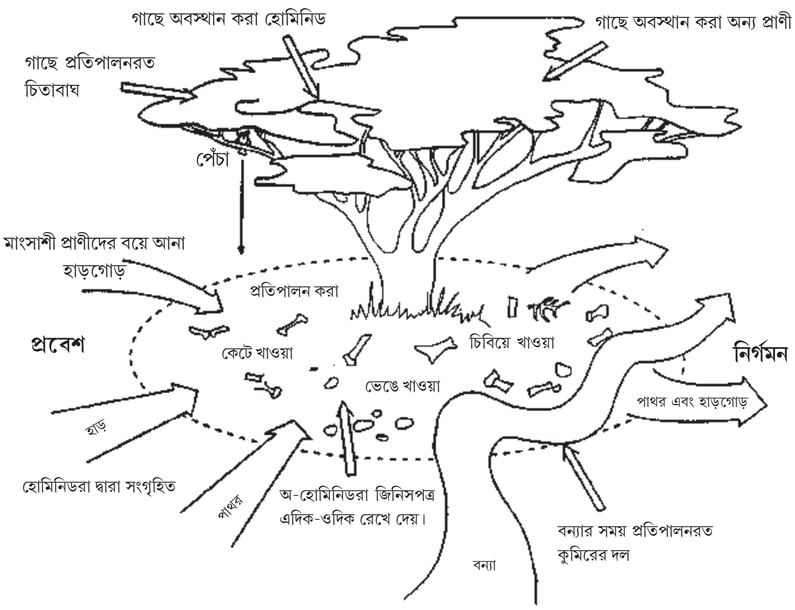

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতানুসারে আদি হোমিনিড, যেমন হোমো-হাবিলিস্‌রা যেখানে খাবারের খোঁজ পেত, সেখানেই বেশির ভাগ খাবার খেয়ে নিত। তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ত এবং বেশিরভাগ সময় গাছেই অবস্থান করত। তোমার কি মনে হয় পাথর, হাড়গোড় ইত্যাদি সেইসব জায়গায় কীভাবে পৌঁছাতো? হাড়গুলো কি অক্ষত অবস্থায় থাকতে পারত?

'Artefacts' বা শিল্পকর্ম হল হাতে তৈরি সরঞ্জাম, যেমন- যন্ত্রপাতি, হাতে আঁকা ছবি, ভাস্কর্য, খোদাই করা ছবি ইত্যাদি।

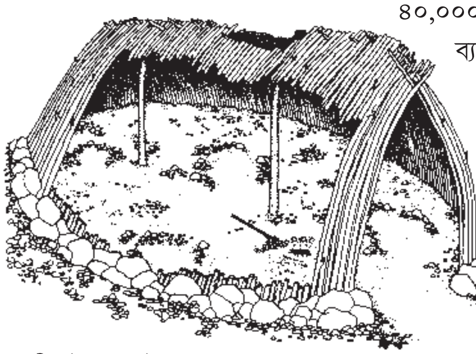

৪০,০০০ এবং ১,২৫,০০০ বছরের মধ্যবর্ত্তী সময়ে গুহা এবং খোলা আকাশের নীচের মুক্তাঙ্গন ব্যবহার করা শুরু হয়। ইউরোপে প্রাপ্ত কিছু কিছু স্থান থেকে এর প্রমাণ মেলে। দক্ষিণ ফ্রান্সের লাজারেট গুহা (lazaret cave) দেওয়ালের পাশে একটি ১২x১ মিটার লম্বা আশ্রয়স্থল বানানো হয়েছে। এর ভেতরে দুটো উনান (Hearths) এবং বিভিন্ন খাদ্যের উৎসের নজির পাওয়া পাওয়া যায় ঃ ফল, শাক সবজি, বীজ, বাদাম, পাখীর ডিম এবং মিঠা জলের মাছ (রুই মাছ, কই মাছ, পোনা মাছ)। অন্যত্র দক্ষিণ ফ্রান্সের উপকূলে টেরা আমাটা (Terra Amata), ঋতুকালীন পরিদর্শনের জন্য কাঠের তৈরী ছাদ এবং মাসযুক্ত ছায়াছবির মতন আশ্রম নির্মাণ করা হয়েছিল।

এটি টেরা আমাটায় পাওয়া একটি কুটিরের পুনর্নির্মিত রূপ। বড়ো বড়ো পাথর খণ্ডের সাহায্যে কুটিরটিকে স্থির রাখা হত। চিত্রটিতে কুটিরের মেঝেতে পড়ে থাকা পাথরের ছোটো ছোটো টুকরোগুলো নির্দেশ করে যে এই জায়গাটিতে পাথরের যন্ত্রপাতি বানানো হত। তিরচিহ্ন যুক্ত কালো জায়গাটি একটি উনান বা 'আখা' বোঝাচ্ছে। গাছে বসবাসকারী হোমিনিড এবং এই ঘরে বসবাসকারী মানুষদের জীবনযাত্রার মধ্যে কী কী পার্থক্য থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

চেসোওয়ানযা, কেনিয়া এবং সোয়াথ ফ্রেনস্ এবং দক্ষিন আফ্রিকাতে ১.৪ এবং ১ মায়া সময়কালের পাথরের সরঞ্জাম সহ শেঁকা মাটি এবং পাথরের সরঞ্জামের সাথে পুরনো হাড় পাওয়া গেছে। এগুলো কি প্রাকৃতিক অগ্ন্যুৎপাত নাকি আগ্নেয়াগিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফল ? অথবা এগুলো কি মানুষের পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রিত আগুনের ব্যবহারের ফলে উৎপাদিত হয়েছিল? আমরা আসলে তা প্রকৃত অর্থে জানি না।

অন্যদিকে উনান নিয়ন্ত্রিত আগুনের ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়। এর অনেক ধরনের সুবিধে ছিল- আগুন গুহার ভেতর উত্তাপ এবং আলোর যোগান দিত এবং রান্নার কাজেও আগুন ব্যবহার করা যেত। তাছাড়া, কাঠকে পুড়িয়ে শক্ত করার জন্যও আগুন ব্যবহার করা হত। এক্ষেত্রে বর্শার ডগাকে উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে। তাপমাত্রার ব্যবহারের ফলে সরঞ্জামের পাত বানানোর সুবিধে হয়। এটা উল্লেখযোগ্য যে আগুনের ব্যবহারের ফলে ভয়ঙ্কর জন্তু জানোয়ারকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর সুবিধা হয়।

আদি মানব ঃ যন্ত্রপাতি তৈরী করা

শুরু করার আগে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং বানানো শুধু মানবজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পাখিদের আমরা জানি বস্তু সামগ্রী জোগাড় করে ঘর বানায়। পাখিদের খাওয়ানোর জন্য, তাদের স্বাস্থ্য বিধির জন্য এবং সামাজিক প্রতিরোধের জন্য এবং কিছু কিছু শিম্পাঞ্জি খাদ্য সংগ্রহের সময় তাদের নিজেদের তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে।

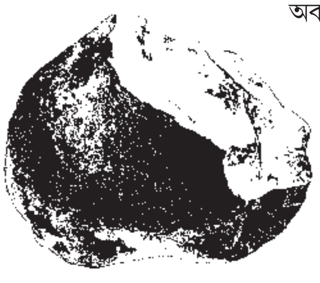

কিছু আদিম যন্ত্রপাতি : এই যন্ত্রপাতিগুলো ওলদোবাই এ পাওয়া যায়। এটি একটি কাটারি বা 'চপার'। একটি বড়ো পাথরখণ্ডকে ঘষে তার ফলকগুলো ফেলে দেওয়া হয় যাতে পাথরখণ্ডটি ধারালো হয়ে যায় এবং এর সাহায্যে কাজ করা যায়।
নীচের একটি কুঠার-এর চিত্র। তোমরা কি বলতে পারবে এই যন্ত্রপাতিগুলো কী ধরণের কাজে লাগত?

অবশ্য মানুষের যন্ত্রপাতির বানানোর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা বনমানুষরা জানে না। আমরা দেখেছি (১১নং পৃষ্ঠা দেখ) কিছু কিছু নির্দিষ্ট শারীর বৃত্তিয় এবং স্নায়বিক (স্নায়ুতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত) অভিযোজন দক্ষ হাতের ব্যবহারের কাজে পরিচালিত করে। তাছাড়া, যে পদ্ধতিতে মানুষ বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করে ও বানায় তা প্রায়শই অনেক বেশি স্মৃতিশক্তি এবং জটিল সাংগঠনিক দক্ষতার প্রয়োজন হয় যা বনমানুষের মধ্যে অনুপস্থিত। পাথরের সরঞ্জাম বানানোর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ইথিওপীয়া ও কেনিয়া থেকে। (১নং মেপ দেখ) সম্ভবত অস্ট্রলপিথেকাস-রা ছিল প্রাচীনতম পাথরের সরঞ্জাম নির্মাতা।

অন্যান্য কাজের মতন, বিভিন্ন সরঞ্জাম বানানোর ক্ষেত্রেও

আমরা জানিনা এগুলো নারী অথবা পুরুষ কিংবা উভয় কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল কিনা। বিশেষ করে মহিলারা বিভিন্ন সরঞ্জাম বানাতো ও ব্যবহার করত তাদের সংগ্রহ এবং তাদের বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

৩৫,০০০ বছর আগে পশু বধ করার জন্য উন্নত পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়, নতুন সরঞ্জামের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। যেমন বর্শা ছুড়ার যন্ত্র এবং তির ও ধনুক-এর ব্যবহার। এভাবে যা মাংস পাওয়া যেত তা থেকে হাড়গুলো বার করে, তারপর তা শুকিয়ে, ধোঁয়া দিয়ে এবং জমা করে তা প্রক্রিয়াজাত করা হত। এভাবে পরবর্তী সময়ে খাওয়ার জন্য খাদ্য গুদামজাত করা হত।

অন্যান্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন, পশমযুক্ত প্রাণীদের জালে আটকানো। তাদের পশম ব্যবহারের জন্য এবং সেলাই করার সূচ আবিষ্কার করা। সেলাই করা পোষাকের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ২১, ০০০ বছর আগে। তাছাড়া ছেনির মতন সরঞ্জাম তৈরির প্রয়োজনে খোঁচা দেওয়ার উপযোগী ধারালো ছুরি ব্যবহারের কৌশল আবিষ্কারের ফলে এখন হাড়, হরিণের মশাখ শৃঙ্গা গজদন্ত অথবা কাঠের ওপর খোদাই করা সম্ভব হয়।

একটি বল্লম-নিক্ষেপকারী হাতলে খোদাই করা চিত্রটি লক্ষ করো। এই যন্ত্রটির সাহায্যে শিকারিরা অনেক দুর অব্দি বল্লম বা বর্শা নিক্ষেপ করতে পারত। এ ধরণের যন্ত্রের আর কী উপকারিতা থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

'পাঞ্চ-ব্লেড' পদ্ধতি

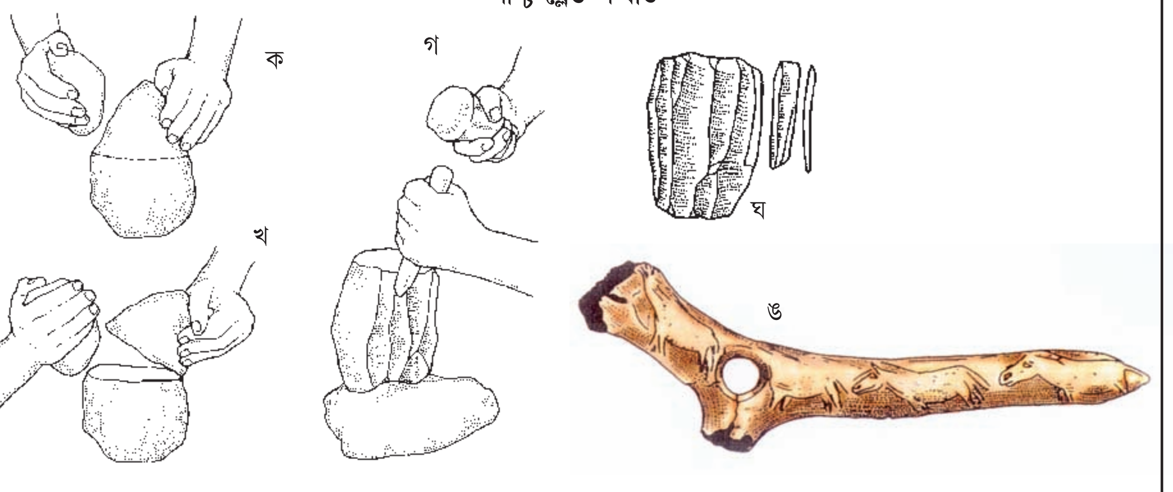

ক) বড়ো পাথরখণ্ডটির উপরিভাগ একটা হাতুড়ি-পাথরের সাহায্যে ভেঙে দেওয়া হয়।
খ) এর ফলে একটি মসৃণ বা চেপ্টা তল এর সৃষ্টি হয়। এটিকে 'স্ট্রাইকিং প্ল্যাটফর্ম' বলা হয়।
গ) এরপর হরিণের শিং বা হাড় দিয়ে তৈরি 'পাঞ্চ' এবং হাতুড়ি দিয়ে পাথরটিকে আঘাত করা হয়।
ঘ) বারংবার আঘাতের ফলে পাথরখণ্ডটি ধারালো পাত বা ব্লেড এ পরিণত হয়। এই ধারালো পাতগুলো ছুরি বা কাটারির ন্যায় ব্যবহৃত হতে পারে। কাঠ, হাতির দাঁত ইত্যাদিতে খোদাই করার সময় এই পাতগুলো বাটালি বা ছেনি হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে।
ঙ) হাড়ের উপর খোদাই এর একটি চিত্র। তোমরা চিত্রটিতে কোন্ কোন্ প্রাণীদের ছবি দেখতে পাচ্ছ?

যাতায়তের পদ্ধতি ঃ ভাষা এবং শিল্প

জীবিত প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানব জাতি-ই ভাষা ব্যবহার করে। ভাষার উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন মতামত আছে ঃ (১) হোমোনিডরা বিভিন্ন অঙ্গাভঙ্গি এবং হাত নাড়ানোর মধ্য দিয়ে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। (২) ভাষা ব্যবহারের পূর্বে মানুষ কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে ভাষাহীন শব্দ ব্যবহার করত। ইঙ্গিতের মাধ্যমে তারা ভাবের আদান প্রদান করত, যথা সুরের মাধ্যমে অথবা গুন গুন শব্দের মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদান। (৩) এসব মানব কথোপকথন সম্ভবত শুরু হয়েছিল এককালে বানরদের মধ্যে প্রচলিত ভাবের আদান প্রদানের আহ্বান থেকে। প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো সীমিত সংখ্যক শব্দধ্বনির সাথে মানুষ অবগত ছিল। ধীরে ধীরে সম্ভবত এগুলো ভাষাতে উন্নীত হয়।

কথ্য ভাষার আবির্ভাব কবে হয়েছিল ? এক্ষেত্রে যে প্রস্তাবটি রাখা হয়েছিল তা হল এই যে, Homo hobilis মস্তিষ্কে (Brain) এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যার ফলে তারা কথা বলতে পারত। হয়তো ২ মায়া (Mya) সময়কালে এভাবে ভাষার উন্নতি তথা বিস্তার ঘটে। কণ্ঠনালীর বিবর্তনও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ন। প্রায় ২,০০,০০০ বছর আগে তা ঘটেছিল। এটি আরো বিশেষভাবে আধুনিক মানুষের সাথে যুক্ত ছিল।

তৃতীয় প্রস্তাবটি ছিল এই যে প্রায় ৪০,০০০-৩৫,০০০ বছর আগে একই সময়ে ভাষা শিল্প হিসাবে উন্নতি লাভ করে। দেখা গেছে যে কথ্য ভাষার বিকাশ, ভাষা শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, কেননা দুটোই যোগাযোগের মাধ্যম।

আলতামিরা-র গুহা চিত্র

উত্তর স্পেনের আলতামিরায় প্রাপ্ত বাইসনের চিত্র

আলতামিরা হচ্ছে স্পেনে অবস্থিত একটি গুহার স্থল। গুহার ছাদে আঁকা চিত্র গুলো প্রথম নজরে আসে মারসেলিনো সানয় দে সৌটোওলা নামের একজন স্থানীয় জমির মালিকের এবং অ্যামেটোর এর একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ, তার মেয়ে ম্যারিয়ার, ১৮৭৯ সালের নভেম্বর মাসে। ছোট মেয়েটি গুহার মধ্যে এখনো সেখানে ছোটাছুটি করে খেলছিল যখন তার বাবা মেঝেতে খনন কাজ করছিল। হঠাৎ করে মেয়েটির নজর পড়ল ছাদের চিত্রগুলোর উপর— 'বাবা দেখ ষাঁড়'! প্রথমে মেয়েটির বাবা হাসল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল যে পেইন্টিং না বরং পেসের মতন কিছু ব্যবহার করা হয়েছে চিত্র গুলোতে এবং তা এতো উদ্যমপূর্ণ ছিল যে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পরের বছর তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করলেন। কিন্তু দুই শতাব্দিকাল পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদরা তার আবিষ্কারকে বাতিল করে দেয় কারণ এগুলো এত ভাল অবস্থায় আছে যে প্রাচীন বলে মনেই হয় না।

ফ্রান্স এবং স্পেনের আলতামিরা উভয় দেদো ল্যাসো (Lascaux) এবং চৌভেট এর গুহায় শত শত গুহাচিত্র (৩০,০০০ এবং ১২,০০০ বছর আগে সম্পন্ন করা হয়) আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে বন্য ষাঁড়, ঘোড়া, বন্য ছাগল, হরিণ, অধুনা বিলুপ্ত হস্তিজাতীয় জন্তু বিশেষ, গন্ডার, সিংহ, ভাল্লুক, চিতাবাঘ, হায়না এবং পেঁচা প্রভৃতির চিত্রায়ণ।

এই চিত্রগুলো সম্পর্কে যত না উত্তর পাওয়া গেছে তার থেকে বেশি প্রশ্ন করা হয়েছে। যেমন, কেন গুহায় কিছু এলাকাতে চিত্র অঙ্কিত আছে — কিন্তু গুহায় অন্যত্র নেই? কেন শুধু কিছু কিছু জন্তুর চিত্র আঁকা হয়েছে, অন্যদের নয়? কেন পুরুষদের ক্ষেত্রে পৃথক ভাবে এবং গ্রুপে উভয় ভাবেই চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। কেন শুধু পুরুষদের জন্তু জানোয়ারের সাথে অঙ্কন করা হয়েছে। কিন্তু মহিলাদের কখনো এভাবে অঙ্কন করা হয় নি? কেন পশুর দলের ছবি গুহার সেসব বিভাগে অঙ্কন করা হয়েছে যেখানে শব্দ ভাল ভাবে ধ্বনিত হয়?

এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, শিকারের গুরুত্বের জন্য জন্তুদের চিত্র গুলো রীতিনীতি ও মাছ বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত ছিল। হয়তো চিত্র অঙ্কনের কাজ একটি রীতি ছিল সকল শিকারের জন্য। আরেকটি বিশ্লেষণ এই যে, এই গুহাগুলো সম্ভবত মানুষের ছোট ছোট দলের বৈঠকের স্থান ছিল অথবা দলীয় কাজকর্মের স্থান ছিল। এই দলগুলো শিকারের কৌশল এবং জ্ঞান ভাগ করতে পারত। অন্যদিকে চিত্র ও খোদাই এর কাজ এক প্রজন্ম থেকে অন্যপ্রজন্মে তথ্য পরিবেশন করতে মিডিয়া তথা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত।

উপরে বর্ণিত আদি সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের উপর নির্ভরশীল ছিল। স্পষ্টত, এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা এখনো জানি না। এই অধ্যায়ের প্রথমেই উল্লেখ করা আছে যে, শিকারী গোষ্ঠী সমাজ আজকের দিনেও বিদ্যমান। বর্তমানের শিকারী গোষ্ঠী সমাজ থেকে অতীত সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা কি কিছু জানতে পারি? পরবর্তী বিভাগে আমরা এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করব।

আফ্রিকাতে আদি শিকারী গোষ্ঠীর সাথে মোকাবিলা

নীচের বর্ণনাটি আফ্রিকার মেষপালক দলের একজন সদস্য দ্বারা বর্ণিত কালাহারি মরুভূমিতে, কুংসান্ নামক একটি শিকারী গোষ্ঠী সমাজের সাথে ১৮৭০ সালে তাদের প্রাথমিক যোগাযোগের বিবরণঃ-

> আমরা প্রথমে যখন এই এলাকায় আসি, আমরা শুধু বালির উপর অদ্ভুত পদচিহ্ন দেখতে পাই। আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম এরা কেমন ধরণের মানুষ হতে পারে। তারা আমাদের ভয় পেত এবং যখনই আমরা তাদের গ্রামগুলো দেখেছি, এগুলো সব সময় খালি থাকত। তারা ছড়িয়ে পড়ত এবং ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে যেত। আমরা বললাম 'উহু' এটাই ভাল, এই লোকগুলো আমাদেরকে ভয় পায়, তারা দুর্বল এবং আমরা অতি সহজেই তাদের উপর শাসন করতে পারব।' তাই আমরা শুধু তাদের শাসন করলাম। কোন হত্যা বা যুদ্ধ ছিল না।

৮ নং এবং ১০ নং প্রবন্ধ আলোচনায় শিকারী গোষ্ঠী সম্বন্ধে আমরা আরও বেশি করে পড়ব।

নৃতত্ত্ব হল মানুষ বিষয়ক বিজ্ঞান। বিশ্বের সকল অঞ্চলের সংস্কৃতির মানুষকে নিয়ে এই বিজ্ঞানে অধ্যয়ণ করা হয়।

হজদা (The Hazda)

হজদা-রা হল একটি ছোট খাটো শিকারী দল এবং সংগ্রহকারী, যারা ইয়াসি (Eyasi) হ্রদের সন্নিকটে বসবাস করত যা ছিল একটি লবনযুক্ত ফ্রাইল ধরা উপত্যকা হ্রদ। শুষ্ক, পাথরে ভরা নিষ্পাদপ প্রান্ত পূর্ব হজদা দেশ প্রভাবিত ছিল ক্ষুদ্র কাঁটা ঝোপ এবং বাবুল গাছে যা বন্য খাবারে সমৃদ্ধ ছিল। জন্তু জানোয়ারের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশী এবং শতাব্দীর প্রথম দিকে এরা ছিল অবশ্যই সাধারণ মানুষের মতন। সজারু, খরগোস, শেয়াল, কচ্ছপ এবং অন্যান্য ছোটজন্তু প্রাণী। হাতী, গন্ডার, মহিষ, জিরাফ ওয়াটারবাক্ (Waterbuck) , হরিণ, ওয়ারঠগ (Warhog), বানর জাতীয় প্রাণী (Baboon), সিংহ, চিতাবাঘ এবং গোবাম (Hyena) প্রভৃতি এবং সাধারণ জন্তু জানোয়ার ছিল। এসব প্রাণীদের মধ্যে হাতী ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীদের হজদা-রা শিকার করে খেত। (ভবিষ্যতে মাংসের প্রাপ্তি বিপন্ন না করে দৈনিক মাংস খাওয়ার প্রক্রিয়া পৃথিবীর অন্য যেকোন অঞ্চল থেকে বেশি ছিল যেখানে শিকারী ও সংগ্রহকারীরা বাস করত অথবা সাম্প্রতিক অতীতে বাস করত।)

উদ্ভিজ্জ খাদ্য-শিকড়, বেরি ফল, বাওবাব গাছের (আফ্রিকার একজাতীয় সুবিশাল কান্ড বিশিষ্ট এবং বড় শাঁসালো ফল ধরা গাছ) ফল ইত্যাদি যদিও আকস্মিক পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিগোচর হত না, কিন্তু এগুলো চূড়ান্ত শুষ্ক ঋতুতেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত খরার বছর গুলোতে। ছয়মাস আর্দ্র ঋতুতে যে সব্জি পাওয়া যেত তা শুষ্ক ঋতুতে প্রাপ্ত সব্জি থেকে আলাদা ছিল, কিন্তু ঘাটতি কোন সময়েই থাকত না। সাত প্রজাতির বন্য মৌমাছির মধু ও চারা (Grabs) খাওয়া হত; যার সরবরাহ প্রক্রিয়া আলাদা আলাদা ঋতুতে পরিবর্তিত হত।

আর্দ্র ঋতুতে জলের উৎস দেশের ভেতর বণ্টন করা হত, শুষ্ক ঋতুতে জলের ঘাটতি দেখা দিত। হাজদা-রা মনে করত ৫-৬ কিমি দূরত্ব হচ্ছে সর্বাধি দূরত্ব জল পরিবহন করার জন্য এবং জলের উৎসের এক কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে দুর্গ তৈরী করা হত। দেশের কিছু অংশে মুক্ত ঘাস যুক্ত সমভূমি ছিল কিন্তু হজদারা সেখানে কখনো শিবির বানাতো না। শিবিরগুলোর অবস্থান অপরিবর্তিতভাবে গাছ অথবা পাথরের মধ্যে বানানো হত এবং পছন্দমতন উভয়ের সাথে বানানো হত।

পূর্বপ্রান্তে বসবাসকারী হজদারা জমি এবং তার সম্পদের উপর কোন দাবি করতে পারত না। যেকোন ব্যক্তি যেখানে ইচ্ছে থাকতে পারত এবং জন্তু জানোয়ার শিকার করা, শিকার সংগ্রহ করা, বেরিফল এবং মধু সংগ্রহ করতে পারত এবং হজদারা দেশের যেকোন জায়গায় বিনা বাধায় জল সরবরাহ করতে পারত। নিজের এলাকায় খেলার জন্তু প্রয়োজনের থেকে বেশি থাকা সত্ত্বেও হজদারা বন্য উদ্ভিজ খাদ্যের উপরেই নির্ভর করত। সম্ভবত তাদের খাদ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ ছিল মাংস এবং মধু।

শিবিরগুলো তুলনামূলকভাবে ছোট ছিল এবং আর্দ্র শুষ্ক ঋতুতে জলের উৎসের পাশে আকারে বড় এবং ঘনীভূত ছিল।

খরার সময়ও খাদ্যের কোন ঘাটতি ছিল না।

—জেমস্ ওডবার্ন নামক একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ দ্বারা ১৯৬০ সালে লিখিত।

কার্যাবলি -৩

হাজদা গোষ্ঠীর লোকেরা জমি এবং ভূসম্পদের উপর তাদের মালিকানা কেন দাবি করে না ? ঋতু অনুসারে তাদের শিবিরগুলোর আয়তন এবং স্থান কেন বদলে যায় ? কী কারণে তারা কোনোদিন এমনকি খরার সময়ও, খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয় না ? ভারতবর্ষে অবস্থান করছে এমন কোনা শিকারী সংগ্রহকারী দলের নাম কি তুমি বলতে পারবে ?

শিকারী ও সংগ্রাহক সমাজ
অতীত থেকে বর্তমান

শিকার ও সংগ্রাহক সমাজ সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণার মাধ্যমে। একটা প্রশ্ন যা বহুবার সামনে তুলে ধরা হয়েছে তা হল আজকের প্রজন্মের শিকারী ও সংগ্রাহক সমাজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে অতীতকে বোঝার প্রয়াস করা যায় কিনা। অতিসম্প্রতি কালে এটা নিয়ে দুটো মতবাদ আছে।

একদিকে গবেষকেরা আছেন যারা এখানকার দিনের শিকারী ও সংগ্রাহক সমাজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সরাসরি প্রয়োগ ঘটিয়ে অতীতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ-বেশকিছু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমান করছেন যে দ্বিতীয় মায়া দশকের হোমিনিড স্থান, তুরকানা হ্রদের পার্শ্ববর্তী এলাকা সম্ভবত আদিম মানুষের শুষ্ক সময়ের আবাসস্থল ছিল, কারণ এমন একটা অভ্যাস লক্ষ্য করা গেছে হাজদা এবং কুং সানদের মধ্যে।

আর অন্যদিকে গবেষক আছেন যারা মনে করেন এথনোগ্রাফিক তথ্যাবলি ব্যবহার করা ঠিক নয়। অতীতের সমাজ ব্যাবস্থাকে অনুধাবন করার জন্য যেহেতু দুটোই আকারে ভিন্ন প্রকৃতির। উদাহরণস্বরুপ আজকের প্রজন্মের শিকারী ও সংগ্রাহক সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে শিকার ও সংগ্রহের পাশাপাশি নানান ধরনের জীবিকা নির্বাহ করে। এর মধ্যে আছে বনজ সম্পদের বিনিময়ে আবদ্ধ হওয়া অথবা নিকটবর্তী কৃষকের জমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করা। সর্বোপরি, এই জনজাতিগুলো সবদিকেই একেবারে কোণঠাসা—ভৌগোলিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে। যে পরিস্থিতিতে তারা বসবাস করে তা একেবারেই আদিম মানুষ থেকে আলাদা।

আরেকটা প্রতিবন্ধকতা হল যে প্রাচুর্যপূর্ণ বিবিধতা লক্ষ্য করা যায়। শিকারী ও সংগ্রাহক সমাজের মধ্যে অসামঞ্জস্যমূলক তথ্য আছে বিভিন্ন প্রকারের যেমন শিকার ও সংগ্রহের আপেক্ষিক তাৎপর্য, গোষ্ঠীর আকার অথবা একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরণ।

তাছাড়া, খাদ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় শ্রম বিভাজন নিয়েও মতানৈক্য প্রচুর। যদিও আজকের দিনে মহিলারা সংগ্রহের কাজ করে এবং পুরুষ শিকার করে। এমন সমাজগোষ্ঠীও আছে যেখানে মহিলা এবং পুরুষ দুজনেই শিকার করে এবং যন্ত্রপাতি তৈরি করে। যে কোনো ক্ষেত্রেই এমন সমাজগোষ্ঠীতে খাদ্য সরবরাহের দিক দিয়ে মহিলাদের অবদান কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। এটা সম্ভবত সেই দিক যা বর্তমান যুগের শিকারী ও সংঘবদ্ধ সমাজে মহিলা ও পুরুষের আপেক্ষিকভাবে সমসাময়িক গুরুত্বকে নিশ্চিত করে, যদিও সেখানে ভিন্নতা আছে। যেখানে এই হচ্ছে সামগ্রিক চিত্র, এটা খুব কষ্টসাধ্য অতীত যুগের নিরীক্ষণ করা।

নৃকুলবিদ্যা, নৃকুলবিজ্ঞান বা Ethnography হল কোনো জাতিগত গোষ্ঠীর অধ্যয়ন। এই বিদ্যায় সেই সব জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, লিঙ্গ, ভূমিকা, সামাজিক আচরণ বিধি নিয়মকানুন এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অধ্যয়ন করা হয়।

শেষাংশ/ এপিলগ

বহু লক্ষ বছর যাবৎ মানুষ বন্য পশু শিকার করে এবং বনের ফলমুল সংগ্রহ করে বেঁচে রয়েছে। তারপর, ১০,০০০ থেকে ৪,৫০০ বছরের মাঝে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ নানান গাছপালা এবং পশুপ্রাণীকে গৃহপালিত করতে শিখেছে। এটাই কৃষিকাজের উন্নতি সাধন করে এবং প্রকৃতি সংলগ্ন জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যাযাবর জীবন থেকে কৃষিকাজে পরিবর্তন মানব ইতিহাসের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। কেন এই মুহূর্তে এই পরিবর্তন সংঘটিত হল?

কার্যাবলি -৪

জাতিগত গবেষণা বা নৃকুলবিদ্যার সাহায্যে আদি মানবজাতির জীবন যাত্রা জীবন শৈলীর পুনর্গঠন করার ক্ষেত্রে আমরা কী কী সুবিধা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারি?

শেষ হিমযুগ প্রায় ১৩,০০০ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে তার সাথে সাথে উষ্ণ, সিক্ত পরিবেশ চলে আসে। তার ফলশ্রুতিতে চাষবাসের সুবিধা বেশ উপযোগী হয়ে উঠে যেমন বনজ বাজরা ও গম। ঠিক সেই সময়েই উন্মুক্ত প্রান্তর এবং তৃণভূমি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কিছু বন্যপ্রাণীর যেমন বন্য ভেড়া, ছাগল, গবাদিপশু, শূকর এবং গাধার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। আমরা যা পাই তা হল মানব সমাজ বন্য ঘাস ও জীবজন্তু সমৃদ্ধ এসব স্থান ধীরে ধীরে দখল করে নেয়। কিছু কিছু জায়গা নির্দিষ্টভাবে অগ্রাধিকার পাওয়ার ফলে খাদ্য যোগানের জন্যও একটা চাপ বাড়তে থাকে। আর এটা সম্ভবত কিছু কিছু গাছপালা ও প্রাণীকে গৃহপালিত করার জন্য বাধ্য করে। এটা অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে বিভিন্ন বিষয়ের মেলবন্ধন—যার মধ্যে আছে পরিবেশ পরিবর্তন, জনসংখ্যার চাপ, কিছু গাছপালা (যেমন গম, ধান, এবং জোয়ার) এবং প্রাণী (যেমন ভেড়া, ছাগল, গবাদিপশু, গাধা এবং শূকর) সম্পর্কে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ ও জ্ঞান এই পরিবর্তনের পেছনে সবিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

কৃষিকাজ ও প্রকৃতি সংলগ্ন জীবন আরও অনেক পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দেয়। যেমন পাত্র তৈরি করা যাতে শস্য মজুত করা হত এবং অন্যান্য সামগ্রী যাতে রান্না করা হত। পাশাপাশি, নতুন ধরনের পাথরের জিনিস ব্যবহার হতে থাকে। অন্যান্য নতুন সামগ্রী যেমন কৃষিকাজে হাল ব্যবহার করা হত। ক্রমশ, মানুষজন তামা ও টিনের মত ধাতুর সাথে পরিচিতি লাভ করে। পাত্র তৈরি ও যাতায়াতের জন্য চাকার ব্যবহার হওয়া শুরু হল।

আনুমানিক ৫,০০০ বছর আগে, আরও অধিক সংখ্যায় মানুষজন শহরে বাস করতে শুরু করে। এমনটা কেন হল? এবং শহর ও অন্যান্য বসতিগুলোর মধ্যে পার্থক্যগুলো কি কি? এই প্রশ্নগুলোর এবং অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরের জন্য থিম ২ দেখো।

সময়রেখা-১ (মিলিয়ন বা লক্ষ বছর পূর্বে)	
৩৬—২৪ লক্ষ বছর পূর্বে	বনমানুষ; এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে বানরের দল
২৪ লক্ষ বছর পূর্বে	(মহাপরিবার) হোমিনয়েড; গিব্বোন, এশিয় ওরাং-ওটাং, আফ্রিকান বানর (গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও বোনোবো বা 'পিগমী' শিম্পাঞ্জি)
৬.৪ লক্ষ বছর পূর্বে	হোমিনয়েড থেকে হোমিনিড্ এ ক্রমবিকাশ
৫.৬ লক্ষ বছর পূর্বে	অস্ট্রালোপিথেকাস্
২.৬ — ২.৫	পাথরের তৈরি প্রাচীনতম হাতিয়ার
২.৬—২.০	আফ্রিকার শীতলীকরণ ও শুষ্কীকরণ এর ফলে বনভূমির হ্রাস এবং তৃণভূমি অঞ্চলের বৃদ্ধি।
২.৫—২.০ লক্ষ বছর পূর্বে	হোমো
২.২ লক্ষ বছর পূর্বে	হোমো হাবিলিস্
১.৮ লক্ষ বছর পূর্বে	হোমো ইরেক্টাস
১.৩ লক্ষ বছর পূর্বে	অস্ট্রালোপিথেকাস্‌দের বিলোপ
০.৮ লক্ষ বছর পূর্বে	'আদিম' সেপিয়ান্স, হোমো হেইডিলবার্গেনসিস্
০.১৯—০.১৬ লক্ষ বছর পূর্বে	হোমো সেপিয়ান্স সেপিয়ান্স (আধুনিক মানুষ)

সময়রেখা-২ (অনেক বছর পূর্বে)	
সমাধি বা সমাধিস্থলের প্রাচীনতম প্রামাণিক তথ্য	৩,০০,০০০
হোমো ইক্টোসদের বিলোপ	২,০০,০০০
স্বর-যন্ত্রের বিকাশ	২,০০,০০০
ভারতের নর্মদা নদীর নদীবিধৌত ভূমিখণ্ডে প্রাপ্ত প্রাচীন হোমো-সেপিয়ান্স-এর মাথার খুলি	২,০০,০০০—১৩০,০০০
আধুনিক মানুষের আবির্ভাব	১,৯৫,০০০—১,৬০,০০০
নিয়েনডারথেল্ দের আবির্ভাব	১,৩০,০০০
মাটির উনান আবিষ্কারের প্রাচীনতম প্রমাণ	১,২৫,০০০
নিয়েনডারথল্-দের বিলোপ	৩৫,০০০
পোড়ামাটির তৈরি ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্তির প্রাচীনতম নজির	২৭,০০০
সেলাই কার্যে ব্যবহৃত সূচের আবিষ্কার	২১,০০০

পূর্ব আফ্রিকার ফাটল উপত্যকা

অনুশীলনীর

রচনাধর্মী উত্তর দাও

১. পেজ ১৩ এ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়া দেখাচ্ছে। চিত্রটি দেখ, সরঞ্জাম তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপাদানের তালিকা তৈরি কর। টুল তৈরির দ্বারা কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ঘটেছিল?

২. বানর এবং অ্যাপসের মতো অন্যান্য স্তন্যপায়ীর আচরণ ও শারীরবৃত্তীয় কিছু মিল রয়েছে। এটা ইঙ্গিত দেয় যে মানুষ সম্ভবত: অ্যাপস থেকে বিকাশ লাভ করেছে। একটি শিরোনামের অধীনে (ক) আচরণ ও (খ) শরীরস্থান এই দুটি কলামে সাদৃশ্য গুলো তালিকাভুক্ত কর।

৩. মানুষের উৎপত্তির আঞ্চলিক ধারাবাহিকতার মডেলের বৈধতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরো। তুমি কি মনে কর যে এটি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের একটি নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দান করে? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৪. নিম্নলিখিত কোন উপাদানটিকে তুমি প্রত্নতাত্ত্বিক রেকর্ডে সেরা নথিভুক্ত বলে মনে করো (ক) সংঘবদ্ধ হওয়া (খ) টুল তৈরি করা (tool making) (গ) আগুনের ব্যবহার (the use of fire)

সংক্ষিপ্ত আকার উত্তর দাও

১. বর্শার ব্যবহারের ফলে শিকার এবং বাসস্থান নির্মাণের পক্ষে কতটা সহজতর হয়েছিল? এই কাজের জন্য যোগাযোগের অন্য কি ব্যবস্থা ব্যবহৃত হত?

২. এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া সময়রেখা (১) ও (২) থেকে দুটি করে (প্রত্যেকটি থেকে) অগ্রগতি নির্বাচন কর এবং তোমার কাছে এগুলো কেন তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় তা উল্লেখ কর।

বিষয়
২

লিখনশৈলী এবং নগর জীবন
WRITING AND CITY LIFE

"মেসোপটেমিয়া" নামটি গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে। 'মেসোস্ (mesos) শব্দটি — যার অর্থ 'মধ্য' এবং 'পটোমোস' (Potamos) শব্দটি— যার অর্থ হল 'নদী'।

নগর জীবন শুরু হয়েছিল মেসোপটেমিয়ায়। এই প্রদেশটি ইউফ্রেটিস এবং ট্রাইগ্রিস নদীর মাঝখানে অবস্থিত, যা বর্তমানে ইরাক প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত। মেসোপটেমিয় সভ্যতা তার নিজস্ব সমৃদ্ধি, নগর জীবন, বিশাল এবং সমৃদ্ধ সাহিত্য, গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের জন্য সুপরিচিত। মেসোপটেমিয়ার লিখন পদ্ধতি এবং সাহিত্য প্রাচ্য ভূমধ্যসাগরীয় প্রদেশ, উত্তর সিরিয়া এবং তুরস্কে ২০০০ খ্রি. পূর্বাব্দের পরে ও বিস্তৃত ছিল, যার ফলস্বরূপ ওই সমস্ত রাজন্য শাসিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে, এমনকি মিশরের ফারাও (Pharaoh) দের সঙ্গেও মেসোপটেমিয় ভাষা এবং লিপিতে লেখা পড়া চলত। এখানে আমরা নগর জীবন এবং লিখিত শৈলীর মধ্যে সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করব এবং এটাও জানার চেষ্টা করব যে, লিখন শৈলীর পরম্পরা থেকে আমরা কী কী ধারণা লাভ করতে পেরেছি।

নথিভুক্ত ইতিহাসের শুরুতে, এই দেশটির মূলত শহরকেন্দ্রিক দক্ষিণভাগ। (নিচে বিবরণ দেখো) সুমের এবং আক্কাদ নামে পরিচিত ছিল। ২০০০ খ্রি. পূর্বাব্দের পরবর্তী সময়ে, যখন ব্যাবিলন এক গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়েছিল, তখন দক্ষিণাঞ্চলকে ব্যাবলোনিয়া বলা হত। ১১০০ খ্রি. পূর্বাব্দ থেকে যখন আশিরিয়ানরা উত্তরাঞ্চলে তাদের রাজ্য স্থাপন করতে শুরু করে, তখন থেকে ওই রাজ্যটি আশিরিয়া নামে পরিচিত হতে লাগল। ওই স্থানের প্রথম ভাষা ছিল সুমেরীয় ভাষা। ক্রমান্বয়ে ২৪০০ খ্রি. পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে যখন আক্কাদ ভাষাভাষীর লোক আশিরিয়াতে বসবাস করতে শুরু করে, তখন আক্কাদ ভাষা সুমেরীয় ভাষার স্থান দখল করে। আলেকজেন্ডারের সময় পর্যন্ত (৩৩৬ থেকে ৩২৩ খ্রি. পূর্বাব্দ) আক্কাদী ভাষা পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের সাথে সাথে উন্নতি লাভ করে। ১৪০০ খ্রি. পূর্বাব্দ থেকে ধীরে ধীরে আরামাইক ভাষা প্রবেশ করতে শুরু করে। এই ভাষার সাথে হিব্রু ভাষার অনেক মিল ছিল এবং ১০০০ খ্রি. পূর্বাব্দের পরেও এই ভাষা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। আজও ইরাকের কিছু কিছু অঞ্চলে এই ভাষাতে কথা বলা হয়ে থাকে।

১৮৪০ এর শুরুতে মেসোপটেমিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়। সেখানে একটি বা দুটি জায়গায় (যেমন উরুক (Uruk) এবং মারি (Mari) যার সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হবে) খননকার্য কয়েক দশক ধরে চলেছিল। (ভারতের কোন জায়গায় এত দীর্ঘমেয়াদী খননকার্য চলতে দেখা যায়নি) এই খননকার্যের ফলস্বরূপ, ইতিহাসের তথ্যরূপে মেসোপটেমিয়ার শতশত ইমারত, মূর্তি, অলঙ্কার, কবর, মুদ্রা ও বিভিন্ন উপকরণই শুধুমাত্র পাওয়া যায়নি, হাজারের উপর লিখিত তথ্যাদিও পাওয়া গেছে, যা ইতিহাস অধ্যয়ণে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে।

ইউরোপীয়দের কাছে মেসোপটেমিয়া ছিল গুরুত্বপূর্ণ — কারণ বাইবেল এর প্রথম খণ্ড "ওল্ড টেস্টামেন্ট' এ তার উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ, 'ওল্ড টেস্টামেন্টের' বুক অফ জেনেসিস্" এ (Book of Genesis) 'শিমার' (Shimar) শব্দটির উল্লেখ আছে, যার অর্থ হল সুমের। অর্থাৎ যে জমিটি ইট দিয়ে তৈরি একটি শহর । ইউরোপের পর্যটক এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা মেসোপটেমিয়াকে একদিক থেকে তাদের পূর্ব পুরুষদের ভূমি হিসাবে মনে করত এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা যখন এই জায়গায় তাদের খননকার্য শুরু করে, তখন

'ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ' উল্লিখিত তথ্যগুলোর আক্ষরিক সত্যতা যাচাই করার একটা প্রয়াস শুরু হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে মেসোপটেমিয়ার অতীতকে খোঁজার চেষ্টায় উৎসাহ কোনো অংশে কম ছিল না। ১৮৭৩ খ্রি. একটি সংবাদ পত্র ব্রিটিশ মিউজিয়াম দ্বারা শুরু করা অনুসন্ধান কার্যের খরচ জুগিয়েছিল — যার অন্তর্গত ছিল মেসোপটেমিয়ার এমন একটি ফলক (Tablet) যাতে বাইবেলে উল্লিখিত জলপ্লাবনের কাহিনি অঙ্কিত ছিল।

১৯৬০ খ্রি. পর্যন্ত এটা মনে করা হত যে, ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনী সর্বাংশে সত্য নয়, কিন্তু এটি ইতিহাসে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের অতীতকে নিজস্ব ভঙ্গিতে অভিব্যক্ত করেছিল। ধীরে ধীরে প্রত্নতাত্ত্বিক ক্রিয়া-কৌশল অধিকতর উন্নত ও স্পষ্টতর হয়ে উঠে। এছাড়াও বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি দেওয়া হতে থাকে, এমন কি সাধারণ লোকজনের জীবন যাত্রা সম্পর্কে বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হতে থাকে। ফলে বাইবেলের কাহিনির সত্যতা যাচাই করার ব্যাপারটাই গৌণ হয়ে যায়। এর পরে যা আলোচিত হবে তা মূলত পরবর্তী অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করবে।

বাইবেল অনুসারে এই জল প্লাবনের অর্থ হল, পৃথিবীর সমগ্র জীবনকে নষ্ট করে দেওয়া। কিন্তু ঈশ্বর জলপ্লাবনের পরেও পৃথিবীতে জীবনকে সুরক্ষিত রাখার জন্য নোয়া (Noah) নামে এক মানুষকে নির্বাচন করে, নোয়া বিশাল আকারের একটি নৌকা বানিয়েছিল এবং এর মধ্যে সমগ্র জীবজন্তুর এক একটি জোড়া রেখে দেয়। যখন জলপ্লাবন হয় তখন বাকী সব জিনিস নষ্ট হয়ে গেলেও কিন্তু নৌকায় রাখা সমস্ত জীবজন্তুর জোড়া সুরক্ষিত ছিল এবং প্রাণে বেঁচে যায়। ঠিক এমনই একটি কাহিনী মেসোপটেমিয়ার পরম্পরাগত সাহিত্যের মধ্যেও আছে। এই কাহিনির মুখপাত্র তথা নায়ককে জিওসুদ্রা বা উৎনাপিসতিম বলা হত।

মানচিত্র ১ : পশ্চিম এশিয়া

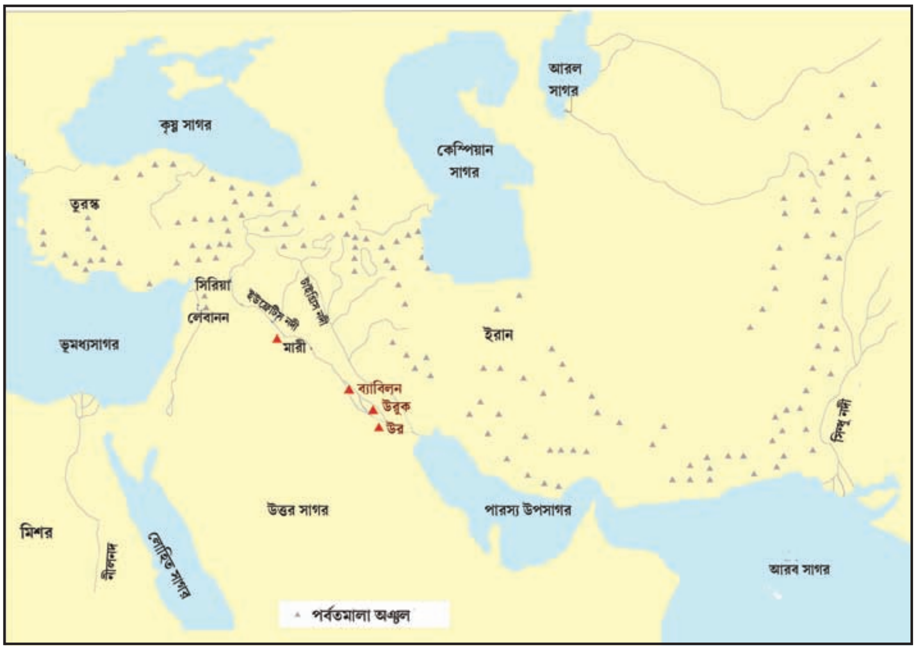

মেসোপটেমিয়া এবং তার ভৌগোলিক অবস্থান

ইরাক ভৌগোলিক দিক থেকে এক বৈচিত্রময় দেশ। এর পূর্বোত্তরে রয়েছে সবুজে ভরা উচু নিচু মাঠ, রয়েছে বৃক্ষরাজিতে ঘেরা পর্বত যা শৃঙ্খলিত ভাবে দেশটির শোভাবর্ধন করছে, রয়েছে এখানে সুন্দর স্বচ্ছ ঝর্ণা এবং বুনো ফুলের সমাহার। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় যা ফসল উৎপাদনের উপযোগী। এখানে ৭০০০ থেকে ৬০০০ খ্রি. পূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল। উপরে উঁচু জায়গায় যেখানে স্টেপ ঘাসের মাঠ ছিল সেখানে জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষিকাজ অপেক্ষা পশুপালন অধিক লাভদায়ক ছিল। শীতকালীন বর্ষার পরে ঝোপঝাড়ের বেড়ে উঠা ছোটো ছোটো ঘাস খেয়ে ছাগল ভেড়া চড়ে বেড়াত। পূর্বদিক ট্রাইগ্রিসের শাখানদীর মাধ্যমে যে রাস্তা তৈরি হয়েছিল, তা ইরানের পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গো যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল। ইরানের দক্ষিণভাগে আছে এক মরুভূমি এবং এটা সেইস্থান যেখানে সর্বপ্রথম নগর

কার্যাবলি -১

জলপ্লাবন সম্পর্কে সমাজে অনেক নিজস্ব পুরাণ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। এটা অনেকটা এই রকম যা ইতিহাসে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে মনে রাখে এবং বর্ণনা করে। এই সম্পর্কে আরও কিছু জানার চেষ্টা করো এবং দেখাও যে, জল প্লাবনের পূর্বে ও পরে জনজীবনের অবস্থা কী রকম ছিল।

এবং লিখন কৌশলের উদ্ভব হয়েছিল (নিচে দেখো)। এই মরুভূমিতে শহরবাসীদের জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ছিল, কারণ ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদী উত্তর পাহাড় থেকে বেরিয়ে নিজেদের সাথে উপযুক্ত পলিমাটি বয়ে আনত। যখন এই নদীগুলোতে বন্যা হত অথবা যখন এই নদীর জলসেচের জন্য ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া হত তখন সেখানে কৃষির উপযুক্ত উর্বর পলি মাটি সঞ্চিত হতে থাকত।

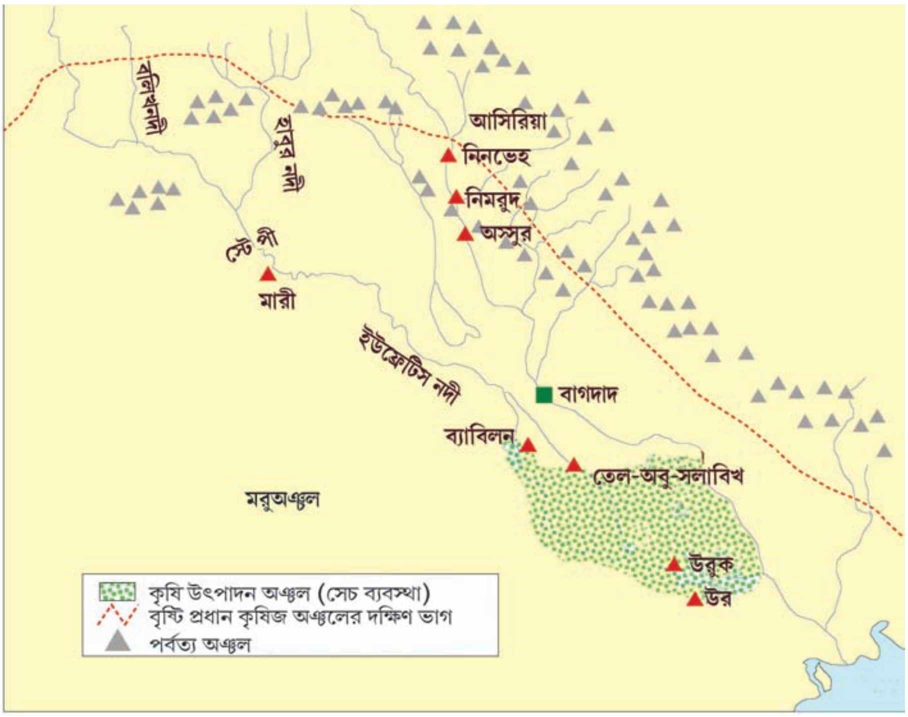

মানচিত্র ২ : মেসোপটেমিয়া পর্বত, স্টেপ, মরুভূমি, দক্ষিণের জলসেচ অঞ্চল।

ইউফ্রেটিস নদী মরুভূমিতে প্রবেশ করার পর কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে বয়ে যেতে থাকে। কখনো কখনো এই ধারাগুলো থেকে জলসেচের কাজ চলত। এখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী গম, জোয়ার, মটর এবং মসুরের ক্ষেতে জলসেচ করা হত। রোম সাম্রাজ্য সহ (বিষয়-৩) সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া কৃষিজ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল ছিল, যদিও সেখানে শস্যদানা উৎপাদনের জন্য বৃষ্টিপাত প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম হত।

কৃষিকাজ ছাড়াও, মেসোপটেমিয়ার স্টেপ অঞ্চলে, উত্তর-পূর্ব সমভূমিতে, এক পাহাড়ের ঢালে ভেড়া এবং ছাগল পালন করা হত (যা উর্বর কৃষিজ অঞ্চল এবং বন্যা কবলিত নদীগুলো থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত ছিল) যেগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে মাংস, দুধ এবং পশম পাওয়া যেত। এছাড়াও নদীগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ এবং গ্রীষ্মকালে গাছ থেকে খেজুর পাওয়া যেত। কিন্তু এটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, নগরগুলোর বিকাশ কেবল গ্রামীণ সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করত। অন্য বিষয়গুলোকে নিয়ে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার পূর্বে প্রথমে আমাদের নগর জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে।

মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনতম নগরের নির্মাণকার্য তাম্রযুগে তথা ৩০০০ খ্রি.পূর্বাব্দে শুরু হয়েছিল। ব্রোঞ্জ হল তামা এবং টিনের সংমিশ্রণে তৈরি একটি ধাতু। ব্রোঞ্জ ব্যবহারের অর্থ এই যে, ধাতুটি অনেক দূর দূরান্ত থেকে আনা হত। কাঠের নিখুঁত কাজ, পুঁতিমালা ছিদ্র করার কাজ, পাথরের খোদাই করা মুদ্রা, আসবাবপত্রের মধ্যে ঝিনুক খোদাই এবং ঝিনুক কাটা প্রভৃতি কাজের জন্য ধাতব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। মেসোপটেমিয়ার অস্ত্রশস্ত্র ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি করা ছিল, বর্শার অগ্রভাগে সূচালো জায়গাটা ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি করা হত। যেটা তোমরা ৩৮ নং পৃ: ছবিতে দেখতে পাবে।

নগরায়ণের তাৎপর্য

শহর এবং নগর শুধুমাত্র বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বসবাসের স্থানই নয়। যখন কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থনীতির গতিবিধির বিকাশ হতে থাকে, তখন সেই জায়গায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। শহরকেন্দ্রিক অর্থনীতি খাদ্য উৎপাদন ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য, নির্মাণকার্য এবং কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ প্রদান করে থাকে। শহরের লোকেরা আত্মনির্ভর হতে পারে না এবং তাদের গ্রামের অন্য লোকেদের দ্বারা সরবরাহ করা বিভিন্ন সামগ্রীর উপর নির্ভরশীল হতে হয়। তাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত আদান প্রদানও চলতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যারা পাথরের মুদ্রা তৈরি করে পাথর খোদাই করার জন্য তাদের ব্রোঞ্জ এবং যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। কারণ তারা নিজেরা এই উপকরণ তৈরি করতে পারেনা এবং তারা এটাও জানেনা যে, মুদ্রার জন্য আবশ্যক রঙিন পাথর কোথা থেকে আনতে হয়। যিনি পাথর খোদাই করেন তার বিশেষত্ব পাথর খোদাই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, কিন্তু এটা নিয়ে সে ব্যবসা করতে জানে না। ঠিক একইরকম ভাবে যিনি ব্রোঞ্জের উপকরণ প্রস্তুত করেন তারও বিভিন্ন ধাতু অর্থাৎ তামা, টিন, প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য বাইরে যেতে হয় না। একই সাথে জ্বালানীর জন্যও তার সবসময় কাঠ, কয়লার প্রয়োজন হয়। এই ধরনের শ্রমবিভাজন নগর জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য।

এছাড়াও, শহরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি সামাজিক সংগঠন থাকা জরুরি ছিল। জ্বালানি, ধাতু ও বিভিন্ন প্রকার পাথর, কাঠ প্রভৃতি শহরের নির্মাতাদের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে আসত। এজন্য সংগটিত ব্যবসা এবং সংরক্ষণেরও দরকার হত। এইভাবে শহরে দানা শস্য এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী গ্রাম থেকে সরবরাহ করা হত এবং এই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ করার জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনার ও প্রয়োজন হত। এছাড়া আরও অন্যান্য কাজ ছিল। যেমন মুদ্রা কাটার জন্য কেবল পাথরই নয়, ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি এবং পাত্রেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। স্বভাবতই এই রকম ব্যবসায় কিছুলোক সব সময় আদেশ দেবে এবং অন্যরা সেই আদেশ পালন করবে। এছাড়া শহরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিজস্ব হিসাব-নিকাশ লিখিত রূপে সংরক্ষণ করারও প্রয়োজন ছিল।

ওয়ারকা মস্তিস্ক

৩০০০খ্রি. পূর্বাব্দের আগে উরুক নগরে স্ত্রীলোকের এই মস্তিষ্কটি শ্বেত মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এর চোখ এবং ভ্রূতে সম্ভবত নীল রঙ (Lapis Lazuli) এবং শ্বেত ঝিনুক ও দাহ্য খনিজ পদার্থ দিয়ে বাঁধানো হয়েছিল। মাথার উপর একটি খাঁজ তৈরি করা আছে, যা সম্ভবত গহনা পরিধানের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। এটি মূর্তি-শিল্পের ক্ষেত্রে এক বিশ্বখ্যাত উদাহরণ। এর মুখ, থুতনি এবং গাল সূক্ষ্ম কারুকাজের জন্য প্রশংসিত। এই মূর্তিটি এমন একটি কঠিন পাথরে নির্মাণ করা হয়, যেটা সম্ভবত অনেক দূর থেকে আনতে হয়েছিল।

পাথর আনা থেকে শুরু করে এই মূর্তি নির্মাণ করা পর্যন্ত কোন্ কোন্ বিশেষজ্ঞের ভূমিকা ছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

কার্যাবলী-২

ধাতুর ব্যবহার ছাড়া কি নগর জীবন সম্ভব ছিল? আলোচনা করো।

শহরে পণ্যসামগ্রীর আদান-প্রদান :

মেসোপটেমিয়াতে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, সেখানে খনিজ সম্পদের অভাব ছিল। দক্ষিণের অধিকাংশ জায়গায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মুদ্রা এবং অলঙ্কার বানানোর পাথরের অভাব ছিল। ইরাকী খেজুর অথবা পোপলার (উঁচু ও সরু গাছ বিশেষ) গাছের কাঠ মালগাড়ী, গাড়ির চাকা এবং নৌকা বানানোর জন্য উপযুক্ত ছিল না। সেখানে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, পাত্র এবং অলঙ্কার বানানোর জন্য কোনোরকম ধাতু পাওয়া যেত না। এজন্য আমরা ধারণা করতে পারি, প্রাচীনকালে মেসোপটেমিয়ার লোকজন সম্ভবত কাঠ, তামা, টিন, রূপা, সোনা, ঝিনুক এবং বিভিন্ন ধরনের পাথর তুরস্ক এবং ইরান অথবা উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে আনত। বিনিময়ে তারা প্রচুর সুতিবস্ত্র এবং কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করত। ওই দেশগুলিতে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেও কৃষি কাজের তেমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এই সমস্ত জিনিসগুলো প্রতিনিয়ত আদান-প্রদান তখনই সম্ভব হত, যখন এই কাজের জন্য কোনো সামাজিক সংগঠন বা বিদেশি অভিযানের ফলস্বরূপ ব্যবসা বাণিজ্য গুরুত্ব পেত। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার লোকজন এরকম সংগঠন স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছিল।

শিল্প, বাণিজ্য, পরিসেবা ছাড়াও সুরক্ষিত পরিবহন ব্যবস্থাও ছিল শহর বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশুদের পিঠে অথবা গরুর গাড়িতে করে শহরের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বা কাঠ-কয়লা আনা-নেওয়া খুব কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। কেননা তাতে অনেক সময় নষ্ট হত এবং পশুদের পরিচর্যা ও খাওয়া দাওয়াতে অনেক খরচ হত। শহরের অর্থব্যবস্থা এই অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে সক্ষম ছিল না। এজন্য পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে সুলভ ও সহজলভ্য ছিল জলপথ। বস্তা বোঝাই খাদ্যশস্য নিয়ে নৌকা বা জাহাজ নদীর স্রোতে অথবা বাতাসের বেগে চলতে পারে, যেখানে তেমন কোনো খরচ লাগে না। কিন্তু যখন পশুদের দিয়ে পণ্য সামগ্রী পরিবহন করতে হত, তখন তাদের প্রচুর ঘাস খাওয়ানোর প্রয়োজন হত। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার খাল এবং প্রাকৃতিক জলধারাগুলো ছোটো বড়ো বস্তিগুলোর মধ্যে মাল পরিবহনের উপযুক্ত মাধ্যম ছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে মারী নগরের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেটা পড়লে এটা স্পষ্ট হবে যে, ওই সময় ইউফ্রেটিস নদী ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ‘বিশ্ব পথ’ হিসাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মাটির ফলক : সম্ভবত ৩২০০ খ্রি: পূর্বাব্দের। প্রত্যেক ফলকের উচ্চতা 3.5 সেমি বা তার থেকে কম ছিল। এই ফলকের উপর তৈরি সাংকেতিক চিত্র (ষাড়, মাছ, খাদ্যশস্য ও নৌকা) এবং সংখ্যা (▯)

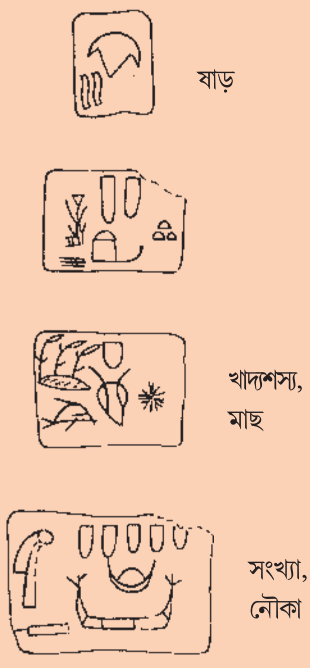

লিখন শৈলীর বিকাশ :

সব সমাজ ব্যবস্থাতেই নিজেদের একটি ভাষা ছিল, যাতে উচ্চারিত ধ্বনিগুলো নিজস্ব অর্থপ্রকাশ করে। এই মৌখিক ভাষার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করা হয়ে থাকে। লিখন মৌখিক ভাষার আদান প্রদান থেকে সেই রকম আলাদা নয়, যতটুকু আমরা মনে করি। যখন আমরা লিখন অথবা কোনো লিপি সম্পর্কে কথা বলি, তখন তার অর্থ এই যে উচ্চারিত ধ্বনিসমূহ দৃশ্যত সঙ্কেত তথা চিহ্নের রূপে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

মেসোপটেমিয়াতে প্রথম যে ফলক (Tablet) পাওয়া যায়, সেটা সম্ভবত ৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ছিল। তার মধ্যে চিত্রের মতো এবং চিহ্ন সংখ্যা ছিল। সেখানে ষাঁড়, মাছ এবং রুটি প্রভৃতির প্রায় ৫০০০ তালিকা পাওয়া গেছে যেগুলো দক্ষিণ শহর উরুক এর মন্দিরের মধ্যে আসা অথবা সেখান থেকে বাইরে যাওয়া কোনো বস্তুর হতে পারে। স্পষ্টত লিখনের কাজ তখনই শুরু হয়েছিল যখন সমাজের ব্যবসায়িরা আদান-প্রদানের স্থায়ী হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। কারণ নগর জীবনে আদান-প্রদান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হত। তার

কীলাকার বর্ণমালার শব্দ সঙ্কেত

সাথে অনেক লোক জড়িত থাকত এবং অনেক প্রকার সামগ্রীর বাণিজ্য হত।

মেসোপটেমিয়ার মানুষেরা মাটির ফলকের উপর লিখত। লিপিকার কাদামাটিকে ভিজিয়ে রাখত,

একটি মাটির ফলকের দুই পৃষ্ঠেই কীলাকার বর্ণমালা লেখা ছিল। এটা একটি গাণিতিক অনুশীলন — ফলকের অগ্রভাগের সবথেকে উপরের দিকে ত্রিভুজাকার এবং তার সামনে পিছে কিছু রেখা অঙ্কিত রয়েছে। তোমরা দেখবে যে, বর্ণগুলোকে কীভাবে মাটির মধ্যে চাপা দিয়ে লেখা হয়েছিল।

আবার তাকে মাখা হত চ্যাপটা করে এবং একএমন আকারের ফলক প্রস্তুত করত, যাতে ফলকটিকে অনায়াসে নিজের এক হাতে ধরে রাখা যায়। লিপিকার খুব যত্ন সহকারে ফলকের উপরিতলকে মসৃণ করত, এরপর কোনো ধারালো বস্তুর তির্যক নখ দিয়ে লিপিকার মসৃণ ফলকের উপর কীলাকার (cuneiform) বর্ণমালার চিহ্ন তৈরি করত। যখন এই ফলকগুলো রোদ্রে শুকিয়ে যেত, তখন খুব শক্ত হত এবং এইগুলো মাটির বাসনপত্রের মতো মজবুত হয়ে যেত। যখন ফলকের উপর লিখিত অনেক হিসাব, যেমন ধাতুর টুকরো বিলি করার হিসাব অসংগত তথা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ত, তখন সেই ফলকটিকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত। এই রকম ফলকের উপরিতল যখন একবার শুকিয়ে যেত, তখন তার উপর নতুন কোনো চিহ্ন বা বর্ণ লেখা যেত না। তাই প্রতিবার লেনদেনের ক্ষেত্রে তা যতই ছোটো হোক না কেন, তার জন্য পৃথক একটি ফলকের প্রয়োজন হত। ফলে মেসোপটেমিয়ার খনন-স্থানের মধ্যে শতাধিক ফলক পাওয়া গেছে এবং এই সমস্ত উৎস অনুসন্ধানের ফলে আমরা মেসোপটেমিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। ফলে তার সাথে আমরা সমসাময়িক ভারতের তুলনা টানতে পারি।

**কুনেইফর্ম (Cuneiform) শব্দটি ল্যাটিন শব্দ কুনেইস (Cuneus) থেকে এসেছে যার অর্থ হল কীলক (wedge) এবং ফর্মা (forma) যার অর্থ হল 'আকার' (shape)।*

সম্ভবত ২৬০০ খ্রি. পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে বর্ণমালা কীলাকারের পরিণত হয়েছিল এবং ভাষা ছিল সুমেরীয়। লেখা তখন শুধুমাত্র হিসাব রাখার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হত না, এছাড়াও শব্দকোশ তৈরিতে ভূমি হস্তান্তরের আইনি স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে, রাজাদের ক্রিয়া-কাণ্ড বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এবং রাজা জমি সংক্রান্ত প্রথাগত আইনের পরিবর্তনের যে ঘোষণা দিত সেটাও লিখিত আকারে ছিল। মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা বলে পরিচিত ছিল সুমেরীয় ভাষা, কিন্তু ২৪০০ খ্রি. পূর্বাব্দের সময়ে ধীরে ধীরে আক্কাদী সুমেরীয় ভাষার স্থান দখল করে। আক্কাদীর ভাষায় কীলাকার বর্ণমালার লিখন প্রচলিত হয় খ্রি. পূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে যেটা ২০০০ বছরের অধিক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

লিখন পদ্ধতি :

কীলাকার বর্ণ যে ধ্বনির চিহ্ন প্রয়োগ করত, সেটি একক কোন ব্যঞ্জনবর্ণ বা স্বরবর্ণের হতো না (যেমন

ইংরেজী বর্ণমালাতে *m* অথবা *a*) কিন্তু অক্ষর (syllabus) হত (যেমন ইংরেজীতে -Put-অথবা-la -বা-in-)। এই ভাবে মেসোপটেমিয়ার লিপিকারদের শতাধিক চিহ্ন শিখতে হত এবং লিপিকারকে ফলকটি শুকিয়ে যাওয়ার আগে লিখতে হত। লিখনকার্যকে এজন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্পকলা হিসাবে মনে করা হত। এই প্রকার কোনো নির্দিষ্টভাষার ধ্বনিগুলোকে দৃশ্যতরূপে প্রস্তুত করা ছিল একটি মহান বৌদ্ধিক কৃতিত্ব।

সাক্ষরতা :

মেসোপটেমিয়ার খুব অল্প সংখ্যক লোকেরাই লিখতে পড়তে পারত। কেবলমাত্র শতশত চিহ্ন জানতে হত শুধু তাই নয় এদের মধ্যে অনেকগুলো চিহ্ন ছিল খুবই জটিল (পৃঃ নং ৩৩ এ দেখো)। যদি রাজা স্বয়ং পড়তে পারতেন তখন তিনি এটা চাইতেন যে তার প্রশস্তিগুলো যাতে শিলালিপিতে অবশ্যই বর্ণনা করা হয়। অধিকতর লিখনের মাধ্যমে কথাবলার ভঙ্গিমা প্রতিফলিত হত।

এক আধিকারিকের দ্বারা রাজাকে লেখা পত্র তাঁকে পড়ে শোনানো হত। এজন্য পত্রটির আরম্ভ এইভাবে হত :

আমার অধিপতি (A) কে .... তার সেবক (B) নিবেদন করছে .... আমাকে দেওয়া কাজটিকে আমি সম্পন্ন করেছি .... ।

সৃষ্টি সম্পর্কে লেখা এক দীর্ঘ পৌরাণিক কবিতার শেষের দিকে এটা লিখা ছিল :

এই কবিতার পংক্তিগুলোকে সব সময়ে মনে রাখা যাবে, এবং বড়ো বয়োজেষ্ঠ্য লোক কবিতাটি ছোটোদের শেখাবে;

বুদ্ধিমান এবং পণ্ডিত লোক এটার উপর আলোচনা করবে;

পিতা তার পুত্রকে এটা পুনঃ পুনঃ বলবে;

(এমন কি) পশু পালকদের কানও এই পংক্তিগুলোকে শোনার জন্য সব সময়ে খোলা থাকবে;

লিখন শৈলীর ব্যবহার:

উরুকের এক প্রাচীন শাসক এনমার্কার এর (Enmerker) সম্পর্কে লেখা এক সুমেরিয়ান মহাকাব্যতে নগর জীবন, ব্যবসা বাণিজ্য এবং লিখন শৈলীর মধ্যে সম্পর্কগুলোকে সুন্দর এবং সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মেসোপটেমিয়ার পরম্পরাগত কথা অনুসারে, উরুক এক অত্যন্ত সুন্দর নগর ছিল, যাকে প্রায়ই কেবল একটি 'শহর' হিসাবে জানা যেত।

সুমের অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রথম ঘটনাটির সাথে এনমার্কারকে যুক্ত করা হয়েছিল। মহাকাব্যটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সেই দিনগুলোতে বাণিজ্যের বিষয়টি কেউই জানত না। এনমার্কার তার শহরের এক মন্দিরে সৌন্দর্যায়নের জন্য নীলাপাথর (lapis Laxuli) এবং অন্য বহুমূল্য ধাতুর আমদানি করতে চেয়েছিল। এই কাজটির জন্য রাজা তার একজন বার্তাবাহককে আরাট্টা (Aratta) নামক এক সুদূর দেশের প্রধানের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। 'এক বার্তাবাহক রাজার আদেশ পালন করেন। রাত্রিতে তিনি শুধু তারার আলোতে এবং দিনের বেলাতে তিনি সূর্যের নির্দেশিত পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি রাস্তার মধ্যে থাকা উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোকে অতিক্রম করার জন্য উপরের দিকে চড়ছিলেন এবং নিচের দিকে নামছিল। যখন তিনি পাহাড়ের চূড়ায় ছিলেন, তখন পাহাড়ের পাদদেশে থাকা সুসা (Susa) নগরের জনগোষ্ঠীরা তাকে ছোটো ইঁদুরের মতো নমস্কার করছিল*। তিনি পাঁচ পর্বতমালা, ছয় পর্বতমালা এবং সাত পর্বতমালা অতিক্রম করেছিলেন .....'।

*কবির কথার তাৎপর্য এই রকম ছিল যে, যখন বার্তাবাহক একবার উঁচু পাহাড়ে উঠেছিল তখন পাহাড়ের পাদদেশে থাকা সব বস্তুগুলোকে অনেক ছোটো দেখাত।

বার্তাবাহক আরাট্টা নগরের প্রধানের কাছ থেকে নীলা পাথর (Lapis Lazuli) বা রূপা আনতে পারেনি এবং বারবার দীর্ঘযাত্রার পথ পার হওয়ার পরও তাকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছিল, উপরন্তু আরাট্টার প্রধান থেকে বহুমূল্য ধাতু আনার জন্য তাকে উরুকের রাজার কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের ধমক এবং আশ্বাসবাক্য শুনতে হয়েছিল। পরিণামে, বার্তাবাহক এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, তার নিজের কথাই সঠিক ভাবে উপস্থাপন করতে পারেনি এবং সে এনমার্কার এর বার্তাগুলোকে উলটপালট করে ফেলেছিল। তখন রাজা এনমার্কার নিজের হাতে কাদামাটির একটি ফলক প্রস্তুত করে তার মধ্যে কিছু আদেশ তথা বাণী

* কিউনিফর্ম অক্ষর ছিল নখের মতো শঙ্কু আকৃতির

লিখেছিলেন। সেসময়ে মাটির ফলকের মধ্যে আদেশ তথা বাণী লেখার কোনো প্রচলন ছিল না।

যখন লিখিত মাটির ফলকটিকে আরাট্টার শাসকের কাছে দিয়েছিলেন, 'তখন তিনি ফলকটিকে ভাল করে পরীক্ষা করেন। ফলকটির উপর উচ্চারিত শব্দ কীলাকার বর্ণমালাতে ছিল। এটা দেখার সময় তার চাউনির মধ্যে একটা বিরাগভাব আসে। তিনি মাটির ফলকটির দিকে বরাবর তাকিয়ে রয়েছিলেন।'

এই ঘটনাগুলোকে আক্ষরিক সত্য হিসেবে মনে করা হয় না। কিন্তু তা থেকে এটা অনুমান করা যেতে পারে যে মেসোপটেমিয়ার বিচার ধারা অনুসারে রাজা সর্বপ্রথম বাণিজ্য এবং লিখনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই কবিতাটি আমাদের এটাও বলে দেয় যে, লিখন কার্যের সূচনার ফলে তথ্য সংগ্রহ এবং দূর-দূরান্তে বার্তা প্রেরণতো করা যেতই, সাথে সাথে তা থেকে মেসোপটেমিয়া শহরের সংস্কৃতির উৎকৃস্টতার ইঙ্গিতও পাওয়া যেত।

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার শহরায়ণ ঃ-

মন্দির এবং রাজা

৫০০০ খ্রি. পূর্বাব্দ থেকে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়াতে বস্তিগুলোর বিকাশ শুরু হয়েছিল। এই বস্তিগুলোর মধ্য থেকে কিছু প্রাচীন শহরের রূপ নিয়ে নিয়েছিল। এই শহরগুলো বিভিন্ন প্রকারের ছিল, প্রথমত কিছু শহর ছিল যা ধীরে ধীরে মন্দিরের চারিদিক থেকে উন্নীত হয়েছিল, দ্বিতীয়ত আরও কিছু শহর ছিল যেগুলো বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত হয়েছিল এবং কিছু রাজকীয় শহর ছিল এদের মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণির শহর সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হবে।

বাইরে থেকে আসা বসতি স্থাপনকারীরা (যাদের উৎপত্তি আমাদের অজানা) তাদের গ্রামের কিছু নির্বাচিত অঞ্চলে মন্দিরগুলোর নির্মাণ এবং পুন নির্মাণ শুরু করেছিল। সব থেকে প্রাচীন বলে পরিচিত মন্দিরটি একটি ছোটো দেবালয় ছিল এবং সেটা তৈরি হয়েছিল কাঁচা ইট দিয়ে। মন্দিরটিতে নানা প্রকারের দেব-দেবী বিরাজ করত। যেমন, উর ছিল চন্দ্রের দেবতা এবং ইনান্না ছিল ভালবাসা এবং যুদ্ধের দেবী। এই মন্দিরগুলো ইট দিয়ে নির্মাণ করা হত যা সময়ের সাথে সাথে বড়ো হতে থাকে। কেননা মন্দিরের যুক্ত প্রাঙ্গানের চারিদিকে অনেকগুলো কক্ষ থাকত। কিছু পুরাতন মন্দির সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ী থেকে আলাদা ছিল না, কেননা মন্দিরগুলোও কোনো দেবতার ঘরই ছিল। কিন্তু মন্দিরের বাইরের প্রাচীরগুলো কিছু বিশেষ অন্তরালে ভেতর এবং বাইরের দিকে মোড়ানো অবস্থায় থাকত। এটাই ছিল মন্দিরগুলোর বিশেষত্ব, যেটা সাধারণ মানুষের ঘর-বাড়ির প্রাচীরের মধ্যে দেখা যেত না।

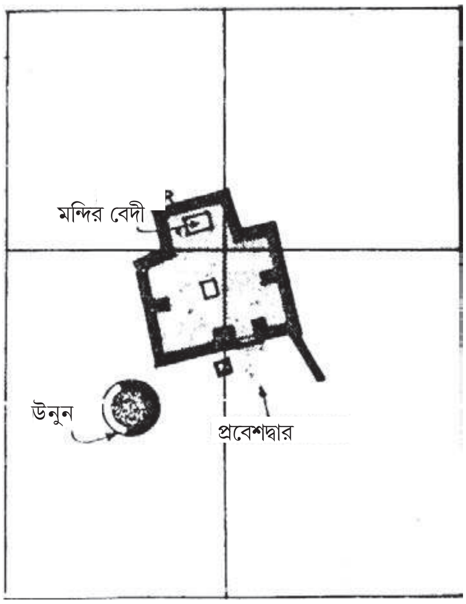

দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার পরিচিতি সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির, সম্ভবত ৫০০০ খ্রি. পূ. (নকশা)

আরাধনা করার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল দেবতা। মানুষ দেব-দেবীকে অর্পণ করার জন্য অন্ন, দই, মাছ নিয়ে আসত। (পুরাতন কালের কিছু মন্দিরের মেঝেতে মাছের হাড়ের জমানো স্তর পাওয়া গেছে) আরাধ্য দেবতাকে তাত্ত্বিকভাবে কৃষিজমি, মৎসচাষ এবং স্থানীয় পশুপালকের অধিপতি মনে করা হত। তখন উৎপাদিত বস্তুর প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিও (যেমন - তেল নিষ্কাশন করা, শস্য চূর্ণন, কাটা এবং পশমের বস্ত্র বুনন প্রভৃতি) মন্দির প্রাঙ্গানেই সম্পন্ন হত। পারিবারিক উৎপাদক সংগঠন, বাণিজ্যের নিয়োগকর্তা, শস্য বরাদ্দ এবং বিতরণ করার নথি লিখিত আকারে রাখা, কৃষিকাজের পশু সমূহ, রুটি, সুরা, মাছ প্রভৃতি মন্দিরের কার্যকলাপ ধীরে ধীরে বিকশিত করেছিল, ফলে মন্দিরটি মুখ্যভাবে শহরের একটি প্রধান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অন্য আর একটি কারণও এই ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

কৃষিজমিগুলোতে প্রাকৃতিক উর্বরতা থাকা সত্ত্বেও কৃষিকাজ করার বিষয়টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। ইউফ্রেটিস নদীর প্রাকৃতিক জলধারাতে কোনো কোনো বছর অত্যাধিক জল আসত এবং তাতে ফলনগুলো

সম্ভবত ৩০০০ খ্রিঃপূঃতে নির্মিত একটি মন্দির যার মুক্ত প্রাঙ্গান এবং ভেতর ও বাহিরের সম্মুখভাগ (খননকৃত হিসেবে) চিত্রতে দেখানো হয়েছে।

জলের তলে ডুবে থাকত এবং কখনো কখনো নদীর গতিপথ পাল্টে যেত। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য অনুসারে মেসোপটেমিয় ইতিহাসে গ্রামগুলো পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও কখনো কখনো মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় হত। যারা উঁচু জায়গায় বসবাস করত, তারা প্রচুর জল নিজেদের জায়গাতে সঞ্চয় করে রাখত। ফলে নিচুস্থানে বসবাসকারী লোকেরা ব্যবহারের জন্য জল পেত না। অথবা উঁচু জায়গার লোকেরা নিজেদের অংশের নদী প্রণালী থেকে জমা গাঁদ (মাটি) পরিষ্কার করত না, যার ফলে নদী প্রবাহ থেমে থাকত এবং নিচে বসবাসকারী লোকেরা জল পেত না। এজন্য তৎকালীন মেসোপটেমিয়ার লোকেরা জমি এবং জলকে নিয়ে বার বার সংঘাতে লিপ্ত হত।

যখন কোনো অঞ্চলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ চলত তখন গ্রামের যে সর্দার যুদ্ধে জয়ী হত, সে তার নিজের সাথী এবং অনুগামীদের লুণ্ঠিত বস্তুগুলো বণ্টন করে দিয়ে খুশি রাখত। তারা পরাজিত লোকেদের বন্দী বানিয়ে নিজেদের সাথে নিয়ে যেত, যাদের তারা চৌকিদার এবং চাকর বানিয়ে রাখত। এইভাবে তারা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শক্তি বৃদ্ধি করত। কিন্তু যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া এই দলপতিরা স্থায়ীভাবে কোন সম্প্রদায়ের সর্দার হয়ে থাকত না, আজ থাকত তো কাল চলে যেত, কিন্তু পরবর্তীতে কোনো এক সময়ে দলপতিরা জনসাধারণের কল্যাণহেতু কাজ করা শুরু করত এবং তার ফলস্বরূপ নতুন নতুন সংস্থার স্থাপন হত। সেই সময়ের বিজয়ী সর্দাররা বহুমূল্যবান সামগ্রী ভগবানকে অর্পণ করত, যার ফলে জনসাধারণের মন্দিরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেত। তারা মানুষদের উৎকৃষ্ট পাথর এবং ধাতু আনার জন্য পাঠাত, যাতে দেবতা এবং সম্প্রদায়ের লোকেরা সুবিধা পায়। মন্দিরের ধন-সম্পদের সুষ্ঠু বিতরণের জন্য মন্দিরের প্রাপ্ত এবং বিতরিত সামগ্রীর হিসেব দক্ষভাবে রাখা হত। যেমন এনমার্কার সম্পর্কিত কবিতাসমূহতে দেখানো হয়েছে যে, এই ব্যবস্থায় রাজার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং জনসাধারণের উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার জন্য বিকাশের এমন একটি কালচক্রের কল্পনা করতে পারি, যেখানে গ্রামের সর্দাররা গ্রামীণ লোকদের নিজেদের নিকট থাকার জন্য উৎসাহিত করত। যাতে প্রয়োজনের সময় নিজেদের সৈন্যবল একত্রিত করতে পারে। এছাড়াও, মানুষ একে অপরের কাছাকাছি ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করাকে অধিক নিরাপদ বলে মনে করত। তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির নগরীর উরুক থেকে আমরা শস্ত্রবীর এবং তাদের কাছ থেকে হতাহত হওয়া শত্রুদের চিত্র পাই। সতর্কভাবে হওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিরীক্ষা থেকে জানা যায় যে ৩০০০ খ্রি. পূ. কাছাকাছি সময়ে যখন উরুক নগর ২৫০ হেক্টর জমিতে বিস্তৃত হয় (যা ছিল মোহেন-জো-দারো এর দ্বিগুণ) তখন অনেকগুলো ছোটো ছোটো গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং অঞ্চলগুলো বিশাল মাত্রায় অনাবাদি জমিতে পরিণত হয় এবং পরবর্তী সময়ে এই

জায়গা থেকে অধিক মাত্রায় জনসাধারণ স্থানান্তরিত হয়। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, উরুক নগরের চারিদিকে অনেক আগে থেকেই প্রতিরক্ষা মূলক সুদৃঢ় প্রাচীর তৈরি করা ছিল। উরুক নগর ৪২০০ খ্রি. পূ. থেকে ৪০০ খ্রি. পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, যার ফলস্বরূপ উরুক নগর ২৮০০ খ্রি. পূ. কাছাকাছি সময়ে বিস্তৃত হয়ে ৪০০ হেক্টর জমিতে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধে বন্দি এবং স্থানীয় লোকেদের অনিবার্য কারণবশত মন্দিরের জন্য অথবা প্রত্যক্ষভাবে শাসকদের জন্য কাজ করতে হত। কৃষি কর না দিলেও কাজ করা ছিল বাধ্যতামূলক। যাদের কাজের জন্য নিযুক্ত করা হত, তাদের কাজের বিনিময়ে খাদ্য দেওয়া হত। শতাধিক এরকম খাদ্য তালিকা পাওয়া গেছে, যার মধ্যে কাজে নিযুক্ত হওয়া লোকেদের নামের পাশে তাদের জন্য বরাদ্দ খাদ্য শস্য, কাপড় এবং তেল প্রভৃতির পরিমাণ লেখা ছিল। একটি অনুমান অনুসারে এই মন্দিরগুলোর মধ্যে একটি মন্দিরকে তৈরি করার জন্য ১৫০০ জন শ্রমিক পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রতিদিন ১০ ঘন্টা করে কাজ করেছিল।

শাসকের আদেশে সাধারণ জনগণ মূল্যবান পাথর, খনিজ ধাতু আনত এবং দূরবর্তী দেশ থেকে মন্দিরের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করত। এজন্যই উরুক শহর ৩০০০ খ্রি. পূ. কাছাকাছি সময়ে প্রযুক্তিগত দিক থেকেও উন্নত ছিল। বিভিন্ন প্রকার শিল্পকাজের জন্য ব্রোঞ্জের উপকরণ ব্যবহার করা হত। স্থাপত্যশিল্পীরা ইটের স্তম্ভ নির্মাণ করার কৌশল রপ্ত করে নিয়েছিল, কেননা তখনকার সময়ে বড়ো-বড়ো কক্ষগুলোর ওজন ধরে রাখার জন্য তথা স্তম্ভ তৈরি করার জন্য উপযুক্ত কাঠ পাওয়া যেত না। শতাধিক লোকেদের কাদামাটির শঙ্কু (কোণ) প্রস্তুত এবং পোড়ানোর কাজে নিযুক্ত করা হত। এই শঙ্কুগুলোকে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে মন্দিরের প্রাচীরে লাগানো হত, যাতে সেই প্রাচীরগুলো বিভিন্ন রঙে সুশোভিত হয়ে থাকে। মূর্তি শিল্পের ক্ষেত্রেও চমকপ্রদ সফলতা অর্জন করেছিল, অনায়াসে লভ্য হওয়া কাদামাটি (clay) অপেক্ষা অধিকতর আমদানিকৃত বহুমূল্য পাথর দিয়েই এই শিল্পের কাজ সম্পন্ন হত।

তখন প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেও এক যুগান্তরকারী পরিবর্তন ঘটে, তা হল কুমোর এর চাকার নির্মাণ এবং যেটা শহরের অর্থব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই চাকার মাধ্যমে কুমোর এর কারখানাতে এক সাথে বিশাল পরিমাণের একই রকমের বাসন তথা মাটির পাত্র প্রস্তুত করা যেত।

উপরে একটি সোজাসুজিভাবে বসানো কালো পাথরের ফলকের মধ্যে দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তির দুই রকম চিত্র দেওয়া হয়েছে। তার চুল এবং চুল বাঁধার ফিতা, কোমরে বাঁধা বেল্ট এবং দীর্ঘ পোশাকের দিকে লক্ষ করো। নীচের দৃশ্যটিতে দেখানো হয়েছে ব্যক্তিটি একটি সিংহের উপর বড়ো তির ধনুক দিয়ে আক্রমণ করছে। উপরের দৃশ্যটিতে এইবীর হিংস্র সিংহটিকে পরিশেষে তার বর্শা দিয়ে হত্যা করে ফেলেছে। (সম্ভবত ৩২০০ খ্রিপূ.)

*(steles) সোজাসুজি ভাবে বসানো পাথরের ফলক, যার মধ্যে লিপি খোদিত অবস্থায় থাকে।

সীলমোহর : একটি শহুরে শিল্পকৃতি

একটি বেলন আকারের মুদ্রার ছাপ, সম্ভবত ৩২০০ খ্রি. পূর্বাব্দের। এই ছবিতে সশস্ত্র দাঁড়ানো দাড়িওয়ালা ব্যক্তি এবং উপরের ছবিতে দেখানো কালো পাথরের ফলকের (stele) মধ্যে বীর এর অঙ্কিত ছবি দুটোর মধ্যে পোশাক এবং চুলের ধরনের সাদৃশ্য রয়েছে। চিত্রটিতে তিনজন যুদ্ধবন্দীর দেখানো হয়েছে যাদের হাত বাঁধা এবং চতুর্থব্যক্তি বিজয়ী যোদ্ধার সামনে হাত বাড়িয়ে দয়া প্রার্থনা করছে।

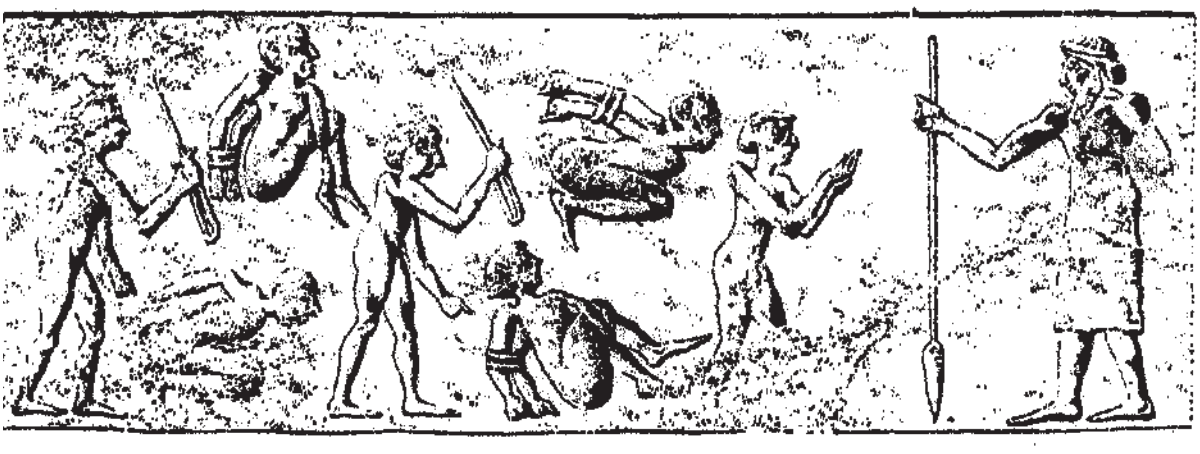

ভারতে, প্রাচীন কালে পাথরের সীলমোহর ছিল, যাতে চিহ্ন অঙ্কিত থাকত। কিন্তু মেসোপটেমিয়াতে, খ্রি. পূ. প্রথম সহস্রাব্দের শেষের দিকে পাথরের বেলন আকৃতির সীলমোহর, এটার মাঝখানটাতে সামনে পেছনে ছিদ্র করা থাকত। একটি লাঠির মধ্যে ভেজা মাটি লাগিয়ে ঘোরানো হত এবং তাতে করে প্রতিনিয়ত ছবি তৈরি হতে থাকত। তারা অত্যন্ত দক্ষ কারিগরের দ্বারা পাথরে অঙ্কন তথা খোদাই করত এবং কখনো কখনো তাতে এমন কিছু লেখা থাকত; যাতে মালিকের নাম, তার আরাধ্য দেবতার নাম এবং নিজের পদমর্যাদা প্রভৃতি থাকত। কোনো কাপড়ের মোড়ক তথা গাঁট বা পাত্রের মুখে মাটির প্রলেপ লাগিয়ে তার মধ্যে সীল মোহরটিকে ঘোরানো হত, যার ফলে সীলমোহরে অঙ্কিত অক্ষরগুলো মাটির ফলকটিতে ছেপে যেত। তাতে সেই কাপড়ের মোড়ক তথা গাঁটি বা পাত্রের মধ্যে রাখা সামগ্রীতে সীলমোহর লাগিয়ে সুরক্ষিত রাখা হত। যখন এই মোহরটিকে মাটির তৈরি ফলকের লিখিত অক্ষরের উপর ঘোরানো হত তখন সেই মোহরটি অক্ষরের প্রামাণিকতার প্রতীক হয়ে থাকত। এইভাবে সীলমোহর তথা মুদ্রা সর্বসাধারণের জীবনে নগরবাসীর ভূমিকাকে নির্দেশিত করত।

পাঁচটি পুরানো বেলন আকৃতির সীলমোহর এবং তাদের ছাপ। চিত্রটিতে তোমার দেখা প্রত্যেকটি ছাপের বর্ণনা করো।
চিত্রটির মধ্যে কি কীলাকার বর্ণমালার কোনো লিপি দেখানো হয়েছে ?

শহরের জীবন :

উপরে উল্লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায় যে, নগরগুলোর সামাজিক ব্যবস্থাতে এক সমভ্রান্ত শ্রেণিবর্গের উদ্ভব হয়েছিল। ধন-সম্পদের বেশিরভাগ অংশ সমাজের একটি ছোটো শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। এখানে প্রাপ্ত কিছু তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, বহুমূল্য সামগ্রী (যেমন-মণিমুক্তা, স্বর্ণের পাত্র, শ্বেত ঝিনুক এবং নীলাপাথর খচিত কাঠের বাদ্য যন্ত্র, স্বর্ণ দিয়ে সাজানো ছুরি প্রভৃতি) বিশাল মাত্রায় উর প্রদেশের রাজা এবং রাণীদের কিছু সমাধিতে তাদের সাথে সমাধিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষদের অবস্থা কী রকম ছিল ?

আইনি দলিলগুলো (ঝগড়া-বিবাদ, উত্তরাধিকার বিষয় সংক্রান্ত মামলা প্রভৃতি) থেকে জানা যায় যে, মেসোপটেমিয়ার সমাজ ব্যবস্থাতে ছোটো পরিবারকেই (Nuclear family) আদর্শ মনে করা হত। যদিও একজন বিবাহিত ছেলে এবং তার পরিবার প্রায়ই নিজের পিতা-মাতার সাথেই থাকত। আমরা বিবাহের প্রক্রিয়া তথা তার বিধিবিধান সম্পর্কে কিছু জানতে পারি। বিবাহ করার ইচ্ছা সম্পর্কে ঘোষণা করা হত এবং কনের পিতা-মাতা তার বিবাহের পক্ষে মত পোষণ করতেন। তারপর বর-পক্ষ থেকে কনে পক্ষকে কিছু উপহার প্রদান করা হত। যখন বিবাহ কার্য সম্পন্ন হত তখন দুই পক্ষ থেকেই উপহার সামগ্রীর

*ছোট পরিবারের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের সন্তান অন্তর্ভুক্ত থাকে।

আদান-প্রদান করা হত। তারা একসঙ্গো বসে ভোজন করে মন্দিরে গিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করত। যখন কনে-কে শাশুড়ি আনতে যেত তখন নববধূকে তার পিতা নববধূর প্রাপ্ত সম্পত্তি দিয়ে দিত। পিতার ঘরবাড়ি, পশুধন, কৃষিজমি প্রভৃতি তার ছেলে পেত।

চলো, আমরা উর নগরের উপর আলোকপাত করি। উর নগর সেই নগরগুলোর মধ্যে একটি ছিল, যেখানে সবচেয়ে প্রথম খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। উর, মেসোপটেমিয়ার এমন একটি শহর ছিল যেখানে সাধারণ ঘরবাড়িগুলোর খনন ১৯৩০ এর দশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে করা হয়েছিল। তাতে কিছু আঁকা-বাঁকা সরু গলিপথ পাওয়া গেছে, যা থেকে এটা জানা যায় যে, তখন চাকা বিশিষ্ট মালগাড়িগুলো উর নগরের অনেক ঘরবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাত না। খাদ্য শস্য ভর্তি বস্তা এবং জ্বালানির কাঠগুলোকে সম্ভবত গাধার পিঠে বসিয়ে ঘর পর্যন্ত আনা হত। সরু আঁকা-বাঁকা পথ এবং অগোছালো বাড়িঘরের গঠন দেখে এটা জানা যায় যে, তখন সেখানে সুষ্ঠু নগর-পরিকল্পনার অভাব ছিল। সেখানে রাস্তার পাশে জল-নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না যেটা আমরা সমসাময়িক মোহেন-জো-দারো দেখতে পেয়েছি। বরং জল-নিষ্কাশনের নালী পথ এবং মাটির তৈরি নলগুলো উর নগরের ঘরবাড়িগুলোর ভেতরের প্রাঙ্গানে পাওয়া গেছে, যা থেকে এটা বোঝা যায় যে, ঘরের ছাদগুলো ঢালু অবস্থায় ভেতরের দিকে থাকত এবং বৃষ্টির জল নিষ্কাশন নালীগুলোর মাধ্যমে ভেতরের প্রাঙ্গানগুলোর মধ্যে তৈরি করা ঢাকনা যুক্ত কুয়োতে (sumps) এসে জমা হত। সম্ভবত কুয়োগুলো এই জন্য তৈরি করা হয়েছিল যে, একসঙ্গো মুষলধারায় বৃষ্টি এলে যাতে ঘরের পাশের কাঁচা রাস্তাগুলোতে অত্যাধিক জল-কাদা না জমে।

* কুয়ো (sumps): জমিতে এমন এক ঢাকনা যুক্ত গর্ত থাকত যাতে জল এবং নর্দমার ময়লা এসে জমা হত।

তারপরও এই রকম মনে হত যে, মানুষ তার ঘরের সব আবর্জনা পরিষ্কার করে রাস্তার মধ্যে ফেলে রাখত, যার ফলে রাস্তার নোংরা আবর্জনার উপর দিয়ে লোকেরা যাতায়াত করত। এভাবে বাইরে আবর্জনা ফেলে রাখার জন্য গলিপথের স্তর উঁচু হয়ে যেত, ফলে কয়েক দিন পর ঘরগুলোর ভিট তথা প্রবেশস্থলগুলোকেও উচুতে উঠাতে হত। যাতে করে বৃষ্টির পরে কাদা জল প্রবাহিত হয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ না করে। কক্ষগুলোর ভেতর আলো জানালা দিয়ে নয়, দরজা দিয়ে প্রবেশ করত যেটা প্রাঙ্গানের দিকে খোলা থাকত। তাতে পরিবারগুলোর মধ্যে গোপনীয়তা বজায় থাকত। ঘরবাড়িগুলোর সম্পর্কে অনেক ধরনের অন্ধবিশ্বাসও প্রচলিত ছিল, এই বিষয়ে উর নগরে পাওয়া শুভ-অশুভ সম্পর্কিত লক্ষণ-ফলকগুলোর মধ্যে লিখিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। যেমন ঘরের প্রবেশস্থল উঁচু হলে সেখানে প্রচুর ধন-সম্পদের আগমন ঘটে; সামনের দিকের দরজা যদি অন্য কোনো ঘরের অভিমুখে না খোলে তবে সেখানে সৌভাগ্য বর্ষিত হয়। কিন্তু যদি ঘরের কাঠের প্রধান দরজা (ভেতরের দিকে খোলার পবিবর্তে) বাইরের দিকে খোলে, তবে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠবে।

উর নগরবাসীদের জন্য একটি কবরস্থান ছিল, যাতে শাসকদের এবং সাধারণ লোকেদের সমাধি পাওয়া গেছে, কিন্তু কিছু মানুষকে সাধারণ ঘরের মেঝের নীচে সমাধিত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

উরুনগরের একটি বসতিপূর্ণ অঞ্চল, সম্ভবত ২০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে। তোমরা কি চিত্রটিতে

পশুচারণ অঞ্চলে একটি বাণিজ্যিক নগর

২০০০ খ্রি. পূ. শেষের দিকে মারি নগর একটি রাজকীয় রাজধানীরূপে উন্নীত হয়েছিল। তোমরা লক্ষ করেছো (মানচিত্র হতে) যে মারি নগর দক্ষিণের সেই সমভূমিতে অবস্থিত ছিল না, যেখানে প্রচুর পরিমাণে কৃষি ফলত। নগরটি ইউফ্রেটিস নদীর উপর উঁচু জায়গাতে অবস্থিত ছিল। মানচিত্র -৩ এ বিভিন্ন রঙের ব্যবহারের মাধ্যমে এটা দেখানো হয়েছে যে, সেই উঁচু জায়গাটিতে কৃষি এবং পশুপালন একই সাথে চলত। যদিও মারি রাজ্যতে কৃষক এবং পশুপালক দুই ধরনের লোকই বসবাস করত, কিন্তু মারি প্রদেশের অধিকাংশ ভাগ ভেড়া এবং ছাগল চারণের জন্যই ব্যবহার করা হত।

মানচিত্র ৩ : মারী নগরের অবস্থান

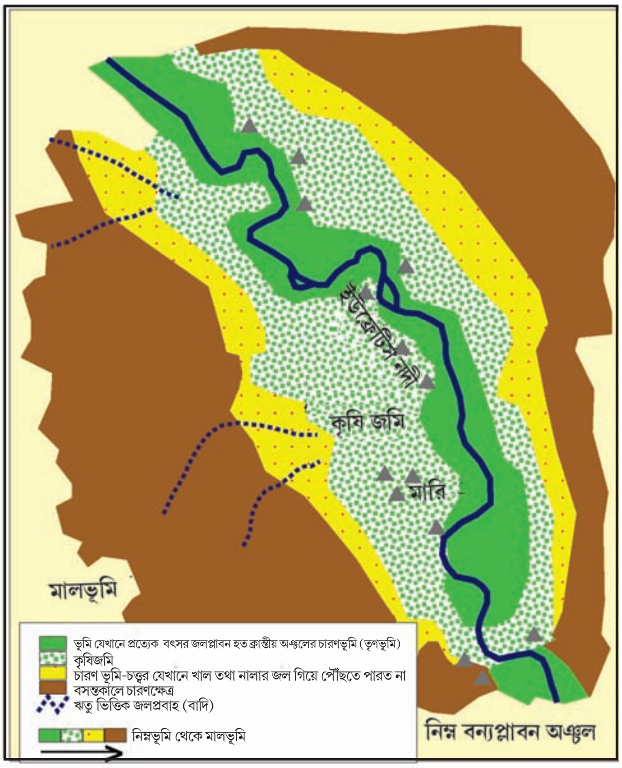

পশু পালকদের যখন খাদ্যশস্য, ধাতুর যন্ত্রপাতি প্রভৃতির প্রয়োজন হত, তখন তারা নিজেদের পশুগুলো থেকে উৎপন্ন পনির, চামড়া এবং মাংস প্রভৃতির বিনিময়ে ওই সমস্ত বস্তুগুলো আদায় করত এবং খামারে রাখা পশুগুলোর গোবরও কৃষকদের জন্য খুব উপযোগী ছিল। কৃষক ও পশুপালকদের মধ্যে অনেক সময় ঝগড়া হত। পশুপালকেরা অনেক সময় যখন তাদের পশুগুলোকে জল পান করানোর জন্য ফসল ভরা কৃষি জমিতে নিয়ে যেত, তাতে অনেক ফসল নষ্ট হত। পশুপালকেরা অস্থির হয়ে অনেক সময় কৃষকদের গ্রামগুলোতে হামলা চালিয়ে তাদের সংরক্ষিত সামগ্রী লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত। অন্য দিকে অনেক সময় এই রকমও দেখা যেত যে বস্তিগুলোতে থাকা লোকেরাও ওই পশুপালকদের রাস্তা বন্ধ করে রাখত এবং তাদের পশুগুলোকে নদী-নালা পর্যন্ত যেতে দিত না।

মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসের উপর দৃষ্টিপাত করলে জানা যাবে যে, সেখানে কৃষির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হওয়া অঞ্চলে যাযাবর সম্প্রদায়ের লোকেরা পশ্চিম মরুভূমি থেকে এসেছিল। পশুপালকেরা গ্রীষ্মকালে তাদের সাথে পশুর দল নিয়ে যেত কৃষি জমির বপন করা অঞ্চল দিয়ে। এই পশুপালকেরা ফসল কাটার শ্রমিক হিসেবে অথবা ভাড়াটে সৈনিকের মতো আসত এবং সমৃদ্ধশালী হয়ে এখানেই তারা বসতিস্থাপন করত। এদের মধ্যে সামান্য কিছু মানুষ নিজস্ব শাসন স্থাপন করার শক্তিও অর্জন করেছিল। এরা ছিল আক্কাদীয়, ইমোরীয়, অসিরিয়ান এবং অরামীয় সম্প্রদায় ভুক্ত। (পরবর্তী বিষয় -৫ এ তোমরা এই পশুপালক সমাজের শাসকদের সম্পর্কে আরও বিশদভাবে জানতে পারবে)। মারি নগরের রাজা ইমোরীয় জাতিভুক্ত ছিল। রাজার পোশাক সেখানের আদি নিবাসীদের থেকে আলাদা ছিল এবং রাজা মেসোপটেমিয়ার দেব-দেবীদের শুধু শ্রদ্ধা প্রদর্শনই করত না বরং স্টেপি (steppe) অঞ্চলের ডেগন (Dagan) দেবতার জন্য মারি নগরে একটি মন্দিরও নির্মাণ করা হয়েছিল। এভাবে, মেসোপটেমিয়ার সমাজ এবং সেখানের সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতির জন্য খোলা হয়েছিল। এবং সম্ভবত বিভিন্ন জাতি তথা সম্প্রদায়ের মানুষদের পরস্পর মিশ্রণের ফলেই তাদের সভ্যতাকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

একজন যোদ্ধা তার হাতের মধ্যে দীর্ঘ একটি বর্শা এবং একটি কঞ্চি নির্মিত ঢাল ধরে রেখেছে। ইমোরীয় সম্প্রদায়ের লোকেদের বিশেষ ধরনের একটি পোশাক দেখানো হয়েছে যেটা (পৃষ্ঠা নং ৩৮ এ দেখানো হয়েছে) সুমেরিয়ান যোদ্ধাদের পোশাক থেকে ভিন্ন ছিল। এই চিত্রটিকে একটি ঝিনুক তথা শঙ্খের উপর খোদাই করা হয়েছে। সম্ভবত ২৬০০ খ্রি. পূ.।

মারি নগরে জিম্‌রিলিম এর রাজপ্রাসাদ (১৮১০-১৭৬০ খ্রি. পূ.)

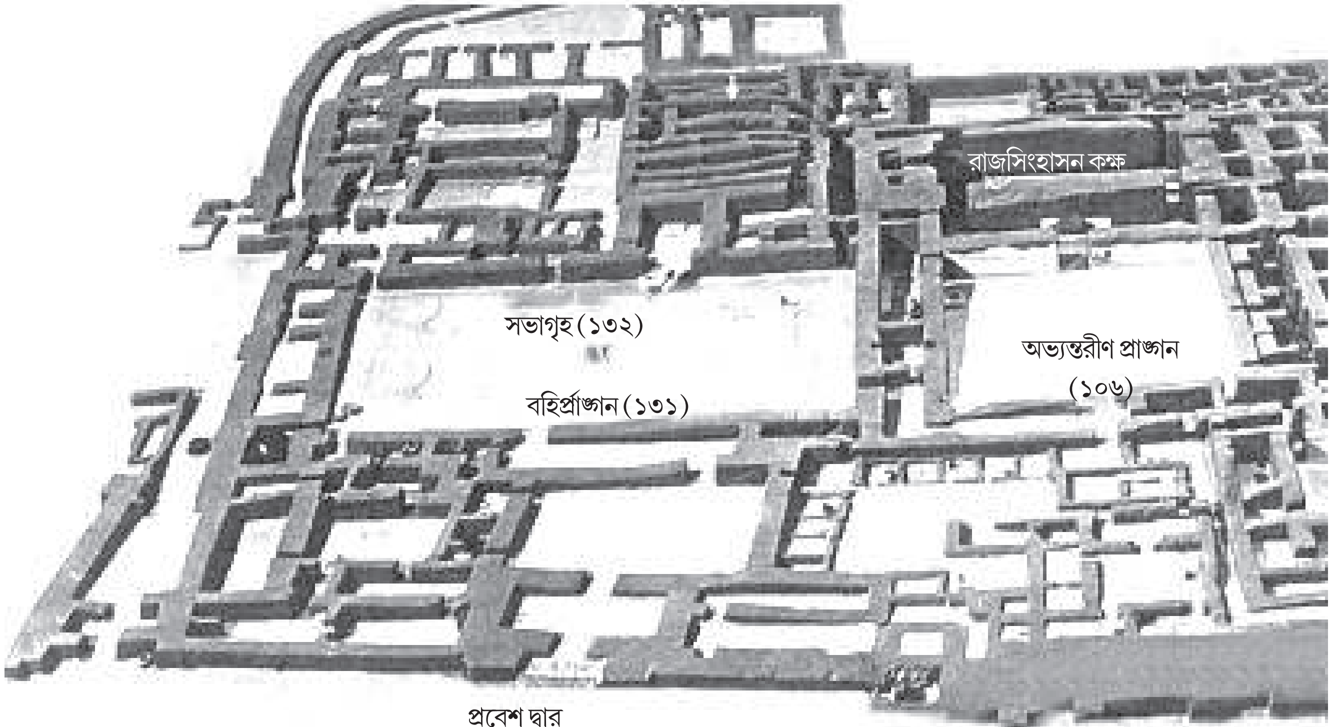

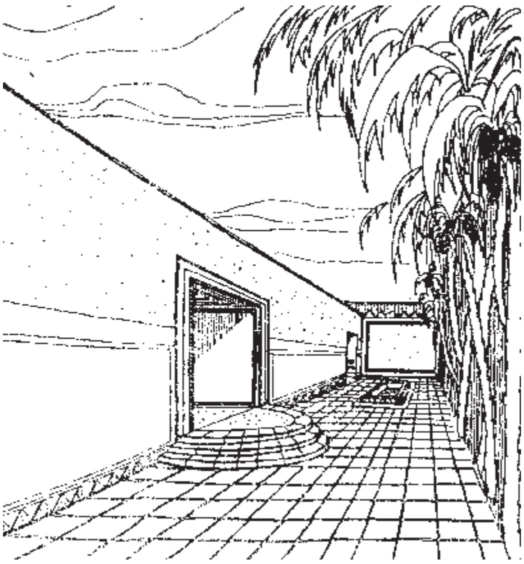

প্রাঙ্গান (১৩১)

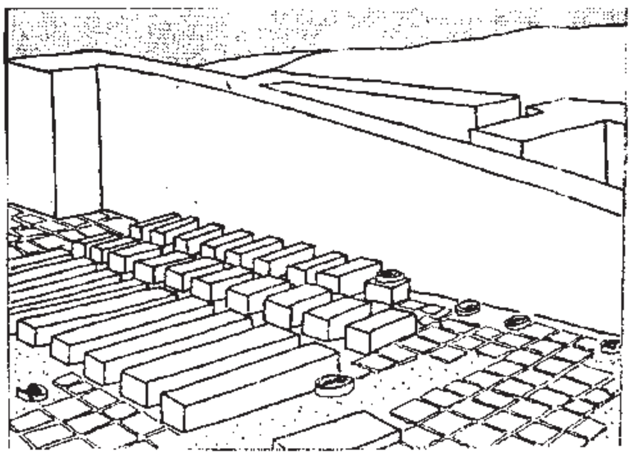

লিপিকার এর কার্যালয়, টুল (benches) এবং মাটির পাত্রগুলোর সাথে মাটির ফলক রাখা হত।

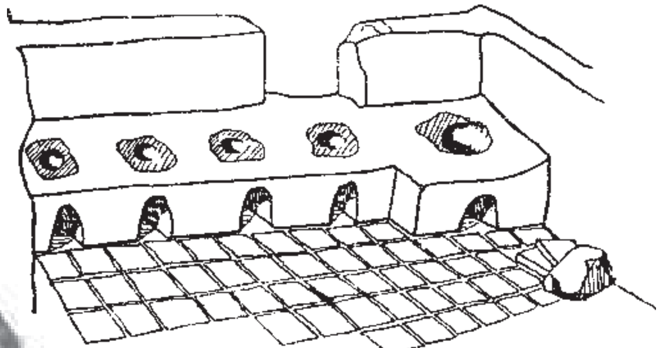

রান্নাঘর

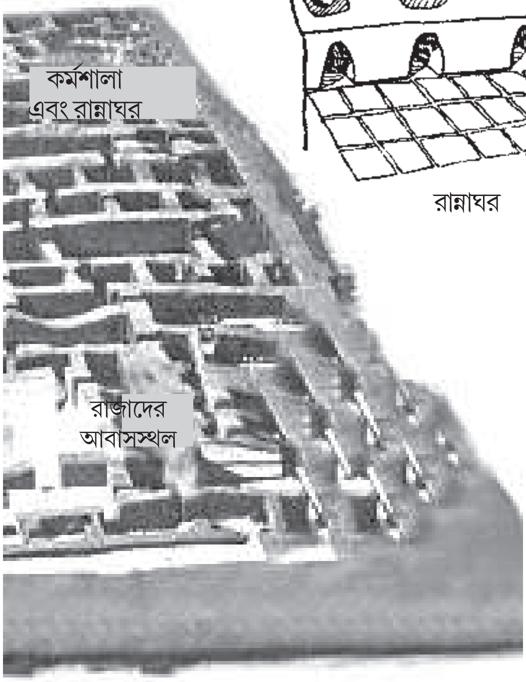

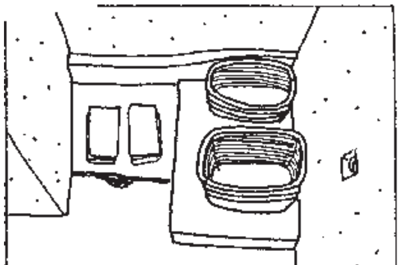

শৌচালয়
এবং স্নান
কক্ষ

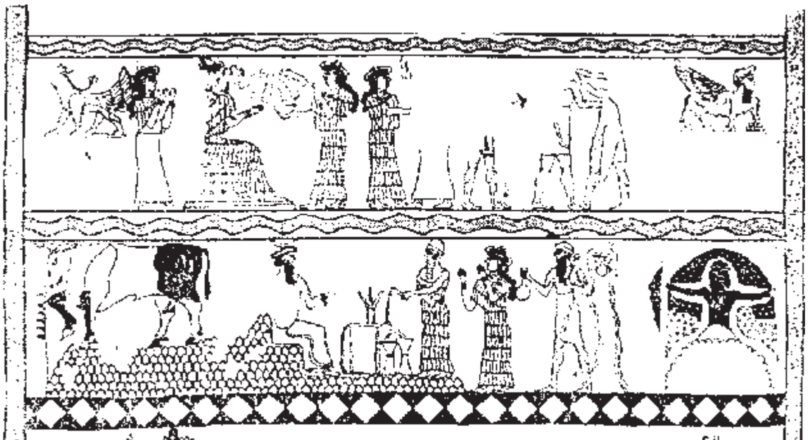

১৩২ প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্র

মারি নগরে অবস্থিত রাজা জিম্‌রিলিম এর রাজপ্রাসাদ (১৮১০—১৭৬০ খ্রি. পূ.) মারি নগরের বিশাল রাজপ্রাসাদ সেখানের রাজ-পরিবারের আবাসস্থলতো ছিলই, সাথে সাথে রাজপ্রাসাদটি প্রশাসন এবং উৎপাদন বিশেষভাবে বহুমূল্য ধাতুর অলঙ্কার তৈরির প্রধান কেন্দ্রও ছিল। সে সময়ে এই অঞ্চলটি এত বেশি প্রসিদ্ধ ছিল যে, এই প্রাসাদটিকে শুধুমাত্র দেখার জন্য উত্তর সিরিয়ার একজন ছোটো রাজা এসেছিলেন, তিনি মারি নগরের রাজা জিম্‌রিলিম এর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে পরিচয়ের জন্য একটি পত্র নিয়ে এসেছিলেন। দৈনিক তালিকাগুলো থেকে জানা যায় যে রাজার ভোজনের জন্য মেজ (Table) এর মধ্যে প্রত্যেকদিন অধিকমাত্রায় খাদ্য পরিবেশন করা হত। যথা — আটা, রুটি, মাংস, মাছ, ফল, সুরা এবং মদ। সম্ভবত রাজা তার অন্য সঙ্গীদের সাথে শ্বেতপাথর বাঁধানো অভ্যন্তরীণ প্রাঙ্গণ (ছবিতে চিহ্নিত ১০৬ নং অংশ) এ বসে ভোজন করতেন। রাজপ্রাসাদটির নকশা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, প্রাসাদটির শুধুমাত্র একটাই প্রবেশদ্বার ছিল যেটা উত্তরের দিকে নির্মিত ছিল। প্রাসাদটির বিশাল মুক্ত প্রাঙ্গান (যেমন ছবিতে চিহ্নত ১৩১ নং অংশ) সুন্দর পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল। রাজা বিদেশি অতিথি তথা বিশিষ্টজন এবং তার প্রমুখ লোকদের নিয়ে কক্ষ ১৩২ এ (ছবিতে চিহ্নিত) মিলিত হত, যেখানে দেওয়ালের মধ্যে আঁকা চিত্রগুলোকে দেখে আগন্তুক লোকেরা হতবাক্ হয়ে যেত। রাজপ্রাসাদটি ২.৪ হেক্টর জমির মধ্যে স্থাপিত অত্যন্ত একটি বিশাল ভবন ছিল যার মধ্যে ২৬০টি কক্ষ নির্মিত ছিল।

কার্যাবলি-৩

প্রবেশদ্বার থেকে অভ্যন্তরীণ প্রাঙ্গান পর্যন্ত রাস্তাটি খুঁজে বের করো। ভাঁড়ার ঘরগুলোতে (store rooms) কী রাখা হয়েছিল বলে তোমার ধারণা? রান্নাঘরটিকে তুমি কীভাবে সনাক্ত করবে?

কিন্তু মারি নগরের রাজাদের সদাসতর্ক এবং সাবধান থাকতে হত। বিভিন্ন জন-জাতির পশুপালকদের রাজ্যটিতে চলাফেরার অনুমতি ছিল, কিন্তু তাদের উপর কড়া নজরদারি থাকত। রাজা তথা আধিকারিকদের মধ্যে প্রতিনিয়ত পত্র বিনিময়ের মধ্যে এই পশুপালকদের চলাফেরা এবং শিবিরগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। একবার এক পদাধিকারী রাজাকে তার পত্রের মধ্যে লিখেছিলেন যে তিনি রাত্রিতে কয়েকবার অগ্নি-সংকেত দেখেছেন, যেটা এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তার ধারণা হয়েছিল যে এখানে কোনো একটি হামলা বা আক্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে।

মারিনগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণিজ্যিক অঞ্চলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেখান থেকে কাঠ, তামা, টিন, তেল, সুরা এবং অন্য অনেক প্রকার বস্তু নৌকার মাধ্যমে ইউফ্রেটিস নদীপথে দক্ষিণ এবং তুরস্ক, সিরিয়া ও লেবাননের খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলের উঁচু জায়গাতে আনা হত। মারি নগর ছিল বাণিজ্য ক্ষেত্রের উপর সমৃদ্ধ হওয়া শহুরে-কেন্দ্রের একটি সুন্দর উদাহরণ। জাহাজে বোঝাই করা দক্ষিণ শহরের পাথর চূর্ণ, কাঠ, সুরা এবং তেলের পাত্রগুলো মারি নগরে এসে থামত। মারি নগরের আধিকারিকরা জাহাজ দিয়ে যেত। জাহাজে বোঝাই করা পণ্য-সামগ্রীর তদারকি করা হত। (একটি জাহাজের মধ্যে ৩০০টি সুরার পাত্র রাখা যেত) এবং জাহাজটিকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার আগে তাতে বোঝাই করা মোট পণ্যসামগ্রীর প্রায় ১০ শতাংশ শুল্ক আদায় করা হত। বার্লি তথা যব একধরনের বিশেষ নৌকা দিয়ে আসত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কিছু ফলকের মধ্যে সাইপ্রাস এর দ্বীপ আলাশিয়া (Alaswiya) থেকে আসা তামার উল্লেখ পাওয়া গেছে। এই দ্বীপটি সেসময় তামা এবং টিনের বাণিজ্যের জন্য খ্যাত ছিল। ব্রোঞ্জ, যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরির জন্য একটি মুখ্য শিল্পজাত উপাদান ছিল। এজন্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রোঞ্জের বিশাল গুরুত্ব ছিল। এইভাবে যদিও মারি রাজ্য সামরিক দিক থেকে সেই রকম শক্তিশালী ছিল না, কিন্তু বাণিজ্য এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে অসাধারণ ছিল।

মেসোপটেমীয় শহরের খননকার্য

বর্তমানে কালের মেসোপটেমিয়ার পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা প্রাচীন কালের পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ছিল। তাদের কাজের যথার্থতা এবং পরিশুদ্ধতা ও নথিপত্র সংগ্রহের মান অনেক উঁচু স্তরের। এজন্যই এখন সেই ধরনের বিশাল এলাকার খনন করা হয় না যেটা উর নগরে করা হয়েছিল। এছাড়া খুব কম সংখ্যক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের কাছেই বিশাল পরিমাণে ধনরাশি থাকত যার সাহায্যে খননকারীদের একটি বড় দলকে খননকাজে নিযুক্ত করা যেত। এভাবে তথ্য প্রাপ্ত করার প্রক্রিয়ারও পরিবর্তন হয়েছে।

এই সম্পর্কে আবু সালাবিখ (Abu Salabik) নামের একটি শহরের উদাহরণ নেওয়া হয়েছে, যে শহরটি ২৫০০ খ্রি. পূ. প্রায় ১০ হেক্টর ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল এবং শহরটির জনসংখ্যা ১০,০০০ থেকে কম ছিল। এই শহরে দেওয়ালের রূপরেখার উপরিতলকে সর্বপ্রথম বেলচার সাহায্যে বের করা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াতে টিলার উপরিতলকে কোনো বেলচা বা অন্য কোনো ধারালো যন্ত্রপাতির সাহায্যে সামান্য মিলিমিটার পর্যন্ত ছেঁটে ফেলা যেত। নীচের মাটি তখনও কিছু ভেজা তথা সিক্ত অবস্থায় ছিল এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা বিভিন্ন ধরনের রঙ, তাদের গঠন এবং প্রাচীরের সীমানা তথা গর্ত এবং অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে এই গুলোর সম্পর্কে অনেক কিছু খুঁজে পেয়েছেন। যে সামান্য কিছু ঘর-বাড়ি আবিষ্কার হয়, সেগুলোকে খননের মাধ্যমে বের করা হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর অবশেষগুলোর প্রাপ্ত করার জন্য প্রচুর পরিমাণ মাটির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিরীক্ষণ করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা উদ্ভিদ এবং পশুদের অনেক প্রজাতির সনাক্ত করতে পেরেছেন এবং তাঁরা অধিক মাত্রায় দগ্ধ হওয়া মাছের হাড়ও পেয়েছিলেন যেটা কুড়ানো অবস্থায় রাস্তার পাশে পাওয়া গেছে। সেখানে গোবরের ঘুঁটের দগ্ধ হওয়া ইন্ধন থেকে উদ্ভিদের বীজ এবং তন্তু পাওয়া গেছে; তার ফলে এখানে রান্নাঘরের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। বসবাস করার কক্ষ কোন্‌টি ছিল সেটা জানার প্রমাণ অনেক কম পাওয়া গেছে। সেখানে রাস্তার পাশে ছোটো শূকর ছানার দাঁত পাওয়া গেছে, যেটা দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে অন্য যে কোনও মেসোপটেমিয়ার শহরের মতো এখানেও শূকর অবাধে ঘুরে বেড়াত। বস্তুত একটি ঘরের প্রাঙ্গাণের নীচে যেখানে মৃত ব্যক্তিকে সমাধিত করা হয়েছিল, সেখানে শূকরের হাড় এর অবশেষ পাওয়া গেছে। যা থেকে ধারণা করা যায় যে, ব্যক্তির পরকালের তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে খাওয়ার জন্য সামান্য শূকরের মাংস রাখা হত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা মেঝে-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অধ্যয়ন করেছিলেন এটা জানার জন্য যে ঘরের কোন কক্ষ ছাউনি তথা ছাদ দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল (শুষ্ক খরকুটো, তালপাতা, লম্বাপাতলা গাছ (Poplar logs) প্রভৃতির দ্বারা) এবং কোনটি খোলা আকাশের নীচে ছিল।

মেসোপটেমিয়া সংস্কৃতিতে শহরের গুরুত্ব

মেসোপটেমিয়াবাসীর শহরের জীবনের গুরুত্ব দিত। সেখানে অনেক সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সংস্কৃতির লোক এক সাথে বসবাস করত। যুদ্ধেত শহরগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর তারা কবিতা বা কাব্যের মাধ্যমে ঘটনাগুলোকে স্মরণ করত।

মেসোপটেমিয়ার লোকেরা নিজেদের শহরকে নিয়ে কী রকম গর্ববোধ করত, এবিষয়ে অধিক মর্মস্পর্শী উল্লেখ আমরা গিল্গেমেশ (Gilgamesh) মহাকাব্যের শেষাংশ থেকে পাই। এই কাব্যটি ১২টি ফলকের উপর লেখা হয়েছিল। এই রকম বলা হয় যে এনমার্কার -এর কিছু সময় পরে উরুক নগরের মধ্যে গিল্গেমেশ শাসন করেছিল। গিল্গেমেশ একজন মহান যোদ্ধা ছিলেন, যিনি দূর দূরান্ত পর্যন্ত প্রদেশগুলোকে নিজের বশ্যতায় নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু, তিনি খুব আঘাত পেয়েছিলেন যখন তার সাহসী বন্ধু হঠাৎ মারা যায়। তাতে তিনি দুঃখী হয়ে অমরত্বের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তিনি সাগর মহাসাগর অতিক্রম করে বিশ্বজগত ও পরিক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু এই সাহসিক পদক্ষেপের পরেও তিনি বিফল হয়েছিলেন এবং অসফল হয়ে গিল্গেমেশ নিজের শহরে ফিরে আসেন। সেখানে তখন তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য শহরের চার দেওয়ালের পাশে সামনে পিছে পায়চারি করছিলেন তখন তার নজর সেই পোড়া ইটের উপর পড়ে যেই জায়গায় ভিত স্থাপন করা হয়েছিল। এইভাবে উরুক নগরের বিশাল প্রাচীরে এসে সেই মহাকাব্যটির দীর্ঘ বীরত্বপূর্ণ এক সাহসী কাহিনীর সমাপ্তি হয়। গিল্গেমেশ একজন উপজাতি যোদ্ধার মতো এটা বলেন না যে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত, যদিও তিনি তার পুত্রদের মধ্য দিয়ে জীবিত থাকবেন এবং এই নগরের আনন্দ উপভোগ করবেন। এভাবে গিল্গেমেশ তাঁর শহরেই সান্ত্বনা পেতেন যেটা তাঁর প্রজারা তৈরি করেছিল।

লিখন শৈলীর দান

যদিও মর্মস্পর্শী কাহিনি এবং বিভিন্ন ধরনের বর্ণাত্মক বিষয়গুলোকে একে অপরকে শ্রবণ করানোর মাধ্যমে জীবিত রাখা যায়, কিন্তু বিজ্ঞানকে জীবিত রাখতে গেলে প্রয়োজন লিখিত দলিল এবং পুস্তকের যাতে করে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি এবং তার পরবর্তী প্রজন্ম সেটা পড়তে পারে ও কিছু তৈরি করতে পারে। সম্ভবত গোটা বিশ্বের কাছে মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে বড় উপহার তথা দান ছিল তার সময়গণনা এবং গণিতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরম্পরা।

১৮০০ খ্রি. পূ. কাছাকাছি সময়ের কিছু ফলক পাওয়া গেছে, যাতে গুণ এবং ভাগ করা তালিকা, বর্গ তথা বর্গমূল এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ এর সারণি ছিল। তাতে ২-এর বর্গমূল এই রকম ছিল—

$$১ + ২৪/৬০ + ৫১/৬০^২ + ১০/৬০^৩$$

যদি তোমরা এই গাণিতিক সমাধানটি কর তবে তার উত্তর হবে ১.৪১৪২১২৯৬ যেটা সঠিক উত্তর ১.৪১৪২১৩৫৬ থেকে একটু আলাদা। সেই সময়ের শিক্ষার্থীদের এই রকম প্রশ্নের সমাধান করতে হত; যদি একটি অঞ্চলের ক্ষেত্রফল মনে কর, এত হয় (such and such) এবং তা এক আঙ্গুল গভীর জলে ডোবানো থাকে তাহলে সম্পুর্ণ জলের আয়তন কত?

পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্রের আবর্তন অনুসারে একটি পূর্ণ বর্ষকে ১২ মাসে বিভাজিত করা হয়। এক মাসকে ৪ সপ্তাহে, একদিনকে ২৪ ঘন্টায় এবং এক ঘন্টাকে ৬০ মিনিট বিভাজন করা হয়—এসব আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। যেটা আমরা মেসোপটেমিয়াবাসী থেকে পেয়েছি। এই সময়বিভাজন আলেকজান্ডারের উত্তরসূরীরা গ্রহণ করেছিল এবং সেখান থেকে এটা রোমান দেশে, তারপর ইসলাম দেশে এবং এরও পরে এটা মধ্যযুগীয় ইউরোপে পৌঁছেছিল (এই সবকিছু কিভাবে হয়েছিল, তা বিষয় ৭ এ দেখো)।

যখন সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ হত তখন বছর, মাস এবং দিনের অনুসারে তাদের সংগঠিত হওয়ার হিসেব রাখা হত। এভাবে রাতের আকাশে তারা এবং নক্ষত্রপুঞ্জের উপস্থিতির উপর প্রতিনিয়ত নজর

রাখার মধ্য দিয়ে তাদের হিসেব রাখা হত।

মেসোপটেমিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য সম্ভব হত না যদি লিখন কৌশল এবং বিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর অভাব হত, যেখানে শিক্ষার্থীরা পুরোনো লিখিত ফলকগুলো পড়ত এবং তার প্রতিলিপি করত। সেখানে ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত যাতে তারা প্রশাসনের সাধারণ হিসেবরক্ষক রূপে নয়, বরং এমন প্রতিভাসম্পন্ন মানুষরূপে নিজেকে তৈরি করতে পারে যাতে সে তার নিজের পূর্বপুরুষদের বৌদ্ধিক উপলব্ধিগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এটা ভাবলে আমাদের ভুল হবে যে মেসোপটেমিয়ার লোকেদের আধুনিক ধ্যাণধারণা ছিলনা। পরিশেষে, আমাদের সেই দুই রকমের প্রারম্ভিক প্রচেষ্টার উপর আলোকপাত করতে হবে যার মাধ্যমে অতীতের বিষয়বস্তু এবং ঐতিহ্য গুলোকে সনাক্তকরণ এবং সুরক্ষিত রাখার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।

একটি পুরাতন গ্রন্থাগার

লৌহযুগে, উত্তরের আসিরিয়ান অঞ্চলের লোকেরা একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল যেটা ৭২০ থেকে ৬১০ খ্রি. পূ. পর্যন্ত তার উন্নতির শিখরে ছিল। এই সাম্রাজ্যটি মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্যের অর্থব্যবস্থা সেসময়ে লুন্ঠনপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কেননা অধীনস্থ প্রজাদের দমিয়ে রেখে তাদের থেকে খাদ্য-সামগ্রী, পশু, ধাতু এবং কারুশিল্প বস্তুগুলো নজরানা রূপে জোর করে নেওয়া হত।

বহিরাগত বড় বড় আসিরিয়ান শাসকরা, দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যাবিলনিয়া প্রদেশকে উচ্চ সংস্কৃতির প্রদেশ হিসাবে মনে করত। তাদের মধ্যে শেষ রাজা অসুরবানিপাল (Assurbanipal, ৬৬৮-৬২৭ খ্রি. পূ.) উত্তরে অবস্থিত তার রাজধানী নিনভে (Nineveh) তে একটি গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ইতিহাস, মহাকাব্য, শুভসাহিত্য, জ্যোর্তিবিদ্যা, স্তুতি এবং কবিতা তথা কাব্যসমূহের ফলকগুলোকে একত্রিত করার অসামান্য প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে তিনি সফলও হন। তিনি তাঁর লিপিকারদের দক্ষিণে পুরনো ফলকগুলো খোঁজার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কারণ দক্ষিণে লিপিকারদের বিদ্যালয়ে পড়া-লেখার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত এবং সেখানে তাদেরকে ডজন পরিমাণে ফলকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করতে হত। ব্যাবিলনিয়াতে এই রকমও একটি শহর ছিল যেখানে ফলকগুলোর বিশাল সম্ভার তৈরি এবং প্রাপ্ত করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। যদিও প্রায় ১৮০০ খ্রি. পূর্বাদের পরবর্তী সময়ে সুমেরীয় ভাষায় কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিদ্যালয় গুলোতে শব্দ ভান্ডার, চিহ্ন-তালিকা, দ্বিভাষী (সুমেরীয় এবং আক্কাদীয়) ফলক প্রভৃতির মাধ্যমে পড়ানো হত। এইজন্যই ৬৫০ খ্রি. পূর্বাব্দেও ২০০০ খ্রি. পূর্বাব্দ পর্যন্ত পুরনো কীলাকার বর্ণমালাতে লেখা ফলকগুলোকে পড়া এবং বোঝা যেত এবং অসুরবানিপালের লোকেরা এটা জানত যে পুরানো ফলক সমূহ এবং তার প্রতিলিপিগুলোকে কোথা থেকে সনাক্ত এবং প্রাপ্ত করা যায়।

গিল্গেমেশ মহাকাব্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফলকগুলোর প্রতিলিপি তৈরি করা হয়েছিল। প্রতিলিপি প্রস্তুতকারকেরা ফলকগুলোতে তাদের নাম এবং সময় লিখে রাখত। কিছু ফলকের শেষের দিকে অসুরবানিপালের উল্লেখও পাওয়া গেছে।

"আমি অসুরবানিপাল, সমগ্রবিশ্বের সম্রাট, আসিরিয়ার শাসক, যিনি ঈশ্বর প্রদত্ত বিশাল বুদ্ধির অধিকারী, এবং যিনি বিদ্বান ব্যক্তির পান্ডিত্যের গভীর জ্ঞানকে প্রাপ্ত করার সফলতা অর্জন করেছেন, আমি ঈশ্বরের জ্ঞান-বুদ্ধিকে ফলকের মধ্যে খোদিত করেছি ..... এবং আমি ফলকগুলোর নিরীক্ষণ করে এবং এগুলো সংগ্রহ করেছি। আমি ফলকগুলোকে নিনভে-তে অবস্থিত আমার ইস্টদেবতা নাবু এর মন্দিরের গ্রন্থাগারে আমার আত্মার কল্যাণ সাধনের জন্য এবং আমার রাজ সিংহাসনের ভিতকে শক্তিশালী করে রাখার জন্য ....।

তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল এই ফলকগুলোর তালিকা প্রস্তুত করা। ঝুড়ি ভর্তি ফলকগুলোতে মাটির প্রলেপ দিয়ে আঁকা হয়েছিল। 'X' এই অসংখ্য ফলকগুলো লিখেছেন ভুতপ্রেত তাড়ানোর বিষয়ের উপর। অসুরবানিপালের গ্রন্থাগারে সামগ্রিকভাবে ১০০০টি মূল পাঠ সম্বলিত পুঁথি ছিল এবং প্রায় ৩০,০০০টি ফলক ছিল, যেগুলোকে বিষয় অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল।

এবং একজন প্রারম্ভিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্

দক্ষিণ অঞ্চলের একজন বীরযোদ্ধা নেবোপোলাসার (Nabopolassar) ব্যাবিলনিয়াকে ৬২৫ খ্রিঃপূঃ আসিরিয়ানের অধীনতা থেকে মুক্ত করেন। তার উত্তরসূরীরা নিজেদের রাজ্যের ক্ষেত্র বিস্তার করেছিলেন এবং ব্যাবিলনিয়াতে ভবন নির্মাণ করার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে। সেই সময় থেকে ৫৩৯ খ্রি. পূ. তে ইরানের আখেমেনীয়দের দ্বারা ব্যাবিলিয়ন বিজয়ী হওয়ার পর এবং ৩৩১ খ্রি. পূ. তে আলেকজান্ডার যখন ব্যাবিলিয়নে বিজয় লাভ করে তখন পর্যন্ত ব্যাবিলিয়ন পৃথিবীর একটি প্রধান শহর ছিল। তার ক্ষেত্রফল ৮৫০ হেক্টর থেকে বেশি ছিল, তিনদিক থেকে প্রাচীরে ঘেরা ছিল, তাতে বড়ো বেড়া রাজপ্রাসাদ এবং মন্দিরও ছিল। একটি জিগুরাত (Ziggurat) অর্থাৎ সিঁড়িযুক্ত দুর্গ ছিল এবং শহরের মুখ্য অনুষ্ঠান কেন্দ্র পর্যন্ত শোভাযাত্রার জন্য একটি রাস্তা প্রস্তুত করা হয়েছিল। তাদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো দূরদূরান্ত পর্যন্ত নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের আদান-প্রদান করত এবং তাদের গণিতশাস্ত্রবিদ্ এবং জ্যোতিষীরা অনেক নতুন অনুসন্ধান করেন।

নেবোনিডাস (Nabonidus) স্বতন্ত্র ব্যাবিলনের শেষ শাসক ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে উর শহরের দেবতা স্বপ্নে এসে তাকে দর্শন দেন এবং তাকে সুদূঢ় দক্ষিণের সেই পুরাতন শহরের কার্যভার নেওয়ার জন্য একজন মহিলা পুরোহিত (priestess) কে নিযুক্ত করার আদেশ দেন। তিনি লিখেছিলেন, "কারণ অনেক দীর্ঘ সময় থেকে উচ্চ মহিলা পুরোহিত প্রতিষ্ঠানের কথা ভুলে গিয়েছিল, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি, আমি নিজে নিজে এই বিষয়টি নিয়ে দিনের পর দিন চিন্তা করেছি ...."।

তিনি তারপর বলেছিলেন যে, তিনি অনেক পুরোনো একজন রাজার (যার রাজত্বকাল আমরা বর্তমানে ১১৫০ খ্রি. পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ের মনে করি) লিখিত ফলক (Stele) পেয়েছেন এবং তাতে মহিলা পুরোহিতের ছবি তিনি অঙ্কিত দেখেছিলেন। তিনি মহিলা পুরোহিতের অলঙ্কারাদি এবং বেশভূষাকে খুব মনোযোগ সহকারে দেখেছেন। ঠিক একইভাবে তিনি তার মেয়েকেও ওই রকমেরই পোশাকে সাজিয়ে মহিলা পুরোহিতের মতো প্রতিস্থাপন করেছিলেন।

অন্য একটি উপলক্ষতে, নিবোনিডাসের লোকেরা তার কাছে একটি ভাঙামূর্তি নিয়ে আসে যার মধ্যে আক্কাদীয় রাজা সারগোন (Sargon) এর নাম খোদিত ছিল। (বর্তমানে আমরা জানি যে, সেই রাজা ২৩৭০ খ্রি. পূ. কাছাকাছি সময়ে শাসন করেছিল) প্রাচীন কাল থেকেই নিবোনিডাস এবং প্রকৃতপক্ষে অনেক বুদ্ধিজীবিরাও এই মহান রাজা সম্পর্কে শুনেছিল। নিবোনিডাস অনুভব করেছিল যে তাকে সেই মূর্তিটির মেরামত করতে হবে। তিনি লিখেছিলেন "ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং রাজার প্রতি আমার নিষ্ঠার কারণে, আমি দক্ষ কারিগরদের ডেকেছি এবং ভাঙা মূর্তিটির মাথা প্রতিস্থাপন করিয়েছি।"

কার্যাবলি-৪

তোমরা কেন মনে কর যে অসুরবানিপাল এবং নেবোনিডাসের মানুষেরা মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন ঐতিহ্যকে পোষণ করে চলছে?

	কালপঞ্জী
প্রায় ৭০০০-৬০০০ খ্রি. পূ.	উত্তর মেসোপটেমিয়ার সমভূমিতে কৃষিকাজের সূচনা।
প্রায় ৫০০০ খ্রি. পূ.	দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার সবথেকে পুরাতন মন্দির সমূহের নির্মাণ।
প্রায় ৩২০০ খ্রি. পূ.	মেসোপটেমিয়াতে লিখন কাজের সূচনা।
প্রায় ৩০০০ খ্রি. পূ.	একটি বিশাল শহর হিসেবে উরুকের বিকাশ, ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার।
প্রায় ২৭০০-২৫০০ খ্রি. পূ.	প্রাচীন রাজাদের শাসনকাল, যার মধ্যে গিগ্লামেশ এর মতো পুরাতন রাজাও সামিল ছিল।
প্রায় ২৬০০ খ্রি. পূ.	কীলাকার লিপির বিকাশ।
প্রায় ২৪০০ খ্রি. পূ.	সুমেরীয় ভাষার স্থানে আক্কাদীয় ভাষার প্রয়োগ।
২৩৭০ খ্রি. পূ.	সারগোন, আক্কাদের সম্রাট।
প্রায় ২০০০ খ্রি. পূ.	সিরিয়া, তুরস্ক এবং মিশরদেশ পর্যন্ত কীলাকার লিপির বিস্তৃতি; গুরুত্বপূর্ণ শহরের কেন্দ্র হিসেবে মারি এবং ব্যাবিলিয়নের উদ্ভব।
প্রায় ১৮০০ খ্রি. পূ.	গাণিতিক মূল পাঠের রচনা; তখন সুমেরীয় ভাষায় আর কথা বলা হত না।
প্রায় ১১০০ খ্রি. পূ.	আসিরিয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
প্রায় ১০০০ খ্রি. পূ.	লোহার ব্যবহার।
৭২০-৬১০ খ্রি. পূ.	অ্যাসিরিয় সাম্রাজ্য।
৬৬৮-৬২৭ খ্রি. পূ.	অসুরবনিপালের শাসন।
৩৩১ খ্রি. পূ.	আলেকজান্ডার ব্যাবিলিয়ন জয় করেন।
প্রায় প্রথম শতাব্দী (খ্রিস্টাব্দ)	আক্কাদীয় ভাষা এবং কীলাকার বর্ণমালার ব্যবহার অব্যাহত ছিল।
১৮৫০	কীলাকার লিপির অক্ষরগুলোর পাঠোদ্ধার করা হয়।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও

১। তোমরা কীভাবে বলতে পার যে প্রাকৃতিক উর্বরতা তথা উচ্চস্তরের খাদ্য উৎপাদনই নগরায়নের জন্য দায়ী ছিল?

২। তোমাদের বিচারে নিম্নলিখিত কোন অত্যাবশ্যকীয় শর্তটির ফলে প্রথম নগরায়ন হয় এবং নিম্নলিখিত কোন্ কোন্ বিবৃতি শহরের বিকাশের ফলস্বরূপ উৎপন্ন হয়?

(ক) উচ্চ উৎপাদনশীল কৃষি (খ) জল-পরিবহন (গ) ধাতু এবং পাথরের অভাব (ঘ) শ্রম বিভাজন (ঙ) মুদ্রা সমূহের প্রয়োগ (চ) রাজাদের সামরিক শক্তি যার ফলে শ্রমকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

৩। কেন যাযাবর পশুচারকেরা নিশ্চিতভাবে শহুরে জীবনের জন্য ভীতির কারণ ছিল না?

৪। তোমরা কেন মনে কর যে পুরোনো মন্দিরগুলো দেখতে অনেকটাই বাড়ি-ঘরের মতো ছিল?

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর দাও

৫। শহুরে জীবনের সূত্রপাত হওয়ার পর কোন্ কোন্ নতুন প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করে? এদের মধ্যে কোন্ প্রতিষ্ঠানটি রাজার উদ্যোগের উপর নির্ভর ছিল?

৬। কোন্ পুরোনো কাহিনি থেকে আমরা মেসোপটেমিয় সভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারি?

II

সাম্রাজ্য (Empires)

তিনটি মহাদেশ জুড়ে একটি সাম্রাজ্য

মধ্য ইসলামিক দেশগুলো

যাযাবর সাম্রাজ্য

সাম্রাজ্য
EMPIRES

মেসোপটেমিয়াতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুই হাজার বছর পর্যন্ত ওই অঞ্চলের পশ্চিম এবং পূর্ব জুড়ে সাম্রাজ্য নির্মাণ করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে অ্যাসেরিয়ান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল ইরানিয়দের নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত হয়েছিল। স্থলভাগের ব্যবসা-বাণিজ্যের যৌথ সম্প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছিল, একইভাবে ভূমধ্যসাগরীয় সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত এই বৃদ্ধির প্রসার ঘটে।

এই পরিবর্তনের ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, গ্রিক শহরগুলো এবং তাদের উপনিবেশগুলো ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে লাভবান হয়েছিল। কৃষ্ণসাগরের উত্তর দিকে যাযাবর গোষ্ঠীর জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যবসা বাণিজ্যে তারাও উপকৃত হয়েছিল। গ্রিসের অধিকাংশ অঞ্চল, নগররাজ্য যেমন এথেন্স এবং স্পার্টা ছিল পৌরজীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পর এই গ্রিক রাজ্যগুলি থেকে ম্যাসিডনিয়ার শাসক আলেকজান্ডার ধারাবাহিক সামরিক অভিযান গ্রহণ করেছিলেন এবং উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার ইরান জয় করে ভারতের বিয়াস নদী পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। এখান থেকে তাঁর সৈন্যরা সুদূর প্রাচ্যে যেতে অসম্মত হল। আলেকজান্ডারের সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করেছিল, যদিও গ্রিকদের অনেকেই তখনও সেখানে রয়ে গিয়েছিল।

আলেকজান্ডারের নিয়ন্ত্রিত অংশের আদর্শ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গুলিকে স্থানীয় জনগণ এবং গ্রিকরা নিজেদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে নিয়েছিল। সমগ্র অঞ্চল 'হেলেনাইজ্ড' অর্থাৎ গ্রিক ভাবধারা সম্পন্ন সংস্কৃতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল (গ্রিকদেরকে বলা হয় হেলেন্স) এবং গ্রিক সর্বত্রই পরিচিত ভাষায় পরিণত হয়েছিল। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর খুব তাড়াতাড়ি তাঁর সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ঐক্য ভেঙে পড়ে। কিন্তু তিন শতক পরেও হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই অঞ্চলের ইতিহাসে এই সময়কালকে হেলেনিস্টিক সময়কাল হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অন্যদের সংস্কৃতি মন যে পুরানো ইরান সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত ইরানীয় সংস্কৃতি ছিল— সেটি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, হেলেনিস্টিক লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হত না।

এরপর কী ঘটেছিল, তা এই বিভাগে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হবে।

আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগে রোমের মধ্য ইতালির নগররাষ্ট্রের ছোটো এবং সুগঠিত সামরিক বাহিনী খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উত্তর আফ্রিকা এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল।

এই সময়ে রোম ছিল প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সরকারের ভিত্তি ছিল জটিল নির্বাচন পদ্ধতি জন্ম এবং ধন-সম্পদকে কিছুটা হলেও গুরুত্ব প্রদান করত এবং সে সময়ের সমাজ ব্যবস্থা দাস-প্রথা থেকেও কিন্তু এখানকার রাজনৈতিক সংগঠনগুলো উপকৃত হয়েছিল। রোম বাহিনী বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য যৌথ সম্প্রচার ব্যবস্থা স্থাপন করেছিল যেগুলো এক সময় আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে উচ্চ বংশ-জাত সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক জুলিয়াস সিজারের অধীনে এই 'রোমান সাম্রাজ্য' বর্তমান ব্রিটেন এবং জার্মানি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

সাম্রাজ্যের প্রধান ভাষা ছিল ল্যাটিন (রোমে প্রচলিত ভাষা) যদিও সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তের জনগণ গ্রিক ভাষা ব্যবহার করত এবং রোমানরা হেলেনিস্টিক সংস্কৃতিকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষদিকে এই সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে এবং খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করার পর এই সাম্রাজ্য ব্যাপক ভাবে খ্রিস্টান ধর্মে প্রভাবিত হয়েছিল।

সরকারের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রোম সাম্রাজ্যকে পূর্ব এবং পশ্চিম এই

গ্রিক নগর করিন্থের ধ্বংসস্তূপ

দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমভাগ তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ রোম এবং সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছিল (গোথ, ভিসিগোথ, ভানডাল এবং অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি)।

এই ব্যবস্থাপনাগুলো ব্যবসা বাণিজ্যের মোকাবিলা, সামরিক বাহিনী নিয়োগ, বসতি স্থাপনের বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করত যার ফলে উপজাতি সম্প্রদায় রোমের শাসন-ব্যবস্থায় উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করত। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্য বিরোধের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে পশ্চিম রোম ভেঙে পড়েছিল। পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের স্থানে উপজাতি গোষ্ঠীগুলো নিজেদের রাজ্য স্থাপন করেছিল। নবম শতক থেকে খ্রিস্টান গির্জার (যাজক সম্প্রদায়) প্ররোচনায় কোনো কোনো রাজ্যে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। রোম সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতা এভাবে রক্ষিত হয়।

সপ্তম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত ভূখণ্ড আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। (মধ্য কন্সটান্টিনোপল), যেটি তৈরি করেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারক মহম্মদ (যিনি সপ্তম শতকে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করেন)এর অনুগামীরা, যেটি দামাসকাসের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়—অথবা ইহার উত্তরাধিকারীদের দ্বারা (যারা প্রাথমিকভাবে বাগদাদ শাসন করেছিলেন)। এই অঞ্চলে গ্রিক এবং ইসলামিক ঐতিহ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই এলাকার ব্যবসাবাণিজ্যের যৌথ সম্প্রচার ব্যবস্থা এবং সমৃদ্ধি উত্তর দিকের তুর্কি উপজাতি সম্প্রদায় সহ পশুপালক বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর জনগণকে আকর্ষণ করেছিল, যারা প্রায়ই শহর এলাকায় আক্রমণ চালাত এবং ওই এলাকা নিজেদের দখলে রাখত। শেষ পর্যন্ত এই জনগোষ্ঠীর এলাকাগুলি আক্রান্ত হয় এবং মঙ্গোল নেতা চেঙ্গিস খাঁ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধীনে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়, যারা ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপ, মধ্য এশিয়া এবং চিন পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল।

বিখ্যাত মসজিদ দামাসকাস নির্মাণ কার্য শেষ হয় ৭১৪ খ্রিস্টাব্দে

সাম্রাজ্য স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণের এসব প্রচেস্টার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের যৌথ সম্প্রচার ব্যবস্থার দ্বারা মোটামুটিভাবে এলাকার সম্পদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং এই অঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের যেমন ভারত অথবা চিনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে সুবিধা অর্জন করা। ব্যবসা বাণিজ্যের স্থায়িত্ব দিতে সব সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলি যুক্ত হয়েছিল। তারা বিভিন্ন ধরনের সামরিক সংগঠনের সাথেও যুক্ত ছিল। একটা সাম্রাজ্যের সাফল্য প্রায়ই নির্ভর করত তার উত্তরাধিকারীর ক্ষমতা গ্রহণ করার উপর। শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চল পারসিয়ান, গ্রিক, ল্যাটিন, আরবি এবং সর্বোপরি অনেকগুলি ভাষায় কথা বলা এবং লেখার উপাদান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

সাম্রাজ্যগুলো খুব স্থায়ী ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিরোধ এবং দ্বন্দ্বের একটা আংশিক কারণ ছিল ওই অঞ্চলের সম্পদ। এছাড়াও সাম্রাজ্য এবং উত্তরদিকের মেষ পালক জন-গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি বিপদের একটি কারণ ছিল। তাদের সৈনিকদের দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য ব্যবসা বাণিজ্য এবং শ্রমিক সরবরাহ উভয়ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যগুলি থেকে সমর্থন পাওয়া যেত। এটা লক্ষ করার বিষয় ছিল যে সমস্ত সাম্রাজ্যগুলো শহর-কেন্দ্রিক ছিল না। দীর্ঘ সময় ধরে মেষপালক জন-গোষ্ঠীর দ্বারা একটি সাম্রাজ্যকে কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় এবং সফলতা অর্জন করা যায় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো মোঙ্গল সম্রাট চেঙ্গিস খাঁ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা।

বিভিন্ন ভাষা ভাষী জাতি গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। খ্রিস্ট ধর্মের ক্ষেত্রে (যার উৎপত্তি হয়েছিল প্রথম শতকে প্যালেস্টাইনে) এবং ইসলাম ধর্মের (যার উৎপত্তি হয়েছিল সপ্তম শতকে) ক্ষেত্রে এটা সত্য ছিল।

সময় তালিকা-২

(খ্রিষ্ট পূর্ব ১০০ থেকে ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ)

TIMELINE II

এই সময়তালিকায় রাজ্য এবং সাম্রাজ্যগুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন এগুলোর মধ্যে রোম সাম্রাজ্য ছিল খুব বিশাল। তিনটি মহাদেশ জুড়ে এই সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল। এছাড়াও সে সময় কিছু মুখ্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটেছিল। এটা ছিল এমন একটি সময়, যখন বুদ্ধিজীবী কার্যকলাপের প্রতিষ্ঠানগুলোরও উত্থান হয়েছিল। তখন ভ্রমণের ধারণা দিয়ে বইগুলো লেখা হতো। তার মধ্যে এমন কিছু জিনিস ছিল, যা এখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ, যেগুলো এই সময়ে প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

তারিখ	আফ্রিকা	ইউরোপ
খ্রি.পূর্ব ১০০ থেকে ৫০ খ্রি.পূ.পর্যন্ত	সমুদ্র পথে দক্ষিণ এশিয়া থেকে পূর্ব আফ্রিকায় কলা গাছের প্রবর্তন ঘটে।	প্রায় ১০০,০০০ দাস স্পার্টাকাসদের বিশালাকার বিদ্রোহ (৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)
৫০-১ খ্রি. পূ.	ক্লিওপেট্রা; মিশরের রানি (৫১ থেকে ৩০ খ্রি. পূ.)	রোমে কলিসিয়ামের অট্টালিকা
১-৫০ খ্রিষ্টাব্দ		
৫০-১০০খ্রি.		
১০০-১৫০ খ্রি.	বীর আলেকজান্দ্রিয়ার দ্রুত বাষ্পচালিত যন্ত্রের আবিষ্কার	উচ্চ শিখরে রোমান সাম্রাজ্য
১৫০-২০০	আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমি ভূগোল সম্পর্কিত একটি রচনা লেখেন	
২০০-২৫০		
২৫০-৩০০		
৩০০-৩৫০ খ্রি.	এক্সামে খ্রি. ধর্ম প্রবর্তন (৩৩০)।	কনস্টেন্টটাইন সম্রাট হন এবং কনস্টান্টিনোপল শহরের প্রবর্তন করেন।
৩৫০-৪০০ খ্রি.		রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব এবং পশ্চিমে বিভক্ত হয়।
৪০০ - ৪৫০ খ্রি.	ইউরোপ থেকে এসেভানডলগণ দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজত্বস্থাপন করে (৪২৯)	উত্তর ও মধ্য ইউরোপের উপজাতিদের দ্বারা রোম সাম্রাজ্য অভিযান।
৪৫০-৫০০ খ্রি.		গলের ক্লভিসদের (ফ্রান্স) খ্রিস্টান ধর্মান্তরিত করন (৪৯৬)
৫০০-৫৫০ খ্রি.		সেন্ট বেনেডিক্ট ইতালিতে সন্ন্যাসীদের জন্য মঠ স্থাপন করেন, (৫২৬ খ্রি.) সেন্ট আগসটাইন ইংলন্ডে খ্রিস্টান ধর্ম প্রবর্তন করেন (৫৯৬ খ্রি.) মহান গ্রেগরি (৫৯০ খ্রি.) রোমান ক্যথলিক গির্জার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেন।
৫৫০-৬০০ খ্রি.		
৬০০-৬৫০ খ্রি.	কিছু মুসলমান অধিবাসিরা (হিজরা)বসতি স্থাপন করে।(৬১৫ খ্রি.)	
৬৫০ -৭০০ খ্রি.	দক্ষিণ মিশরের নুবিয়ার সাথে আরবের মুসলিমদের চুক্তি।	বেডে(Bede) ইংরেজ জনগণ ও গির্জার ইতিহাস লেখেন।
৭০০-৭৫০ খ্রি		
৭৫০-৮০০ খ্রি.		
৮০০-৮৫০ খ্রি.	ঘানা রাজত্বের প্রবর্তন	ফ্রাঙ্ক এর রাজা সালেমান পবিত্র রোমান সম্রাটের (৪০০ খ্রি.) মুকুট পরিধান করেন।
৮৫০-৯০০ খ্রি.		কিয়েভ এবং নভগুরোডে প্রথম রাশিয়ান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
৯০০-৯৫০ খ্রি.		পশ্চিম ইউরোপের সমুদ্র পথে দস্যুদের হানা।
৯৫০-১০০০ খ্রি.		
১০০০-১০৫০ খ্রি.		ইতালী সেলারনোতে (১০৩০ খ্রি.) স্বাস্থ্য বিদ্যালয় স্থাপন।
১০৫০-১১০০ খ্রি.	আলমোরাবিভ রাজ্য (১০৫৬-১১৪৭) যার প্রসার ঘটেছিল ঘানা থেকে দক্ষিণ স্পেন পর্যন্ত।	ইউলিয়াম নরমানডি ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করেন এবং রাজা হন (১০৬৬) প্রথম ক্রুসেড এর ঘোষণা (১০৯৫)
১১০০-১১৫০ খ্রি.	জিম্বাবোয়ে (১১২০-১৪৫০) আবির্ভাব ঘটে স্বর্ণ ও তামা উৎপাদন এবং দুরদেশে ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে।	
১১৫০-১২০০ খ্রি.	ইথিওপিয়ার খ্রিস্টান গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয়।	নটরিডেমে ক্যাথেড্রালের গঠন কাজ শুরু হয় (১১৬৩)
১২০০-১২৫০ খ্রি.	পশ্চিম আফ্রিকায় মালি রাজ্য (১২০০) এবং টিমবোকুটোর শিক্ষা কেন্দ্র	এসিসির সেন্ট ফ্রান্সিস সন্ন্যাসীদের জন্য কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করেন, গভীর সংযম এবং সমবেদনার (১২০৯) উপর জোর দেন। ইংল্যান্ডে লর্ডদের বিদ্রোহ রাজার বিরুদ্ধে যিনি IV ম্যাগনাকাটা স্বাক্ষর করেন এবং আইনানুযায়ী শাসন প্রবর্তন করেন।
১২৫০-১৩০০ খ্রি.		হাপাসবার্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা যেটি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অস্ট্রিয়াতে শাসন করেছিল।

তারিখ	এশিয়া	দক্ষিণ এশিয়া
খ্রি.পূর্ব ১০০-৫০	চিনে হান সাম্রাজ্য এশিয়া থেকে ইউরোপে সিল্ক রাস্তার উন্নতি করেন।	উত্তর-পশ্চিম অংশে ব্যকট্রিয়ান গ্রিক এবং শক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিনে সাতবাহন বংশের উত্থান।
৫০-১ খ্রি. পূ.		ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, দক্ষিণ-এশিয়া, সুদূর দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে।
১-৫০ খ্রিস্টাব্দ	রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ জুদাই এ যীশুখ্রিস্টের আবির্ভাব, রোমানদের আরব আক্রমণ (২৪)	
৫০-১০০খ্রি.		উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য এশিয়ার কুষাণ সাম্রাজ্য স্থাপন।
১০০-১৫০ খ্রি.	চীনে কাগজের আবিষ্কার (১১৮) প্রথম সিস্‌মোগ্রাফ এর অগ্রগতি (১৩২ খ্রি.)	
১৫০-২০০		
২০০-২৫০	হান সাম্রাজের পতন (২২১) পারশিয়া শাসানিভ এর শাসন (২২৬ খ্রি.)	
২৫০-৩০০	চীনে রাজ দরবারে চা, (২৬২) চীনে চৌম্বকীয় কম্পাসএর ব্যবহার (২৭০খ্রি.)	
৩০০-৩৫০ খ্রি.	চীনে অশ্ব আরোহণের রেকাব এর ব্যবহার শুরু হয়।	গুপ্ত রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা (৩২০)
৩৫০-৪০০ খ্রি.		চীন থেকে ফা-হিয়েন এর(Fa-xean)ভারত-ভ্রমণ(৩৯৯খ্রী.)
৪০০ - ৪৫০ খ্রি.		
৪৫০-৫০০ খ্রি.		গনিতজ্ঞ এবং জ্যাতিষবিদ আর্যভট্ট।
৫০০-৫৫০ খ্রি.		
৫৫০-৬০০ খ্রি.	জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন (৫৯৪ খ্রি.) শস্য পরিবহনের জন্য চীনে গ্রান্ড ক্যানেল তৈরি করা হয়। (৫৮৪-৬১৮) ৫,০০০,০০০ শ্রমিক ৩৪ বৎসর কাজ করে।	বাদামী এবং আইহোলে চালক্য মন্দির।
৬০০-৬৫০ খ্রি.	চীনে টাঙ রাজ বংশ (৬১৮খ্রি.) প্রোফেট মহম্মদ এর মদিনায় গমন। হিজরি যুগের প্রবর্তন (৬২২ খ্রি.) শসানিয়ান সাম্রাজ্যের ভাঙ্গান (৬৪২ খ্রি.)	হিয়েন সাং এর চীন থেকে ভারতে ভ্রমণ, গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে নালন্দার আর্বিভাব।
৬৫০-৭০০ খ্রি.	উমাইয়া খলিফাপদ (৬৬১-৭৫০)	
৭০০-৭৫০ খ্রি	উমাইয়াদের একটা শাখার স্পেন জয়; চীনে তাং রাজবংশের প্রতিষ্ঠা।	আরবদের সিন্ধু বিজয় (৭১২ খ্রীঃ)
৭৫০-৮০০ খ্রি.	আবাসিদ খলিফার প্রতিষ্ঠা এবং বাগদাদ, সংস্কৃতি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত।	
৮০০-৮৫০ খ্রি.	কম্বোডিয়া খমের রাজ্য প্রতিষ্ঠা (৮০২ খ্রি.)	
৮৫০-৯০০ খ্রি.	চিনে প্রথম ছাপানো বই (৮৬৮ খ্রি.)	
৯০০-৯৫০ খ্রি.		
৯৫০-১০০০ খ্রি.	চিনে কাগজের নোট এর ব্যবহার	
১০০০-১০৫০ খ্রি.	পাসিয়ান ডক্টর ইবান সিনহা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বই লিখেন যা অনুসরণ করা হয় কয়েক শতক পর্যন্ত।	উত্তর-পশ্চিমে মামুদ গজনির হানা। আল বেরুনীর ভারত ভ্রমণ। তাঞ্জাভোরে রাজ রাজেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।
১০৫০-১১০০ খ্রি.	তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা আল্প আরসালন১০৭৫ খ্রী	
১১০০-১১৫০ খ্রি.	চিনে প্রথম আতশবাজি প্রর্দশন করা হয়।	কলহনের রাজতরঙ্গিনী রচনা
১১৫০-১২০০ খ্রি.	অঙ্কর সাম্রাজ্য কম্বোডিয়া। অঙ্করভাটের মন্দির প্রতিষ্ঠা (উচ্চতা ১১৮০)	
১২০০-১২৫০ খ্রি.	চেঙ্গিস খাঁ এর ক্ষমতা মজবুত করা(১২০৬)	দিল্লির সুলতানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (১২০৬ খ্রীঃ)
১২৫০-১৩০০ খ্রি.	চেঙ্গিস খাঁর নাতি কুবিলাই খাঁন চীনের সম্রাট পদ লাভ।	কবিতা এবং সঙ্গীতে আমির খসরুর নতুন রূপ প্রদান, কোনারকে সূর্য মন্দির প্রতিষ্ঠা।

তারিখ	আমেরিকা	অস্ট্রেলিয়া/ প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জ
খ্রি.পূর্ব ১০০-৫০		
৫০-১ খ্রি. পূ.		
১-৫০ খ্রিষ্টাব্দ		
৫০-১০০খ্রি.		
১০০-১৫০ খ্রি.		
১৫০-২০০ খ্রি.		
২০০-২৫০ খ্রি.		
২৫০-৩০০ খ্রি.		
৩০০-৩৫০ খ্রি.	তিওতিহুয়াকান নামে মেক্সিকো শহর , পিরামিড মন্দির, মায়া আনুষ্ঠানিক শহর, জ্যোতিষ বিদ্যার উন্নতি , চিত্র সংক্রান্ত লেখা।	
৩৫০-৪০০ খ্রি.		
৪০০ - ৪৫০ খ্রি.		
৪৫০-৫০০ খ্রি.		
৫০০-৫৫০ খ্রি.		
৫৫০-৬০০ খ্রি.		
৬০০-৬৫০ খ্রি.		
৬৫০-৭০০ খ্রি.		
৭০০-৭৫০ খ্রি		
৭৫০-৮০০ খ্রি.		
৮০০-৮৫০ খ্রি.		
৮৫০-৯০০ খ্রি.		
৯০০-৯৫০ খ্রি.		
৯৫০-১০০০ খ্রি.	উত্তর আমেরিকায় এমন শহর তৈরি হয় (৯৯০ খ্রিঃ)	পলিমেশিয়া থেকে মাওরি নাবিকরা নিউজিল্যান্ড আবিষ্কার করেন,
১০০০-১০৫০ খ্রি.		
১০৫০-১১০০ খ্রি.		পলিমেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে মিষ্টি আলুর (দক্ষিণ আমেরিকা হতে) উৎপাদন।
১১০০-১১৫০ খ্রি.		
১১৫০-১২০০ খ্রি.		
১২০০-১২৫০ খ্রি.		
১২৫০-১৩০০ খ্রি.		

কার্যাবলি

পাঁচটি পরিচিত ঘটনা বের করার চেষ্টা কর যেগুলো এই অঞ্চলে / এই মহাদেশে তাদের অবস্থান পরিবর্তনের সংঙ্গো যুক্ত ছিল। এই ঘটনাগুলোর তাৎপর্য কি ছিল?

বিষয় ৩

তিনটি মহাদেশ জুড়ে একটি সাম্রাজ্য
(An Empire Across Three Continents)

রোমান সাম্রাজ্য বিশাল অঞ্চল জুড়ে সম্প্রসারিত হয়েছিল যেটি ইউরোপের সবচেয়ে বেশি অঞ্চলকে যুক্ত করেছিল এবং বর্তমানে যেটি উর্বর ক্রিসেন্টের এক বিরাট অংশ কে উত্তর আফ্রিকা হিসাবে আমরা জানি। এই অধ্যায়ে আমরা এই সাম্রাজ্যের সংগঠন, রাজনৈতিক শক্তি, সাম্রাজ্যের আকৃতি-প্রকৃতি এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত জনসাধারণের অবস্থান দেখব। স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ভাষার দ্বারা এই সাম্রাজ্য যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী ছিল-এটাও তোমরা দেখবে। তখন মহিলাদের সামাজিক অবস্থান ছিল আজকের অনেক দেশের মহিলাদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। সে সময় অধিকাংশ অর্থনীতি পরিচালিত হত দাস শ্রমিকদের মতো কিছু সংখ্যক ব্যক্তির স্বাধীনতা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে। পঞ্চদশ শতক থেকে সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের পতন শুরু হয়, কিন্তু সাম্রাজ্যের বাকি অংশ বিশেষভাবে পূর্বদিকের অর্ধেক অংশের সমৃদ্ধি তখনও অক্ষত ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নাগরিক সমৃদ্ধি ও ধর্মীয় ঐতিহ্য নিয়ে খলিফা সাম্রাজ্য গড়ে উঠে। সে সম্পর্কে তোমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পড়বে।

রোমান ঐতিহাসিকরা যে সকল প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেগুলোকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি, যথা— (ক) সাহিত্য বা গ্রন্থ (খ) নথিপত্র এবং (গ) উপাদানের অংশবিশেষ। ইতিহাসের সাহিত্যিক উপাদান বলতে বোঝায় সেই সময়ের লিখিত (যেগুলোকে বলা হয় কাহিনি কারণ এগুলো বছরের পর বছর বর্ণনা করা হয়েছিল) চিঠিপত্র, বক্তৃতা / ভাষণ, ধর্ম-উপদেশ, আইন ইত্যাদি বিষয়গুলো। নথিপত্রের উপাদানে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন লিপি এবং পাপেরি। লিপিগুলো সাধারণত পাথরে খোদিত ছিল। এদের অনেকগুলো এখনো গ্রিক এবং ল্যাটিন উভয় ভাষায় টিকে আছে। পেপারাস (Papyrus) হল নলখাগড়ার মত একধরনের গাছ যেগুলো ইজিপ্টের নীল নদের তীরে জন্মাতো এবং এগুলো লেখার উপাদান হিসাবে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা হত। এই পেপারাসগুলোতে হাজার হাজার চুক্তিপত্র, চিঠিপত্র, সরকারি নথিপত্র ইত্যাদি লিপিবন্ধ করে রাখা হত এবং এগুলো যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশিত হত তাদেরকে পেপারোলোজিস্ট বলা হত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্ন ধরণের উপাদানের ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছিলেন (উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন খনন কার্য এবং জরিপের মাধ্যমে) যেমন অট্টালিকা, স্মৃতিস্তম্ভ, বিভিন্ন ধরণের কাঠামো, মৃৎপাত্র, মুদ্রা। ছোটো ছোটো রঙিন পাথর এমনকি প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলোও (উদাহরণ স্বরূপ এরিয়াল আলোকচিত্রের মাধ্যমে) এই সমস্ত উৎসগুলো আমাদের অতীত সম্পর্কে অনেক কিছু বলে এবং এগুলোকে একত্রিত করে ফলপ্রসূ ধারণা লাভ করা যায়, কিন্তু কিভাবে এই কাজটি ভালোভাবে করা যায় তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ঐতিহাসিকদের দক্ষতার উপর।

প্যাপারাস স্ক্রোলস্

ইউরোপের অধিকাংশ, উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্য শাসন করেছিল। এই দুটি সাম্রাজ্য হল রোম এবং ইরান। রোমান এবং ইরানীয়রা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং তাদের ইতিহাস থেকে জানা যায়, তারা একে অপরের সাথে যুদ্ধেও লিপ্ত ছিল। তাদের সাম্রাজ্য পরবর্তী সময়ে একে অপর থেকে পৃথক হয় এক টুকরো সরু ভূমির দ্বারা যেখান দিয়ে ইউপ্রোটিস নদী বয়ে গেছে। এই অধ্যায়ে আমরা রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে জানব। কিন্তু পাশাপাশি আমরা রোমের সাথে ইরানের বিরোধের কারণগুলোও আলোচনা করবো।

তোমরা যদি মানচিত্রের দিকে তাকাও, তাহলে দেখবে ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাদেশ সমুদ্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে যা সম্প্রসারিত হয়েছিল পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে সিরিয়া পর্যন্ত। এই সমুদ্রকে বলা হয় ভূমধ্যসাগর এবং এটি ছিল রোম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। ভূমধ্যসাগর এবং এর চার দিকের অঞ্চলগুলোর উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় দিকই রোমানদের অধীনে ছিল। এই সাম্রাজ্যের উত্তর দিকের সীমান্তে ছিল রাইন ও দানিয়ুব নামে দুটি বিখ্যাত নদী। দক্ষিণ সীমান্তে ছিল সাহারা নামে বিশাল বিস্তৃত মরুভূমি।

MAP 1: ইউরোপ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা

এই সুবিশাল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিল রোমান সাম্রাজ্য। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণের সমগ্র নিম্নাঞ্চল থেকে পূর্বে আরব পর্যন্ত ইরানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কোনো কোনো সময় আফগানিস্তানের এক বিরাট অংশকেও নিয়ন্ত্রণ করেছিল। এই দুই মহাশক্তি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অংশে বিভক্ত ছিল যাকে চিনারা বলে তা চিন (Tachin) (বৃহৎ চিন যা সাধারণত পশ্চিমে অবস্থিত।)

প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য

তৃতীয় শতাব্দীর ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে বৃহৎ রোম সাম্রাজ্য মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা- প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য এবং পরবর্তী রোম সাম্রাজ্য। অন্যভাবে বলতে গেলে তৃতীয় শতাব্দীর পুরো সময় কালটাই ছিল প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য এবং তার পরের সময় কালকে বলা হয় পরবর্তী রোম সাম্রাজ্য।

এই দুই শক্তিধর সাম্রাজ্যের মধ্যে যে মূল পার্থক্য ছিল তা হল ইরানের চেয়ে রোম সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি ছিল বৈচিত্র্যময়। এই সময়ে প্রথমে পার্থিয়ানরা এবং পরে সাসানিয়ান বংশধররা ইরানের শাসন করেছিল। এই শাসিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল ইরানীয়। রোমান সাম্রাজ্যের কারুকার্য, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় গুলি সরকারের একটা সাধারণ নিয়মনীতির দ্বারা মুখ্যত বাঁধা ছিল। রোমে অনেক ধরনের ভাষায় কথাবার্তা বলত। কিন্তু প্রশাসনিক কাজে শুধুমাত্র ল্যাটিন এবং গ্রিক ভাষাকে ব্যবহার করা হত। বর্তমানে শুধু মাত্র একটিই ভাষা। পূর্বদিকস্থ উচ্চশ্রেণির মানুষেরা কথাবলা এবং লেখার ক্ষেত্রে গ্রিক ভাষা ব্যবহার করত এবং পশ্চিম দিকস্থ মানুষেরা ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার করত। এই প্রধান ভাষাগুলি তাদের সীমানা অতিক্রম করে মধ্য ভূমধ্যসাগরের কোনো কোনো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেমন আফ্রিকার ট্রিপোলিটিনিয়া অঞ্চলে (যারা ল্যাটিন ভাষায় কথা বলে) এবং সাইরাইনিকা (গ্রিক ভাষায় কথা বলে) অঞ্চলে। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে যারা বাস করত তারা সবাই একজন শাসক অর্থাৎ একজন সম্রাটের অধীনে থাকত, তারা কোথায় বাস করে এবং কোন্ ভাষায় কথা বলে, তাতে কিছু আসে যায় না। প্রথম সম্রাট অগস্টাস,২৭ খ্রি পূর্বাব্দে যে শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন তাকে বলা হত প্রিন্সিপেট। যদিও অগস্টাস ছিলেন একমাত্র শাসক এবং কর্তৃত্বের প্রকৃত উৎস। এই গল্পটি প্রচলিত ছিল যে তিনি প্রকৃত পক্ষে ছিলেন নাগরিক নেতৃত্ব (প্রিন্সেপস-ল্যাটিন), প্রকৃত শাসক ছিলেন না। এটা করা হয়েছিল সেনেটকে মর্যাদা দানের জন্য, যে সংগঠনটি প্রাচীন প্রজাতান্ত্রিক রোমের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছিল। শত শত বছর ধরে রোমে সেনেটের অস্তিত্ব ছিল এবং এটি অভিজাতদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, যারা ছিল রোমের বিত্তশালী পরিবার এবং পরবর্তী কালে তারাই ইতালির ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিল। অধিকাংশ রোমান ইতিহাস যা গ্রিক এবং ল্যাটিনে বেঁচে ছিল সেগুলো সেনেটের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হয়। খারাপ সম্রাট ছিল তারাই, যারা সেনেট সভ্যদের অবিশ্বাস করত এবং তাদের প্রতি বর্বর এবং হিংসাত্মক আচরণ করত। অধিকাংশ সেনেট সভ্যদের আকাঙ্খা ছিল পুরানো প্রজাতান্ত্রিক শাসনের দিনগুলোতে ফিরে যেতে। কিন্তু তারা এটাও বুঝেছিল যে এটা কখনো সম্ভব নয়।

পরবর্তী সম্রাট, সেনেট এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য মুখ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেনা শাসন ছিল। পার্সিয়ান সাম্রাজ্যে সেনারা ছিলেন এর প্রতিদ্বন্দ্বী, যারা বাধ্যতামূলক সৈনিক ছিল। রোমান সাম্রাজ্যে পেশাগত সৈনিকদের বেতন দেওয়া হত যারা কমপক্ষে ২৫ বছর ধরে সৈনিক পদে কাজ করত। প্রকৃত পক্ষে রোমান সাম্রাজ্যে বেতনভোগী সেনাদের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য ছিল। সাম্রাজ্যে সবচেয়ে বড় একক সংগঠন ছিল সৈনিকরা (চতুর্থ শতক পর্যন্ত ৬,০০,০০০ জন) এবং সম্রাটদের ভাগ্য এদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করত। সৈনিকরা প্রতিনিয়ত ভালো মজুরি এবং ভালো কাজের জন্য আন্দোলন করত। যদি সেনানায়ক বা এমনকি সম্রাটের দ্বারা সৈনিকদের দাবিদাওয়াগুলো অবহেলিত হত, তাহলে প্রায় সময়ই তা বিদ্রোহের আকার ধারণ করত।

* শাসন ব্যবস্থা ছিল প্রজাতান্ত্রিক কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল সিনেটের হাতে। ছোটো গ্রুপ এর ধনী পরিবারগুলি যারা অভিজাততন্ত্র গঠন করেছিল, তাদের অধীনে ছিল সিনেট। প্রজাতন্ত্র সরকারের আভিজাত্যের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এই কর্তৃত্বপূর্ণ সংস্থা কে সিনেট বলা হত। এই প্রজাতন্ত্রের সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫০৯ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৭ পর্যন্ত। জুলিয়াস সিজারের উত্তরাধিকারী এবং দত্তক পুত্র অক্টোভিয়ান, যিনি পরবর্তী সময়ে অগাস্ঠাস নাম ধারণ করেছিলেন তাঁর দ্বারা এই প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদ হয়েছিল। সিনেটের সদস্য পদের সময়সীমা আজীবন ছিল এবং অধিষ্ঠিত দপ্তর ছিল অভিজাত বংশে জন্মের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

** বাধ্যতামূলক ভাবে একজন সৈনিক যে বলপূর্বক সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হত। নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জনসাধারণের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিল।

জুলিয়াম, রোমের সর্বসাধারণের ব্যবহারের দোকানগুলো এবং এই বারান্দা এবং স্তম্ভগুলো তৈরি করা হয়েছিল ৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, যার সম্প্রসারণ ঘটে প্রাচীন রোমান বিচারালয়ে।

আবার, রোমান সেনাদের অবস্থান বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল ছিল সেনেটেরিয়ালদের সহানুভূতির উপর যা ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় দেখা যায়। সেনেট, সেনাদের ঘৃণা এবং ভয় করত কারণ এরাই ছিল অনিশ্চিত হিংসার উৎস, বিশেষ করে তৃতীয় শতাব্দীতে সরকার বলপূর্বক প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব আদায় করে পার্বত্য অঞ্চলের সৈনিকদের ব্যয় নির্বাহ করত।

সংক্ষেপে, সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে সম্রাট, অভিজাত এবং সেনা—এই তিনজন ছিল প্রধান খেলোয়াড়। প্রত্যেক সম্রাটের সফলতা নির্ভর করত তাঁরা কতটা সৈনিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত তার উপর। যখন সৈনিকরা বিভক্ত হয়ে যেত, তখন সাধারণত তার ফল হয় গৃহযুদ্ধ। যখন উত্তরাধিকারসূত্রে পর পর চার জন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তখন প্রথম দুই শতাব্দী, একমাত্র একটি খারাপ বছর ৬৯ খ্রিস্টাব্দ ছাড়া সাম্রাজ্য ছিল গৃহযুদ্ধমুক্ত এবং অপেক্ষাকৃতভাবে স্থিতিশীল। সিংহাসনে উত্তরাধিকারের ভিত্তি ছিল যতদূর সম্ভব পরিবারগত নতুবা জন্মসূত্রগত অথবা দত্তক গ্রহণ, এমনকি সৈনিকদের বিবাহ বন্ধনের ক্ষেত্রে এই নীতি দৃঢ় ভাবে মানা হত। উদাহরণ স্বরূপ টিবিরিয়াস (১৪-৩৭ খ্রি.), যিনি রোমান সম্রাটদের দীর্ঘ অপেক্ষমান তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন, তিনি জন্মসূত্রে অগাস্টাসের সন্তান ছিলেন না।

প্রথম দুই শতাব্দী পর্যন্ত বাইরের যুদ্ধ বিগ্রহ খুব কমই ছিল। অগাস্টাস থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে টিবেরিয়াস যে সাম্রাজ্য পেয়েছিল তা ছিল বিশাল, যেটি পুনরায় সম্প্রসারণের কোনো প্রয়োজন ছিল না। এটা ঘটনা যে ' অগাস্টাসের যুগ' স্মরণীয় হয়ে আছে শান্তির জন্য যা কয়েক শতাব্দীর অভ্যন্তরীণ শত্রুতা এবং সামরিক বিজয়ের পর স্থাপিত হয়। প্রাচীন সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য একমাত্র বড়ো অভিযান ছিল ইউপ্রেটিস দিয়ে ট্রাজানের নিষ্ফলা পেশা অঞ্চল অভিযান, যা ১১৩-১৭ খ্রিস্টাব্দে তার উত্তরাধিকারীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল।

* গৃহযুদ্ধ বলতে বোঝায় একই দেশের অভ্যন্তরে ক্ষমতার জন্য অস্ত্রের সংগ্রাম, বিপরীত দিক থেকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব।

সম্রাট ট্রাজানের স্বপ্ন—ভারত বিজয় কি?

তখন, শীতের পর (১১৫/১৬) অন্তিওচ এ একটা বড় ভূমিকম্প হয়, ১১৬ এ ট্রাজান মিছিল করে ইউফ্রেটিস থেকে পার্থিয়ানের রাজধানী কটোশিপন এ যান এবং তারপর পারস্য উপসাগরের চূড়ায় (ঐতিহাসিক কাসিউস দিও বর্ণনা করেছিলেন) তিনি একটি বাণিজ্যিক জাহাজে করে ভারতবর্ষ অভিযানের আকাঙ্খা করেন এবং এই অভিলাষ ব্যক্ত করেন যে তিনি আলেকজাণ্ডারের মতই যৌবন দৃপ্ত ব্যক্তি।

— ফ্রেগুস মিল্লার, নিকট প্রাচ্যের রোম।

নিকট প্রাচ্য
তাদের পরিপ্রেক্ষিতে যারা রোমান ভুমধ্যে বসবাস করত, সেই সব প্রদেশ গুলোকে প্রাচ্য ভুমধ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়, প্রধানত রোমান প্রদেশের সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মেসোপোটেমিয়া এবং অন্য অভিজ্ঞতার নিরিখে পরিবেষ্টিত প্রদেশগুলো ছিল আরব প্রদেশের মতো।

*এগুলো ছিল রোমের অধীন রাজন্যশাসিত স্থানীয় রাজ্য যাদের সামরিকশক্তি রোম সম্রাটের সাহায্যে ব্যবহৃত হত এবং বিনিময়ে রোম এদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করত।

রোমান সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ শাসনের অনেক বৈশিষ্ট্য ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়েছিল। রোমের প্রাদেশিক এলাকার রাজ্যগুলো সম্পূর্ণ ভাবে এর উপর নির্ভরশীল ছিল। নিকট প্রাচ্য ছিল এই ধরনের রাজ্যগুলোর দ্বারা পরিপূর্ণ। কিন্তু দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে অঞ্চলগুলো ইউফ্রেটিসের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল (সাথে রোমান অঞ্চলগুলোও), সেগুলো অদৃশ্য হয়েছিল এবং রোমের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। (প্রসঙ্গক্রমে এই রাজ্যগুলোর মধ্যে কিছু কিছু রাজ্য অতিরিক্ত সম্পদশালী ছিল। উদাহরণস্বরূপ হেরোড এর রাজ্য প্রতিবছর ৫৪ লক্ষ ডেনরি সমতুল্য সম্পদ উৎপাদন করত যা ১,২৫,০০০ কেজি স্বর্ণের সমপরিমাণ ছিল। ডেনারিউস ছিল রোমান রৌপ্যমুদ্রা যা ৪.৫ গ্রাম বিশুদ্ধ রূপা দিয়ে তৈরি করা হত)

আসলে এই শতাব্দীতে ইতালি ছাড়া অন্য অঞ্চলগুলোকে প্রদেশ হিসাবে গণ্য করা হত না। সাম্রাজ্যের সব অঞ্চলগুলোকে প্রদেশ হিসাবে গঠন করা হয়েছিল রাজস্ব আদায়ের জন্য। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে রোমান সাম্রাজ্য স্কটল্যাণ্ড থেকে আরমেনিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত এবং সাহারা থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং কোনো কোনো সময় আরও দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আধুনিককালে সরকার বলতে যা বোঝায়, সে রকম কোনো সরকার ছিল না সেই অঞ্চলগুলোকে পরিচালনা করার জন্য। তোমার জিজ্ঞাসা থাকতে পারে, দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে যার জনসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ সেই বিস্তৃর্ণ অঞ্চল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রদেশগুলোকে সম্রাট কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করত এবং শাসন কার্য পরিচালনা করত? সাম্রাজ্যের নগরায়ণের মধ্যেই এর উত্তর ছিল। ভূমধ্যসাগরের তীরে সারিবদ্ধ বড় শহরগুলো (কারথেজ, আলেকজান্দ্রিয়া, এনতিওচ ছিল এগুলোর মধ্যে বৃহত্তম) ছিল সাম্রাজ্য পরিচালনা পদ্ধতির সত্যিকারের শক্ত নিরেট প্রস্তরের নকশা। শহরগুলোর মাধ্যমে সরকার প্রাদেশিক অঞ্চলগুলো থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল যেগুলো সাম্রাজ্যের সম্পদবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এর অর্থ হল যে, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত শ্রেণির জনসাধারণ রোমান রাষ্ট্রের সহযোগিতায় সক্রিয়ভাবে তাদের প্রদেশ গুলোকে শাসন করেছিল এবং রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিল। রোমান রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা মজার ঘটনা হল ইতালি এবং এর প্রদেশগুলোর মধ্যে নাটকীয়ভাবে ক্ষমতা বদল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দী ধরে প্রদেশের উচ্চশ্রেণিরা যারা অধিকাংশ কর্মচারীবৃন্দের মূলকাঠামো গঠন করেছিল শাসিত প্রদেশগুলোতে এবং সৈনিকদের নির্দেশ দিতে। তারা এসেছিল নতুন অভিজাত প্রশাসকশ্রেণি এবং সামরিক সেনানায়কদের গড়ে তুলতে যারা সেনেটোরিয়েল শ্রেণির চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী ছিল, কারণ তারা ছিলেন সম্রাটদের প্রধান সমর্থক। সম্রাট গাল্লিনাস (২৫৩-৬৮) সামরিক আদেশ দ্বারা সেনেটরদের বহিষ্কৃত করে এই নতুন আবির্ভূত গোষ্ঠীর ক্ষমতাকে সংকুচিত করেছিলেন। আমরা বলি যে, গাল্লিনাস সেনেটারদের সামরিক বিভাগে চাকুরি করতে বা নিয়োগ করতে নিষেধ করেছিলেন। এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল তাদের হাত থেকে সাম্রাজ্যের পতন নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ করার জন্য।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ফ্রান্সের 'নিম' নামক স্থানের নিকট পন্ট ডু গার্ডে রোমান ইঞ্জিনিয়ারা একটি বৃহদায়তন নালা তৈরি করেছিল তিনটি মহাদেশের মধ্যে জল সরবরাহ করার জন্য।

মোট কথা হল, প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে এবং তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রশাসনে প্রদেশগুলো থেকে সেনাদেরকে তুলে আনা হয়েছিল,

যেহেতু ওই অঞ্চলগুলোতে নাগরিক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং এটা আর ইতালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইতালিয়ান বংশজাত ব্যক্তিরা সেনেটকে নিজেদের আয়ত্তে রেখেছিল। তখন তারাই ছিল প্রাদেশিক সেনেটে সংখ্যাগরিস্ট। এই প্রবণতা সাধারণত প্রতিফলিত হয়েছিল ইতালি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে পতনের মধ্যে এবং ভূমধ্যসাগরীয় শহরাঞ্চলে উৎপত্তি হয়েছিল নতুন সম্পদশালী অভিজাত শ্রেণির। যেমন দক্ষিণ স্পেনে, আফ্রিকায় এবং প্রাচ্যে। রোমান অনুভূতিতে নগর ছিল একটি শহরকেন্দ্র যার নিজস্ব বিচারক, নগর পরিষদ, গ্রাম এলাকা-যেগুলো এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তাই একটা শহর এলাকার মধ্যে আর একটি শহর ছিল না কিন্তু গ্রামগুলো সর্বদা ছিল, গ্রামগুলোকে শহরে উন্নীত করা হয়েছিল। সাধারণত এইগুলো ছিল সার্বভৌম আনুকূল্যের প্রতীক চিহ্ন (অথবা এর বিপরীত)। গ্রামের চেয়ে শহরে বসবাস করার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ছিল খাদ্য সংকট এবং এমন কি দুর্ভিক্ষের সময় শহরে ভালো খাবার সরবরাহ করা হত।

কার্যাবলি-১

কারা ছিল রোমান রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রধান তিন খেলোয়াড়? তাঁদের প্রত্যেকের সম্পর্কে এক অথবা দু'একটি লাইন লিখো। এবং কীভাবে রোমান সম্রাট এই বিস্তৃর্ণ অঞ্চলকে শাসন করত? কার সহযোগিতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?

ডঃ গ্যালন রোমান শহরগুলোর তুলনায় গ্রামাঞ্চলের অবস্থা যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

ধারাবাহিকভাবে কয়েকবছর ধরে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবে অনেক প্রদেশ জনমানবশূন্য হয়ে যায়। আবার অপুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রথা অনুসারে শহরবাসীরা ফসল উঠার পরেই প্রচুর পরিমাণে দানাশস্য—গম, বার্লি, মটরশুটি এবং ডাল নিজেদের জন্য সংগ্রহ ও মজুত করে রাখে এবং অতিসামান্য হারে কৃষকদের জন্য রেখে যায়। শীতের পর খাবার মত তাদের কিছুই থাকে না। বসন্তের সময় গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ অস্বাস্থ্যকর খাদ্যগুলোকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তারা গাছের বাকল, পাতা, কাণ্ড, ঝোপঝাড় এবং গাছপালার মূল খেয়ে বাঁচে.....

— গ্যালেন, ভালো এবং খারাপ খাদ্য।

রোমান শহরজীবনের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বসাধারণের স্নানাগারগুলো (একজন ইরানীয় শাসক যখন ইরানে এগুলো চালু করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি যাজকদের রোষানলে পড়েন। কারণ জল হলো পবিত্র উপাদান এবং তা জনসাধারণের স্নানাগারে ব্যবহার করলে তাদের কাছে অপবিত্র বলে মনে হবে।) এবং শহরের জনসাধারণেরা তা উপভোগ করতে পারবে অত্যন্ত আনন্দদায়কভাবে। উদাহরণ হিসাবে একটি ক্যালেন্ডার থেকে জানা যায় যে প্রতি বছর তাদের দর্শনীয় স্থানগুলো ১৭৬ দিনের কম খোলা ছিল না।

প্রথম শতাব্দীতে রোমান সেনাছাউনির বিন্দুনিষা শহরের গ্যালারি (আধুনিক সুইজারল্যান্ড)। সেনাবাহিনীর অনুশীলন এবং সৈনিকদের বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা হত।

তৃতীয় শতাব্দীর সংকট (The Third-century crisis)

যদি প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দী এই দীর্ঘ সময় শান্তি, সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক বিকাশের যুগ হয়, তাহলে তৃতীয় শতাব্দী বহন করে এনেছিল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ অত্যাচারের চিত্র। ২৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সাম্রাজ্য একই সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। ২২৫ খ্রিস্টাব্দে ইরানে এক নতুন এবং অধিক আক্রমণাত্মক রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে (তারা নিজেদের 'সাসানিয়ান' বলে অভিহিত করতেন) এবং ১৫ বৎসরের মধ্যে খুব দ্রুতগতিতে তারা ইউফ্রেটিসের দিকে বিস্তৃত হন। সে সময় বিখ্যাত প্রস্তর লিপিকে তিনটি ভাষাতে বিভক্ত করা হয়েছিল। ইরানীয় শাসক শাহপুর-১ দাবি করেন যে তিনি ৬০,০০০ রোমান সেনাকে বিলুপ্ত করেছিলেন এবং এমনকি আনটিওচ এর পূর্বদিকের রাজধানী দখল করেছিলেন। ইতিমধ্যে সমস্ত জার্মানিক উপজাতি গোষ্ঠী অথবা উপজাতীয় সঙ্ঘ মৈত্রী (বিশেষ করে আলামাননাই, ফ্রাঙ্কস এবং গোথস) রাইন এবং দানিয়ুব সীমান্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল। ২৩৩ থেকে ২৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে দেখা যায় সমস্ত সীমান্ত প্রদেশগুলোতে বারবার আক্রমণ হচ্ছিল এবং তা সম্প্রসারণ হয়েছিল কৃষ্ণসাগর থেকে আল্পস এবং দক্ষিণ জার্মানি পর্যন্ত। সে সময় রোমানদের বলপূর্বক দানিয়ুবের অপর প্রান্তে অবস্থিত অনেক প্রদেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এই সময়ে সম্রাটরা যাদের সাথে অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন, রোমানরা তাদের বর্বর বলে আখ্যা দিত। তৃতীয় শতাব্দীতে (৪৭ বছরে ২৫ জন সম্রাট) রোমান সামাজ্যের উত্তরাধিকারে দ্রুত ধারাবাহিক পট পরিবর্তন এটা নিশ্চিত করে যে এই সময়কালে এই সাম্রাজ্যটি বহু টানাপোড়েনের সম্মুখীন হয়েছিল।

লিঙ্গ, সাক্ষরতা, সংস্কৃতি (Gender, Literacy, Culture)

রোমান সাম্রাজ্যের একটি আধুনিক বৈশিষ্ট্য হল ব্যাপক ভাবে নিউক্লিয়ার (ছোটো) পরিবারের বিস্তার। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে পরিবারের সাথে বাস করত না। প্রাপ্তবয়স্ক ভাইদের জন্য এটা ছিল ব্যতিক্রমী যে তারা একই সাধারণ পরিবারের অংশীদার ছিলেন। অন্যদিক দিয়ে ক্রীতদাসরা পরিবারের সাথে যুক্ত থাকত আর রোমানরা এটা বুঝেছিলেন। পরবর্তী প্রজাতন্ত্রে (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী) বিবাহ-বন্ধনের প্রতীক স্বরূপ ছিল—যেখানে স্ত্রীরা স্বামীদের কাছে স্থানান্তরিত হতো না, কিন্তু তারা পিতৃ পরিবারের সম্পত্তির উপর পূর্ণ অধিকার ভোগ করত। বিয়ের সময় মহিলাদের যৌতুক স্বামীর কাছে হস্তান্তরিত হত। মহিলারা ছিলেন প্রাথমিকভাবে তার বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। বাবার মৃত্যুর পর তারা স্বাধীনভাবে বাবার সম্পত্তির মালিকানা পেতেন। এইভাবে রোমান মহিলারা সম্পত্তির মালিকানা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনত অধিকার ভোগ করতেন। অন্যভাবে বলতে গেলে আইনগতভাবে বিবাহিত দম্পত্তিকে কেবল একটা আর্থিক সত্তা হিসেবে না ধরে দুটো পৃথক সত্তা হিসেবে বিবেচিত হত এবং স্ত্রী সম্পূর্ণভাবে আইনগত স্বাধীনতা উপভোগ করত। বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল অপেক্ষাকৃত ভাবে সহজ এবং স্বামী অথবা স্ত্রী কারও ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোন বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন ছিল না। অন্য দিকে পুরুষদের বিয়ের বয়স ছিল ২০ বছরের পরে অথবা ৩০ বছরের আগে। আর মেয়েদের বিয়ের বয়স ছিল ১০ বছরের পরে অথবা ২০ বছরের আগে। সুতরাং স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে বয়সের একটা ফারাক থাকত এবং এটা অসমতাকে উৎসাহিত করেছিল। সাধারণত বিয়ের আয়োজন করা হত এবং এতে কোন সন্দেহ ছিলনা যে, মহিলারা তাদের স্বামীর অধিকারের

*সন্ত আগস্টিন (৩৪৫-৪৩০) ৩৯৬ খ্রি. থেকে উত্তর আফ্রিকার হিপো শহরের বিশপ ছিলেন। চার্চের বৌদ্ধিক ইতিহাসে উনার স্থান ছিল অনেক উচ্চে। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশপরা ছিলেন খুব গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং খুব ক্ষমতা সম্পন্ন।

বিষয় ছিল। বিখ্যাত ক্যাথলিক বিশপ আগস্টিন যিনি তার জীবনের অধিকাংশ সময় উত্তর আফ্রিকায় কাটিয়েছিলেন, তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে, তাঁর বাবা প্রতিদিন তাঁর মাকে মারতেন। এবং যে ছোট শহরে তিনি বড়ো হয়েছিলেন, সেই শহরের অধিকাংশ স্ত্রীদের শরীরে তিনি এই কালসিটের চিহ্ন দেখেছিলেন।

* প্রত্যেকদিন পড়া এবং লেখার জন্য তুচ্ছ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হত।

পরিশেষে, পিতাই বাস্তবিক পক্ষে শিশুর উপর বৈধ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ছিলেন। কোনো কোনো সময় শিশুর উপর জঘন্য মাত্রায় অত্যাচার হত। উদাহরণস্বরূপ—অবাঞ্ছিত শিশুদের জীবিত রাখা বা মেরে ফেলার আইনত অধিকার ছিল বাবার। এমনও জানা গেছে যে বাবা কখনো কখনো শিশুদের মেরে ফেলার জন্য ঠান্ডার মধ্যে ছেড়ে দিত।

সাক্ষরতার অবস্থান কী ছিল? এটা নিশ্চিত যে সাধারণ সাক্ষরতার হার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ছিল। উদাহরণস্বরূপ—পোম্পাই নগর, যেটি ৭৯ খ্রিস্টাব্দে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেই নগরটি ছিল ব্যাপক হারে সাক্ষরতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। পোম্পাই শহরের প্রধান রাস্তার দেওয়ালগুলোতে প্রায়ই অনেক বিজ্ঞাপন লাগানো থাকত এবং সারা শহর জুড়ে দেওয়ালের গায়ে আঁকা বিভিন্ন প্রকার ছবি দেখা যেত।

এর মধ্যে একটি সবচেয়ে মজার বিজ্ঞাপন যেটা পোম্পাই এর দেওয়ালে লাগানো আছে, সেটা হল— দেওয়াল তুমি ধন্য যে, তোমার উপর এত লেখার বোঝা থাকা সত্ত্বেও তুমি ঠায় দাঁড়িয়ে আছ; ভেঙে পড়নি।

এর বিপরীতে মিশরে যেখানে শত শত প্যাপিরাস বেঁচে ছিল, অধিকাংশ আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র যেমন চুক্তিপত্রগুলো সাধারণত পেশাদারি ধর্ম শিক্ষকদের দ্বারা লিখিত ছিল এবং তারা আমাদের প্রায়ই বলত যে X অথবা Y পড়তে এবং লিখতে অক্ষম। কিন্তু, এখানেও কিছু কিছু নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যেমন সৈনিক, ফৌজি অফিসার এবং জমিদারদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করেছিল।

সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়েছিল—যেমন ধর্মীয় রীতি এবং স্থানীয় দেবদেবীর সুবিশাল বৈচিত্র্য; বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা; পোশাক পরিচ্ছদের শৈলী; জনসাধারণের বিভিন্ন রকম খাবার-দাবার; সামাজিক সংগঠনের রূপ (উপজাতি এবং অ-উপজাতি); এমনকি তাদের বসতি স্থাপনের নিদর্শনের মধ্যেও বৈচিত্র্য ছিল। নিকট প্রাচ্যের (ইউফ্রেটিসের

দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইডেসার মোজাইক শিল্প। সিরিয়াক লিপিতে যাদেরকে দেখানো হয়েছে তারা হলেন রাজা অবগরের স্ত্রী এবং তার পরিবার।

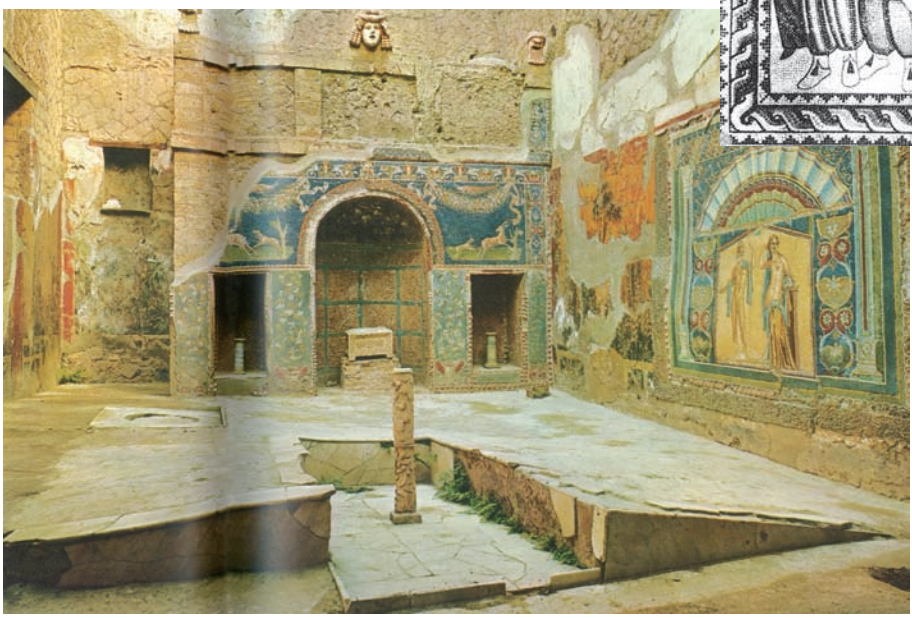

পোম্পাই: এক মদ ব্যবসায়ীর ভোজন কক্ষের-এর দেওয়ালগুলো বিভিন্ন পৌরাণিক পশুর চিত্রে সজ্জিত করা হয়েছে।

কার্যাবলি -২

রোমান সাম্রাজ্যে মহিলারা কতটুকু স্বাধীন ছিল? আজকের ভারতীয় পরিবারের অবস্থার সাথে রোমান পরিবারের অবস্থার তুলনা করো।

পশ্চিমে) প্রভাবশালী ভাষা গোষ্ঠী ছিল 'অ্যারামিক'। মিশরের কথ্য ভাষা ছিল 'কপটিক'; পুনিক ছিল উত্তর আফ্রিকার বর্বরদের ভাষা; স্পেন তথা উত্তর পশ্চিমদের ছিল 'কেলটিক' ভাষা। কিন্তু অধিকাংশ ভাষার সংস্কৃতিই ছিল মৌখিক, যতদিননা এদের জন্য কোন লিপি উদ্ভাবিত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ পঞ্চম শতাব্দীর অনেক পর থেকে 'অ্যারমিনিয়ান' ভাষা লেখা শুরু হয়, যেখানে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কপটিক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হয়ে গিয়েছিল। অন্যত্র ল্যাটিন ভাষার প্রসার ওই সব ভাষাগুলোর স্থান দখল করে, যেগুলোর ব্যাপক প্রসার প্রথম থেকেই ছিল। লক্ষ্যণীয়ভাবে এটা ঘটেছিল কেল্‌টিক ভাষার ক্ষেত্রে; যেটির লেখা প্রথম শতাব্দীর পরই বন্ধ হয়ে যায়।

অর্থনৈতিক বিস্তার (Economic Expansion)

এই সাম্রাজ্যের বন্দর, খনি, ইটভাট্টা এবং জলপাই তেলের কারখানা সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে মজবুত করেছিল। গম, মদ এবং জলপাই এর প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্য ছিল এবং এগুলো মূলত স্পেন, ফরাসী প্রদেশ, উত্তর আফ্রিকা, মিশর এবং অল্পমাত্রায় ইতালী থেকে আসত—যেখানে এই ফসলগুলো উৎপাদনের উৎকৃষ্ট পরিবেশ ছিল। মদ এবং জলপাইয়ের তেলের মতো তরলগুলো 'অ্যাম্ফোরা' নামক পাত্রে পরিবহন করা হত। এই পাত্রগুলোর অনেক ভাঙা টুকরোর অস্তিত্ব এখনো আছে (রোমের মোন্টে টেস্টিকিওতে এমন ৫০ লক্ষেরও বেশি ভাঙা পাত্রের অবশেষ পাওয়া গেছে।) প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই ভাঙা পাত্রগুলোকে পুনর্গঠন করে এটা জানতে সক্ষম হয়েছেন যে, এই পাত্রগুলোতে করে কী কী বহন করা হত এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মাটির স্তূপের সাথে প্রাপ্ত ভাঙা পাত্রের টুকরোগুলোর মাটির তুলনা করে প্রত্নতত্ত্ববিদরা পাত্রগুলোর নির্মাণস্থানের সন্ধানও দিতে সক্ষম হন। এইভাবে কিছুটা বিশ্বাসের সাথে আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে স্পেনে জলপাইর তেল নিষ্কাশনের উদ্যোগ ১৪০-১৬০ বছর পর্যন্ত চরমসীমায় ছিল। এই সময়ে স্পেনের জলপাইয়ের তেল মূলত যে পাত্রে বহন করা হত তার নাম ছিল 'ড্রেসেল-২০' (প্রত্নতত্ত্ববিদরা এর গঠন আবিষ্কারের পর নামকরণ করেন)। ড্রেসেল-২০ নামক পাত্রগুলোর ভগ্নাবশেষ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়েছিল, যার দ্বারা এটা মনে করা হয় যে, স্পেনের জলপাইয়ের তেলের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। এই ধরনের প্রমাণ ব্যবহার (নানা প্রকারের অ্যাম্ফোরা পাত্রের ভগ্নাবশেষ এবং তাদের প্রাপ্ত স্থান) করে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এটা দেখিয়েছেন যে স্পেনের জলপাইয়ের তেলের উৎপাদকরা তাদের প্রতিপক্ষ ইতালির তেলের বাজার দখল নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে জাহাজডুবি; সীলমোহরযুক্ত ইতালিয়ান দানি যেগুলো তৈরি হয়েছিল ফোন্দী হ্রদের কাছাকাছি।

এটা তখনই সম্ভব হত, যখন স্পেনের উৎপাদনকারীরা অপেক্ষাকৃত কম দামে উন্নতমানের তেল সরবরাহ করত। অন্যদিকে বিভিন্ন অঞ্চলের জামিদাররা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য দিয়ে মূল বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করত। পরের দিকে উত্তর আফ্রিকার উৎপাদকরা স্পেনের জলপাইয়ের তেল উৎপাদকদের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছিল এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর বেশিরভাগ সময়ই ওই ক্ষেত্রে তাদের প্রতিপত্তি ছিল। পরে, ৪২৫ খ্রিষ্টাব্দের পর প্রাচ্য (পূর্ব) উত্তর আফ্রিকার প্রভাব ভেঙে দিয়েছিল। পরবর্তী পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এজিয়ান, দক্ষিণ এশিয়া-মাইনর (তুর্কি), সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন ব্যবসায়ীরা মদ এবং জলপাই তেলের মূল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হল এবং ভূমধ্যসাগরের বাজারে আফ্রিকা থেকে আগত পাত্রগুলোর উপস্থিতি নাটকীয় ভাবে হ্রাস পেতে থাকল। এই আন্দোলনের প্রসারের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রদেশগুলোর সমৃদ্ধি, তাদের পণ্যগুলোর গুণমান এবং তাদের উৎপাদন ও পরিবহনের ক্ষমতা অনুসারে বাড়তে বা কমতে লাগল।

সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এমন অনেক অঞ্চল ছিল যেগুলো উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন, ইতালির ক্যাম্পেনিয়া, সিসিলি, মিশরের ফেয়ুম, গ্যালিলি, বাইজেসিয়াম, (টিউনিশিয়া), দক্ষিণ গল (গ্যালিয়া নারোর্নিসিস বলা হত) এবং বায়টিকা (দক্ষিণ স্পেন)। স্ট্র্যাবো এবং প্লিনির মতো লেখকদের মতে এইসব প্রদেশগুলোতে ঘন জনবসতি ছিল এবং এগুলো ছিল সাম্রাজ্যের সম্পদশালী অংশ (অঞ্চল)। সবচেয়ে ভালো মদ ক্যাম্প্যানিয়া থেকে আসত। সিসিলি এবং বাইজেসিয়াম থেকে অত্যাধিক মাত্রায় গম রোমে রপ্তানি হত। গ্যালিনিতে ব্যাপকভাবে গম চাষ করা হত (ঐতিহাসিক জোসেফ্স এর মতে, এলাকাবাসীরা প্রতি ইঞ্চি জমিতে গম চাষ করত), এবং স্পেনের জলপাই তেল প্রধানত দক্ষিণ স্পেনের গুয়াদাল কুইভি নদীর তীরে অবস্থিত জমিদারি (ফুন্দি) থেকে আসত। অন্যদিকে, রোমের অনেক বিস্তীর্ণ প্রদেশ অনুন্নত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, নুমিডিয়ার (আধুনিক আলজিরিয়া) গ্রামাঞ্চলে পশু পরিচালকরা ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করে। এই পশুচালকরা এবং অর্ধ-যাযাবর সম্প্রদায় অধিকাংশ সময় নিজেদের সাথে চুলার মতো কুঁড়েঘর (মেপালিয়া বলা হত) গুলো নিয়ে চলাফেরা করত। যখন উত্তর আফ্রিকাতে রোমান জমিদারি বিস্তৃত হল, তখন সেখানে পশুচারণ ভূমির সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেতে থাকল এবং তাদের গতিবিধি খুব শক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকল। এমনকি স্পেনের উত্তরাঞ্চলও অনুন্নত ছিল এবং সেখানে বেশির ভাগ কেল্টিকভাষী কৃষকদের বসতি ছিল, যারা পাহাড়ের চূড়ার গ্রামগুলোতে থাকত। গ্রামগুলোকে কেস্টাল বলা হত। যখন আমরা রোমান সাম্রাজ্যের কথা ভাবি, তখন আমরা অবশ্যই এই পার্থক্যগুলোর কথা ভুলব না। আমরা যাতে এটা মনে না করি যে, প্রাচীন বিশ্বের কারণে ওই সময়ের লোকদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন অনগ্রসর বা আদিম ছিল—এই বিষয়ে আমাদেরও সতর্ক থাকা উচিৎ। অপরদিকে, ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে জলশক্তির নানা রকম ব্যবহার করা হত। এই সময়ে জলশক্তির দ্বারা কল চালানোর প্রযুক্তিতে ভালো উন্নতি হয়েছিল। স্পেনে সোনা-রূপার খনি জলশক্তির দ্বারা খনন করা হত এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে এইসব খনি থেকে বিপুল পরিমানে খনিজ নিষ্কাশন করা হয় (উৎপাদন হার ওই সময়ে এত বেশি ছিল যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১,৭০০ বৎসর পরও এমন উৎপাদন হার দেখা যায় নি)। ওই সময়ের সুগঠিত বাণিজ্যিক এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও বিপুল পরিমাণে অর্থের ব্যাপক বিনিয়োগ, এটা নির্দেশ করে যে, আমরা রোমের পরিশীলিত অর্থনীতিকে কতটুকু অবমূল্যায়ন করে এসেছি। এটা শ্রম এবং দাসত্ব প্রথার প্রায়োগিক সমস্যার কথা নির্দেশ করে।

কার্যাবলি-৩

প্রত্নতত্ত্ববিদ, কারা মাটির পাত্রের ভগ্নাবশেষ নিয়ে গোয়ান্দাদের মত অনুসন্ধান করেছিলেন? তুমি কী ব্যাখ্যা করতে পারবে কেন? রোমান যুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে দানি (amphorae) আমাদেরকে কী বলে?

**ট্রান্সসোম্যানস হল পশু পালকদলের পরিচালক; সারা বৎসর প্রতিনিয়ত চলাচল করতো উচ্চ পাহাড়ী অঞ্চলে এবং নীচু জমিতে অনুসন্ধান করতো তাদের মেষ এবং অন্যান্য পশু পালকদের।*

শ্রমিকদের উপর নিয়ন্ত্রণ (Controlling Workers)

প্রাচীন বিশ্বে ভুমধ্যসাগর এবং নিকট প্রাচ্য উভয় অঞ্চলেই দাসত্ব প্রথার শিকড় গভীর ভাবে প্রোথিত ছিল। এমনকি খ্রিস্টানধর্ম (চতুর্থ শতাব্দীতে) যখন রাষ্ট্রধর্ম রূপে উত্থান হল এবং এর জয় ঘোষণা হল, তখনও এই গোলামি প্রথার বিরুদ্ধে গভীরভাবে কোন প্রতিবাদ জানায়নি। এর মানে এটা নয় যে রোমের অর্থব্যবস্থায় অধিকাংশ শ্রম ক্রীতদাসদের দ্বারা করা হত। ইতালির বিরাট অংশে প্রজাতন্ত্রের সময় এটা সত্যি হতে পারে (আগস্টাসের শাসন কালে ইতালির ৭.৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ৩ মিলিয়ন ক্রীতদাস ছিল); যদিও সমগ্র সাম্রাজ্যে এমন অবস্থা ছিল না। ক্রীতদাস বিনিয়োগ করা হত। কমপক্ষে একজন রোমানীয় কৃষি-লেখক জমিদারদের এই প্রসঙ্গে ক্রীতদাসদের ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যেহেতু তাদের অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল (যেমন ফসল কাটার জন্য) অথবা যেখানে তাদের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় (যেমন ম্যালেরিয়ার মতো রোগের দ্বারা) সেখানে। এরকম বিবেচনা দাসদের প্রতি সহানুভূতি নয় বরং কঠোর অর্থনৈতিক হিসাব নিকাশ। অন্যদিকে, যেখানে উচ্চশ্রেণির রোমানরা তাদের ক্রীতদাসদের উপর নিষ্ঠুর ছিল, সেখানে সাধারণ মানুষেরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। নীরোর শাসনকালে এক বিখ্যাত ঘটনা সম্পর্কে এক ঐতিহাসিক কী বলে দেখা যাক।

> **দাসদের প্রতি আচরণ**
>
> "কিছুদিন পর শহরের শাসক লুসিয়স পেডেনিয়স সেকন্ডাসকে তাঁর এক দাস হত্যা করে ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের পর, প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রতিটি দাসকে একই ছাদের নিচে রেখে ফাঁসিতে ঝুলানো হত। সেখানে ভিড় জমতো বহু নির্দোষ দাসকে বাঁচানোর জন্য এবং দাঙ্গা শুরু হত। এমন কি সেনেট হাউসও ঘেরাও করা হত। আর ভিতরে অত্যধিক নির্দয়তা চলত। কিন্তু অধিকাংশই যে কোন প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তনের বিরোধীতা করত। (সেনেট সভার সভ্যরা) ফাঁসি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। সে যাই হোক, প্রচুর জনতা পাথর এবং মশাল নিয়ে তৈরি থাকত ফাঁসির আদেশকে রদ করার জন্য। ফরমান জারি করে সম্রাট নীরো জনতার ভিড়কে তাড়িয়ে ছিল এবং সমগ্র রাস্তায় সেনা মোতায়েন করে যারা অপরাধী ছিল তাদেরকে ফাঁসির জন্য ধরা হয়েছিল।"
>
> — টেসিটাস (৫৫-১১৭) -প্রাচীন সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক।

যখন প্রথম শতাব্দীতে শান্তি স্থাপিত হওয়ার সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ কমে গিয়েছিল, তখন ক্রীতদাসদের সরবরাহের ধারারও পতন হচ্ছিল এবং দাসশ্রম ব্যবহারকারীদের দাস-প্রজনন অথবা বেতনভোগী শ্রমিকদের মতো সস্তা বিকল্পের সাহায্য নিতে হয়েছিল। বাস্তবে রোমের সরকারী নির্মাণ কাজে স্বাধীন শ্রমিকদের ব্যবহার করা হত কারণ দাসশ্রমিকদের বেশি মাত্রায় নিয়োগ ব্যয়বহুল ছিল। ভাড়াটে শ্রমিকদের সাথে দাস শ্রমিকদের সারা বছর রাখার জন্য খাবার এবং তাদের অন্যান্য খরচ দিতে হত, যার কারণে এই দাস শ্রমিকদের রাখতে গিয়ে পরিবারিক ব্যয় বেড়ে যেত। হয়তো এই জন্যই পরবর্তী সময়ে কৃষি ক্ষেত্রগুলোতে বেশি সংখ্যক দাস ছিল না। অন্তত পূর্ব প্রদেশের ক্ষেত্রে এমনই ঘটেছিল। অন্যদিকে এইসব দাস এবং স্বাধীন শ্রমিকদের তাদের মালিকেরা তাদের মুক্ত করে দিয়েছিল। তাদের ব্যবসা-পরিচালকের কাজে ব্যাপক হারে নিযুক্ত করা হত, যেখানে মূলত তাদের অধিক সংখ্যায় নিযুক্তির কোনো প্রয়োজন ছিল না। মালিকরা প্রায়ই নিজের পক্ষ থেকে দাস বা স্বাধীন শ্রমিকদের ব্যবসা চালানোর জন্য পুঁজি এবং এমনকি নিজেদের দাসও লগ্নি করতো।

*মহিলা ক্রীতদাসীদের উৎসাহিত করা হত তাদের সঙ্গীদের সাথে থেকে বেশি সন্তান উৎপাদন করতে। যারা পরবর্তীকালে অবশ্যই ক্রীতদাসে পরিণত হবে।

বিপরীত পাতায়: তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে (চারচিল-এ মোজাইক), এবং আলজিরিয়ার কৃষিকাজের দৃশ্য।

উপরে : হলকর্ষণ এবং বীজ বপন।

নিচে : আঙ্গুর ক্ষেতের মধ্যে কাজ।

রোমান কৃষি বিষয়ক লেখকেরা শ্রম পরিচালনার উপর অনেক নজর দিয়েছিলেন। দক্ষিণ স্পেন থেকে আগত প্রথম শতাব্দীর লেখক কোলুমেল্লা (Columella), জমিদারদের নিজের প্রয়োজন থেকে দ্বিগুণ মাত্রায় যন্ত্রাদির সুরক্ষিত ভাণ্ডারের সুপারিশ করেছিলেন যাতে উৎপাদন ব্যবস্থা অনবরত চলতে থাকে। কারণ দাসদের শ্রমের সময় যে ক্ষতি হয়েছিল, তা এসব জিনিসগুলোর মূল্যবৃদ্ধি করেছিল। নিযুক্তকারীদের ধারণা ছিল যে বিনা রক্ষণাবেক্ষণে কোন কাজই সঠিক ভাবে করানো যায় না। এজন্য স্বাধীন শ্রমিক এবং দাসদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণ ছিল অন্যতম। রক্ষণাবেক্ষণকে সহজ করার জন্য শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে দল বা ছোটো গোষ্ঠী তৈরি করত। কোলমুল্লা দশ জনের ক্ষুদ্র দলের সুপারিশ করেছিলেন এবং দাবি

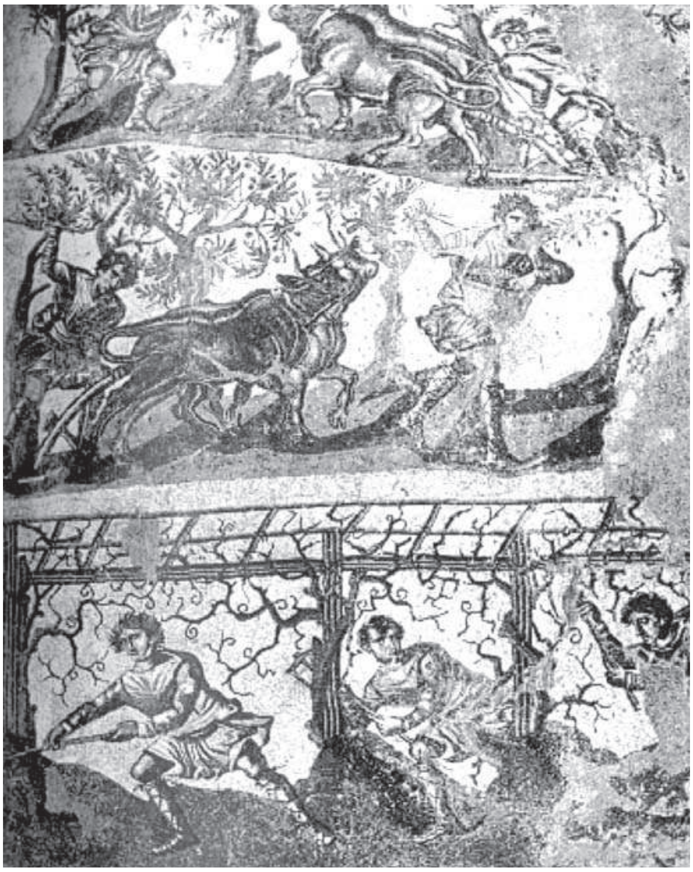

করেছিল যে এর দ্বারা এটা মূল্যায়ন করা সহজ হবে যে তাদের মধ্যে কে কাজ করছে আর কে কাজ করছে না। এর দ্বারা জানা যায় যে ওই সময়ে শ্রম পরিচালনার উপর বিস্তারিত ভাবে বিবেচনা করা হত। বিখ্যাত 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' এর লেখক প্লিনি দাস শ্রেণিদের এই পদ্ধতিকে উৎপাদনের সবচেয়ে খারাপ পদ্ধতি বলে নিন্দা করেন। কারণ যে সব দাসেরা ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করত, তাদের সাধারণত পায়ে শেকল বেঁধে একসাথে রাখা হত।

এমন ক্রিয়াকলাপগুলো অনেক কঠোর ছিল। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে আজকের বিশ্বের অধিকাংশ কারখানা শ্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুরূপ নীতিকেই জোরদার করছে। প্রকৃতপক্ষে রোমান সাম্রাজ্যের কিছু শিল্পসংস্থা কেন্দ্র থেকেও বেশি শক্ত নীতিকে জোরদার করে। প্লিনি আলেকজান্দ্রিয়ার একটি সুগন্ধি রজন কারখানার অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন যেখানে তিনি বলেন যে পর্যাপ্ত পরিমাণে কোনো রক্ষণাবেক্ষন হয়নি। শ্রমিকদের জামার বহিরাবরণে একটি সীলমোহর লাগিয়ে দেওয়া হত। তাদের মাথায় আবদ্ধ জালের মুখোশ বা নেট পরতে হতো এবং কারখানা থেকে বাইরে বেরোনোর জন্য তাদের সব কাপড় খুলতে হত। কৃষি শ্রমিকরা অবশ্যই অবসাদগ্রস্ত হত এবং অপছন্দ করত। কারণ তৃতীয় শতাব্দীর এক বিখ্যাত অনুশাসনে মিশরের কৃষকদের নিজেদের গ্রাম ছেড়ে দেওয়ার উল্লেখ আছে, যাতে করে তাদের আর কৃষিকাজে চুক্তিবদ্ধ না হতে হয়। সম্ভবত তা একই রকম সত্যি ছিল কারখানা এবং কর্মশালাগুলোর ক্ষেত্রে। ৩৯৮ খ্রিস্টাব্দের একটি আইনে বলা হয়েছিল যে, শ্রমিকদের চিহ্নিত করা হত যদি তারা পালিয়ে যাবার বা লুকানোর চেষ্টা করে তাহলে তাদের চেনা যাবে। অনেক বেসরকারি মালিক শ্রমিকদের সাথে ঋণের চুক্তি করত যাতে তারা এটা দাবি করতে পারে যে, তাদের কর্মচারীরা তাদের কাছে ঋণী এবং এইভাবে মালিকরা নিজেদের শ্রমিকদের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকের এক লেখক আমাদের বলেন, "হাজার হাজার শ্রমিক নিজেদের ক্রীতদাস হিসাবে আত্মসমর্পণ করে, দাস ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার পরও"। অন্যভাবে বলা যায় যে, অনেক দরিদ্র পরিবার শুধু বেঁচে থাকার জন্য ঋণবন্ধতা স্বীকার করে নিয়েছিল। আগস্টিনের সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত একটি চিঠিতে আমরা জানতে পারি যে, অনেক সময় বাবা-মা তাদের সন্তানদের ক্রীতদাসত্ব করার জন্য পঁচিশ (২৫) বছরের জন্য বিক্রি করে দিত। আগস্টিন একবার তাঁর উকিল বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিল যে বাবার মৃত্যুর পর ওই শিশুরা স্বাধীন বা মুক্ত হত কিনা। গ্রামীণ বাধ্যবাধকতা আরো ব্যাপক ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইহুদি বিদ্রোহে বিপ্লবীরা জনসমর্থনের জন্য সাউকারদের ঋণপত্র নষ্ট করে দিয়েছিল।

আবার, আমাদের সতর্ক থাকা উচিৎ আর এই সিদ্ধান্তে আসা উচিৎ নয় যে অধিকাংশ শ্রমিকদের

*ড্রাকোনিয়ান (Draconian) : কঠোর আইন (কঠোর আইন বলা হয় কারণ খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে গ্রিক আইন প্রস্তুতকারীকে বলা হত ডারকো (Darco), যে অধিকাংশ অপরাধীদের যথাবিহিত শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড দিত।)

** ফ্রাঙ্কিনসেন্স (Frankincense) : গুগগুল এটি ইউরোপীয় নাম যেটি সুগন্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি ধূপ, আগরবাতি এবং সৌরভযুক্ত রজন তৈরিতে ব্যবহার হত। এটি নেওয়া হয় বোসেলিয়া (Boswellia) গাছের ছাল নির্গত রস থেকে ভাল গুণসম্পন্ন গুগগুল (সুগন্ধি) আসতো আরব দেশের উপদ্বীপ থেকে।

* রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যিহুদিয়া (Judaea) বিদ্রোহ : যেটি দমন করতে রোমানরা নিষ্ঠুর দমননীতি গ্রহণ করেছিল, যাকে ইহুদি (Jewish) বিদ্রোহ বলা হয়।

এভাবে নিগৃহীত করা হত। পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে সম্রাট এনস্টেসিয়াস বেশি মজুরি দিয়ে এবং পূর্ব সীমান্ত থেকে শ্রমিকদের নিযুক্ত করে তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে পূর্বসীমান্তে দারা (Dara) শহরের নির্মাণ করেছিলেন। কিছু পাপাইরিদের থেকে এটা অনুমান করা যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিশেষত পূর্বাঞ্চলে বেতনভোগী শ্রমিক সংখ্যা কত ব্যাপক ছিল।

সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস (Social Hierarchies)

কার্যাবলি-৪

এই পাঠে তিনজন লেখকের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের লেখাতে রোমানরা কীভাবে শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যবহার করত সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে। তুমি কি তাদের সনাক্ত করতে পারবে? তুমি এই অধ্যায়টি পুনরায় পড়ে যে কোনো দুইটি পদ্ধতি বর্ণনা করো যা রোমানরা শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনুসরণ করত।

এখন বিশদ আলোচনা থেকে সরে গিয়ে সাম্রাজ্যের সামাজিক গঠন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। ঐতিহাসিক টেসিটাস প্রারম্ভিক সাম্রাজ্যের মুখ্য সামাজিক শ্রেণির বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন-সেনেটরস্ (প্যাটরিস্ বা পিতা), অশ্বারোহীবর্গের মুখ্য সদস্য , জনতার সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ, যাদের বনেদী পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিল, অমার্জিত নিম্নশ্রেণি (প্লেব্স ডিডা), এনার মতানুসারে যারা নাট্যাভিনয় ও যাত্রায় আসক্ত ছিল তারা এবং শেষে ক্রীতদাসরা। তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০০০ ছিল এবং পুরো সভার প্রায় অর্ধকেরও বেশি সংখ্যার সদস্য ছিল ইতালীয় পরিবারের। সাম্রাজ্যের পরবর্তী সময়ে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রথম কন্‌স্টেন্‌টাইনের শাসন কাল থেকে যেটা শুরু হয়েছিল, টেসিটাস দ্বারা উল্লিখিত প্রথম দুই শ্রেণি (সেনেটর এবং নাইট বা অশ্বারোহী) একত্রিত হয়ে অভিজাত শ্রেণিকে সম্প্রসারিত করেছিল এবং তাদের সম্পূর্ণ পরিবারের প্রায় অর্ধেক পরিবার ছিল আফ্রিকান যা প্রাচ্যে (পূর্বে) উৎপত্তি। এই পরবর্তী রোমান অভিজাতবর্গ প্রচুর ধনবান ছিল। কিন্তু অনেক দিক দিয়ে এরা মূল সৈনিক থেকে কম শক্তিশালী ছিল, যাদের অধিকাংশই ছিল অসম্ভ্রান্ত (non- aristocratic) পরিবারের এমন আমলা শ্রেণি এবং সৈনিকদের সেবা করার জন্য সাধারণ মানুষরা কিন্তু এখানে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ বণিক এবং কৃষকও সামিল হয়েছিল , যাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক পূর্বপ্রান্তে বসবাস করতেন। টেসিটস এই সম্মানীয় মধ্যবর্তী শ্রেণিকে সেনেটদের আশ্রিত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এখন এটা ছিল প্রধানত সরকারি সেবা এবং রাজ্যের উপর নির্ভরতাই এই শ্রেণির লোকদের ভরণ পোষণ বজায় রাখত। এর নিচে ছিল বিশাল নিম্নশ্রেণির লোক, যাদের সাধারণত হিউমিলিওরিস (নিম্ন শ্রেণি)বলা হত। এতে গ্রামীণ শ্রমিকরাও ছিলেন, যেমন- কারখানা এবং খনিতে কাজ করা শ্রমিক, প্রবাসী শ্রমিক যারা সজি এবং জলপাইর ফসল কাটত এবং শিল্প নির্মাণের কাজে অধিকাংশ শ্রম দিতেন। স্বনিয়োজিত শিল্পকার যাদেরকে বলা হত যে মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিকদের থেকে এরা ভালো খাবার পেত। বস্তুত বড় শহরগুলিতে, হাজার হাজার বেগার খাটা ক্রীতদাসদের পুরো পশ্চিম সাম্রাজ্যে খুঁজে পাওয়া যেত।

**নাইটরা (নাইট অথবা অশ্বারোহী) ছিল ঐতিহ্যগত ভাবে দ্বিতীয় শক্তিশালী এবং সম্পদশালী গোষ্ঠী। মূলত তারা ছিল এমন পরিবারের, যারা যোগ্য অধিকারী ছিল অশ্বারোহী বাহিনীকে পরিচালনা করার। যেমন -সেনেটর, অধিকাংশ নাইট, যারা ছিল জমির মালিক কিন্তু বিপরীত দিক থেকে অনেক সেনেটর ছিলেন জাহাজের মালিক, ব্যবসায়ী এবং ব্যাংকের মালিক যারা বাণিজ্যিক কাজ কর্মে নিযুক্ত ছিল।*

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে এক ঐতিহাসিক অলিম্পিওডোরাস্ (যিনি ছিলেন একজন রাজদূত) লিখেছিলেন যে, রোমে অবস্থিত কুলীন পরিবারদের সম্পদ থেকে যে বার্ষিক আয় হত তা ৪,০০০ (চার হাজার) পাউন্ড সোনার সমান, উৎপাদনের ব্যয় করা অংশ গণনার বাইরে ছিল।

পরবর্তী সাম্রাজ্যে প্রথম তিন শতাব্দীতে অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে রূপার মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কারণ স্পেনের রূপার খনির উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছিল। ফলে সরকারের নিকট রূপার মুদ্রা প্রচলনের জন্য পর্যাপ্ত রূপা ছিল না। কনস্টেন্টাইন আর্থিক ভাবে সোনার প্রচলন শুরু করেন এবং পরবর্তী সময়ে

অনেক কাল পর্যন্ত এই মুদ্রার অধিক ব্যবহার ছিল।

পরবর্তী রোমান আমলাতন্ত্রে উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণির লোকেরা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী ছিল। কারণ, তারা তাদের বেতন স্বর্ণের আকারে পেত এবং তাদের প্রাপ্ত বেতনের বেশির ভাগ অংশ দিয়ে জমির মতো প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে রাখত। সাম্র্যাজ্যে ভ্রষ্টাচারও প্রচুর পরিমাণে ছিল, বিশেষ করে ন্যায়তন্ত্র এবং সৈন্য সরবরাহ প্রশাসনে। উচ্চ শ্রেণির আমলারা এবং প্রাদেশিক গভর্নররা তাদের অবৈধ জুলুম ও লোভের জন্য কুখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সরকার এইসব ভ্রষ্টাচারকে বন্ধ করার জন্য প্রতিবার হস্তক্ষেপও করেছিল। এই সম্পর্কেআমরা প্রথম থেকেই জানি কারণ সরকার এগুলো দমন করার জন্য অনেক আইন তৈরি করে। ইতিহাসবিদ এবং বুদ্ধিজীবিরা এই সব ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে জোরদার নিন্দা করেছেন। সমালোচনার এই তত্ত্ব ছিল ক্ল্যাসিকেল বিশ্বের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। রোমান রাজ্যে স্বৈরাচারী শাসন ছিল, অন্যভাবে বলা যায় ভিন্ন পথ পোষণ করাকে কদাচিৎ প্রশ্রয় দেওয়া হত এবং সাধারণত বিরোধিতার উত্তরে সরকার হিংসাত্মক কার্যকলাপ করত (বিশেষত পূর্বাঞ্চলের শহরগুলিতে যেখানে জনতা প্রায়ই নির্ভয়ে সম্রাটদের নিয়ে মজা করত)। তথাপি চতুর্থ শতাব্দীর শুরু হওয়ার সাথে সাথে একটি শক্তিশালী রোমান ঐতিহ্যবাহী আইনের উদ্ভব হয়েছিল এবং এটা এতই ভয়ংকর ছিল যে রোমান সম্রাটরাও এই আইনকে ভয় পেত। সম্রাটদের নিজের ইচ্ছামত যা খুশি করার স্বাধীনতা ছিল না। আইনগুলি মূলত বেসামরিক অধিকারগুলিকে সক্রিয়ভাবে রক্ষা করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। এজন্য চতুর্থ শতাব্দীতে অ্যাম্ব্রোসের মতো শক্তিশালী বিশপরা সম ক্ষমতা সম্পন্ন শক্তিশালী সম্রাটদের মুখোমুখি হতে সক্ষম হয়েছিলেন যখন সম্রাটরা সাধারণ জনতার উপর অত্যাধিক কঠোর ভাবে উৎপীড়ন চালাতেন।

রোমান অভিজাতদের আয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে

রোমের প্রতিটি বড় বাড়িতে তাদের নিজেদের এমন কিছু জিনিস মজুত ছিল যেগুলিকে মাঝারি আকারের শহর বলে মনে হত। একটি ঘোড়া দৌড়ের মাঠ, অনেক মন্দির, ঝর্ণা এবং বিভিন্ন ধরনের স্নানাগার। অনেক রোমান গৃহকর্তারা তাঁদের জমি থেকে প্রতিবছর চারশত পাউন্ড স্বর্ণ আয় করতেন। শস্য, মদ এবং অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্যগুলি যদি যুক্ত না করে বিক্রি করা হত, তাহলে তার মূল্য হতো অর্জিত স্বর্ণের এক তৃতীয়াংশ, রোমের দ্বিতীয় শ্রেণির গৃহকর্তাদের আয় ছিল এক হাজার বা পনেরশো পাউন্ড স্বর্ণ।

— থিব্স-এর অলিম্পিওডারাস।

পরবর্তী প্রাচীনযুগ

রোমান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দিকে আলোকপাত করে আমরা এই অধ্যায় শেষ করব। 'পরবর্তী প্রাচীন যুগ' শব্দটির প্রয়োগ রোমান সাম্রাজ্যের উদ্ভব, বিকাশ এবং পতনের আকর্ষণীয় ইতিহাস বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়। চতুর্থ শতাব্দী রোমে সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক উভয় দিক দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সাংস্কৃতিক স্তরে এই সময়ের লোকেদের ধর্মীয় জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যার মধ্যে একটি ছিল সম্রাট কনস্টেনটাইন কর্তৃক খ্রিস্ট ধর্মকে সরকারি ধর্মে পরিণত করার প্রচেস্টা এবং অপরটি ছিল সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মের উদ্ভব। কিন্তু রাজ্যের গঠনতন্ত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল, যেটা সম্রাট ডায়োক্লিশিয়ানের(২৮৪-৩০৫) সময় থেকে শুরু হয়। সাম্রাজ্যের অতিরিক্ত সম্প্রসারণের কারণে সম্রাট ডায়োক্লিশিয়ানকে আর্থিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। তিনি সাম্রাজ্যের সীমায় দুর্গ বা কেল্লা তৈরি করেছিলেন, প্রান্তের পুনর্গঠন করেছিলেন এবং সামরিক কাজকে অসামরিক কাজ থেকে পৃথক করেছিলেন এবং সেনাপতিদের অধিক স্বায়ত্বশাসনের অধিকার প্রদান

করেছিলেন। যার দ্বারা সৈন্য অধিকারিকরা অধিক শক্তিশালী দলে পরিণত হতেন। কন্স্টেনটাইন কিছু সংখ্যক পরিবর্তনগুলিকে দৃঢ় করেছিলেন এবং নিজের থেকে কিছু যোগ করেছিলেন। তাঁর মুখ্য পরিবর্তন ছিল অর্থিক ক্ষেত্রে তিনি সলিডাস নামে ৪.৫ গ্রামের বিশুদ্ধ সোনা দিয়ে তৈরি একটি স্বর্ণ মুদ্রা তৈরি করেন যেটি রোমান সাম্রাজ্য সমাপ্ত হওয়ার পরও চলেছিল। সলিডি মুদ্রা অনেক বেশি মাত্রায় প্রচলিত ছিল এবং এগুলির প্রচলন লাখ, কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কন্স্টেনটাইনের আরেকটি নতুন আবিষ্কার ছিল কন্স্টেন্টিনোপলে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন (যেখানে এখন তুর্কির ইস্তানবুল আছে, প্রথমে একে বাইজেনটিয়াম বলা হত) এটি তিন দিক দিয়ে সমুদ্র ঘেরা ছিল। যেহেতু নতুন রাজধানীর জন্য নতুন সেনেট প্রয়োজন ছিল, তাই চতুর্থ শতাব্দীতে শাসক শ্রেণির সংখ্যা অনেক তাড়াতাড়ি বিস্তার হয়েছিল। আর্থিক স্থায়িত্ব এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক বিকাশ তাড়াতাড়ি হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক লিপি থেকে জানা যায় যে, গ্রামীণ বিনিয়োগের সাথে যুক্ত হয়েছিল শিল্প কারখানা স্থাপন। যেমন তেলের মিল এবং কাঁচের কারখানা, অভিনব প্রযুক্তি যেমন স্ক্রু, ইস্ত্রি বা ছাপাখানা এবং বিভিন্ন রকম জলের কারখানার মতো প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং প্রাচ্যের (পূর্বের) সাথে অনেক দূরের বাণিজ্য পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছিল।

৩১৩ *খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্টানটিনের বিশাল ভাস্কর্যের অংশ।*

এই সবকিছুর কারণে শহরের সমৃদ্ধি অনেক মজবুত হয়েছিল। যার ফলে স্থাপত্য কলা এবং অতিরঞ্জিত বিলাসিতা নতুন রূপে বিকশিত হয়েছিল। শাসনকার্যে লিপ্ত কুলীনরা আগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সম্পদশালী হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী শতাব্দীতে মিশরে শত শত প্যাপাইরি বেঁচে ছিল এবং এরা তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ সমাজ গড়েছিল যেখানে অর্থ ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়েরা প্রচুর সোনা উপার্জন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ষষ্ঠ শতাব্দীর সময় জাস্টিনিয়ানের শাসনকালে মিশর প্রতি বছর ২.৫ মিলিয়নের বেশি সলিডি (প্রায় ৩৫,০০০ পাউন্ড সোনা) কর দিতেন। নিকটবর্তী পশ্চিমের দেশগুলোর বৃহৎ অংশের গ্রামীণ এলাকাগুলো আজকের বিংশ শতাব্দীর তুলনায় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনেক উন্নত ও জনবসতিযুক্ত ছিল। এই সামাজিক পটভূমির জন্যই এই সময়ে অনেক সাংস্কৃতিক উন্নতি হয়েছিল।

ক্ল্যাসিকেল বিশ্বে ঐতিহ্যগত ধর্মীয় সংস্কৃতিতে-গ্রীক এবং রোমান উভয় দেশই ছিল বহুদেববাদে বিশ্বাসী। তাঁরা নানা রকম ধর্মানুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন, যাদের মধ্যে রোমান দেবতা যেমন বৃহস্পতি, জুনো, মিনের্ভা, মঙ্গল এবং একই ভাবে গ্রীক এবং পূর্বের দেবদেবীদের পূজা করতেন। যার জন্য পুরো সাম্রাজ্যে হাজার হাজার মন্দির, মঠ এবং দেবালয় তৈরি হয়েছিল। বহুবাদিদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট নাম ছিল না। সাম্রাজ্যের আরেকটি ঐতিহ্যগত মহান ধর্ম ছিল সেটি হল ইহুদী ধর্ম। কিন্তু ইহুদী ধর্মও বৈচিত্রহীন ছিল না অর্থাৎ পরবর্তী প্রাচীনকালের ইহুদিধর্মে অনেক বৈচিত্র্য ছিল। এভাবে, চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের 'খ্রিস্টীয়করণ' ক্রমান্বয়ে এবং জটিলভাবে হয়েছিল। বহুদেববাদ বিশেষত পশ্চিমী প্রাপ্ত থেকে রাতারাতি উধাও হয়ে যায়নি, সেখানে খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা প্রচলিত বহুদেববাদী ধার্মিক রীতি-নীতির বিরোধীতা করতেন এবং খ্রিস্টান জনসাধারণদের সাথে বহুদেববাদীদের তুলনা করতেন। চতুর্থ শতাব্দীতে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর সীমানা অনেক বেশি সরল ছিল। এটা ধর্মীয়

যাজকদের ক্রমাগত চেষ্টার ফলে সম্ভব হয়েছিল। শক্তিশালী বিশপ যারা গির্জা চালাতেন, তাঁরা তাঁদের অনুগামীদের কঠোরভাবে ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করার উপদেশ দিতেন।

জনগণের মধ্যে অগ্রগতি প্রধানত পূর্বাঞ্চলে অধিক ছিল, যেখানে জনসংখ্যা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত বেড়েই যাচ্ছিল, যদিও সেখানে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল, যা ৫৪০ খ্রিস্টাব্দে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। অন্যদিকে, পশ্চিমের সাম্রাজ্য রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল কারণ উত্তর থেকে আগত জার্মানগোষ্ঠী (গোথ, ব্যান্ডাল, লোম্বার্ড প্রমুখ) সমস্ত বড় অঞ্চলকে নিজের অধীনে করে নিয়েছিল এবং নিজেদের রাজ্য স্থাপন করেছিল, যাদের রোমানোত্তর বলে বর্ণনা করাই ভালো। এদের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল স্পেনে অবস্থিত বিসিগোথ যেটা আরবদের দ্বারা ৭১১ থেকে ৭২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ধ্বংস হয়েছিল। গলের ফ্রাঙ্ক (৫১১-৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) এবং ইতালীর লোম্বডিয়া (৫৬৮-৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) - এই সব রাজ্য একটা ভিন্ন দুনিয়ার সূচনার পূর্ব সংকেত ছিল, যাকে সাধারণত মধ্যযুগ বলা হত। পূর্বাঞ্চল, যেখানে সাম্রাজ্য ছিল ঐক্যবদ্ধ, সেখানে জাস্টিনিয়ানের শাসনকালে সমৃদ্ধি এবং উচ্চাকাঙ্খার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। জাস্টিনিয়ান আফ্রিকাকে ব্যাণ্ডল থেকে পুনরুদ্ধার করেন (৫৩৩ তে) কিন্তু ইতালিকে (অস্ট্রোগোথস থেকে) পুনরুদ্ধার করে পুনরায় ইতালির উপর অধিকার স্থাপন করে দেশকে ধ্বংস করে দিল এবং লোম্বার্ডদের আক্রমণের জন্য রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে রোম ও ইতালীর মধ্যে আবার যুদ্ধ শুরু হয় এবং সাসানিয়ান যারা তৃতীয় শতাব্দী থেকে ইরানকে শাসন করেছিল, তারা পূর্বাঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে আক্রমণ করেছিল (মিশর সহ), যখন বাইজেন্টিয়াম, রোম সাম্রাজ্য হিসাবে বেশি পরিচিত হতে লাগল,

** Monolith : মোনোলিথ হল সাহিত্যের ভাষায় পাথরের বড় অংশ কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় অন্যান্য বিষয় (উদাহরণ হিসাবে সমাজে বা সংস্কৃতি) যাতে বৈচিত্র্যের অভাব এবং এগুলো সব একই ধরনের।*

** খ্রিস্টানাইজেশন: খ্রিস্টীয়করণের পদ্ধতি হল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রসার এবং প্রভাবশালী ধর্ম হিসাবে পরিণত হয়।

**** Laity : লাইটি - অপেশাদারি লোকসমূহ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাধারণ সদস্যরা পুরোহিত অথবা যাজকদের বিরোধী ছিল, যাদের অবস্থান সম্প্রদায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল।*

৭৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি কলিসীয়াম যেখানে গ্লাডিয়েটর্সর বন্যপশুদের সাথে যুদ্ধ করতেন। এতে ৬০,০০০ লোককে নির্বাসিত করা হয়।

তখন ৬২০ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চল পুনরায় অধিকার করেছিল। এই ঘটনার কয়েক বছর পরই দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল থেকে সবচেয়ে বড় এবং শেষ আঘাত এসেছিল।

আরব থেকে শুরু হওয়া ইসলামের বিস্তারকে প্রাচীন বিশ্ব-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বিপ্লব বলা হয়। ৬৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদের মৃত্যুর ১০ বছর পর, পূর্ব রোমান এবং সাসানিয়ান রাজ্যের বড় একটা অংশ ভীষণ যুদ্ধের পর আরবদের অধীনে চলে গিয়েছিল। যাহোক আমাদের ইসলামিক রাজ্যগুলোর জয় মনে রাখা উচিৎ যেটা (এক শতাব্দী পর) স্পেন, সিন্ধু এবং মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। উদীয়মান ইসলামিক রাজ্য দ্বারা আরব উপজাতিদের পরাজয় হয়েছিল। প্রথমে আরব দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং তারপর সিরিয়া মরুভূমি এবং শেষে ইরাক। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখব আরব উপদ্বীপের ঐক্যবদ্ধতা এবং এর অসংখ্য উপজাতি, ইসলাম ধর্মের আঞ্চলিক সম্প্রসারণের মূল কারণ ছিল।

মানচিত্র-২: *পশ্চিম এশিয়া*

শাসকরা	ঘটনাবলী
২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ—১৪খ্রিস্টাব্দ অগাস্টাস, প্রথম রোমান সম্রাট ১৪—৩৭খ্রিস্টাব্দ টাইবেরিয়াস ৯৮—১১৭ খ্রিস্টাব্দ ট্রারজান ১১৭—৩৮ খ্রিস্টাব্দ হাডরিয়ান ১৯৩—২১১ সেপ্টিমিউস সেভেরাউস ২৪১—৭২ খ্রিস্টাব্দ ইরানে প্রথম শাপুর (Shapur-1) রাজত্বকাল। ২৫৩—৬৮ খ্রিস্টাব্দ গ্যালিনিয়াস ২৮৪—৩০৫ খ্রিস্টাব্দ টেট্রারসি; প্রধান শাসক উইওক্লেতিয়ান। ৩১২—৩৭ খ্রিস্টাব্দ কন্স্টান্টাইন ৩০৯—৭৯ খ্রিস্টাব্দ ইরানে দ্বিতীয় শাপুরের (Shapur-II) রাজত্ব ৪০৮—৫০ খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় থিউডোসিউস (বিখ্যাত থিউডোসিয়ান কোডের সংকলনকারী) ৪৯০—৫১৮ খ্রিস্টাব্দ আনাস্টাসিউস ৫২৭—৬৫ খ্রিস্টাব্দ জাস্টিনিয়ান ৫৩১—৭৯ খ্রিস্টাব্দ ইরানে প্রথম খুসরোর (Khusro-1) শাসন কাল। ৬১০—৪১ খ্রিস্টাব্দ হেরাক্লিয়াস	২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, অক্টাভিয়াম কর্তৃক, 'প্রিন্সিপ্যাট' প্রতিষ্ঠা যিনি নিজেকে 'অগাস্টাস' বলেছেন। ২৪—৭৯ খ্রিস্টাব্দ, এলডার প্লিনির জীবন, ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে মৃত্যু, যে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে রোমান শহর পোম্পী ধ্বংস হয়। ৬৬—৭০ খ্রিস্টাব্দ বিখ্যাত ইহুদি বিদ্রোহ এবং রোমান সেনাবাহিনীর দ্বারা জেরুসালেম দখল। ১১৫ খ্রিস্টাব্দ রোমান সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তার, টারজানের প্রাচ্য বিজয় (পূর্বদিক বিজয়) ২১২ খ্রিস্টাব্দ — সাম্রাজ্যের সব স্বাধীন অধিবাসীদেরকে রোমান নাগরিকে পরিবর্তন। ২২৪ খ্রিস্টাব্দ-ইরানে নতুন রাজবংশের স্থাপন যেটি সাসানিয়ান রাজবংশ নামে পরিচিত, পূর্বপুরুষ সাসানের পর। ২৫০ খ্রিস্টাব্দ -পার্সিয়ানরা রোমান ভূখণ্ড ইউফ্রেটিস এর পশ্চিম দিক আক্রমণ করে। ২৫৮ খ্রিস্টাব্দ - সাইপ্রাসের অধিবাসী বিশপের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর। ২৬০ খ্রিস্টাব্দ - গ্যালিনিয়াস সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন করেন। ২৭৩ খ্রিস্টাব্দ - রোমানদের দ্বারা পালময়রার ক্যারাভান শহর ধ্বংস হয়েছিল। ২৯৭ খ্রিস্টাব্দ ডাইওক্লেতিয়ান ১০০টি প্রদেশের মধ্যে সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন করেন। ৩১০ খ্রিস্টাব্দ কন্স্টান্টাইন কর্তৃক নতুন স্বর্ণ মুদ্রা চালু (সলিডাস) ৩১২ খ্রিস্টাব্দ কন্স্টান্টাইন খ্রিষ্টানধর্মে ধর্মান্তরিত হন। ৩২৪ খ্রিস্টাব্দ কন্স্টান্টাইন সাম্রাজ্যের একমাত্র শাসকে পরিণত হন; কনস্টান্টিনোপল শহর স্থাপন। ৩৫৪—৪৩০ খ্রিস্টাব্দ অগাস্টাস্টিনের জীবন; হিপ্পোর বিশপ। ৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ গোট্স (বর্বরজাতি) হানাদারিদের আক্রমণে আদ্রিনোপনলের রোমান সেনাদের পরাজয়। ৩৯১ খ্রিস্টাব্দ আলেকজেন্দ্রিয়ার সেরাপিয়াম (সেরাপিসের মন্দির) নগর ধ্বংস। ৪১০ খ্রিস্টাব্দ ভিসিগোথস্ দ্বারা রোমের ধ্বংস সাধন। ৪২৮ খ্রিস্টাব্দ ভানডলদের আফ্রিকা দখল। ৪৩৪-৫৩ খ্রিস্টাব্দ এটিলা হুনের সাম্রাজ্য। ৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ ওস্ট্রোগোথস কর্তৃক ইতালীতে রাজধানী স্থাপন। ৫৩৩-৫০ খ্রিস্টাব্দ জাস্টিনিয়ান দ্বারা আফ্রিকা এবং ইতালি পুনরুদ্ধার। ৫৪১-৭০ খ্রিস্টাব্দ গ্রন্থিস্ফীতিসহ প্লেগ এর প্রাদুর্ভাব। ৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ লম্বার্ডি র ইতালি আক্রমণ। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ মহম্মদের জন্ম। ৬১৪-১৯ পার্সিয়ান শাসক দ্বিতীয় খুসরোর রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ আক্রমণ এবং দখল। ৬২২ খ্রিস্টাব্দ মহম্মদ এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের মদিনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ। ৬৩৩-৪২ খ্রিস্টাব্দ প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আরব বিজয়ের; মুসলিম সৈন্যরা সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, ইরাক এবং ইরানের কিছু অংশ দখল করে। ৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ সিরিয়াতে উমাইয়া রাজবংশ। ৬৯৮ খ্রিস্টাব্দ আরবদের ক্যারথাজ দখল। ৭১১ খ্রিস্টাব্দ আরবদের স্পেন জয়।

৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে রেভেন্নাতে মোজাইক শিল্পে সম্রাট জাস্টিনিয়ানকে দেখানো হয়েছে।

অনুশীলনী (Exercises)

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১. যদি তুমি রোমান সাম্রাজ্যে বাস করতে, তাহলে কোথায় তুমি বাস করতে— শহরে না গ্রামাঞ্চলে ? কেন — ব্যাখ্যা করো।

২. এই অধ্যায়ে উল্লিখিত শহর, নগর, নদী, সমুদ্র এবং প্রদেশগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর এবং তারপর এগুলোকে মানচিত্রে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করো। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যে কোনো তিন (৩)টি বিষয় সম্পর্কে কি কিছু তুমি বলতে পারবে ?

৩. কল্পনা করো, তুমি একজন রোমান গৃহিণী এবং গৃহের জন্য প্রয়োজনীয় কেনাকাটার একটা তালিকা তৈরি করো। এই তালিকায় কী কী থাকবে ?

৪. কেন রোমান সরকার রৌপ্য মুদ্রা বন্ধ করে দিয়েছিল ? এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কী ? এবং মুদ্রা তৈরির জন্য কোন্ ধাতু ব্যবহার করা হতো ?

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী উত্তর

৫. সম্রাট ট্রাজান যদি সত্যি সত্যি ভারত জয়ে সফল হত এবং রোমবাসীরা এদেশকে অনেক শতাব্দী ধরে দখল করে রাখত, তাহলে তোমার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ভারত বর্তমান অবস্থা থেকে আলাদা হত ?

৬. অধ্যায়টি মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং রোমান সমাজ ও অর্থব্যবস্থার কিছু মূল বৈশিষ্ট্য বের করো। তোমার দৃষ্টিতে কোন্‌টি পুরোপুরি আধুনিক বলে মনে হয় ?

বিষয়

৪

ইসলামের কেন্দ্রভূমি

THE CENTRAL ISLAMIC LANDS

আজ আমরা যখন একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছি, তখন সারা বিশ্বে ১০০ কোটিরও বেশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর লোক বসবাস করে। তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, তাদের পোশাকও বিভিন্ন রকমের। তাদের মুসলমান হবার পেছনে বিভিন্ন কারণ ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির কারণে তারা ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিল তথাপি মুসলমান সমাজের একটি ইতিহাস আছে, যেখান থেকে আমরা জানতে পারি, প্রায় ১৪০০ বছর আগে আরবীয় উপদ্বীপে এই ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল। আমরা এই অধ্যায়ে ইসলাম ধর্মের উত্থান ও মিশর থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিশাল ক্ষেত্রে এই ধর্মের বিস্তার কীভাবে ঘটল তা আলোচনা করব। ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সব এলাকা ইসলামি সভ্যতার মূল কেন্দ্র ছিল। এই সময়ে ইসলাম সমাজে অনেক প্রকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন দেখা যায়। এখানে শুধু একটি ধর্ম বোঝাতেই ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি। বরং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত সমাজ ও সংস্কৃতি বোঝাতেই ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই সমাজে যা কিছু ঘটছিল এর উদ্ভব শুধু ধর্ম থেকে হয়নি, বরং এমন এক সমাজে এর উদ্ভব হয়েছিল, সেখানে মুসলমান এবং তাদের ধর্মের সামাজিকভাবে প্রাধান্য ছিল। অমুসলিমরা সমাজে গৌণ হলেও সমাজের অভিন্ন অংশ হিসাবেই ছিল, যেভাবে খ্রিস্টান সমাজে ইহুদিরা ছিল।

৬০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামি অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তার ভিত্তি হল ইতিবৃত্ত বা তারিখ (যেখানে সময়ের ক্রম অনুযায়ী ঘটনার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা থাকে) এবং আধা ঐতিহাসিক রচনার উপর নির্ভরশীল, যেমন জীবন চরিত (সিরা) পয়গম্বরের কথা ও কাজের বর্ণনা এবং কোরানের ব্যাখ্যা (তফসির)। যে সব উপাদান থেকে ইতিহাস রচনা হয়েছে, তা ছিল প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রতিবেদনের একটি বৃহৎ সংগ্রহ (আখবার) যা একটি সময়ে মৌখিকভাবে বা কাগজ লিখে প্রচার করা হত। প্রতিটি বিবরণের (খবর) সত্যতা যাচাই করা হত একটি আলোচনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে। এটি সমালোচনামূলক পদ্ধতি, যেখানে বিবরন যিনি পাঠিয়েছেন (ইসনাদ) তার শৃঙ্খলার সন্ধান করে বিবরণ প্রতিস্থাপন করা হত যদিও এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ সঠিক ছিল না, এছাড়া মধ্যযুগের মুসলমান লেখকরা তথ্য নির্বাচন করতে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতেন। সংবাদদাতার অভিপ্রায় বোঝার জন্য বিশ্বের অন্যান্য জায়গার সমসাময়িক লোকদের থেকে বেশি সতর্ক থাকতেন। বিতর্কিত বিষয়ে তারা একই ঘটনার বিভিন্ন সংস্করণ ইতিহাস রচনার উৎস হিসেবে সংগ্রহ করত এবং এই বিষয়ে বিচার করার ভার পাঠকের হাতে ছেড়ে দিত। তাদের নিজেদের সমসাময়িক যুগের ঘটনাবলি বর্ণনা করার সময় তারা আরো বিশ্লেষণাত্বক পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন এবং খবরের কাগজ থেকে তথ্য সংগ্রহ কম করতেন। অধিকাংশ ইসলামি এবং অর্ধ-ইসলামি রচনা

আরবি ভাষায় রচিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাবেরির (মৃত্যু ৯২৩ খ্রি.) লেখা 'তারিখ', যেটা ৩৮টি খণ্ডে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছিল, যদিও পারসিক ভাষায় লিখিত ঘটনাপঞ্জির সংখ্যা কম, কিন্তু এই ভাষাতেই ইরাক এবং মধ্য এশিয়া সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লেখা হয়েছে। সিরিয়া ভাষায় (আরামেইক অঞ্চলের উপভাষা) খ্রিষ্ট ধর্ম সম্পর্কে রচিত বর্ণনা খুবই কম পাওয়া যায়। তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। ইতিবৃত্ত ছাড়াও আইনি বিবরণ, ভূগোল, পর্যটকের বিবরণ এবং সাহিত্যিকদের রচনা যেমন গল্প ও কবিতা থেকেও আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি।

আরামিক হচ্ছে এমন একটি ভাষা যার সাথে হিব্রু এবং আরবী ভাষায় মিল আছে। অশোকের লিপিতে এই ভাষার ব্যবহৃত হয়েছে।

ইতিহাসের বিবরণ হিসেবে দলিল দস্তাবেজ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (অসম্পূর্ণ লিখিত বিবরণ যেমন সরকারি আদেশ বা নিজস্ব পত্রাবলি) কারণ এখানে লেখক চিন্তাভাবনা করে কোনো ঘটনা বা ব্যক্তির বিবরণ দিতে পারে না।

এটা সম্পূর্ণরূপে গ্রিক ও আরবিক পাপারি (যা প্রশাসনিক ইতিহাসের জন্য প্রয়োজনীয়) এবং গেনিজা লিপি থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান (ধবংস প্রাপ্ত প্রাসাদে খনন করা) মুদ্রা সংক্রান্ত (মুদ্রার অধ্যয়ন) এবং লিপি (লিপির পাঠোদ্ধার) ইত্যাদি হচ্ছে অর্থনৈতিক ইতিহাস, কলা ইতিহাস, এবং নাম ও তারিখের জন্য প্রামাণ্য তথ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানি এবং নেদ্যারল্যান্ডের অধ্যাপকদের দ্বারা ইসলামের সঠিক ইতিহাস লেখা শুরু হয়। মধ্যপূর্ব এবং উত্তর আফ্রিকাতে উপনিবেশিকদের স্বার্থে ফরাসি এবং ব্রিটিশ গবেষকদের ইসলামিক ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য উৎসাহিত করা হয়। খ্রিস্টান যাজকরাও ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নে গুরুত্ব দেন এবং কিছু ভাল পুস্তক রচনা করেন, যদিও তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের সাথে খ্রিস্টান ধর্মের তুলনা করা। সে সব পন্ডিতদের প্রাচ্যবিদ বলা হত এবং তারা আরবি ও ফারসি ভাষায় তাদের জ্ঞান এবং মূল গ্রন্থে আলোচনাত্মক বিশ্লেষনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ইগনাজ গোল্ডজিহর (Ignaz Goldziher) যিনি হাঙ্গেরীর একজন ইহুদি ছিলেন, তিনি কায়রোর একটি ইসলামি কলেজে (আল-অজহার) অধ্যয়ন করেন এবং ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে জার্মান ভাষায় পুস্তক রচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর ইসলামীয় ঐতিহাসিকরা প্রধানত প্রাচ্যবিদ্‌দের ইতিহাস লেখার ধারাকে অনুসরন করেছিলেন। তাঁরা নতুন নতুন বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগ অর্ন্তভুক্ত করে ইসলামীয় ইতিহাসের পরিধির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিলেন— যেমন, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ববিদ্যা (anthropology) এবং পরিসংখ্যান বিদ্যা ইত্যাদি। বিষয়গুলো প্রাচ্যবিদ্যার বিভিন্নদিককে সমৃদ্ধ করেছিল। ইসলামের ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকরা তাদের অধ্যয়নের অন্তগর্ত জনগণের প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা প্রকাশ না করে এবং আধুনিক ঐতিহাসিক পদ্ধতি অবলম্বন করে কীভাবে ব্যাখা করা যেতে পারে, তা জানার জন্য ইসলামের ইতিহাস চর্চা হচ্ছে প্রকৃস্ট উদাহরণ।

আরব দেশে ইসলামের উত্থান- ধর্ম বিশ্বাস, সম্প্রদায় এবং রাজনীতি

৬১২ থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম ধর্মগুরু প্রফেট মহম্মদ আল্লার পূজা করতে এবং আস্তিকদের (উম্মা) একটি সম্প্রদায়ের সদস্যপদ নেওয়ার জন্য প্রচার করেন এখান থেকেই ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি। প্রফেট মহম্মদ পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ভাষা ও সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে আরবি ছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবীয় সংস্কৃতি আরবীয় উপদ্বীপ, সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল এবং মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে মূলত সীমিত ছিল।

আরববরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল (qubila) প্রত্যেক গোষ্ঠীর আবার একজন নেতা ছিলেন যিনি কিছুটা তার পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার ব্যক্তিগত সাহসিকতা এবং উদারতার (murawwa) ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজেদের আলাদা দেব-দেবী থাকত, যারা মূর্তি (sunam) রূপে পূজিত হতেন। অনেক আরবীয় গোষ্ঠী যাযাবর ছিল (বেদুইন) যারা তাদের খাদ্যের সন্ধানে (বিশেষত খেজুর) এবং তাদের উটের খাদ্যের সন্ধানে মরুভূমির শুকনো এলাকা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত সবুজ এলাকার (মরূদ্যান) দিকে যেত। কেউ কেউ শহরাঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে এবং ব্যবসা ও কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত হয়। প্রোফেট মহম্মদের নিজের গোষ্ঠী যার নাম ছিল কুরেশ, মক্কায় বসবাস করতেন এবং মক্কার প্রধান ধর্মস্থান নিয়ন্ত্রণ করতেন। কাবা যার আকার ছিল খনকের মত, সেখানে মূর্তি স্থাপিত ছিল। এমনকি মক্কার বাইরে যে সমস্ত গোষ্ঠী বসবাস করত তারাও মক্কাকে পবিত্র স্থান বলে মনে করত, সেখানে তাদের নিজস্ব মূর্তি স্থাপন করত, এবং প্রত্যেক বছর সেখানে তীর্থযাত্রা করত (হজ)। মক্কা ইয়েমেন এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী বাণিজ্যপথে অবস্থিত ছিল, ফলে শহরের গুরুত্ব আরো বেড়ে গিয়েছিল। (মানচিত্র লক্ষ করো)। মক্কা এমন একটি পবিত্র জায়গা ছিল (haram) যেখানে হিংসা নিষিদ্ধ ছিল এবং প্রত্যেক দশনার্থীর সুরক্ষা প্রদান করা হত। তীর্থযাত্রা এবং ব্যবসাবাণিজ্যের ফলে যাযাবর এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারীরা একে অপরের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের মধ্যে আচার ব্যবহারের আদান প্রদান ঘটে। যদিও বহু ঈশ্বরবাদী আরবদের সর্বোচ্চ ঈশ্বর আল্লা সম্পর্কে খুব স্বল্প ধারণা ছিল, (সম্ভবত ওদের মধ্যে ইহুদি এবং খ্রিস্টের প্রভাব ছিল) কিন্তু মূর্তি এবং তীর্থযাত্রীদের সাথে তাদের সংযুক্তি অকপট এবং শক্তিশালী ছিল।

৬১২খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পয়গম্বর মহম্মদ নিজেকে ঈশ্বরের বার্তাবহ বলে ঘোষণা করেন। (rasu) যাকে শুধুমাত্র আল্লাহর উপাসনা করা উচিত বলে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আল্লার উপাসনার রীতিনীতিগুলি খুব সাধারণ ছিল যেমন দৈনিক প্রার্থনা (Salat) নৈতিক তত্ত্ব যেমন দানকার্য করা, চুরি না করা। পয়গম্বর মহম্মদ এমন একটি সম্প্রদায়ের (umma) সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যে সমাজ ধার্মিক বিশ্বাসের মাধ্যমে নিজেরা আবদ্ধ হতে পারে। এই সমাজের লোকেরা ঈশ্বরের সাক্ষ্যপ্রমাণ (shahada) সম্পর্কে নিজেদের যে বিশ্বাস তা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করতেন। পয়গম্বর মহম্মদের বাণী মক্কার এমন লোকদের প্রভাবিত করেছিল, যারা বাণিজ্য এবং ধর্মের সুফল থেকে নিজেদের বঞ্চিত বলে মনে করত। তারা একটি সামাজিক পরিচয় পেতে চাইছিল।

যারা এই ধর্মের অনুশাসন মেনে নিয়েছিল, তাদের মুসলমান বলা হত। তারা মীমাংসার দিনে পরিত্রাণের ভূমিকা নেওয়ার এবং পৃথিবীর সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল। শীঘ্রই মুসলমানদের মক্কার সমৃদ্ধশালী লোকদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যারা তাদের দেব দেবীর প্রত্যাখ্যান করাটা অপরাধ বলে মনে করেছিল এবং যারা নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠা, মক্কার মর্যাদা এবং সমৃদ্ধির পক্ষে বিপদজনক বলে মনে করেছিল। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদকে তার অনুগামীদের নিয়ে মদিনাতে যেতে বাধ্য করা হয়। মহম্মদের মক্কা থেকে এই যাত্রার (hijra) ফলে ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে। যে বছর তিনি মদিনাতে প্রবেশ করেন, সে বছর থেকেই মুসলিম ক্যালেন্ডারের সূচনা হয়।

গোষ্ঠী হচ্ছে এমন একটি সমাজ যা একমাত্র রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে গঠিত হয়। আরবের গোষ্ঠীগুলো তৈরি হয়েছিল জাতি বা বড়ো পরিবারের সমন্বয়ের মাধ্যমে। একটি গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করার জন্য সম্পর্কহীন জাতিরা একসাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। বিশিষ্ট গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় অ-আরবীয় (মাওয়ালি) ব্যক্তিরাও গোষ্ঠীর সদস্য হয়ে ওঠে। তথাপি মাওয়ালিদের আরবীয় মুসলিমদের মতো সমান মর্যাদা দেওয়া হত না যদিও তাদের মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, তবুও তাদের প্রার্থনার জন্য পৃথক মসজিদে যেতে হত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অজয়বুল মাকলুকাত'(Ajaibul Makhluqat) বই থেকে নেওয়া চিত্র যেখানে চিত্রকার মহাদূত জিবরিল (Archangel Gabriel) এর পরিকল্পনা করেন, বলা হত যে জিবরিল মহম্মদের জন্য বার্তা নিয়ে আসে। এটিও বলা হয়, যে শব্দ তিনি প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন তা হল 'ইকরা' (recite) যা থেকে কোরান শব্দটি এসেছে। মনে করা হয় ইসলামিক সৃষ্টি তত্ত্বে ফেরেস্তা হচ্ছে বিশ্বজগতে তিনটি বৌদ্ধিক রূপের মধ্যে একটি । বাকি দুটি হচ্ছে মানব এবং জিন।

ইসলামি ক্যালেন্ডার

ওমরের খিলাপতের সময় থেকেই হিজরি সনের সূচনা হয় যার প্রথম বছরটি ৬২২ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়। হিজরি সনের তারিখ লেখার পর AH লেখা হয়। হিজরি বছর হচ্ছে চন্দ্র বছর যার ৩৫৪ দিন, ২৯ দিন বা ৩০ দিনের ১২টি মাস আছে। (মহরম থেকে ধুল হিজরা পর্যন্ত)। সূর্যাস্তের সময় থেকে প্রত্যেক দিন শুরু হয়। হিজরি সন সৌরবর্ষ থেকে ১১ দিন কম হয়। সুতরাং হিজরির যেকোনো ধর্মীয় উৎসব যেমন রমজানের রোজা, ইদ এবং হজ ঋতুর সাথে মিলিয়ে অনুষ্ঠিত হয় না। হিজরি ক্যালেন্ডারের সাথে গ্রাগোরিয়ান ক্যালেন্ডার (যা ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ গ্র্যাগোরি দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল) মিলানোর কোনো সহজ পদ্ধতি নেই। ইসলামি বছর (H) এবং গ্র্যাগোরিয়ান খ্রিস্টান বছর (C) নিম্নলিখিত সূত্র অনুযায়ী তুলনা করা হয়।

$$H \times ৩২ / ৩৩ + ৬২২ = C$$
$$(C - ৬২২) \times ৩৩ / ৩২ = H$$

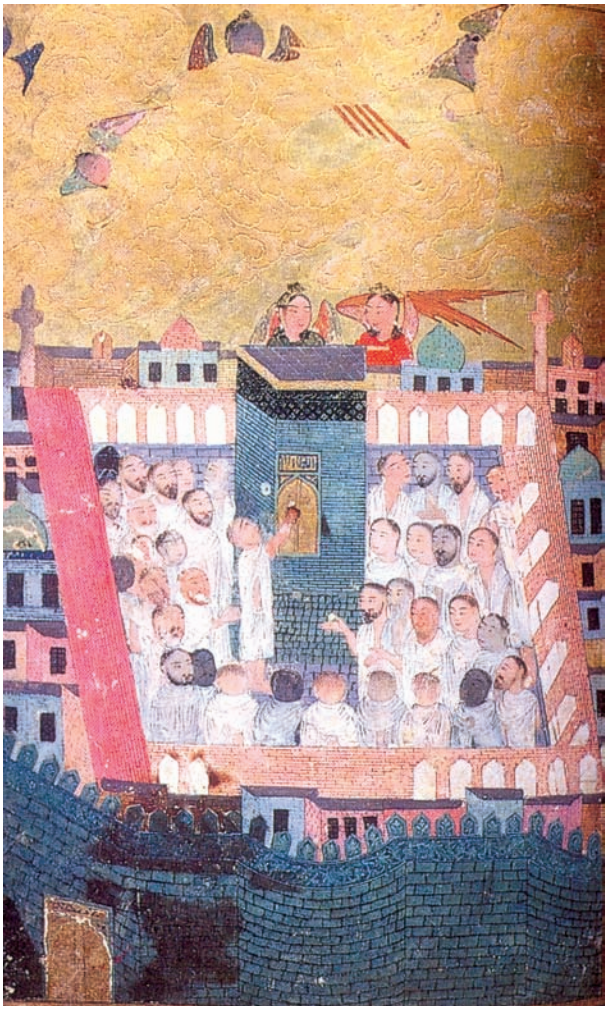

কোনো ধর্মের টিকে থাকা নির্ভর করে ওই ধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার উপর। এই সম্প্রদায়কে ভেতর থেকে শক্তিশালী করা এবং বাহ্যিক বিপদ থেকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। সমন্বয়সাধন ও সুরক্ষার জন্য রাজনৈতিক সংস্থার প্রয়োজন। যেমন রাজ্য এবং সরকার, যেগুলো অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, বা বাইরে থেকে অনুসরণ করা অথবা সম্পূর্ণ নতুন ভাবে তৈরি করা শাসনব্যবস্থা। এই সূত্র অনুসরণ করে পয়গম্বর মহম্মদ মদিনাতে একটি রাজনৈতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন যার মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুসরণকারীদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদান করেন এবং শহরের নাগরিক দ্বন্দ্ব মীমাংসা করেন। মদিনার বহুত্ববাদী ও ইহুদিদের পয়গম্বর মহম্মদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ওস্মাদের একটি বড় সম্প্রদায়কে ধর্মান্তরিত করা হয়। পয়গম্বর মহম্মদ তাঁর অনুগামীদের বিশ্বাস সুদৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান (যেমন উপবাস) ও কিছু নৈতিক সিদ্ধান্ত নেন। মুসলিম সম্প্রদায় কৃষি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে এবং ভিক্ষা (জকাত) করে জীবিকা নির্বাহ করত।

এছাড়া মুসলিমরা মক্কায় ভ্রমণকারী যাত্রীদল এবং কাছাকাছি মরুদ্বীপ অঞ্চলে অভিযান সংঘঠিত করত। ফলস্বরূপ মক্কাবাসী লোকেদের সঙ্গো মদিনার ইহুদিদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়। বিভিন্ন যুদ্ধ সংঘঠিত হলে মক্কা জয়লাভ করে ফলে একজন ধর্মপ্রচারক ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পয়গম্বর মহম্মদের নাম বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি এই সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার জন্য

কাবার তীর্থ যাত্রী, পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফারসি পান্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত চিত্র।

ধর্মান্তরিতকরণের জন্য জোরাজুরি করেন। মরুভূমি অঞ্চলে কঠোর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, আরব জাতীয়তাবাদের একত্রীকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পয়গম্বর মহম্মদের কৃতিত্বে প্রভাবিত হয়ে অনেক সম্প্রদায়, বিশেষত বেদুইনরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মহম্মদের জোট এই ধর্মের প্রচার করতে থাকে ফলে সমগ্র আরবের জনসাধারণ এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়। মদিনা ইসলামি রাজ্যের প্রশাসনিক রাজধানীতে পরিণত হয় এবং মক্কা ধার্মিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। কাবা থেকে সমস্ত মূর্তি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, কারণ মুসলিমদের নামাজ পড়ার জন্য মাজারের প্রয়োজন ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই পয়গম্বর মহম্মদ আরব দেশের একটা বড়ো অংশকে একটি নতুন ধর্ম-সম্প্রদায় এবং রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। তা সত্ত্বেও প্রথমদিকে ইসলামি রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় অনেক দিন পর্যন্ত আরব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় গুলোর সংঘ বজায় ছিল।

খিলাফতের শাসন-বিস্তার, গৃহযুদ্ধ এবং সম্প্রদায় গঠন ঃ-

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে পয়গম্বর মহম্মদ মৃত্যুবরণ করলে, কোন ব্যক্তিই পরবর্তী পয়গম্বর হবার জন্য আইনত দাবি করতে পারেনি। এর ফলে, তার রাজনৈতিক মর্যাদা, উত্তরাধিকার এসব কোন সুনির্দিষ্ট নীতির অভাবে উম্মাদের হস্তান্তরিত করা হয়েছিল। এর ফলে নতুনদের মধ্যে যেমন সুযোগ সৃষ্টি হয়, তেমনি মুসলিমদের মধ্যে গভীর বিভেদের সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন যা হয়েছিল তা হল খিলাফতের সংগঠন তৈরি হয় যেখানে গোষ্ঠীর নেতা(আমির আল-মুমিনিন) পয়গম্বরের প্রতিনিধি হয়ে উঠেন। প্রথম চারজন খলিফা (৬৩২-৬৬১) পয়গম্বের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের ক্ষমতা গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পয়গম্বরের নির্দেশিত নীতি মেনে তাদের কার্য পরিচালনা করেন। খিলাফতের দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমত গোষ্ঠীর উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা যার মাধ্যমে উম্মা গঠিত হয়েছিল, দ্বিতীয়ত রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি করা।

পয়গম্বর মহম্মদের মৃত্যুর পর অনেক গোষ্ঠী ইসলামি রাজ্য ছেড়ে আলাদা হয়ে যায়। কোনো কোনো গোষ্ঠী আবার উম্মার অনুকরণে নতুন ধর্মপ্রচারক সহ নতুন গোষ্ঠীর উত্থাপন করেন। প্রথম খলিফা আবু বকর অনেক অভিযানের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করেন। দ্বিতীয় খলিফা উমর, উম্মার নীতির সম্প্রসারণ করেন। খলিফা জানতেন যে শুধু ব্যবসা বাণিজ্য ও শুল্কের স্বল্প আয় থেকে উম্মাদের পরিচালনা করা যাবে না। অভিযাত্রীদের থেকে ছিনতাই করে প্রচুর সম্পদ (ঘনিমা) পাওয়া যেতে পারে এটা বুঝতে পেরে, খলিফা এবং তাঁর সেনাপতিরা তাদের গোষ্ঠীদের নিয়ে পশ্চিমে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য ও পূর্বে সানিয়ান সাম্রাজ্য জয়ের জন্য সমবেত হয়। বাইজেনটাইন এবং সাসনী সাম্রাজ্য যখন তাদের শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল, তখন বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতে এবং আরবে নিজেদের রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক ক্ষমতার স্বার্থে বিপুল সম্পদ নিজেদের অধীনে আনে।

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রাধান্য ছিল এবং সাসানিয়ান সাম্রাজ্য ইরানের প্রাচীন ধর্ম জোরোয়াস্ট্রিয়ানিসম (zoroastrianism) ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করত। আরব অভিযানের সময় ধর্মীয় এবং অভিজাতদের বিদ্রোহের ফলে এই দুই সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। এর ফলে যুদ্ধ এবং সন্ধির মাধ্যমে এই সাম্রাজ্যগুলো আরবের অধীনে নিয়ে আসা সহজ হয়। তিনটি সফল অভিযানের মাধ্যমে (৬৩৭-৬৮২ খ্রিস্টাব্দ) আরবরা সিরিয়া, ইরাক, ইরান এবং মিশরকে মদিনার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। সামরিক নীতি, ধর্মীয় উৎসাহ এবং বিরোধীদের দুর্বলতার ফলে আরবরা সফলতা লাভ করেছিল। তৃতীয় খলিফা 'উথমান' মধ্য এশিয়াকে নিজের অধীনে আনার জন্য অভিযান চালায়। পয়গম্বর মহম্মদের মৃত্যুর পর এক দশকের মধ্যে আরব-ইসলামি রাজ্য নিল এবং অক্সাস এর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এই অঞ্চল এখনো পর্যন্ত মুসলিম শাসনের অধীনে রয়েছে।

মানচিত্র ১-ইসলামি অঞ্চল

যুদ্ধে জয়ী অঞ্চলগুলোতে, খলিফারা নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেন, যেখানে গভর্নরদের (আমির) নেতৃত্ব ছিল এবং গোষ্ঠীর নেতা (আশরফ) থাকত। মুসলমানদের দেওয়া রাজস্ব এবং লুঠ এর ভাগ থেকে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা কেন্দ্রীয় রাজকোষে (বেট-আল-মাল) অর্থ প্রাপ্ত হত। খলিফার অধিকাংশ ছিল বেদুইন সৈনিক। তারা মরুভূমির প্রান্তে অবস্থিত শহরে যেমন কুফি এবং বাস্‌রাতে শিবির করে বসবাস করত যাতে তারা নিজেদের প্রাকৃতিক আবাসস্থলের কাছাকাছি এবং খলিফার অনুশাসনে থাকতে পারে। শাসক সম্প্রদায় এবং সৈনিকরা লুঠের সম্পদের ভাগ পেত এবং মাসিক পারিশ্রমিক (আটা) পেত। অমুসলিমদের নিজেদের সম্পত্তি এবং তাদের ধর্মীয় কর্মের জন্য কর (খরাজ এবং জিজিয়া) দিতে হত। ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সংরক্ষিত প্রজা (ধিম্মিস) বলে ঘোষণা করা হয় এবং তাদের নিজেদের সামাজিক কার্যকরার জন্য অধিক পরিমাণে সাহায্য করা হয়।

আরব গোষ্ঠী এই রাজনৈতিক সম্প্রসারণ এবং সমন্বয়সাধন খুব সহজে অর্জন করতে পারেনি। রাস্ট্রের সম্প্রসারণের ফলে, সম্পদের বন্টন নিয়ে মতবিরোধ হয়। যা উম্মার অখন্ডতার জন্য বিপদজ্জনক হয়ে ওঠে। প্রাথমিক ইসলামি রাজ্য শাসনে মক্কার কুরেশ(Quraysh) ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়েছিল। তৃতীয় খলিফা, উথমানও(৬৪৪-৫৬) একজন কুরেশ ছিলেন যিনি অধিক নিয়ন্ত্রণ সুরক্ষিত করার জন্য প্রশাসনে নিজের লোক নিয়োগ করেন। ফলে রাজ্যে মক্কার নিয়ন্ত্রণ আরও সুদৃঢ় হয়। পরিণামস্বরূপ অন্য গোষ্ঠীর সাথে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়। ইরাক ও মিশরের মত মদিনাতে এবার বিরোধিতা শুরু হয় যার

পরিণামে উথমানকে হত্যা করা হয়। উথমানের মৃত্যুর পর, আলি চতুর্থ খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হন।

আলি কর্তৃক (৬৫৬-৬১) মক্কার অভিজাততন্ত্রের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে দুটো যুদ্ধ করার পর মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যের আরও ফাটল দেখা দেয়। আলি নিজেকে কুফায় স্থাপিত করেন এবং মহম্মদের স্ত্রী আয়েশার নেতৃত্বে যে সৈন্যবাহিনী ছিল, তাদের 'উটের যুদ্ধে'(Battle of Camel 657) পরাজিত করেন। কিন্তু তিনি উথমানের আত্মীয় এবং সিরিয়ার গর্ভনর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ চলছিল তা দমন করতে পারেন নি। আলির দ্বিতীয় যুদ্ধ, যেটা সিফিনে সংগঠিত হয়েছিল (উত্তর মেসোপটেমিয়া) তা সন্ধির মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হয়েছিল। ফলে তার অনুগামীরা দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, কেউ কেউ তাঁর অনুগত থেকে যায়, অন্যরা তাঁর সঙ্গ ছেড়ে দেয় এবং খরজি নামে পরিচিত হয়। কিছুদিন পর খরজিরা কুফার এক মসজিদে আলীকে হত্যা করে। আলির মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা আলির পুত্র হুসেন এবং তাঁর বংশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। মুয়াবিয়া নিজেকে পরবর্তী খলিফা বলে ঘোষণা করেন (৬৬১) এবং উমায়াদ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন যা ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

গৃহযুদ্ধের পর মনে হয়েছিল যে আরব আধিপত্য ভেঙে পড়বে। এটাও মনে করা হয়েছিল যে বিজয়ী গোষ্ঠীরা অধীনস্তদের আধুনিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করছে। কুরেশ গোষ্ঠীর এক সমৃদ্ধ বংশ উমায়াদের অধীনে দ্বিতীয় দফায় সমন্বয় সাধন করার কাজ শুরু হয়।

উমায়াদ এবং রাজতন্ত্রের কেন্দ্রীকরণ :

বড়ো বড়ো অঞ্চলগুলো জয়লাভ করায় মদিনাতে স্থাপিত খিলাফত শাসন ধবংস হয়ে যায় এবং সে সব জায়গায় কর্তৃত্ববাদী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উমায়ারা এমন অনেক রাজনৈতিক নীতি প্রয়োগ করেন, যার ফলে উম্মার মধ্যে তাদের নেতৃত্ব সুদৃঢ় হয়। প্রথম উমায়াদ খলিফা মুয়াবিয়া ডামাস্কাসে তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের রাজদরবারী ক্রিয়াকলাপ ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বংশগত উত্তরাধিকার এর সূত্রপাত করেন এবং বিশিষ্ঠ মুসলিমদের মতামত গ্রহন করেন। এই করানে যাতে তার পুত্রকে উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করা হয়। এর পর পরবর্তী খলিফারা ও এই পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেয়, যার ফলে উময়্যদ ৯০ বছর ধরে এবং আব্বাসী দুশো বছর ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিল।

উময়্যদ রাজ্য যখন এক শক্তি শালী সাম্রাজ্যে পরিনত হয়, তখন এটি আর সরাসরি ইসলাম ভিত্তিক রাজ্য থাকল না। বরং রাষ্ট্রের পরিচালন পদ্ধতি এবং সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীর আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে চলছিল। প্রশাসনে খ্রিস্টান উপদেস্টামণ্ডলী ছিল, এছাড়াও ইহুদি লিপিকার ও আমলা ছিল। কিন্তু ইসলাম উমায়াদ শাসনকেই বৈধতা প্রদান করতে থাকে। উমায়াদ সবসময় একতার আহ্বান করে এবং যে কোনো ধরনের বিদ্রোহকে ইসলামের নামে দমন করতে থাকে। তাঁরা নিজেদের আরবি সামাজিক পরিচয় বজায় রাখে। অব্দ অল-মালিক এবং তাঁর উত্তরাধিকারিদের রাজত্বকালে (৬৮৫-৭০৫) আরবি এবং ইসলামি দুই ধরনের পরিচয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। অব্দ অল-মালিক যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তাতে তিনি আরবি ভাষাকে প্রশাসনিক ভাষা হিসেরে স্বীকৃতি দেন এবং ইসলামি মুদ্রায়ও আরবি ভাষা প্রয়োগ করেন। খিলাফতের শাসনকালে সোনার দিনার এবং রূপার দিরহাম চালু ছিল যা রোমান এবং ইরানি মুদ্রার প্রতিলিপি

পাথুরে টিলার উপর অব্দ অল-মালিক দ্বারা নির্মিত পাথুরে গম্বুজ যা ইসলামিক স্থাপত্য শিল্পের প্রথম নিদর্শন। জেরুজালেম নগরের মুসলিম সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে এটি নির্মাণ করা হয়। পয়গম্বর মহম্মদের স্বর্গের দিকে রাত্রি যাত্রার (মিরাজ) স্মারক হিসাবে এটি পরিচিত। এর সাথে এটি একটি রহস্যময় মহত্ব জড়িত আছে।

ছিল (দিনারিয়াজ এবং ড্রাচম) যার মধ্যে ক্রুশ এবং অগ্নিবেদীর চিহ্ন থাকত এবং গ্রিক ও পহ্লবি (ইরানের ভাষা) ভাষায় খোদাই করা হত। এই চিহ্নগুলোকে অপসারিত করে এবং মুদ্রাতে আরবি ভাষা ব্যবহার করা হতে থাকে। অব্দ অল-মালিক জেরুজালেমে পাথরের গম্বুজ তৈরি করে আরব-ইসলামি পরিচয়ের উন্নয়নে মহৎ দৃষ্টান্তমূলক অবদান রেখে গেছেন।

অব্দ অল-মালিক কর্তৃক মুদ্রার সংস্কার সাধন

তিনটি মুদ্রার নমুনার মাধ্যমে এটা জানা যায় যে বাইজেনটাইন মুদ্রা প্রণালী থেকে আরবি ইসলামি প্রণালীতে কীভাবে পরিবর্তন করা হয়। দ্বিতীয় মুদ্রায় দেখানো হচ্ছে লম্বা চুল ও দাড়ি যুক্ত খলিফা আরবি ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করেছে এবং তরবারি ধারণ করেছে।

ওই সময়ে মুসলমানদের যা প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে, এর মধ্যে এটি প্রথম। এটি আরও অনন্য কারণ পরবর্তীকালে কলা এবং শিল্পে প্রাণির প্রতিরূপের প্রতি বিদ্বেষ দেখা যায়। অব্দ অল- মালিক রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করেই মুদ্রার সংস্কার সাধন করেছিলেন। এটি এত সফল প্রমাণিত যে শত শত বছর ধরে নীচে দেখানো তৃতীয় মুদ্রার ওজন ও ছাঁচের মতো শত শত বছর ধরে মুদ্রার প্রচলন ছিল।

বাইজেনটাইনের সোনার সোলিডাস (denarius aureus) যার মধ্যে সম্রাট হেরাক্লিয়াস ও তাঁর দুই পুত্রকে দেখানো হয়েছে।

অব্দ অল-মালিক দ্বারা নিজের নাম ও প্রতিরূপ সহ সোনার দিনার।

পরিবর্তিত দিনার যেখানে শুধুমাত্র লিপি পাওয়া গেছে। এটি কলিমা বহন করে। 'আল্লা ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই এবং আল্লার কোনো অংশীদারও নেই।'

আব্বাসি বিপ্লব

মুসলিম রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয়করণের সফলতার জন্য উমায়াদ বংশের ভারী দাম দিতে হয়েছে। দবা নামে এক সুসংগঠিত আন্দোলন উমায়াদ বংশকে উচ্ছেদ করে। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার আরেকটি পরিবার আব্বাসিরা উমায়াদের স্থলাভিষিক্ত হয়। আব্বাসিরা উমায়াদ শাসনব্যবস্থাকে মন্দ বলে আখ্যায়িত করে এবং পয়গম্বর মহম্মদের মূল ইসলামি মতবাদের পুনস্থাপনা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। এই বিপ্লবের ফলে শুধু যে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন হয়েছে তা নয়, ইসলামের রাজনৈতিক কাঠামো এবং সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন এসেছিল।

আব্বাসিদের বিদ্রোহ খুরাসানের (পূর্ব-ইরান) বহু দূরবর্তী স্থানে শুরু হয়েছিল, যেখানে পৌঁছতে হলে ডামাসকাস থেকে দ্রুত দৌড়ায় এমন ঘোড়া দিয়ে পৌঁছতে ২০ দিন লাগত। খুরাসানে আরবীয়-ইরানীয় মিশ্র জনবসতি ছিল, যাদেব বিভিন্ন কারণে সংহত করা সম্ভব হয়েছিল।

সামারার দ্বিতীয় আব্বাসী রাজধানী অল-মুটব্বকিলের মহান মসজিদ। ৮৫০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করা হয়। এই মিনারটি ৫০ মিটার উঁচু এবং এটি ইটের তৈরি। এটি মেসোপটেমীয় স্থাপত্যকলার ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত। এটি অনেক শতাব্দী ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মসজিদ ছিল।

অধিকাংশ আরব সৈন্যরা ইরাক থেকে এসেছিল এবং সিরিয় নাগরিকদের কর্তৃত্বের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। আরবের সাধারণ নাগরিকরা উমায়াদ শাসনকে পছন্দ করত না। কারণ তারা সাধারণ নাগরিক বিশেষাধিকার এবং কর ছাড়ের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা রক্ষা করেনি। ইরানীয় মুসলিমদের (মাওয়ালি) গোষ্ঠীকে সচেতন আরবিরা ঘৃণার চোখে দেখত, এবং তারা উমায়াদদের উচ্ছেদ করার জন্য যে কোনো অভিযানে শামিল হতে ইচ্ছুক ছিল।

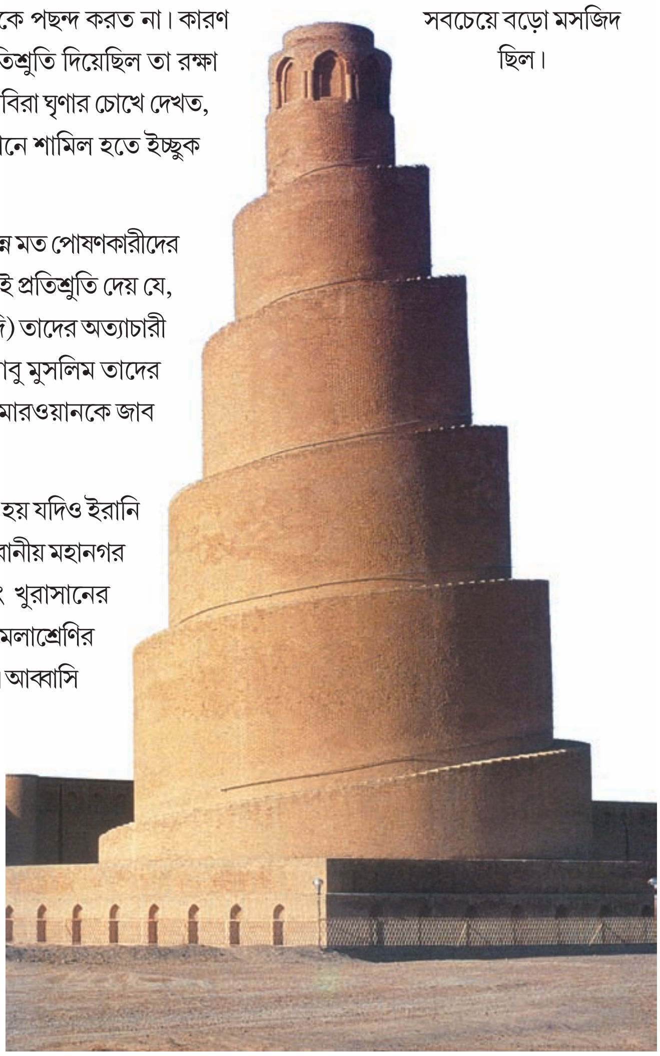

পয়গম্বরের কাকা আব্বাসের বংশধর আব্বাসিরা তাদের ভিন্ন মত পোষণকারীদের সমর্থন আদায় করে নেয়। ক্ষমতার বৈধতা আদায় করার জন্য এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, পয়গম্বরের পরিবারের (আহল অল বয়ত) কোনো মসিহা (মহদি) তাদের অত্যাচারী উমায়াদদের শাসন থেকে মুক্ত করবে। একজন ইরানি ভৃত্য, আবু মুসলিম তাদের সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যিনি শেষ উমায়াদ খলিফা মারওয়ানকে জাব নদীর যুদ্ধে পরাজিত করেন।

আব্বাসি শাসনের অধীনে, আরবিদের প্রভাবের অবনতি হয় যদিও ইরানি সংস্কৃতির মহত্ত্ব বৃদ্ধি পায়। আব্বাসিরা তাদের রাজধানী প্রাচীন ইরানীয় মহানগর টেসিফোনের কাছাকাছি বাগদাদে স্থাপন করে। ইরাক এবং খুরাসানের অপেক্ষাকৃত বেশি ভাগীদার সুনিশ্চিত করার জন্য সেনা এবং আমলাশ্রেণির পুর্ণগঠন করা হয় এবং গোষ্ঠীর ভিত্তিকে এখানে অস্বীকার করা হয়। আব্বাসি শাসকরা খিলাফতের ধার্মিক মর্যাদা এবং কার্যকলাপ শক্তিশালী করে ইসলামি সংস্থা এবং পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু সরকার এবং সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে রাজ্যের কেন্দ্রীয়-স্বরূপ বজায় রাখার জন্য তাদের বাধ্য করা হয়েছিল। তারা উমায়াদদের মহৎ রাজকীয় স্থাপত্য এবং রাজদরবারে ব্যাপক অনুষ্ঠান পরম্পরা গতভাবে প্রতিপালন করতে থাকে। প্রথম দিকে যাদের গর্ব ছিল যে তারা রাজতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে, তারা নিজেরাই আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়।

কার্যাবলি-১

খিলাফতের পরিবর্তিত রাজধানী চিহ্নিত কর। এর মধ্যে কোনটি একেবারে কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত বলে তোমার মনে হয়?

খিলাফতের অবসান এবং সুলতানি শাসনের উত্থান

নবম শতাব্দী থেকে আব্বাসি রাজ্য দুর্বল হতে শুরু করে, কারন দূরবর্তী প্রদেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা বাগদাদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছিল না। এর আরেকটি কারণ হল সেনা এবং আমলাদের মধ্যে আরবীয় সমর্থক এবং ইরাণ সমর্থকদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হয়েছিল। ৮১০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হারুন অল- রশিদের পুত্র আমিন এবং মামুন এর সমর্থকদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ফলে গোষ্ঠীকোন্দল আরও প্রকট আকার ধারণ করে এবং তুর্কি গোলাম অফিসারের (মামলুক) এক নতুন শক্তি-জোট তৈরি করে। শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমরা পুনরায় সুন্নি গোড়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার জন্য লড়াই করে। ফলে অনেক ছোটো ছোটো রাজবংশের উৎপত্তি হয় যেমন খুরাসান এবং ট্রানসোক্সিয়ানাতে(তু রান অথবা অক্সাসের পরে অবস্থিত এলাকা) তাহিরিড এবং সামানিড বংশ এবং মিশর তথা সিরিয়াতে টুলুনি বংশ। শীঘ্রই আব্বাসিদদের প্রতিপত্তি মধ্য ইরাক এবং পশ্চিমি ইরানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে যখন ইরানের কাস্‌পিয়ান সাগর অঞ্চলে (ডেলাম) বুবাহী নামক শিয়া বংশ বাগদাদ দখল করে নিলে ইরানও আব্বাসিদের হাতছাড়া হয়ে যায়। বুবাহী শাসকরা বিভিন্ন উপাধি ধারণ করে, যার মধ্যে একটি ছিল প্রাচীন ইরানীয় পদবি শাহেনশাহ (রাজাদের রাজা)। কিন্তু 'খলিফা' পদবি ধারণ করেন নি। তাঁরা আব্বাসি খলিফাদের তাদের সুন্নি প্রজাদের প্রতীকী নেতা করে রাখেন।

খিলাফতকে বাতিল না করার সিদ্ধান্ত বিচক্ষণতার সাথে নেওয়া হয়েছিল, কারণ ফাতিমিড নামে অন্য একটি শিয়া রাজবংশেরও ইসলামি জগতে শাসন করার উচ্চাকাঙ্খা ছিল। ফাতিমিডরা শিয়া মুসলিমদের একটি গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং তাদের দাবি ছিল যে যেহেতু তারা পয়গম্বরের কন্যা ফতিমার বংশধর, তাই তারাই একমাত্র ইসলামদের শাসক হবার অধিকারী। উত্তর আফ্রিকার মূল ঘাঁটি থেকে তারা ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মিশর জয় করে এবং ফাতিমিড খিলাফতের প্রতিষ্ঠা করেণ। মিশরের প্রাচীন রাজধানী ফুসতাত এর বদলে এক নতুন শহর কাহিরাতে (কায়রো) রাজধানী স্থানান্তরিত করে যা মঙ্গলগ্রহের উত্থানের দিন হয়েছিল। (মিরিখ, যাকে অল-কাহিরও বলা হয়) দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশই শিয়া সম্প্রদায়ের প্রশাসক, কবি এবং বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষকতা করেণ।

৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইসলামি সমাজ কোনো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা অথবা কোন সংস্কৃতির একটি ভাষার (আরবি) জন্য নয়, বরং সাধারণ আর্থিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শে একজোট ছিল। রাজনৈতিক বিভাজন থাকা সত্ত্বেও, একতা বজায় রাখার জন্য রাজ্য ও সমাজকে আলাদা করে দেখা হয় এবং ইসলামি উচ্চ সংস্কৃতির ভাষারূপে ফরাসি ভাষার বিকাশ সাধন করা হয়।

বিদ্বান, শিল্পী, এবং ব্যবসায়ীরা কেন্দ্রীয় ইসলামি সমাজে মুক্তভাবে ঘোরাফেরা এবং যাতায়াত করত এবং বিশ্বাস এবং আচরণের প্রসার সুনিশ্চিত করত। এদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মান্তরিত করণের ফলে গ্রাম্যস্তরে নিচে পড়ে গিয়েছিল। উমায়াদ এবং প্রথমদিকের আব্বাসি আমলে মুসলমানদের সংখ্যা ১০ শতাংশ কম ছিল তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। অন্য ধর্ম থেকে পৃথক ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক পদ্ধতিরূপে ইসলামের পরিচয় অধিক স্পষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে সার্থকভাবে ধর্মান্তরিতকরণ করা সম্ভব হয়।

দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে তুর্কি সুলতানের উত্থানের পরে আরবীয় এবং ইরানীয়দের সাথে তৃতীয়

এক জাতিগোষ্ঠীও যুক্ত হয়। তুর্কিরা ছিল মধ্য এশিয়ার প্রান্তরে (ঘাসের ময়দান) অবস্থিত তুর্কিস্তানের (অরল সাগরের উত্তর-পূর্বে চিনের সীমান্ত পর্যন্ত) যাযাবর গোষ্ঠীর মানুষ যারা ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্মকে গ্রহন করে (৫নং বিষয় দেখো)। তারা দক্ষ অশ্বারোহী এবং যোদ্ধা ছিল এবং তারা দাস এবং যোদ্ধা হিসেবে আব্বাসি, সামানি ও বুবাহি প্রশাসনে প্রবিষ্ঠ হয়ে যায় এবং নিজেদের বিশ্বস্ততা এবং সামরিক ক্ষমতার জন্য উচ্চপদে আসীন হতে পেরেছিল। ৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আলপ্তগিন দ্বারা গজনি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং গজনির মামুদ (৯৯৮-১০৩০) এই সাম্রাজ্যকে মজবুত করেন। বুবাহিদের মতো, গজনিরাও একটি সৈনিক-বংশ ছিল, যাদের কাছে তুর্কি এবং ভারতীয়দের মত পেশাদারী সৈনিক ছিল(মামুদের একজন ভারতীয় সেনাপতি ছিল যার নাম ছিল তিলক)। কিন্তু তাদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল খুরাসান এবং আফগানিস্তান। আব্বাসি খলিফারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না বরং তাদের বৈধতা প্রাপ্তির উৎস ছিল। মমুদ এই ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন যে তিনি এক দাসের সন্তান এবং খলিফা থেকে সুলতানের উপাধি পাওয়ার জন্য প্রচন্ড ইচ্ছুক ছিলেন। খলিফা শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সুন্নি গজনভিকে সমর্থন দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

সলজুক তুর্কিরা সামানিড এবং কারাখানির (সুদূর পূর্বের অ-মুসলিম তুর্কি) সৈন্যবাহিনীর সৈন্য হিসাবে তুরানে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে তাঁরা নিজেদের দুইভাই, তুগরিল এবং চাঘরি বেগের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। গজনির মমুদের মৃত্যুর পর অব্যবস্থার সৃষ্টি হলে এর সুযোগ গ্রহণ করে, সলজুকরা ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে খুরাসান দখল করে এবং নিশাপুরে তাদের প্রথম রাজধানী স্থাপন করে। সলজুকরা এরপর পশ্চিম পারস্য এবং ইরাকের (যেখানে বুবাহিদের সাম্রাজ্য ছিল) দিকে নজর দেয় এবং ১০৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে পুনরায় সুন্নিদের শাসন প্রবর্তন করেন। খলিফা অল-কায়েম তুগরিল বেগকে সুলতানের উপাধি প্রদান করেন। যার ফলে ধর্মীয় সত্ত্বা রাজনৈতিক সত্ত্বা থেকে আলাদা হয়। সলজুক ভ্রাতৃদ্বয় পারিবারিক শাসন চালানোর গোষ্ঠীর ধারণা অনুযায়ী একসাথে মিলে শাসনকার্য পরিচালনা করত। তাঁর ভাইপো আল্‌প্ অরসলনের উত্তরাধিকারী হল (১০৬৪ খ্রিঃ)। আল্‌প্ অরসলনের শাসনকালে সলজুক সাম্রাজ্য অনাতোলিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

ফরাসী-ইসলামী শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং ওমর খ্যায়ামের জন্মস্থান।

একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় খ্রিস্টান ও আরবদেশের মধ্যে বহু ঝগড়া-বিবাদ হয়। এসব নিচে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম জগৎ একটি বড়ো দুর্যোগের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। এটা মোঙ্গলদের থেকে আসা বিপদের সংকেত ছিল। এটা স্থায়ী সভ্যতার উপর যাযাবরদের দ্বারা শেষ সর্বনাশা আক্রমণ ছিল।

ধর্মযুদ্ধ

মধ্যযুগের ইসলামি সমাজে, খ্রিস্টানদের গ্রন্থের মানুষ (অহল অল-কিতাব) মনে করা হত, কারণ তাদের কাছে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ (দি নিউ টেস্টামেন্ট অথবা ইনঞ্জিল) ছিল। ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রী, রাষ্ট্রদূত এবং পর্যটক হিসেবে মুসলিম রাজ্যে আগত খ্রিস্টানদের সুরক্ষা প্রদান করা হত। এর মধ্যে এসব অঞ্চলও ছিল যেগুলো একসময় বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বিশেষ করে প্যালেস্টাইনের পবিত্র ভূমি উল্লেখযোগ্য। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরবরা জেরুজালেম জয় করে, কিন্তু এটি প্রভু যিশুর ক্রুশারোহণ পুনরুজ্জীবনের স্থান হিসেবে খিস্টানদের কল্পনায় সদা উপস্থিত ছিল। খ্রিস্টান ইউরোপে মুসলিম জগতের ভাবমূর্তি তৈরি করার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

আলেপ্পো, এক হিট্টাইট, আসিরিয়ান এবং হেলেনিক স্থল। আরবরা ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে এই স্থান দখল করে। পরবর্তী ১০০০ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলতে থাকে। চিত্রে যুদ্ধরত ধর্মযোদ্ধাদের দেখো— নসুহ অল মটকরকি যাত্রা বৃত্তান্ত ১৫৩৪-৩৬ খ্রিস্টাব্দ।

মুসলিম জগতের প্রতি শত্রুতা একাদশ শতাব্দীতে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। নর্মান, হাঙ্গোরিয়ান এবং স্লাভ জাতির কিছু লোককে খ্রিস্টান ধর্মে রূপান্তরিত করা হয় এবং কেবল মুসলমানরাই প্রধান শত্রু হিসেবে রয়ে যায়। একাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমি ইউরোপের সামাজিক ও আর্থিক সংগঠনেও পরিবর্তন হয় যা খ্রিস্টান জগত এবং মুসলিম জগতের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছিল। পাদ্রি এবং যোদ্ধা শ্রেণি (প্রথম দুই শ্রেণি দেখো – বিষয় ৬) রাজনৈতিক স্থিরতার পাশাপাশি কৃষি এবং ব্যবসাবাণিজ্যের উপর ভিত্তি করে আর্থিক উন্নতি সুনিশ্চিত করার প্রচেস্টা করে। প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্ত শাসকদের মধ্যে সামরিক ঘাটিগুলোর লুণ্ঠনের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনকে ঈশ্বরীয় শান্তি (peace of God) আন্দোলনের মাধ্যমে গঠন করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে, পূজাস্থলের সামনে চার্চের ক্যালেন্ডারে পবিত্র বলে বিবেচিত স্থান সমূহ এবং নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী যেমন পাদ্রি এবং সাধারণ জনতার বিরুদ্ধে সকল প্রকার সামরিক হিংসা বর্জন করা হয়েছিল। ঈশ্বরীয় শান্তি আন্দোলন সামন্তান্ত্রিক সমাজের আক্রমণকারী প্রবৃত্তিকে খ্রিস্টান জগৎ থেকে সরিয়ে 'ঈশ্বরের শত্রুদের' দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এর ফলে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যার ফলে অবিশ্বাসীদের (বিধর্মী) বিরুদ্ধে লড়াই শুধু অনুমোদনযোগ্যই নয়, প্রশংসনীয়ও হয়ে ওঠে।

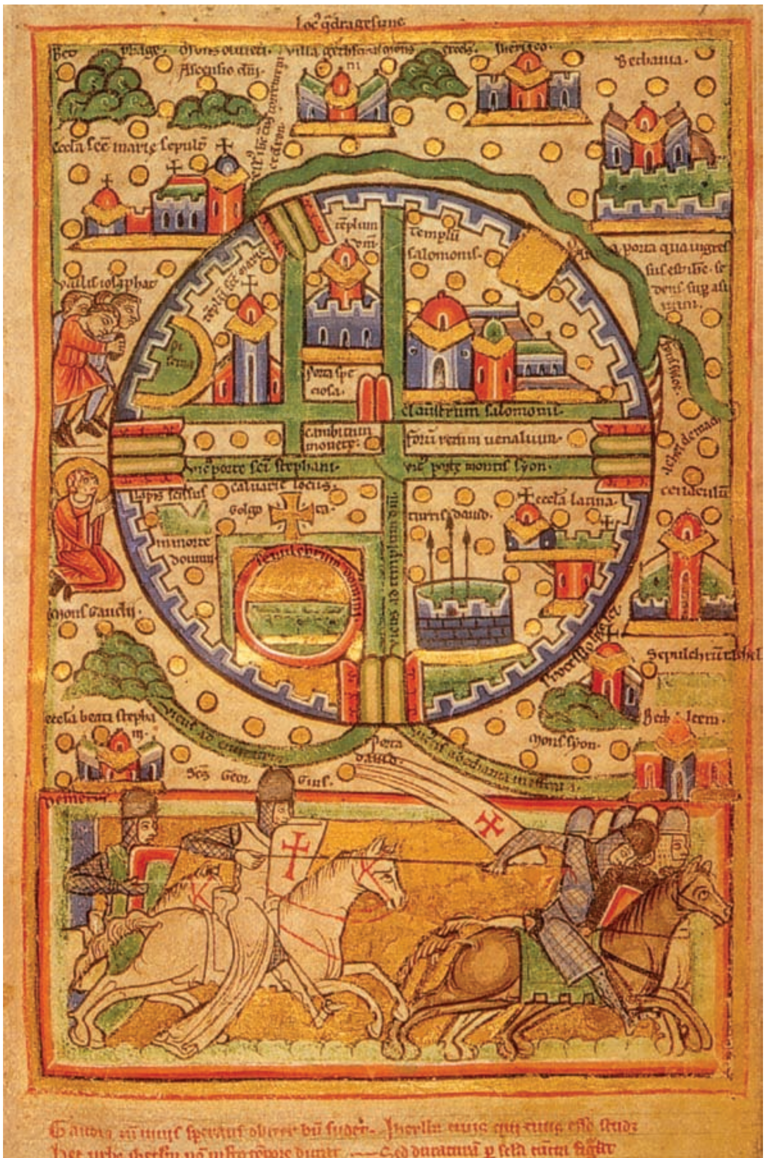

১০৯২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সলজুক সুলতান মালিক শাহ এর মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের বিভাজন ঘটে। এর ফলে বাইজেনটাইন সম্রাট প্রথম আলেক্সিয়াস (Alexius I) এর এশিয়া মাইনর এবং উত্তর সিরিয়াকে পুনরুদ্ধার করার সুযোগ আসে। পোপ দ্বিতীয় উর্বন এর কাছে খ্রিস্টধর্মের আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের একটি সুযোগ চলে আসে। ১০৯৫ সালে পোপ বাইজেনটাইন সম্রাটের সাথে সম্মিলিত হয়ে পুণ্যস্থান (Holy Land) কে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বরের নামে যুদ্ধের আহ্বান করেন। ১০৯৫ এবং ১২৯১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিম-ইউরোপের খ্রিস্টানরা ভূমধ্যসাগরের (Levant) উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চলের মুসলিম শহরগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করে এবং যুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে এই যুদ্ধকে 'ধর্মযুদ্ধ' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রথম ধর্মযুদ্ধে (১০৯৮-৯৯) ফ্রান্স এবং ইতালির সৈন্যরা সিরিয়ার এন্টিওক দখল করে নিয়েছিল এবং জেরুজালেম দখল করার দাবি করেছিল। শহরে মুসলিম এবং ইহুদিদের হত্যা করে তারা জয়লাভ করেছিল, এ বিষয়ে ইহুদি এবং মুসলিম দুই ধর্মাবলম্বী লোকেরা বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। মুসলিম লেখকরা খ্রিস্টানদের (যাদের ফিরিঙ্গি অথবা ইফ্রিনজি বলা হত) আগমনকে পশ্চিমি লোকদের আক্রমণ বলে উল্লেখ করেছেন। ফরাসিরা ধর্মযুদ্ধের দ্বারা জয়ী হওয়া সিরিয়া-ফিলিস্তিনের চারটি অঞ্চল দ্রুত দখল করে নেয়। এই অঞ্চলকে সম্মিলিতভাবে ‘আউট্রেমের’ বলা হত এবং পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যের রক্ষা এবং বিস্তারের জন্য ধর্মযুদ্ধ পরিচালিত হত।

যুদ্ধ করার জন্য যারা শপথ নিয়েছিল পোপ তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্রস প্রদান করার আদেশ দেন।

আউট্রেমের প্রদেশে কিছুদিন পর্যন্ত খুব ভালভাবেই শান্তি বিরাজ করছিল। কিন্তু ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দে তুরস্ক যখন এডিসা দখল করে নেয়, তখন পোপ দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধের (১১৪৫-১১৪৯) আহ্বান করেন। জার্মান এবং ফরাসি সেনারা মিলিতভাবে দামাস্কাস অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা পরাজিত হয় এবং তাদের ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। এর পরে আউট্রেমের-এর শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে শুরু করে। ধর্মযুদ্ধের উদ্দীপনা তখন শেষ হয়ে যায় এবং খ্রিস্টান শাসকরা বিলাসী জীবন যাপন শুরু করে এবং নতুন নতুন এলাকা দখল করার জন্য যুদ্ধ শুরু করে। সালাহ্ আল্-দিন (সালাদিন) মিশর-সিরিয়ান সাম্রাজ্য স্থাপন করে এবং খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ বা পবিত্র-যুদ্ধের আহ্বান করে এবং ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তাদের পরাজিত করে। প্রথম ধর্মযুদ্ধের প্রায় ১০০ বছর পর তিনি পুনরায় জেরুজালেখ দখল করেন। ওই সময়ের নথিপত্র থেকে জানা যায় যে খ্রিস্টধর্মালম্বীদের সাথে সালাহ্ আল্-দিনের ব্যবহার মানবিক ছিল যা পূর্বে মুসলমান ও ইহুদিদের সাথে খ্রিস্টানদের ব্যবহারের দিক থেকে বিপরীত ছিল। তিনি চার্চ অব দি হোলি সেপল্‌করের রক্ষা করার দায়িত্ব খ্রিস্টানদের উপর দিলেও তিনি কিন্তু অনেক গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন এবং জেরুজালেম আবার মুসলিম শহরে পরিণত হয়।

এই শহরে পরাজিত হওয়ার ফলে ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধর্মযোদ্ধারা প্যালেস্টাইনের কিছু উপকূলবর্তী শহরে এবং খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা জেরুজালেমে মুক্তভাবে প্রবেশ করার অধিকার ছাড়া আর কিছু লাভ করতে পারেনি। তারপর মিশরের শাসক মামলুক ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধাদের সমগ্র প্যালেস্টাইন থেকে তাড়িয়ে দেন। ধীরে ধীরে ইউরোপ ইসলামের প্রতি সামরিক আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং তারা তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে।

এই ধর্মযুদ্ধগুলো খ্রিস্টান-মুসলিম সম্পর্কে দুটি দিকে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। এর মধ্যে একটি ছিল মুসলিম রাষ্ট্রের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি কঠোর মনোভাব ও দ্বন্দ্বের তিক্ত স্মৃতি যা মিশ্র জনবসতি অঞ্চলে নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। দ্বিতীয়টি ছিল, মুসলিম শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে ইতালির ব্যাপক প্রভাব। (পিসা, জেনোয়া এবং ভেনিসের প্রভাব বেশি ছিল)।

সিরিয়াতে ফ্রাঙ্ক

নিজের অধীনে থাকা মুসলিম জনগণের সাথে ফ্রাঙ্ক শাসকরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আচরণ করত। গোড়ার দিকের ধর্মযোদ্ধারা যারা সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা পরবর্তীকালে আগত জনগণের তুলনায় মুসলিম অধিবাসীদের প্রতি অনেক বেশি সহনশীল ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে ওসামা ইবন্ মনকিথ (usama ibn Munqidh) নামে একজন সিরিয়ান মুসলিম তাঁর স্মৃতিকথায় তাঁর নব্য প্রতিবেশীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে কিছু মজাদার মন্তব্য করেছেন ঃ

'ফ্রাঙ্কদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যারা এদেশে বসতি স্থাপন করেছে এবং মুসলিমদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। তারা নবাগতদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু তারা বিধিনিষেধ মানত না এবং তাদের সম্বন্ধে কোনোকিছু অনুমান করা যেত না।

এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হল, একবার আমি এক ব্যক্তিকে ব্যবসার জন্য এন্টিওকে পাঠিয়েছিলাম, ওই সময়, মুখ্য থিওডোর সোফিয়ানোস (Chief Theodore Sophianos) প্রাচ্যদেশের একজন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী) সেখানে ছিলেন এবং আমরা পরস্পরের বন্ধু ছিলাম। তিনি তখন এটিওকের সবদিক দিয়ে শক্তিশালী লোক ছিলেন। একদিন তিনি আবার লোকটিকে বললেন "একদিন আমার একজন ফ্রাঙ্কীয় মিত্র আমাকে আমন্ত্রণ করলেন। আমার সাথে চলো এবং দেখো মানুষ কীভাবে বসবাস করে।" আবার লোকটি আমাকে বলল, " আমি এজন্যই তার সাথে চলে গেছি, এবং আমি পুরানো নাইটদের (knight) মধ্যে এক নাইটের বাড়িতে পৌঁছাই, যিনি প্রথম ফ্রাঙ্কীয় অভিযাত্রীদের সাথে এসেছিলেন। তিনি রাজ্য এবং সেনাবাহিনী থেকে ইতিমধ্যেই অবসর নিয়েছিলেন এবং এন্টিওকে তিনি যেখানে থাকতেন, সেখানে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। তিনি খুব পরিষ্কারভাবে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করেছিলেন। আমাকে খেতে অনিচ্ছুক দেখে তিনি বললেন "তৃপ্তি করে খাও, কারণ আমি ফ্রাঙ্কীয় খাবার খাই না। আমার খাবার রান্না করার জন্য একজন মিশরীয় মহিলা আছেন এবং তিনি যা রান্না করেন তার বাইরে আমি কিছু খাই না। আমার ঘরে কখনোই শুয়োরের মাংস প্রবেশ করেনি।" এজন্য আমি খাবার খেয়েছি, কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করে এবং তারপর আমরা সেখান থেকে চলে যাই।

সিরিয়াতে মিশরীয় ধর্মযোদ্ধাদের একটি দুর্গ (১১১০)। আরব নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল আক্রমন করার জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। ১২৭১ খ্রিষ্টাব্দে মামলুক সুলতান বেবার এই দুর্গ দখল করে দুর্গের থিনার এবং জল-প্রণালী তৈরী করেন।

পরবর্তীকালে আমি যখন বাজারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ করে একজন ফ্রাঙ্কীয় মহিলা আমাকে ধরল এবং নিজের ভাষাতে কিছু বলতে শুরু করে। তার বক্তব্য আমার বোধগম্য হয়নি। আমার আশে-পাশে ফ্রাঙ্কীলোকদের ভীড় জমে যায়। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমার জীবনের অন্তিম সময় চলে এসেছে। তারপর হঠাৎ সেই নাইট সেখানে চলে আসে এবং সে ওই মহিলাকে জিজ্ঞেস করে "তুমি এই মুসলিম ব্যক্তির এর কাছ থেকে কি চাও ?" মহিলা উত্তর দিল " সে আমার ভাই হুরসোকে হত্যা করেছে।" এই হুরসো আফেমিয়ার একজন নাইট ছিলেন, যাকে হামার সৈন্যবাহিনীর একজন সৈনিক হত্যা করেছে। তখন ওই নাইট চিৎকার করে ওই মহিলাকে বলল "এই ব্যক্তি একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক (bourgeois) অর্থাৎ তিনি একজন ব্যবসায়ী, তিনি কখনো যুদ্ধে যোগদান করেনি।" তিনি মানুষের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে তা বলেন, ফলে ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তারপর তিনি আমার হাত ধরেন এবং আমাকে সেখান থেকে নিয়ে গেলেন। তার সাথে ভোজন করায় সন্তুষ্টির কারণে সে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

অর্থব্যবস্থাঃ কৃষি, নগরায়ণ এবং বাণিজ্য ঃ

নতুন জয়ী অঞ্চলগুলোতে বসবাসকারী জনগণের অন্যতম পেশা ছিল কৃষিকাজ। ইসলামি রাজ্য এই ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন করেনি। বড়ো এবং ছোটো কৃষকেরা জমির মালিক ছিল, কোথাও কোথাও রাজ্যের (সরকারের) জমি ছিল। ইরাক এবং ইরানে বৃহৎ পরিমাণে) ভূমি বণ্টন করা হয়েছিল এবং কৃষকেরা জমি চাষ করত। সাসানিয়া এবং মুসলিম যুগে জমিদাররা রাজ্যের হয়ে কর সংগ্রহ করত। এই অঞ্চলগুলো পশুচারণ ক্ষেত্র থেকে স্থায়ী কৃষিভূমিতে পরিণত হয়, জমি ছিল গ্রামের যৌথ সম্পত্তি। শেষ পর্যন্ত, যে ভূ-সম্পত্তি ইসলামি বিজয়ের পর মালিকদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে যায়, সেই জমিগুলো রাজ্য সরকার নিজের আয়ত্তে নিয়ে সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, বিশেষ করে খলিফা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

কৃষিজমি সামগ্রিক ভাবে রাজ্যই নিয়ন্ত্রণ করত। বিজয়ের পর রাজ্যের অধিকাংশ আয় ভূমি-রাজস্ব থেকেই প্রাপ্ত হত। আরবদের যুদ্ধে অধিকৃত জমি, যেগুলো মালিকের হাতে থাকত, সেগুলো করের (kharaj) অধীন ছিল সেগুলো চাষের স্থিতির উপর নির্ভর করে উৎপাদন অনুসারে আধা থেকে এক পঞ্চমাংশ পর্যন্ত সমানভাবে ভাগ করা হত। যে জমিগুলো মুসলমানদের দ্বারা চাষ করা হত বা তাদের মালিকানায় ছিল সেখান থেকে উৎপাদনের এক দশমাংশ কর আদায় করা হত। যখন কর কম দেওয়ার জন্য অ-মুসলিমরা মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করল, তখন রাজ্যের আয় কমে গেল। সংকট মোকাবিলার জন্য খলিফারা প্রথমে ধর্ম পরিবর্তনে মানুষদের নিরুৎসাহিত করেন এবং পরবর্তীকালে করের একটি অভিন্ন নীতি গ্রহণ করেন। দশম শতাব্দী থেকে রাজ্য তার আধিকারিকদের বেতন তাদের রাজ্যের কৃষি-রাজস্ব থেকে সংগ্রহ করত যাকে ইক্তা (করের অংশ) বলা হত।

ফসল কাটা ঃ শ্রমিকদের খাবার একটি ট্রেতে করে আনা হচ্ছে। সুডো গেলনের প্রবন্ধের বই (Books of Antidotes) এর আরবীয় সংস্করণ, ১১৯৯ (ড.ঃ গেলনের প্রবন্ধ দেখুন পৃ ৬৩).

রাজনৈতিক স্থিরতার সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। অনেক অঞ্চলে বিশেষ করে নীল নদের উপত্যকায় রাজ্যের উদ্যোগে সেচের ব্যবস্থা করা হয়, বাঁধ এবং খাল নির্মাণ করা হয়, কুয়ো খনন করার (যেগুলো প্রায়ই জল তোলার জন্য কপিকল বা নোবিয়া যুক্ত থাকে) জন্য সহায়তা করা হয়, যেগুলো ভাল ফসল উৎপাদনের জন্য খুবই জরুরি যারা বিভিন্ন জমি প্রথমবার চাষের অধীনে নিয়ে আসত তাদেরকে ইসলামি আইন অনুযায়ী কর ছাড় দেওয়া হত। কৃষকদের উদ্যোগ এবং রাজ্যের সমর্থনের ফলে চাষ-যোগ্য জমির বিস্তার হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ছাড়াই এই বৃদ্ধি ঘটেছিল। অনেক নতুন ফসল যেমন তুলা, কমলালেবু, কলা, তরমুজ, পালং এবং বেগুনের চাষ করা হত এবং ইউরোপেও রপ্তানি করা হত।

ইসলামীয় সভ্যতায় শহরের সংখ্যা বিস্ময়কর ভাবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে। অনেক নতুন নতুন শহর প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আরব সৈন্যদের বসতি স্থাপন করা, যারা ছিল স্থানীয় প্রশাসনের মেরুদণ্ড। এই শহরগুলোর মধ্যে সৈন্যসরবরাহকারী শহরগুলো ছিল মিশর (ইজিপ্টের আরবি নাম), ইরাকের

কুফা এবং বসেরা এবং মিশরের ফুসটাট এবং কায়রো। আব্বাসি খিলাফত (৮০০) এর রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাগদাদের জনসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এই শহরগুলোর সাথে সাথে দামাস্কাস, ইসপাহান এবং সমরখন্দ এর মতো কিছু পুরোনো শহর ছিল যেগুলো নতুন জীবন খুঁজে পেয়েছিল। তাদের আকার এবং ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার জন্য কাঁচা সামগ্রী যেমন কার্পাস এবং আখের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। এভাবে বিশাল নগরায়নের জাল বিস্তৃত হয়, এক শহর আরেক শহরের সাথে পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন করে বিশাল পরিধি সৃষ্টি করে। শহরের কেন্দ্রস্থলে দুটি ভবন ছিল যা সাংস্কৃতিক ও আর্থিক শক্তির পরিচয় বহন করত। এর মধ্যে একটি জামায়েত মসজিদ (মসজিদ আল-জামি) এতটাই বড়ো ছিল যে অনেক দূর থেকেও দেখা যেত এবং কেন্দ্রীয় বাজার (সুক) ছিল যেখানে সরাসরি দোকান ছিল, ব্যবসায়ীদের থাকার ঘর (ফান্ডুক) ছিল এবং মুদ্রা পরিবর্তনকারীদের অফিস ছিল। শহরের প্রশাসক (যিনি রাজ্যের আয়ন অথবা চক্ষু ছিলেন) এবং বিদ্বান এবং ব্যবসায়ীদের (তুজুর) ঘর ছিল যারা কেন্দ্রস্থলের নিকটে বসবাস করত। সাধারণ নাগরিক এবং সৈন্যদের বসবাস করার কোয়ার্টারগুলো বৃত্তের বাইরে অবস্থিত ছিল এবং প্রতিটির সাথে নিজস্ব মসজিদ, গির্জা এবং ইহুদিদের ধর্মস্থান (সিনাগগ) ছিল, ছোটো বাজার এবং সর্বজনীন স্নানঘর (হামাম) এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ সভাস্থল থাকত। শহরের বাইরে শহরের গরিবদের বাড়িঘর, গ্রামাঞ্চল থেকে আনা তাজা সব্জি এবং ফলের বাজার, মরুযাত্রীদের ঠিকানা, 'অশুচি' দোকান যেমন চামড়ার কারবারী এক কসাইখানা ছিল। যখন শহরের দরজা বন্ধ থাকত তখন শহরের বাইরে যে পান্থনিবাস ছিল সেখানে মানুষ বিশ্রাম করত। বিভিন্ন ধরনের ভূ-প্রকৃতি, রাজনৈতিক পরম্পরা এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলির উপর নির্ভর করে শহরের নক্সা তৈরি হত।

রাজনৈতিক একত্রীকরণ এবং খাদ্যবস্তু এবং বিলাসবস্তুর শহুরে চাহিদার ফলে বিনিময়ের পরিধি বিস্তারলাভ করেছিল , যা ভারত মহাসাগর এবং ভুমধ্যসাগরের ব্যবসায়ী অঞ্চলের মধ্যে প্রসার লাভ করেছিল। পাঁচশ বছর ধরে আরব এবং ইরানি বণিকরা চিন, ভারত এবং ইউরোপের মধ্যে সমুদ্র বাণিজ্যে একাধিপত্য কায়েম রেখেছিল। এই বাণিজ্য দুটি মুখ্য পথ যথা লোহিত সাগর এবং পারস্য উপসাগরের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হত। দূরবর্তী অঞ্চলে বাণিজ্যের জন্য উচ্চ-মূল্যের পণ্যদ্রব্য উপযুক্ত ছিল যেমন মশলা, কাপড়, চিনা মাটির বাসন এবং বারুদ। ভারত এবং চিন থেকে জাহাজ বোঝাই করে লোহিত সাগরের বন্দর অর্থাৎ এডেন এবং আইধাব পর্যন্ত এবং সিরাফ ও বসেরার উপকূল বন্দর পর্যন্ত আনা হত।

বসেরার পথে যাত্রা করা একটি নৌকা। নাবিক ভারতীয় এবং যাত্রীরা আরবী। আধুনিক কালের পূর্ব জল পথে পণ্য এবং যাত্রী পরিবহন সস্তা দ্রুততম এবং সুরক্ষিত ছিল। এই চিত্রটি হরিহি দ্বারা রাতে মকামত থেকে নেওয়া (দ্বাদশ শতাব্দীর পান্ডুলিপি) মকামত (Assemblies) একটি জনপ্রিয় আরবী সাহিত্য, যেখানে বর্ণনাদাতা এক প্রবন্ধকের কাহিনী বর্ণনা করেছে

এখান থেকে পণ্যদ্রব্য স্থলভূমিতে উটের গাড়ি দিয়ে বাগদাদ, দামাস্কাস এবং আলেপ্পোর গুদাম (মখাজিন, যা ফরাসি শব্দ মেগাজিন থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে দোকান) পর্যন্ত স্থানীয় ব্যবহারের জন্য অথবা আরও দূরবর্তী অঞ্চলে পাঠানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হত। মক্কার রাস্তা অতিক্রম করার সময় মরুযাত্রীর দল বড়ো হয়ে যেত যখন হজ যাত্রা এবং ভারত মহাসাগরে নৌ-যাত্রা একই সময়ে পড়ত। এই বাণিজ্যপথের ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে

ইউরোপে রপ্তানি বাণিজ্য ইহুদি ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করত, যাদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি ভারতে বাণিজ্য করত। যেমন গনিজা সমগ্রতে সংরক্ষিত তাদের চিঠি পত্রে দেখা যেতে পারে। যাই হোক দশম শতাব্দী থেকে লোহিত সাগরের যাত্রাপথের গুরুত্ব বেড়ে যায়, কারণ বাণিজ্য এবং প্রতিপত্তির কেন্দ্রস্থল হিসেবে কায়রোর উত্থান হয় এবং ইতালির বাণিজ্যিক শহরগুলো থেকে প্রাচ্য দেশীয় পন্যের চাহিদা বাড়তে থাকে।

কার্যাবলি-২
বসেরার প্রাত:কালের একটি দৃশ্য বর্ণনা করো।

কাগজ, গেনিজা তথ্য সংরক্ষণ এবং ইতিহাস

কাগজ আবিষ্কারের পর মধ্য ইসলামীয় জগতে কাগজে লেখার কাজ ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। কাগজ (লিনেন দ্বারা নির্মিত) চিন থেকে এসেছিল, সেখানে খুব সাবধানের সাথে কাগজ বানানোর প্রক্রিয়া গোপন রাখা হয়েছিল। ৭৫১ খ্রিস্টাব্দে, সমরখন্দের মুসলমান প্রশাসক ২০,০০০ চিনা আক্রমণকারীদের বন্দী করে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ কাগজ তৈরিতে খুব নিপুণ ছিল। পরবর্তী ১০০ বছরের জন্য সমরখন্দের কাগজ একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তাণী পণ্যে পরিণত হয়। যেহেতু ইসলাম ধর্মে একাধিপত্য নিষিদ্ধ, ফলে ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলেও কাগজ তৈরি করা শুরু করে। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে কাগজ পেপিরাইস এর স্থান দখল করে নিয়েছিল। পেপিরাইস হচ্ছে এমন একটি লেখন সামগ্রী যা একটি গাছের ভেতরের কাণ্ড থেকে তৈরি করা হয়, সেটি নীল নদী উপত্যকায় প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠে। কাগজের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং অব্দ অল লতিফ যিনি বাগদাদ থেকে আগত একজন চিকিৎসক ছিলেন (আদর্শ বিদ্যার্থী সম্পর্কে তাঁর বিবরণ পৃষ্ঠা ৯৮দেখো) এবং ১১৯৩ থেকে ১২০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশরের অধিবাসী ছিলেন, তিনি লিখেছেন যে মিশরের কৃষকেরা কাগজের কারখানায় বিক্রি করার জন্য পট্টবস্ত্র দিয়ে মোড়ানো মমি লুঠ করার উদ্দেশ্যে কবরে লুঠতরাজ চালাত যাতে আবরণগুলোকে কাগজের কারখানাতে বিক্রি করতে পারে।

কাগজের আবিষ্কারের ফলে সব ধরনের বাণিজ্যিক এবং ব্যক্তিগত দস্তাবেজ লেখা সহজতর হয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ফুস্টাটের বেন এজরা নামক ধর্মস্থানে একটি সিলবন্ধ ঘরে(গেনিজা, যার উচ্চারণে ঘনিজা বলা হত) মধ্যযুগের ইহুদি দস্তাবেজের এক বিশাল সংগ্রহ পাওয়া গেছে। এই দস্তাবেজ ইহুদিদের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল যাতে কোনো লিখিত অংশ নষ্ট করা উচিত নয়, যেখানে পরমেশ্বরের নাম লেখা আছে। গেনিজাতে প্রায় আড়াই লক্ষ পাণ্ডুলিপি এবং পাণ্ডুলিপির অংশ ছিল যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের তারিখের উল্লেখ ছিল। অধিকাংশ সামগ্রী ছিল দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর অর্থাৎ ফাতিনি, আয়ুবি এবং মামলুক সময়কালের প্রথম দিকের। এর সাথে ব্যবসায়ী, পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের মধ্যে লেখা চিঠিপত্র, চুক্তিপত্র পণের জন্য প্রতিষ্ঠা পত্র, বিক্রির দস্তাবেজ, ধোপার কাপড়ের তালিকা, অন্যান্য নগণ্য বস্তুও এই তালিকায় অন্তভুর্ক্ত ছিল। অধিকাংশ দস্তাবেজ ইহুদি আরবীয় ভাষায় লেখা হয়েছিল যা হিব্রু অক্ষরে লেখা আরবি ভাষার একটি রূপ ছিল, যা মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষ সাধারণত ব্যবহার করত। গেনিজা দস্তাবেজ ব্যক্তিগত এবং অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতায় ভরপুর ছিল এবং এটি ভূমধ্যসাগরীয় এবং ইসলামীয় সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে ভরপুর। এই দস্তাবেজ থেকে এটাও জানা যায় যে মধ্যযুগের ইসলামি অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের দক্ষতা এবং বাণিজ্যিক কৌশল সমকালীন ইউরোপীয় প্রতিপক্ষদের থেকে অনেক উন্নত ছিল। গয়টিন গেনিজা নথি থেকে তথ্য নিয়ে ভূমধ্যসাগরের ইতিহাসের গ্রন্থের বহু খণ্ড রচনা করেন। এবং গেনিজার একটি পত্র পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অমিতাভ ঘোষ নিজের গ্রন্থ ইন-এন এন্টিক ল্যান্ড(In an Antique Land) এ এক ভারতীয় দাস সম্পর্ক গল্প লিখেছেন।

মরুযাত্রী ইরানীয় ব্যবসায়ীরা কাগজ সহ মধ্য এশিয়া এবং চিনের অন্যান্য পণ্য আনয়নের জন্য পূর্বদিকের শেষ প্রান্তে বাগদাদ থেকে চিনে রেশম যাত্রাপথ বরাবর বুখারা এবং সমরখন্দ (Tranroxiana তথা তুরান) মরু অঞ্চল ধরে যাত্রা করত। তুরানের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ইউরোপীয় পণ্যসমূহ — প্রধানত পশম এবং বন্দীকৃত দাসদের আদান প্রদান যা উত্তরে রাশিয়া এবং স্কেনডিনেভিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সব ব্যবসায়ে আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত ইসলামীয় মুদ্রা ভল্গা নদীর আশেপাশে এবং বাল্টিক সাগর অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে। এসব বাজারে খলিফা ও সুলতানদের দরবারের জন্য তুর্কি ক্রীতদাস (দাস দাসী) কেনাবেচা হত।

রাজকোষ প্রণালী (রাজ্যের আয় এবং ব্যয়) এবং বাজারে বিনিময়ের ফলে ইসলামি দেশে ধনসম্পদের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সোনা, রূপা এবং তামার (ফুলুস) মুদ্রা তৈরি করা হত এবং মুদ্রা বিনিময়কারীদের দ্বারা সীলবন্ধকরা ব্যাগের মাধ্যমে পণ্য এবং সেবার মূল্য পরিশোধ করার জন্য বণ্টন করা হত। সোনা আফ্রিকা থেকে (সুদান) এবং রুপা মধ্য এশিয়া (জরফস্টান উপত্যকা) থেকে আমদানি করা হত। মূল্যবান ধাতু এবং মুদ্রা ইউরোপ থেকেও আসত, যার দ্বারা ইউরোপ প্রাচ্য দেশের সাথে বাণিজ্য করার অর্থ সংগ্রহ করেছিল। অর্থের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে মানুষ নিজের সঞ্চিত অর্থ এবং নিষ্ক্রিয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে বাধ্য করেছিল। সেখানকার বাণিজ্য মুদ্রার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়, যার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি পায়। মধ্যযুগের আর্থিক জীবনে মুসলিম জগতের সবচেয়ে বড়ো যোগদান ছিল যে তারা পারিতোষিক এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল। ঋণ-পত্র (সক্ক, যা চেক শব্দ থেকে এসেছে) এবং হুঞ্জর (সুফতাজা) ব্যবহারের ফলে ব্যাপারী ও মহাজনরা মূলধন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এবং এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে হস্তান্তর করা সহজ হয়। বাণিজ্যিক পত্রের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ব্যাপারীরা সব জায়গায় নগদ অর্থ নেওয়া থেকে মুক্তি পায় এবং তাদের বাণিজ্যিক যাত্রাও সুরক্ষিত হয়। খলিফাও বেতন দেবার জন্য অথবা কবি এবং চারণদের পুরস্কার দেওয়ার জন্য সক্কের ব্যবহার করতেন।

যদিও ব্যাপারীদের জন্য পারিবারিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করা অথবা নিজের কাজ সম্পাদন করার জন্য দাসদের কাজে লাগানো একটি গতানুগতিক প্রথা ছিল, কিন্তু মুজার্বা নামে একধরনের ব্যবসার প্রচলন ছিল, যেখানে নিষ্ক্রিয় অংশীদার নিজের পুঁজি বাণিজ্যিক কাজে দেশ বিদেশে ভ্রমণকারী সক্রিয় অংশীদারদের ন্যস্ত করে দিত এবং লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করে নির্দিষ্ট অনুপাতে বণ্টন করে নিত। ইসলাম ধর্ম কখনোই মানুষকে ধনসম্পদ অর্জন করাকে বাধা দিত না, তবে নির্দিষ্ট কিছু নিষেধাজ্ঞাকে মান্য করে চলতে হত। উদাহরণস্বরূপ সুদ-সম্পর্কিত লেনদেন (রিবা) বেআইনি ছিল, কিন্তু জনসাধারণ খুব চতুরতার (হিয়াল) সাথে সুদের লেনদেন করত। যেমন একধরনের মুদ্রা ধার নিয়ে অন্য ধরনের মুদ্রা দিয়ে পরিশোধের সময় কমিশনের ছদ্মবেশে সুদ আদায় করা হত।

Thousand and one nights (অলিফ লেয়লা ওয়া লেয়লা) গল্পে আমরা মধ্যযুগের মুসলিম সমাজের সুস্পষ্ট ছবি দেখতে পাই। এসব গল্পে নাবিক, দাস, ব্যাপারী এবং মুদ্রা বিনিময়কারীদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি

যখন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মুসলিমদের ধার্মিক এবং সামাজিক অনুভবের গভীরতা এসেছিল, তখন মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের চিন্তাধারাকে প্রতিফলিত করতে বাধ্য হয় এবং ঈশ্বর (আল্লাহ) এবং সংসার সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হয়। একজন মুসলমানের আদর্শ আচরণ প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে কেমন হওয়া উচিত? জগৎ সৃষ্টির পেছনে সৃষ্টিকর্তার কী উদ্দেশ্য ছিল এবং কোনো ব্যক্তি এটা কীভাবে জানতে পারবে যে ঈশ্বর তাঁর দ্বারা সৃষ্টি করা প্রাণীদের থেকে কী চায়? সৃষ্টিকর্তার রহস্য সম্পর্কে কেউ কীভাবে জানতে পারবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জ্ঞানী মুসলমানদের কাছ থেকে এসেছিল যারা নিজেদের সম্প্রদায়ের সামাজিক পরিচয়কে মজবুত করার জন্য এবং নিজেদের বৌদ্ধিক কৌতূহলকে পরিতৃপ্ত করার জন্য জ্ঞান অর্জন এবং সংকলন করেছিল।

ধার্মিক বিদ্বানদের (উলেমা) জন্য কোরান থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান (ইলম্) এবং পয়গম্বরের আদর্শ ব্যবহারই (সুন্না) ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জানার একমাত্র উপায়। তিনিই এই দুনিয়ায় মার্গদর্শন প্রদান করে। মধ্যযুগে উলেমারা কোরানের বিষয়বস্তু নিয়ে টীকা (তফসির) লিখতেন এবং মহম্মদের প্রামাণ্য উক্তি এবং কাজের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতেন। কোনো কোনো উলেমা ধর্মানুষ্ঠানের (ইবাদত) মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং সামাজিক কর্মের মাধ্যমে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন অথবা শারিয়া (সোজা রাস্তা) তৈরি করতেন। ইসলামি আইন তৈরি করার জন্য ফকীহগন যুক্তির প্রয়োগ করেছিলেন (কিয়াস), কারণ কোরান অথবা হাদিসে সব কিছু স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান ছিল না এবং নগরায়ণের ফলে জীবনধারণের জটিলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিভিন্ন সূত্রের ব্যাখ্যা করতে এবং বিচারব্যবস্থার পদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ দূর করতে অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে আইনের চারটি শাখা (মজহব) গঠিত হয়। এগুলো হল মালিকি, হানাফি, শাফিই এবং হানবালি, যেগুলোর প্রতিটি একেকজন নেতৃস্থানীয় (ফকিহ) আইনজ্ঞের নামে নামকরণ করা হয়েছিল, এরমধ্যে শেষেরটি খুব রক্ষণশীল ছিল। শারিয়া সুন্নি সমাজের অভ্যন্তরীণ সব ধরনের গ্রহণযোগ্য আইনি বিষয়ে পথপ্রদর্শন করেছিল, যদিও এটা বানিজ্যিক অথবা দণ্ডনীয় বিষয় এবং সাংবিধানিক বিষয়ের চেয়ে ব্যক্তিগত অবস্থার (বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়) প্রশ্নের বিষয়ে অধিক সুনির্দিষ্ট ছিল।

১২৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাগাদাদে স্থাপিত মুস্টানসিরিয়া মাদ্রাসা, যে সকল বিদ্যার্থীরা মকতবে বিদ্যালয়-শিক্ষা সম্পন্ন করত তাদের জন্যই মাদ্রাসা (মহাবিদ্যালয়) স্থাপন করা হয়েছিল। মাদ্রাসাগুলো মসজিদের সাথে যুক্ত ছিল, কিন্তু বড়ো মাদ্রাসাগুলোর নিজস্ব মসজিদ ছিল।

কোরান শরিফ

"যদি সংসারের সব গাছ কলম হত এবং সমুদ্র কালি হত
এবং এই ভাবে সাত সমুদ্র তা সরবরাহ করত
তাহলেও আল্লাহর কথা লেখার অবসান ঘটবে না।"

কোরান, অধ্যায় ৩১, স্তবক ২৭

নবম শতাব্দীতে চামড়াপত্রে (vellum) লিখিত কোরানের একটি পৃষ্ঠা বিশেষ। এটি সুরা ১৮ 'অল-কাফ' (গুহা) এর প্রারম্ভ। এটিতে মুসা, এফিসাস এবং সিকন্দরের সাতজন নিদ্রিত ব্যক্তির উল্লেখ আছে (জুল্কর নেন)। এই কৌণিক কুফি লিপিতে স্বরবর্ণকে লাল চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে, কারণ যাতে ভাষার সঠিক উচ্চারণ হয়।

আরবি ভাষায় রচিত কোরান ১১৪টি অধ্যায়ে (সুরা) এত বিভাজিত, যা লম্বায় নিম্ন ক্রমে সাজানো, শেষ সুরা সবচেয়ে ছোটো। প্রথম সুরাটি একমাত্র ব্যতিক্রমী কারণ এটি একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা (অল-ফতিহা অথবা প্রারম্ভ) মুসলিম পরম্পরা অনুসারে, কোরান হচ্ছে বাণীর সম্ভার (revelations), যা ঈশ্বর ৬১০ এবং ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পয়গম্বর মহম্মদকে প্রথমে মক্কায় এবং পরে মদিনাতে দিয়েছিলেন। এই সকল দৈববাণীকে সংকলিত করার কাজ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের কোনো সময় করা হয়েছিল। আজকের দিনে সবচেয়ে প্রাচীন সম্পূর্ণ কোরান আমরা পাই যা নবম শতাব্দীতে রচিত। এতে অনেক খণ্ড আছে, যেগুলো অনেক পুরোনো, তার মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে প্রথম দিকের স্তবক, সেগুলো গম্বুজে এবং সপ্তম শতাব্দীর মুদ্রায় অন্তর্লিখিত আছে।

গোড়ার দিকের ইসলামের ইতিহাসের উৎস-উপাদান হিসেবে কোরানের উপযোগিতা কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেছে। প্রথমত এটি একটি ধর্মগ্রন্থ, যা রচনার বিষয়বস্তুতে ধর্মীয় প্রভাব আছে। মুসলমানরা সাধারণভাবে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের বাণী (কালাম আল্লাহ) হিসেবে, এটা আক্ষরিকভাবে বুঝতে হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে যুক্তিবাদীরা অধিক উদারতার সাথে কোরানের ব্যাখ্যা করেছেন। ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসি খলিফা, অল-মামুন এই মতামত আরোপ করেন (বিশ্বাস অথবা মিহনা পরীক্ষায়) যে কোরান, ঈশ্বরের বাণী নয় বরং ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য। দ্বিতীয় সমস্যাটি হল, কোরান প্রায়শই রূপকের মধ্য দিয়ে বর্ণিত এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের (তাওরিত) সঙ্গে মেলে এমন ঘটনার বর্ণনা করে না, বরং কেবল তাদের উল্লেখ করে। তাই মধ্যযুগের মুসলিম পণ্ডিতদের হাদিসের সাহায্যে অনেক স্তবকের রচনা করতে হয়েছিল। কোরান পড়ার জন্য অনেক হাদিস লেখা হয়েছিল।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, শরিয়াকে বিভিন্ন রাজ্যের রীতি নীতি অনুসারে (উরফ) এবং রাজ্যগুলির রাজনৈতিক এবং সামাজিক ধারা অনুসারে প্রয়োগ করা হত (সিয়াসা শরিয়া)। তথাপি দেশের বৃহৎ অংশের রীতি নীতিকে কেন্দ্র করে যে আইন তৈরি হয়েছিল, সেগুলোর শক্তি অপরিবর্তিত রাখা হয় এবং কন্যাসন্তানদের উত্তরাধিকারসূত্রে জমির থেকে শরিয়া পাশ কাটিয়ে দেওয়া হল। অধিকাংশ শাসক এবং তাঁর আধিকারিকরা রাজ্যের সুরক্ষার ব্যাপারে নিয়মিতভাবে লক্ষ্য রাখতেন এবং কেবল কিছু নির্বাচিত মামলা কাজীর (বিচারপতি) কাছে পাঠাতেন। রাজ্য দ্বারা প্রত্যেক শহর অথবা অঞ্চলে নিযুক্ত কাজী প্রায়শই শরিয়ার কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন না করে যে কোনো বিতর্কের সালিশির কাজ করত।

মধ্যযুগের ইসলাম ধর্মে ধর্মীয় ভাবাপন্ন একদল মানুষ যাদের সুফি বলা হত, তারা কঠোর সাধনা (রহবানিয়া) এবং অতীন্দ্রিয়বাদের মাধ্যমে ঈশ্বরকে গভীরভাবে পেতে এবং আরও ব্যক্তিগত জ্ঞান অর্জন করতে চেয়েছিল। সমাজ যত বেশি পার্থিব জিনিস এবং সুখানুভব অর্জনের জন্য লালায়িত হচ্ছিল, সুফিরা ততই সংসার ত্যাগ (জুদ্) করে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে শুরু করল (টাওয়াক্কুল)। অস্টম এবং নবম শতাব্দীতে কঠোর তপস্যা এবং বৈরাগ্যের প্রবৃত্তি সর্বেশ্বরবাদ এবং প্রেমের বিচার দ্বারা অতীন্দ্রিয়বাদ (তসফফুল) উচ্চস্তরে সমুন্নত হয়। সর্বেশ্বরবাদ হচ্ছে ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্টির একতার ধারণা, যার অভিপ্রায় হচ্ছে মানুষের আত্মাকে তাঁর নির্মাতার সাথে যুক্ত করা। ঈশ্বরের সাথে সংগতিসাধন, ঈশ্বরের সাথে তীব্র প্রেমের মাধ্যমেই প্রাপ্ত করা যাবে (ইশ), এবং এই প্রেমের উপদেশ বসেরার রাবিয়া নামে একজন মহিলা সন্ত (মৃত্যু ৮৯১ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর কবিতার মাধ্যমে দিয়েছিলেন। ব্যয়জিদ বিস্তামি (মৃত্যু ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে) যিনি একজন ইরানি সুফি ছিলেন, তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি নিজেকে ঈশ্বরে লীন (ফানা) করার উপদেশ দিয়েছিলেন। সুফিরা আনন্দ উৎপন্ন করতে এবং প্রেম ভাবাবেগে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য সংগীতানুষ্ঠানের (সামা) আয়োজন করতেন।

জোড়ে ঘূর্ণনরত দরবেশের ইরানি চিত্র (১৪৯০) নৃতরত চারজন পুরুষের মধ্যে মাত্র একজনের হাতকেই সঠিক ভঙ্গিতে দেখানো হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ আবার মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যায় এবং তাদেরকে উঠিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সুফিবাদের দরজা জাতি, ধর্ম, ব্যক্তির পদমর্যাদা এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার জন্য খোলা ছিল। ধুলনুন মিশ্রি (মৃত্যু ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে) যার কবর আজকের দিনেও মিশরের পিরামিডের কাছে দেখা যায় তিনি আব্বাসি খলিফা, অল-মুটাওয়াক্কিল এর সামনে ঘোষণা করেছিলেন যে 'তিনি প্রকৃত ইসলাম একজন বয়স্ক মহিলা থেকে এবং প্রকৃত বীরধর্ম একজন জলবাহকের থেকে শিখেছিলেন। সুফিবাদ ধর্মকে আরও ব্যক্তিগত এবং কম প্রাতিষ্ঠানিক করে তোলে এবং এভাবে সুফিবাদ ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামিকে আপত্তি জানিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ইসলামি দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকরা গ্রিক দর্শন এবং বিজ্ঞানে প্রভাবিত হয়ে ঈশ্বর এবং বিশ্বের এক বিকল্প চিন্তার

বিকাশ ঘটান। সপ্তম শতাব্দীতে কোনো এক সময়ে, বাইজেনটাইন এবং সাসানি সাম্রাজ্যে পূর্ববর্তী গ্রিক সংস্কৃতির অবশিষ্টাংশ পাওয়া যেতে পারে, যদিও তা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার স্কুলগুলোতে, যা একসময় আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেখানে অন্য বিষয়ের সাথে সাথে গ্রিক দর্শন, গণিত এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হত। উমায়াদ এবং আব্বাসি খলিফারা খ্রিস্টান পণ্ডিতদের দ্বারা গ্রিক এবং সিরিয় ভাষার গ্রন্থগুলোকে অনুবাদ করিয়েছিছেলেন, অল-মামুনের শাসনকালে অনুবাদ একটি সুগঠিত কার্যকলাপে পরিণত হয়। তিনি বাগদাদে গ্রন্থাগার তথা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানকে (বায়ত অল—হিক্মা) সহায়তা করেছিলেন, যেখানে পণ্ডিতরা কাজ করতেন। এরিস্টটলের রচনা, ইউক্লিডের শাস্ত্রের প্রাথমিক তত্ত্ব এবং টলেমির পুস্তক আল্‌মাগেস্টের প্রতি আরবি-পড়ুয়া পণ্ডিতদের মনোযোগী করা হয়েছিল। জ্যোর্তিবিজ্ঞান, গণিত এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত ভারতীয় পুস্তকের আরবি অনুবাদও ওই সময়ে করা হয়েছিল। এই রচনাগুলো ইউরোপেও পৌঁছায় এবং তাতে দর্শনশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

কার্যাবলি ৩
এই রচনাংশ ব্যাখ্যা কর, আজকের দিনের বিদ্যার্থীদের জন্য কি এটি প্রাসঙ্গিক হবে?

আদর্শ ছাত্র

দ্বাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে আইন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের পণ্ডিত অব্দ-অল-লতিফ নিজের আদর্শ ছাত্রের সাথে কথা বলছিলেন-

আমার অনুরোধ আপনি কারোর সহায়তা ছাড়া, বইয়ের সহায়তা ছাড়া বিজ্ঞান শিখবেন না, যদি আপনার বোঝার ক্ষমতার উপর আপনার বিশ্বাস থাকে তাহলেও নয়। যেসব বিষয়ে আপনি জ্ঞান অর্জন করতে চান সেগুলোর জন্য অধ্যাপকদের সাহায্য নিন এবং যদি আপনার অধ্যাপক সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন হন তাহলেও তিনি যতটুকু দিতে পারেন ততটুকুই গ্রহণ করুন যতক্ষন না আপনি যোগ্য অধ্যাপকের সন্ধান পাচ্ছেন। আপনি আপনার অধ্যাপককে অবশ্যই শ্রদ্ধা ও সম্মান করবেন। যখন আপনি কোনো বই পড়বেন, তখন হৃদয় দিয়ে শেখার সবরকম চেস্টা করবেন। মনে করুন, যে বই হারিয়ে গেছে বা আপনাকে বইটি কাউকে দিয়ে দিতে হবে, তখন আপনার হৃদয় দিয়ে শিক্ষা নেওয়ার ফলে আপনার কিছু ক্ষতি হবে না। যখন কেউ ইতিহাস অধ্যয়ন করবে, তখন তার জীবনী এবং জাতি এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। এভাবে অধ্যয়ন করলে মনে হবে যে কেউ তার সংক্ষিপ্ত জীবনকালে অতীতের মানুষের সাথে বসবাস করছে, অতীতের মানুষের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এবং তাদের ভালো এবং খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে অবগত আছে, আপনার নিজের আচরণ গোড়ার দিকে মুসলিমদের মতো হওয়া উচিত। সুতরাং পয়গম্বরের জীবনী পড়ুন এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। প্রকৃতি সম্পর্কে আপনার ভালো ধারণা না রেখে বরং প্রকৃতিকে অবিশ্বাস করা উচিত। পণ্ডিত ব্যক্তি এবং তাদের কৃতিত্বের প্রতি আপনার মনোযোগ দেওয়া উচিত, সাবধানতা অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং দ্রুত অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি অধ্যয়নের চাপ সহ্য করেনি, তারা জ্ঞান লাভের আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। যখন আপনি আপনার অধ্যয়ন এবং প্রতিফলন শেষ করবেন, তখন আপনি আপনার জিহ্বাকে আল্লার নাম নেওয়ার কাজে ব্যস্ত রাখবেন এবং আল্লাহর গুণকীর্তন করবেন। যদি সংসার আপনার দিকে না তাকায়, তাহলেও কোনো অভিযোগ করবেন না। এটা জেনে রাখুন, যে শেখার কোনো শেষ নেই, জ্ঞান তার পেছনে সুগন্ধি রেখে যায়। তাঁর উপর উজ্জ্বল এক রশ্মি এবং আলো স্ফুরিত হয় এবং তাঁর দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে।

আহমদ ইবন্ আল কাসিম ইবন্ আবি উসাইবিয়া ইয়ুন আল আনবা

নতুন নতুন বিষয় অধ্যয়নের ফলে যে সমালোচনামূলক অনুসন্ধান শুরু হয়, তা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আধ্যাত্মিক মন সম্পন্ন পণ্ডিতরা যেমন মুতাজিলা নামে পরিচিত পন্ডিতবর্গ ইসলামি বিশ্বাসকে রক্ষা করার জন্য গ্রিক ন্যায়শাস্ত্রের পদ্ধতিকে (কলাম) ব্যবহার করেছিলেন, দার্শনিকরা (ফলাসিফা) ব্যাপক প্রশ্ন তৈরি করেন এবং নতুন উত্তর প্রদান করেন। ইবন্ সিনা (৯৮০-১০৩৭) যিনি পেশায় একজন চিকিৎসক এবং দার্শনিক ছিলেন, তিনি এই ব্যাপারটি বিশ্বাস করতেন না যে শেষ বিচারের দিন শরীরের পুনরুজ্জীবন ঘটে। ধর্মতত্ত্ববিদরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কিত তাঁর লেখাকে ব্যাপকভাবে পড়া হত, তাঁর সবচেয়ে প্রভাবশালী গ্রন্থ অল—কানুন ফিল তিব (চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনুশাসন) যা দশ লাখ শব্দের একটি পাণ্ডুলিপি ছিল, যার মধ্যে ওই সময়ের ফার্মাসিস্ট দ্বারা বিক্রি করা ৭৬০ ধরনের ঔষধের উল্লেখ আছে এবং হাসপাতালে (বিমারিস্তান) পরিচালিত তাঁর নিজের পরীক্ষানীরিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্যও অন্তর্ভুক্ত করা আছে। এই গ্রন্থে খাদ্য নির্বাচনের গুরুত্বের ওপর ইঙ্গিত করা হয়েছে, (খাদ্য নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে রোগ নিরাময়) এবং জলবায়ু, পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং কিছু কিছু সংক্রামক রোগের উপর প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের অনুশাসনগুলোকে ইউরোপে পাঠ্যপুস্তকের রূপে ব্যবহৃত হত যেখানে লেখক হিসাবে এবিসেন্নার নাম জানা যায়। এটা বলা হয় যে বৈজ্ঞানিক এবং কবি ওমর খৈয়াম নিজের মৃত্যুর ঠিক আগে এই গ্রন্থটি পড়েছিলেন। তাঁর সোনার খড়কে (দাঁত পরিষ্কারের কাঠি) এই গ্রন্থের অধিবিদ্যাবিষয়ক অধ্যায়ের দুটি পৃষ্ঠার মাঝখানে পাওয়া গিয়েছিল।

মধ্যযুগের ইসলামি সমাজে সুন্দর ভাষা এবং সৃজনাত্মক কল্পনাকে একজন ব্যক্তির সবচেয়ে প্রশংসনীয় গুণাবলি বলে মানা হত। এই গুণাবলি ব্যক্তির বিচার অভিব্যক্তিকে আদব স্তরে উন্নীত করত। 'আদব' যার অর্থ হচ্ছে সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক পরিশোধন। আদবরূপী অভিব্যক্তিতে পদ্য (নাজম সুশৃঙ্খল আয়োজন) এবং গদ্য (নথ্র বা বিক্ষিপ্ত শব্দ) ছিল যার অর্থ ছিল স্মরণ করা এবং উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করা। ইসলাম-পূর্ব কালের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাব্যিক রচনা হল ওড (কোয়াসিডা), যা আব্বাসি যুগে তাদের গৌরব গাথা রচনা করার জন্য তাদের পৃষ্ঠপোষক কবিদের দ্বারা বিকশিত করা হয়েছে। পারস্যের কবিরা আরবি কবিতার পুনরায় আবিষ্কার এবং আরবের সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন।

আবু নুবাস (মৃত্যু ৮১৫) যিনি জাতিতে পারসিক ছিলেন তিনি ইসলাম নীতিতে বর্জিত আমোদ প্রমোদ উদ্‌যাপন করার জন্য মাদকদ্রব্য এবং পুরুষ প্রেমের মতো নতুন নতুন বিষয়ের শাস্ত্রীয় কবিতা রচনা করার নতুন উদ্যোগ নেন। আবু নুবাসের পরবর্তীকালের কবিরা তাদের আবেগের পাত্র হিসেবে পুরুষকেই সম্বোধন করেন এমনকি কবি যদি স্ত্রী জাতির হতেন সেক্ষেত্রেও পুরুষকেই সম্বোধন করতেন। এই ধরনের পরম্পরাকে অনুসরণ করে, সুফিবাদীরা রহস্যময় প্রেমের মাদক দ্বারা উৎপন্ন উন্মাদনার গুণগান করেন।

যখন আরবেরা ইরান বিজয় করল, তখন পহ্লবির পতন ঘটেছিল, পহ্লবি প্রাচীন ইরানের পবিত্র গ্রন্থের ভাষা ছিল। শীঘ্রই পহ্লবির অন্য সংস্করণ বিকশিত হল, যাকে নতুন পারসিক বলা হত, যার মধ্যে প্রচুর আরবি শব্দ ছিল। খুরাসান এবং তুরান সুলতানি সাম্রাজ্যের স্থাপনার ফলে নতুন পারসি মহান সাংস্কৃতিক উচ্চতায় পৌঁছে যায়। সমানি রাজদরবারের কবি, রুদকিকে (মৃত্যু ৯৪০) নতুন পারসিক কবিতার জনক বলা হত। এসব কবিতায় ছোটো গীত-কাব্য (গজল) এবং চতুষ্পদী শ্লোকের (রুবাইয়াত) মত সবকিছুকে নতুন রূপ দেওয়া হয়। রুবাই চার পঙ্‌ক্তির কবিতা যার মধ্যে প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি মঞ্চস্থ করা হত, তৃতীয় পঙ্‌ক্তি সূক্ষ্মভাবে ভজন করা হত এবং চতুর্থ পংক্তিতে মুখ্য বিষয় বলা হত। এই রীতির বিপরীতে রুবাই এর বিষয়বস্তু ছিল অবাধ। রুবাই কখনো কখনো প্রিয়তমের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে, পৃষ্ঠপোষকের প্রশংসা

করতে বা দার্শনিকদের চিন্তার প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হত। উমর খৈয়ামের হাত ধরে রুবাই সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল উমর খৈয়াম (১০৪৮—১১৩১) একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং গণিতজ্ঞ ছিলেন, যিনি বিভিন্ন সময়ে বুখারা, সমরখণ্ড এবং ইস্ফাহানে বসবাস করতেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরবী পাণ্ডুলিপির একটি লঘুচিত্র যেখানে দেখা যাচ্ছে দিমনা বাঘের (আসদ) সাথে কথা বলছে।

একাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, গজনি পারসিক সাহিত্যিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। কবিরা স্বাভাবিক ভাবেই দরবারি আদালতের জাঁকজমকের প্রতি আকর্ষিত হত। শাসকরাও নিজেদের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য শিল্পী এবং বিদ্বনদের উৎসাহ দেওয়ার ও রক্ষা করার গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। গজনির মাহমুদ একটি কবির দলের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত থাকতেন যারা কাব্য সংগ্রহ (দিওয়ানস) এবং মহাকাব্য (মহানবি) রচনা করতেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন ফিরদৌসি (মৃত্যু ১০২০) যিনি ৩০ বছর সময় নিয়ে শাহনামা (রাজাদের জীবনী রচনা করেছেন, এই গ্রন্থে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) পদ আছে যা ইসলামি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান বলে মানা হয়। শাহনামা হচ্ছে পরম্পরা এবং পৌরাণিক কাহিনির সংগ্রহ (যার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনী রুস্তমও আছে)। যার মধ্যে পথম থেকে আরবিদের বিজয় পর্যন্ত ইরানের কাহিনি কাব্যিকভাবে চিত্রিত হয়েছে। তার সঙ্গে গজনভি পরম্পরার মিল ছিল যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের পারসি প্রশাসনিক এবং সংস্কৃতির ভাষাতে পরিণত হয়।

বাগদাদের একজন বই বিক্রেতা, ইবন্ নদিম্ (মৃত্যু ৮৯৫) এর গ্রন্থ তালিকাতে (কিতাব অল ফিহরিস্ত) এমন প্রচুর গ্রন্থের উল্লেখ আছে, যা পাঠককে নৈতিক শিক্ষা দেয় এবং মনোরঞ্জন করে। এর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো গ্রন্থ হচ্ছে পশুদের গল্প যা 'কালিলা ওয়া ডিমনা' নামে পরিচিত (দুটো শৃগালের গল্প, যা গল্পের মুখ্য চরিত্র ছিল)। এই গ্রন্থটিতে পঞ্চতন্ত্রের পহুবি সংস্করণের আরবি অনুবাদ করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রচলিত এবং স্থায়ী সাহিত্য ছিল বীর-দুঃসাহসিকদের গল্প, যেমন আলেকজাণ্ডার (অল-ইসকান্ডার) ও সিন্দবাদ, বা অসুখী-প্রেমীদের গল্প যেমন কায়েস (যা মজনু বা ম্যাডমান নামে পরিচিত ছিল)। এই গল্পগুলো কয়েক শতাব্দী ধরে ঐতিহ্যগত ভাবে মৌখিক অথবা লিখিত রূপে বিকশিত হয়েছিল। 'এক হাজার এক রাত' (The Thousands and One Nights) এর গল্প হচ্ছে অন্য একটি সংগ্রহ, যার একজনই বর্ণাদাত্রী, শেহরজাদ দ্বারা নিজের স্বামীকে একের পর এক রাতে শুনিয়েছেন। এই সমগ্র মূলত ইন্দো-পারসিক ভাষায় রচিত ছিল এবং অস্টম শতাব্দীতে বাগদাদে আরবি ভাষাতে এর অনুবাদ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে মামলুকের শাসনকালে কায়রোতে আরও অনেক গল্প যুক্ত করা হয়েছিল। এই গল্পগুলোতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ—যেমন মহৎ, মূর্খ, অতি সরল এবং ধূর্ত মানুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষা এবং মনোরঞ্জন করার কথা বলা হয়েছে। বাসরার জহিজ (মৃত্যু ৮৬৮) তাঁর গ্রন্থ 'কিতাব অল-বুখালা'তে (কৃপণের গল্প) কৃপণদের সম্পর্কে মজাদার কাহিনি একত্রিত করেছেন এবং লোভি-লালসার বিশ্লেষণ করেছেন।

নবম শতাব্দী থেকে, আদাবের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করা হয় এবং জীবনী, নীতিশাস্ত্র গ্রন্থ (আখলাক), রাজকুমারদের শাসনকার্য, শিক্ষার গ্রন্থ এবং সর্বোপরি ইতিহাস (তারিখ) ও ভূগোলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শিক্ষিত মুসলিম সমাজে ইতিহাস লেখার ঐতিহ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইতিহাস গ্রন্থ পণ্ডিত এবং বিদ্যার্থী ছাড়াও অধিক শিক্ষিত লোকেরা পড়তেন। শাসক এবং আধিকারিকদের জন্য ইতিহাস কোনো রাজবংশের মহিমা এবং সাফল্যের বিবরণ দিত এবং পাশাপাশি প্রশাসনের কৌশল সম্পর্কে উদাহরণ প্রস্তুত করত। বালাধুরির (মৃত্যু ৮৯২) আনসার অল-অসরফ (অভিজাতদের বংশতালিকা) এবং তাবেরির 'তারিখ অল-রসুল ওয়াল মালুক' (পয়গম্বর এবং সম্রাটের ইতিহাস) নামে ইতিহাসের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ সমগ্র মানব ইতিহাসকে ইসলামিক যুগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যবহার করেছে। খিলাফতের অবসানের পর স্থানীয় ইতিহাস লেখার চর্চা বিকশিত হয়। ইসলামি জগতের একতা এবং বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করার জন্য ফার্সি ভাষায় রাজবংশ, নগর এবং প্রদেশ সম্পর্কে গ্রন্থ লেখা হয়েছিল।

ভূগোল এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত (রিহলা) আদবের এক বিশেষ বিভাগে পরিণত হয়। এতে গ্রিক, ইরানি এবং ভারতীয় গ্রন্থের মন্তব্য এবং বণিক ও ভ্রমণকারীদের পর্যবেক্ষণ সমৃদ্ধ জ্ঞানকে একত্রিত করা হয়। গাণিতিক ভূগোলে সমগ্র বিশ্বকে সাতটি জলবায়ু অঞ্চলে (একবচন ইকলিম) নিরক্ষরেখার সমান্তরাল, তিনটি মহাদেশের অনুরূপে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রতিটি শহরের সঠিক অবস্থান জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে নির্ধারণ করা হয়। মুকাদ্দাশি (মৃত্যু ১০০০) লিখিত বর্ণনাত্মক ভূগোল ('অহসন অল তাকাসিম' অথবা সর্বোত্তম বিভাজন) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এবং মানুষের একটি তুলনামূলক গবেষণা এবং বিদেশ সম্পর্কে কৌতূহল দমন করার ভাণ্ডার। বিশ্বের সংস্কৃতির ব্যাপক বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করার জন্য মাসুদির (৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিখিত) গ্রন্থ 'মুরুজ অল-ধাহাব' (সোনালী তৃণভূমি) ভূগোল এবং সাধারণ ইতিহাস বিষয়কে একসাথে সংযুক্ত করেছিলেন। আলবেরুনির বিখ্যাত গ্রন্থ 'তহকিক্ মা লিল-হিন্দ' (ভারতের ইতিহাস) একাদশ শতাব্দীর একজন মুসলিম লেখকের ইসলাম জগতের বাইরে অন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জানার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা ছিল।

অস্টম শতাব্দীতে, প্যালেস্টাইনের খিরবত অল মফজর মহলের স্নানাঘরের মোজাইক পাথরের মেঝে। মনে করো, এই গাছে খলিফা বিরাজমান। চিত্রে গাছটিতে শান্তি এবং যুদ্ধ দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গন

দশম শতাব্দী পর্যন্ত এমন এক ইসলামি বিশ্ব আবির্ভূত হয়েছিল যা পর্যটকরা সহজেই চিনতে পারত। ধর্মীয় ইমারতগুলো এই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহ্যিক প্রতীক ছিল। স্পেন থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তারিত মসজিদ, ইবাদতখানা এবং সমাধিস্থলগুলো দেখতে একই রকম ছিল—খিলান, গম্বুজ, মিনার, খোলা অঙ্গান মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক চাহিদা প্রকাশ করেছে। প্রথম ইসলামি শতাব্দীতে মসজিদ একটি স্বতন্ত্র স্থাপত্যের রূপ (থামের সাহায্যে ছাদ) অর্জন করেছিল যা আঞ্চলিক বৈচিত্রকে অতিক্রম করেছিল। মসজিদে একটি খোলা প্রাঙ্গান (সহন) থাকত, যেখানে একটি ফোয়ারা অথবা জলাশয় তৈরি করা হত এবং একটি বড় খিলানযুক্ত কক্ষ থাকত যেখানে উপাসনাকারীদের দীর্ঘ লাইনের সমন্বয়সাধন করা যায় এবং প্রার্থনা পরিচালকের (ইমাম) জন্য পর্যাপ্ত স্থান থাকত। বড়ো কক্ষগুলির ভেতর দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল দেওয়ালে আঁকা কুলুঙ্গি (মেহরাম) যা মক্কার (কিবলা) দিক নির্দেশ করে এবং একটি মঞ্চ (মিম্বার) যেখান থেকে শুক্রবার দুপুরে নামাজের সময় উপদেশ দেওয়া হত। বড়ো কক্ষ সংযুক্ত মিনার ছিল, যা নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা করার

ইসলামি সাজসজ্জার সৃজনী প্রতিভার পূর্ণ অভিব্যক্তি ধাতব পাত্রে দেখা যায়। এই ধাতব বস্তুগুলোকে ভালোভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে, সিরিয়ার এক মসজিদের বাতিতে 'শ্লোক' অঙ্কিত আছে। "ঈশ্বর স্বর্গ এবং পৃথিবী আলো (নুর)" তাঁর আলো হচ্ছে একটি বাতির (মিসকাট) সঙ্গে কুলুঙ্গির (মিশাব) মতো। বাতিটি এমন একটি গ্লাসে রয়েছে যা দেখে মনে হয় এটি একটি দ্যুতিময় তারকা যা আশীর্বাদপুষ্ট জলপাই গাছ থেকে প্রজ্বলিত হয়েছে, যা পূর্ব বা পশ্চিম কোন দিকেরই নয়, যার তেল সবসময়েই চকমক করবে এমনকি যদি কোনো আগুন এটাকে স্পর্শ না করে, তবুও।

(কোরান, অধ্যায় ২৪, পদ ৩৫)

জন্য, মানুষদের আহ্বান করার জন্য এবং নতুন বিশ্বাসের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হত। শহর এবং গ্রামের মানুষ পাঁচটি দৈনিক নামাজ এবং সাপ্তাহিক ধর্মোপদেশ দ্বারা সময়ের ধারণা করত।

কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গান (ইবান) এর চারদিকে নির্মিত ইমারতের নির্মাণ শুধু মসজিদ এবং মক্তবেই দেখা যেত তাই নয়, সরাইখানা, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন প্রাসাদেও দেখা যেত। উমায়াদরা মরুদ্বীপে 'মরুভূমি প্রাসাদ' তৈরি করেছিল যেমন প্যালেস্টাইনে খিরবাত অল মফজর এবং জর্ডনে কুয়াসর অমরা, যা জাঁকজমক ও বিলাসবহুল নিবাস এবং শিকার ও মনোরঞ্জনের জন্য বিশ্রামস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হত। যে প্রাসাদগুলো রোমান এবং সাসারিয়ান স্থাপত্যকে অনুকরণ করে তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলোকে মোজাইক এবং মানুষের চিত্র ভাস্কর্যে সজ্জিত করা হত। আব্বাসিরা সামারায় বাগান এবং ধাবমান জলের মাঝে একটি নতুন সার্বভৌম শহর তৈরি করেছিল যা হারুন অল রসিদ তাঁর কিংবদন্তি গল্পে উল্লেখ করেছেন। বাগদাদে আব্বাসিদের বিশাল মহল এবং কায়রোতে ফাতিমিডদের মহল লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কেবল সাহিত্যিক গ্রন্থে এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইসলামের ধর্মীয় শিল্পে প্রাণিদের চিত্র আঁকা খারিজ করা হয় ফলে ইসলাম ধর্মে দুই ধরনের শিল্প উন্নতি লাভ করেছিল—লিপিবিদ্যা (খাত্তাতি অথবা সুন্দর হাতের লিখাবিদ্যা) এবং অ্যারাবিক্স (জ্যামিতিক এবং উদ্ভিদ নকশা)। স্থাপত্যকে সাজানোর জন্য সাধারণত ধর্মীয় উদ্বৃতিকে ছোটো এবং বড়ো শিলাস্তম্ভে খোদাই করা হত। কোরানের অস্টম এবং নবম শতাব্দীর পাণ্ডুলিপিতে লিপিবিদ্যাকে সবচেয়ে ভালোভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে। কিতাব-অল-অঘানি (গানের বই) কলিলা ওয়া দিমনা, এবং হরিরির মকামতের মত সাহিত্যিক গ্রন্থগুলোকে লঘুচিত্র দ্বারা সাজানো হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য চিত্রকলার বিভিন্ন কৌশলের প্রবর্তন করা হয়। প্রাসাদ এবং গ্রন্থে চিত্র আঁকার জন্য উদ্যানের সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ এবং ফুলের নকশা ব্যবহার করা হয়।

আমরা যে ইসলামি অঞ্চল সম্পর্কে অধ্যয়ন করলাম, এতে মানব সভ্যতার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে— ধর্ম, সম্প্রদায় এবং রাজনীতি। আমরা একে তিনটি বৃত্ত হিসেবে দেখতে পারি যা সপ্তম শতাব্দীতে একটি বৃত্ত হিসেবেই প্রদর্শিত হয়েছিল। ৫০০ বছরের পরবর্তী সময়ে এই বৃত্তগুলো আলাদা হয়ে যায়। সময়ের সাথে সাথে দেখা যায় রাজ্য ও সরকারের উপর ইসলামের প্রভাব একেবারেই ক্ষীণ হয়ে যায় এবং রাজনীতিতে অনেক কিছু জড়িয়ে যায় যার কোনো ধর্মীয় অনুমোদন ছিল না, যেমন রাজতন্ত্র গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি)। ধর্ম এবং সম্প্রদায় একই বৃত্তে জড়ানো ছিল। ব্যক্তিগত বিষয় এবং ধর্মানুষ্ঠানে শরিয়া পালনের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায় প্রভাবিত ছিল এবং এটি মুসলিমদের একজোট হবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। ইসলামের ধর্মীয় শাসন চলছিল না (রাজনীতির বৃত্ত ভিন্ন ছিল) কিন্তু এটি ধর্মীয় পরিচয় সংজ্ঞায়িত করেছিল। মুসলিম সমাজে প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বারা ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের বৃত্তকে পৃথকীকরণ করা সম্ভব ছিল। কোনো কোনো দার্শনিক এবং সুফিরা এই ধর্মনিরপেক্ষতার পরামর্শ দিত এবং বলত নাগরিক সমাজকে ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত এবং নিজস্ব রীতি ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা পালন করা উচিত।

কার্যাবলি-৪
এই অধ্যায়ে কোন্ চিত্রটি তোমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে এবং কেন?

৫৯৫	পয়গম্বর (হজরত) মহম্মদের সাথে খদিজার বিবাহ। খদিজা মক্কাতে বাণিজ্য করতেন এবং ধনী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম ধর্মকে সমর্থন করেন।
৬১০-১২	পয়গম্বর মহম্মদের প্রথম রহস্য উদ্‌ঘাটন, ৬১২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সর্বজনীন উপদেশ
৬২১	মদিনার ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সাথে আকাবার প্রথম চুক্তি
৬২২	মক্কা থেকে মদিনাতে স্থানান্তর। মদিনার আরব জাতিগোষ্ঠী (অনসর) মক্কার অভিবাসীদের (মুজাহির) আশ্রয় দেয়।
৬৩২-৬১-	খিলাফতের প্রাথমিক কাল: সিরিয়া, ইরাক, ইরান এবং মিশর বিজয়: গৃহযুদ্ধ,
৬৬১-৭৫০	উমায়াদ শাসন, দামাস্কাসে রাজধানী স্থাপিত হয়।
৭৫০-৯৪৫	আব্বাসি শাসন, বাগদাদে রাজধানী স্থাপিত হয়।
৯৪৫	বুয়িদরা বাগদাদকে কব্জা করে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রস্ফুটন ঘটে।
১০৬৩-৯২	নিজামুল মুল্‌কের শাসন, যিনি একজন শক্তিশালী সলজুক উজির ছিলেন যিনি অনেক মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন যেগুলো নিজামিয়া নামে পরিচিত ছিল, যাকে হাসিসায়ান নামে একজন গুপ্তহত্যাকারী হত্যা করেছিল।
১০৯৫-১২৯১	ধর্মযুদ্ধ: মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে সম্পর্ক
১১১	প্রভাবশালী ইরানি বিদ্বান গজলির মৃত্যু যিনি যুক্তিবাদের বিরোধিতা করেছিলেন।
১২৫৮	মোঙ্গলরা বাগদাদকে কব্জা করেছিল।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

১. সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভিক দিকে বেদুইনদের জীবনের বিশেষত্ব কী ছিল?

২. 'আব্বাসি বিপ্লব' এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

৩. আরবি, ইরানি এবং তুর্কি দ্বারা স্থাপিত রাজ্যের রাজ্যগুলোর সর্বজনীনতার উদাহরণ দাও।

৪. ইউরোপ এবং এশিয়াতে ধর্মযুদ্ধের কী প্রভাব পড়েছিল?

সংক্ষেপে প্রবন্ধ লিখ

৫. রোমান সাম্রাজ্যের স্থাপত্য শিল্পের সাথে ইসলামি স্থাপত্য শিল্পের কীরূপ পার্থক্য ছিল?

৬. সমরখন্ড থেকে দামাস্কাস পর্যন্ত অবস্থিত নগর সমূহের উল্লেখ করে যাত্রা পথের বর্ণনা দাও।

বিষয়

৫

যাযাবর সাম্রাজ্য
(Nomadic Empires)

'যাযাবর সাম্রাজ্য' আখ্যাটি বিতর্কিত মনে হতে পারে: যুক্তিগতভাবে যাযাবররা আক্ষরিক অর্থে ভ্রাম্যমান লোক যারা অপেক্ষাকৃত দ্বিধান্বিত অর্থনৈতিক জীবন এবং সবেমাত্র শুরু হওয়া রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে মিলিত হয়ে পরিবারের মতন সংগঠিত হয়। অন্যদিকে 'সাম্রাজ্য' কথাটি উপাদানগত অবস্থান এর ধারণা বহন করে। 'সাম্রাজ্য' জটিল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে স্থিতিশীলতা প্রদান করে। এটি একটি ব্যাপক শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের দ্বারা একটি ব্যাপক আঞ্চলিক কর্তৃত্বের শাসন প্রণয়ন করে। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে এই সংজ্ঞাগুলো লেখা হয়েছিল, তা হয়তো খুব সংকীর্ণভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে কল্পিত। যখন আমরা যাযাবর গোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত সাম্রাজ্য গঠনের সম্বন্ধে চর্চা করি, তখন বোঝা যায় যে এই ধারণা ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা মধ্য ইসলামীয় অঞ্চলের রাজ্যগঠন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেছি যার উৎস আরব উপদ্বীপের বেদুইন যাযাবর ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে একটি ভিন্ন যাযাবর গোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে: তারা হল মধ্য-এশিয়ার মোঙ্গাল গোষ্ঠী যারা চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে একটি আন্তর্মহাদেশীয় সাম্রাজ্য গঠন করেছিল, যার সাম্রাজ্য তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চিনের কৃষি নির্ভর সাম্রাজ্য গঠনের তুলনায় প্রতিবেশী মোঙ্গালরা দীন-দরিদ্র, অপেক্ষাকৃত কম জটিল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন যাপন করছিল। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার যাযাবর সমাজগুলো একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আবদ্ধ ছিল না যে তারা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। এই সমাজগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক রাখত, এদের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করত। বৃহত্তর সমাজ থেকে তারা শিখেছিল যে তারাও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারি মোঙ্গালরা চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে কীভাবে প্রচলিত ঐতিহ্যগত সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতিনীতি অভিযোজন করে একটি ভয়ঙ্কর সৈনিকতন্ত্র এবং অত্যাধুনিক শাসন পদ্ধতির সূচনা করেছিল। বিভিন্ন ধর্মের লোক, অর্থনীতি এবং মতামত সম্বলিত অঞ্চলে রাজত্ব করাটা মোঙ্গালদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কারণ মোঙ্গালদের পক্ষে তাদের স্টেপ অঞ্চলের ঐতিহ্যকে নতুন অধিকৃত অঞ্চলে প্রয়োগ করা সম্ভবপর ছিল না। তারা নতুন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিয়ে নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করে একটি যাযাবর সাম্রাজ্য গঠন করল যার ইউরেশিয়া সাম্রাজ্যের উপর গভীর প্রভাব পড়েছিল, এমনকি সেটি তাদের সমাজের চরিত্র এবং গঠন চিরকালের জন্য পাল্টে দেয়।

স্টেপবাসীরা কোন সাহিত্য রচনা করে যায়নি। সুতরাং যাযাবর সমাজ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি উপাখ্যান, ভ্রমণকাহিনি, শহুরে সাহিত্যিদের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিলপত্রাদি থেকে। এই লেখকরা প্রায়শই যাযাবর জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ এবং পক্ষপাত দুষ্ট বিবরণী পেশ করত। অবশ্য মোঙ্গালদের সাম্রাজ্য বিস্তারের

সফলতা অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে আকর্ষণ করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের অভিজ্ঞতার নিরিখে ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করল; অন্যরা তাদের মোঙ্গাল অধিপতিদের সেবার কাজে নিযুক্ত থাকল। এসব ব্যক্তিরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে এসেছিল— যেমন বৌদ্ধ, কনফুসিয়ান, খ্রিস্টান, তুর্কি এবং মুসলমান। যদিও তারা মোঙ্গালদের রীতিনীতির সাথে পরিচিত ছিল না, তাদের মধ্যে অনেকেই সহানুভূতিপূর্ণ বিবরণ এবং প্রশংসাত্মক স্তুতি রচনা করেছেন— যা স্টেপ অঞ্চলের লুঠেরাদের সম্পর্কে প্রচলিত শহরভিত্তিক বাণিজ্যের বিবরণকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয় এবং মোঙ্গালদের চিত্র আগের থেকে বেশি জটিল হয়ে যায়। মোঙ্গালদের ইতিহাস আমাদের এমন সব আকর্ষণীয় বিবরণ দেয় যা অভ্রমণশীল সমাজের দ্বারা যাযাবর গোষ্ঠীকে সাধারণত আদিম বর্বররূপে পেশ করার প্রচেস্টাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়।।

সম্ভবত মোঙ্গালদের সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছিল রাশিয়ার পণ্ডিতরা যা শুরু হয়েছিল অস্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যখন মধ্যএশিয়ার শাসকরা নিজেদের ক্ষমতা দৃঢ় করছিল। এই কাজগুলো ঔপনিবেশিক আবহাওয়ায় পরিবেশিত হয়েছিল এবং এগুলো বেশির ভাগই ছিল ভ্রমণকারী, সৈনিক, বণিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেশিত টিকা। বিংশ শতকের প্রথম দিকে, এই এলাকায় সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের বিস্তারের পর নতুন মার্ক্সবাদী ইতিহাস চর্চা বলে যে, প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক সম্পর্কের চরিত্র নির্ণয় করে। এটা চেঙ্গিজ খান এবং উদীয়মান মোঙ্গাল সাম্রাজ্যকে মানব বিবর্তনের এমন এক দাড়িপাল্লায় খাড়া করে যা প্রত্যক্ষ করছিল আদিবাসী ব্যবস্থা থেকে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তর। এটি ছিল শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা থেকে অপেক্ষকৃত এমন সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তর যেখানে প্রভু, ভূস্বামী এবং কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ছিল। এপ্রকার ইতিহাস নির্ণায়ক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, গবেষকরা মোঙ্গাল ভাষা, তাদের সমাজ এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গবেষণা চালিয়ে গেলেন, যেমন বোরিস ইয়াকোভ্লেভিক ভ্লাদিমিরটসভ (Borix yakovlevich vladimirtso)। অন্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা যেমন ভাসিলি ভ্লাডিমিরোভিক্ বারটোল্ড (Vasily Vladimirovich Bartold) সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারি নিয়মনীতি মানল না। একসময় যখন স্ট্যালিন-এর শাসনকাল আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিল, তখন চেঙ্গিস খান-এর নেতৃত্বে মোঙ্গালদের কর্মজীবন এবং কৃতিত্ব সম্পর্কে বারটোল্ড-এর ইতিবাচক মূল্যায়নের জন্য তাঁকে সেন্সর তথা বিবেচকদের কাছে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। এই পণ্ডিতব্যক্তির কাজের প্রচার গুরুতরভাবে সঙ্কুচিত করা হল এবং শুধু ১৯৬০-এর দশকে অনেক বেশি উদারপন্থী ক্রুশ্চেভ (Khruchev)-এর যুগে এবং তার পরে, তাঁর লেখাগুলো নয়টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

মোঙ্গাল সাম্রাজ্যের আন্তর্মহাদেশীয় প্রসার থেকে বোঝা যায় যে পণ্ডিত ও গবেষকদের কাছে যে উপাদান ছিল তা বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে। সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলো ছিল চিনা, মোঙ্গালিয়, পার্সি এবং আরবি ভাষাতে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গুলো ইতালীয়, ফরাসী এবং রুশ ভাষায়ও পাওয়া যায়। প্রায়শই একই লেখা দুই ভাষায় প্রকাশিত হয় যদিও বিষয়বস্তু ছিল আলাদা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোঙ্গালদের গোপন ইতিহাস (Monggol-Un-nivea tobea) নামক চেঙ্গিস খান সম্পর্কে লেখা বইয়ের চিনা ও মোঙ্গালীয় সংস্করণ একেবারেই ভিন্ন ছিল এবং এর সাথে মার্কোপোলের ভ্রমণ কাহিনির ইতালীয় এবং ল্যাটিন সংস্করণের কোন মিল নেই। যেহেতু মোঙ্গালরা খুব

বর্বর (Barbarian) কথাটি গ্রিক্ শব্দ barbaros থেকে এসেছে যার অর্থ গ্রিক নন এমন ব্যক্তি (Non Greek), যার ভাষা এলোমেলো শব্দের মত ধ্বনিত হয়: barbar. গ্রিক রচনায় barbarian তথা বর্বরদের শিশুদের মত চিত্রিত করা হয় যারা কথা বলতে অথবা চিন্তা করতে অক্ষম, ভীতু, মেয়েলি, অলস, লোভী এবং নিজেদের শাসন পরিচালনায় অসমর্থ। এই বাঁধাধরা গতি রোমানদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় যারা এই শব্দ জার্মান আদিবাসি গৌল (the Gauls) এবং হুন (the Huns)-দের জন্য ব্যবহার করত। স্টেপ অঞ্চলের বর্বরদের (barbarians) জন্য চিনাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ছিল, কিন্তু এর কোনোটাই কোনো যথার্থ অর্থ বহন করত না।

কম সাহিত্য রচনা করেছে, পরিবর্তে বিদেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক মোঙ্গালদের সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, সুতরাং ঐতিহাসিকদের মোঙ্গালদের ব্যবহৃত বুলির অর্থের সান্নিধ্যে আসার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদের কাজ করতে হত। একজন বিদ্বান ব্যক্তি ইগর দে র‍্যাচেউলস্-এর লেখা 'The Secret History of the Mongols' এবং গেরহার্ড ডোয়েরফার (Gerhard Doerfer)-এর মোঙ্গাল এবং তুর্কি পরিভাষাগুলো যা পার্সি ভাষায় প্রবেশ করেছে, তা মধ্য এশিয়ার যাযাবার গোষ্ঠীর ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আগত সমস্যাকে সামনে তুলে ধরেছে। এই অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশে আমরা লক্ষ করব যে, তাদের অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব অর্জন সত্ত্বেও চেঙ্গিস খান এবং মোঙ্গালদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অনেক কিছু আছে যা এখনো অধ্যাবসায়ী পন্ডিত ব্যক্তিদের সুবিবেচনার অপেক্ষায় আছে।

সূচনা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইউরো-এশিয়া মহাদেশের বড় সাম্রাজ্যগুলো, মধ্য এশিয়ার স্টেপ অঞ্চলের নতুন রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাবের বিপত্তি বুঝতে পেরেছিল ঃ চেঙ্গিস খান (d1227) মোঙ্গালদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। যাহোক চেঙ্গিজ খানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মধ্য এশিয়ার স্টেপ অঞ্চলে মোঙ্গাল আদিবাসীদের জোট গঠনের উদ্দেশ্যে আরও অনেক দূর এগিয়েছিল। কথিত আছে তাঁর কাছে ঈশ্বরের আদেশ ছিল পুরো ভারত জয় করার জন্য। যদিও চেঙ্গিস খানের নিজের জীবন কেটেছিল মোঙ্গালদের

মানচিত্র ১ : মোঙ্গাল সাম্রাজ্য

উপর তার অধিকার সুদৃঢ় করতে এবং পার্শ্ববর্তী উত্তর চিন, ট্রানসোক্সিয়ানা, আফগানিস্তান, উত্তর ইরান এবং রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করতে, তার উত্তরপুরুষরা চেঙ্গিস খানের স্বপ্ন পূরণের জন্য আরও কিছুদূর এগিয়েছিল এবং পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল।

চেঙ্গিস খানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার পৌত্র মৌঙ্কে (১২৬১—৬০) ফরাসী সম্রাট নবম লুইসকে (১২২৬—৭০) সতর্ক করে দেয়: 'স্বর্গে শুধু একটাই শাশ্বত অবিনশ্বর আকাশ আছে, পৃথিবীতে শুধু একজনই প্রভু আছে, তিনি হলেন স্বর্গের সন্তান চেঙ্গিস খান..... যখন শাশ্বত স্বর্গের শান্তিতে পূর্ণ বিশ্ব, সূর্যের উদয় থেকে শুরু করে অস্ত পর্যন্ত আনন্দিত এবং শান্তিতে থাকবে, তখন স্পষ্ট হবে যে আমরা কী করতে যাচ্ছি। যদি আপনি শাশ্বত স্বর্গের আদেশ বুঝেও কর্ণপাত না করেন এবং কেবল বলেন যে, "আমাদের দেশ দূরে আছে, আমাদের বিরাট পর্বত আর আমাদের বিশাল সমুদ্র"। যদি এই বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবল নিয়ে আসেন তাহলে আমরাও জানি আমরা কী করতে পারি। শাশ্বত স্বর্গও জানে কে কঠিনকে সহজ বানিয়েছে আর সুদূরকে নিকট এনে দিয়েছে।'

এগুলো শুধু শূন্যগর্ভ ভয় প্রদর্শন ছিল না। চেঙ্গিসখানের আরেকজন পৌত্র বাটু (Batu) তার ১২৩৬—১২৪১-এর অভিযানগুলোতে রাশিয়ার ভূমিকে মস্কো পর্যন্ত বিধ্বস্ত করে দেয় এবং পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিকে জয় করে ভিয়েনার বাইরে শিবির স্থাপন করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এটা বোঝা যাচ্ছিল যে শাশ্বত আকাশ মোঙ্গালদের পক্ষে ছিল এবং চিনের বহু অংশ, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপ মানতে শুরু করল যে পৃথিবীর উপর চেঙ্গিস খানের বিজয় 'ঈশ্বরের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ' আর তা ছিল বিচারের দিনের শুরু।

বুখারা অধিকার

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দশকে ইরানের মোঙ্গাল শাসকদের পারসিক ঘটনাপঞ্জীকার জুবাইনি (Juwaini) ১২২০ খ্রিস্টাব্দে বুখরা জয়ের বিবরণ দিয়েছে। জুবাইনির বিবরণ অনুসারে নগর বিজয়ের পর চেঙ্গিস খান উৎসবের ময়দানে যান যেখানে নগরের ধনী বণিকরা একত্রিত হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "হে জনতা! তোমরা এটা জান যে তোমরা মহাপাপ করেছ। তোমরা যদি আমার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে প্রশ্ন কর, আমার কাছে এ ব্যাপারে কী প্রমাণ আছে, তাহলে আমি বলবো যে, আমি হলাম ঈশ্বরের প্রেরিত দূত। যদি তোমরা মহাপাপ না করতে, তাহলে ভগবান আমাকে দূত হিসেবে তোমাদের কাছে পাঠাতেন না।" তখন একটি ব্যক্তি বুখারা দখলিকৃত হওয়ার পর পালিয়ে কোরাসান চলে যায়।

নগরের পরিণতি সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে সে উত্তর দেয় : 'তারা এসে নগরের দেওয়াল গুলো ধ্বংস করে ফেলে, মানুষকে হত্যা করে, লুণ্ঠন করে এবং চলে যায়।

কার্যাবলি-১

ধরে নাও জুবাইনিদের বুখারা দখল করার ব্যাখ্যাটি সঠিক ছিল। এখন কল্পনা করো তুমি বুখারা ও খোরাসানের অধিবাসী যে এই ভাষণ শুনছ। তোমার উপর এর কী প্রভাব পড়বে?

মোঙ্গালরা কীভাবে এমন একটি সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছিল যা অপর বিশ্ববিজেতা আলেকজান্ডারের কৃতিত্বকেও ম্লান করে দিয়েছিল? প্রাক্ শিল্পযুগে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত ছিল, তখন মোঙ্গালরা তাদের বিশাল সাম্রাজ্যকে শাসন এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কী কৌশল অবলম্বন করেছিল? যে ব্যক্তির নিজের নীতির এবং শাসনের দৈব অধিকারের প্রতি এত আত্মবিশ্বাস ছিল, সেই চেঙ্গিস খান তার নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সামাজিক এবং ধর্মীয় লোকের সাথে কীভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন? তাঁর রাজসত্তার বিকাশে এই বহুবিবিধতার কী পরিণতি হয়েছিল? যাই হোক মোঙ্গাল তথা চেঙ্গিস খানের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষপট ভালোভাবে বোঝার জন্য আমাদের বিনম্র প্রশ্নগুচ্ছ দিয়ে আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন। মোঙ্গাল কারা? তারা কোথায় বাস করত? ওদের সম্পর্ক কাদের সাথে ছিল এবং তাদের সমাজ আর রাজনীতি সম্বন্ধে আমরা কীভাবে জানতে পারি?

মোঙ্গালদের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

মোঙ্গালরা পূর্বদিকের তাতার, খিতান এবং মাঞ্চুস্ এবং পশ্চিমের তুর্কি আদিবাসিদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত লোক। মোঙ্গালদের মধ্যে কেউ ছিল পশুপালক, কেউ আবার শিকারী-সংগ্রাহক ছিল। মেষপালকরা ঘোড়া, ভেড়া এবং অল্প পরিমাণে গবাদি পশু, ছাগল এবং উট পালত। তাদের যাযাবরীকরণ মধ্য এশিয়ার চারণভূমিতে (স্টেপ অঞ্চলে) হয়েছিল, যেখানে আধুনিক মোঙ্গাল রাজ্যের ভূভাগ ছিল। এটা ছিল (এখনো আছে) দিগন্ত বিস্তৃত, ঢেউখেলা সমতল ভূমিতে ঘেরা মনোরম স্থান যার পশ্চিম ভাগে অলতাই পাহাড়ের বরফে আবৃত চূড়া ছিল। এর দক্ষিণ ভাগে শুষ্ক গোবি মরুভূমি, বয়ে যাওয়া অনোন এবং সেলেঙ্গা নদী, উত্তরে এবং পশ্চিমে বরফে গলা পাহাড়গুলো থেকে বেরিয়ে আসা অসংখ্য ছোটো ছোটো ঝরণা। আরামদায়ক ঋতুতে পশুচারণের জন্য উজ্জ্বল শ্যামল ঘাস এবং উল্লেখযোগ্য ছোটো ছোটো খেলা সহজলভ্য ছিল। শিকার-সংগ্রাহকরা সাইবেরিয়ার অরণ্যে পশুপালকদের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করত।

বন্যার সময় অনোন নদী

এরা পশুপালক গোষ্ঠী থেকেও হতদরিদ্র ছিল এবং গ্রীষ্মকালে ফাঁদে আটকানো পশুদের চামড়ার ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করত। পুরো এলাকায় অধিক ও ন্যূনতম তাপমাত্রার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল: কঠোর ও সুদীর্ঘ শীতের পর ক্ষণকালের জন্য শুষ্ক গরমকাল শুরু হত। বছরের খুব অল্পসময় চারণভূমিতে কৃষিকাজ সম্ভবপর ছিল, কিন্তু মোঙ্গালরা (সুদূর পশ্চিম ভাগের কিছু তুর্কীদের বিপরীতে) কৃষিকাজকে বেছে নেয়নি। পশুচারণ কিংবা শিকার-সংগ্রাহক অর্থ ব্যবস্থার কোনোটিই ঘন জনসংখ্যার উপনিবেশকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম ছিল না। ফলে এই এলাকায় কোনো শহর ছিল না। মোঙ্গালরা তাবু এবং জরে-তে (gers) বাস করত এবং তাদের পশুদল নিয়ে শীতকালীন নিবাস স্থল থেকে গ্রীষ্মকালীন চারণভূমিতে চলে যেত।

জাতিগত ও ভাষাগত বন্ধন মোঙ্গালদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল, কিন্তু সম্পদের অভাবে তাদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক বংশে বিভক্ত ছিল। গরিব পরিবারগুলো ছিল অধিকতর বড়ো, তাদের কাছে অধিক সংখ্যায় পশু ও চারণভূমি থাকত। এজন্য তাদের অনেক অনুগামী ছিল এবং আঞ্চলিক রাজনীতিতে তাদের প্রভাব অনেক বেশি ছিল। নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়, যেমন অস্বাভাবিক কঠোর শীতে যখন খেলা এবং সংরক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী ফুরিয়ে যেত অথবা খরার ফলে তৃণভূমি শুষ্ক হয়ে যেত, তখন পরিবারগুলোকে পশুখাদ্যের সন্ধানে ঘুরতে হত। এর ফলে তৃণভূমির জন্য তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হত এবং পশু ছিনতাই হত। প্রায়শই পরিবারসমূহ আক্রমণ এবং নিজেদের রক্ষার জন্য তারা অধিক শক্তিশালী বংশের সাথে মিত্রতা রাখত, কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই সংঘগুলো ছিল ছোটো এবং ক্ষণস্থায়ী। চেঙ্গিস খানের মোঙ্গাল এবং তুর্কি উপজাতি-সংঘের আকারে মিল ছিল যা পঞ্চম শতাব্দীতে আট্টিলা (৪৫৩ খিস্টাব্দে) একসাথে জুড়েছিল।

আট্টিলার অপেক্ষা চেঙ্গিস খানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনেক বেশি স্থায়ী ছিল এবং এর প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরও তা টিকে ছিল। এই ব্যবস্থা এতো বেশি মজবুত ছিল যে চিন, ইরান এবং পূর্ব ইউরোপের উন্নত দেশের শত্রুদের মত উন্নত সামরিক উপকরণের সাথেও মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিল। মোঙ্গালরা এই অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করার সাথে সাথে জটিল কৃষিব্যবস্থা এবং নগর জীবন-স্থানবদ্ধ সমাজকে (Sedentary Societies) দক্ষতার সাথে শাসন করেছে— যা তাদের সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাস থেকে অনেক দূরে ছিল।

যদিও যাযাবরী সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগঠন কৃষি অর্থব্যবস্থা থেকে অনেক ভিন্ন প্রকৃতির ছিল, কিন্তু এই দুই সমাজ একে অপর থেকে আলাদা ছিল না। বাস্তবে স্টেপ অঞ্চলের স্বল্প পুঁজি তথা সম্পদের জন্য মোঙ্গালদের এবং মধ্য এশিয়ার যাযাবরদের ব্যবসা এবং বস্তু বিনিময়ের জন্য তাদের প্রতিবেশী চিনের স্থায়ী নিবাসীদের নিকট যেতে হত। এই ব্যবস্থা দুই পক্ষের জন্যই লাভজনক ছিল: চিন থেকে তারা কৃষিজাত উৎপাদন এবং লৌহ পাত্রের পরিবর্তে ঘোড়া, পশম এবং ফাঁদে আটকানো শিকারের বিনিময় করত। বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপে তাদের অনেক উত্তেজনার সম্মুখীন হতে হত। কারণ দুই পক্ষই অধিক লাভের জন্য নির্দ্বিধায় সামরিক চাপ প্রয়োগ করত। যখন মোঙ্গাল বংশধররা সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করত, তখন তারা প্রতিবেশী চিনাদেরকে বাধ্য করত বাণিজ্যক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধাজনক শর্ত রাখার জন্য তারা কখনো কখনো বাণিজ্যিক বন্ধন প্রত্যাখ্যান করে কেবল লুটপাট করত। এই সম্পর্কগুলো মোঙ্গালরা যখন ছত্রভঙ্গ হত, তখন পরিবর্তিত হয়ে যেত। এমতাবস্থায় চিনারা স্টেপ অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে 'প্রয়োগ' করত। এই সীমান্তবর্তী যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বসবাসকারী লোকেদের দুর্বল করে

নীচে মধ্য প্রাচ্যের মহান স্টেপ অঞ্চলের মৈত্রী সংঘের তুর্কী ও মোঙ্গালদের তালিকা দেওয়া হল। তারা সবাই একই অঞ্চল অধিকার করত না এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংগঠনে সমান বৃহৎ এবং জটিল ছিল না। যাযাবর জনসংখ্যার ইতিহাসে তাদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল কিন্তু চিন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাদের প্রভাব বিভিন্ন প্রকার ছিল।

স্যাঙ-নিউ (২০০ খ্রি.পূর্বাব্দ) (তুর্কীরা)

জুয়ান-জুয়ান (৪০০ খ্রস্টাব্দ) (মোহগলগণ)

ইপথালিট হুনগণ(৪০০খ্রি.) (মোঙ্গালগণ)

টিউ-চুয়ে (৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ) (তুর্কীগণ)

উইঘুরস্ (৭৪০ খ্রিষ্টাব্দ) (তুর্কীগণ)

খিতান (৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ) (মোঙ্গালগণ)

দিত। তারা কৃষিকাজকে স্থানচ্যুত করে দিত এবং শহর লুটপাট করত। অন্যদিকে, যাযাবররা সংঘর্ষস্থল থেকে দূরে পশ্চাদপসরণ করতে পারত সীমিত ক্ষতির পর। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে চিন যাযাবরদের অনধিকার প্রবেশের সমস্যায় পীড়িত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে বিভিন্ন শাসনকালে বিভিন্ন শাসক দুর্গ নির্মাণ করে তাদের প্রজাদের রক্ষা করেছে। এই দুর্গ নির্মাণ বিদ্যা শেষপর্যন্ত একটি সাধারণ আত্মরক্ষামূলক কাজের রূপরেখার অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা এখন Great wall of china নামে পরিচিত — যা উত্তর চিনের কৃষি সমাজগুলোর উপর যাযাবর হামলা সংক্রান্ত ঝামেলা এবং ভীতি প্রদর্শনের জবাব হিসেবে গড়ে উঠা একটি নাটকীয় এবং বাস্তব প্রমাণ।

চিনের প্রাচীর

চেঙ্গিস খাঁর জীবন যাত্রা :

১১৬২ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনও এক সময় বর্তমান মঙ্গোলিয়ার উত্তরে অবস্থিত ওনোন নদীর তীরে চেঙ্গিস খাঁ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশবে তাঁর নাম ছিল তেমুজিন, তাঁর পিতার নাম ছিল য়েসুজেই(Ysugei)। তিনি কিয়াতদের সর্দার ছিলেন। কিয়াত এমন কতকগুলো পরিবারের সমষ্টি যাদের বর্জিগিড (Borjigid) গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক ছিল। অল্প বয়সেই তাঁর পিতাকে হত্যা করা হয়। তাঁর মা ওয়েলুন-একে তেমুজিন ও তাঁর ভাই এবং সৎ ভাইকে প্রচণ্ড কষ্টে লালন-পালন করেছিলেন। পরবর্তী দশকটি খুব বিপর্যয়ে ভরা ছিল। তেমুজিনকে অপহরণ করে দাস বানানো হয়েছিল এবং তার স্ত্রী বোর্তে-কে বিবাহের পরে অপহরণ করা হয়েছিল। স্ত্রীকে পুনরুদ্ধার করার জন্য তেমুজিনকে যুদ্ধ করতে হয়। তাঁর এই বিপর্যয়পূর্ণ সময়েও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুকে কাছে পেয়েছিলেন। যুবক বঘুরচু তাঁর প্রথম বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। তাঁর রক্তসম্পর্কিত ভাই, জামুকা তাঁর অপর একজন বিশ্বস্ত বন্ধু। কেরেয়িটদের দের শাসক তুঘরিল ওরফে ওঙ খাঁ তেমুজিনের পিতার রক্তের সম্পর্কের ভাই ছিলেন। তেমুজিন তার সাথেও পুরোনো সম্পর্ক জোড়া দেন।

যদিও জামুকা তাঁর পুরানো বন্ধু ছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি তাঁর শত্রুতে পরিণত হন। ১১৮০ এবং ১১৯০ এর সময়কালে তেমুজিন ওঙ খানের বন্ধু ছিলেন এবং তিনি এই বন্ধুত্বকে ব্যবহার করে জামুকার মত শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করেছিলেন। জামুকাকে পরাজিত করার পর তেমুজিনের

আত্মবিশ্বাস জন্মায় এবং তিনি অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেন। এর মধ্যে শক্তিশালী তাতারদেশী (তাঁর পিতার হত্যাকারী) দের বিরুদ্ধে কিরাইত এবং স্বয়ং ওঙ খাঁ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ করেছিলেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে শক্তিশালী জামুকা এবং নেইমন মানুষদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার পর তেমুজিন স্টেপ অঞ্চলের রাজনীতিতে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে উঠেন। মোঙ্গাল পরিষদের সর্দারদের এক সভায় তাঁকে প্রভাবশালী বলে মান্যতা দেওয়া হয় এবং তাঁকে চেঙ্গিস খাঁ, সামুদ্রিক খান, বা 'সর্বজনীন শাসক' এর উপাধি সহ মোঙ্গালদের মহান হিসেবে ঘোষিত করা হয়।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ 'কুরিলতাই' উপাধি পাওয়ার আগে মোঙ্গালদের নিয়ে আরও কার্যকর এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিক বাহিনী পুনর্গঠিত করেন (নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদটা দেখো)। এই বাহিনী ভবিষ্যতে তাঁর সৈন্য অভিযানে সাফল্য এনে দিয়েছিল। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল চিন বিজয়। সে সময় চিন তিনটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল ঃ যেখানে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তিব্বতী সি-সিয়া জাতির জনগন (Hsi Hsia) এর বাস ছিল। জার্চেনদেরও চিনা রাজবংশীয়রা শাসন করত। এই চিনা রাজবংশীয়রা পিকিং থেকে উত্তরচিন পর্যন্ত শাসন কার্য পরিচালনা করত। দক্ষিণ চিন অঞ্চল শুঙ্গ রাজবংশের অধীনে ছিল। ১২০৯ খ্রিস্টাব্দে সি-সিয়া জনগণ পরাজিত হয়। ১২১৩ খ্রিস্টাব্দে চিনের বিখ্যাত প্রাচীর অতিক্রম করে চেঙ্গিস খাণ ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে পিকিং নগর লুট করেছিলেন। ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চিনাদের সাথে যুদ্ধ চলেছিল কিন্তু চেঙ্গিস খাঁ নিজের অভিযানের অগ্রগতিতে খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। ফলে এই অঞ্চলের সামরিক বিষয়গুলো তাঁর অধস্তনের উপর ছেড়ে দিয়ে ১২১৬ সালে তিনি তাঁর মঙ্গোলিয়ান মাতৃভূমিতে ফিরে গিয়েছিলেন।

১২১৮ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে চিনের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত তিয়েনশান পার্বত্য অঞ্চলের শাসনভার খিতাতের হাত থেকে মোঙ্গালদের হাতে চলে আসে। ক্রমে মোঙ্গালদের রাজত্ব আমুদরিয়া, তুরান এবং খুয়ারজম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। খুয়ারজমের শাসক সুলতান মহম্মদ মোঙ্গালীয় দূতকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ায় চেঙ্গিস খাঁ প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়েছিলেন। ১২১৯ থেকে ১২২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যকার সামরিক অভিযানের সময় বড়ো বড়ো শহরগুলো যেমন অট্রার, বুখারা, সমরখণ্ড, বাল্ক, গুরগঞ্জ, মার্ব নিশাপুর এবং হেরাত মোঙ্গাল সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। যে শহরগুলো প্রতিরোধ করেছিল তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল। মোঙ্গাল সৈন্যদল যখন নিশাপুর অবরোধ করে রাখে তখন যুদ্ধে একজন মোঙ্গাল রাজকুমারকে হত্যা করা হয়েছিল। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ চেঙ্গিস খাঁ আদেশ দেন, এই নগরকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করা হোক যাতে পুরো শহর ধূলিসাৎ হয়। নিজের প্রতিশোধ স্পৃহাকে (রাজকুমারের হত্যার জন্য) উগ্ররূপ দেওয়ার জন্য তিনি শহরের বেড়াল, কুকুরকেও হত্যা করতে বলেন।

মোঙ্গালদের দ্বারা কৃত ধ্বংসলীলার আনুমানিক বিস্তৃতি

চেঙ্গিস খাঁর সামরিক অভিযানের বিষয়ে প্রাপ্ত সমস্ত বিবরণ থেকে এই ব্যাপারে সম্মত হওয়া যায়, যে সমস্ত শহর চেঙ্গিস খাঁর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেছে, তাঁর সৈন্যদল সেই শহরগুলোতে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। এর ব্যাপকতা হতবাক করে দেওয়ার মতো। ১২২০ খ্রিস্টাব্দে নিশাপুর অবরোধ করে রাখার সময় ১৭,৪৭,০০০ জন লোককে হত্যা করা হয়েছিল।

১২২২ খ্রিস্টাব্দে হেরাতে ১৬,০০,০০০ লোককে এবং ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে ৮০,০০,০০ লোককে হত্যা করা হয়। ছোটো ছোটো শহরে তুলনামূলক কম নরহত্যা হয়েছিল। নাসাতে ৯০,০০০, বেহাক জেলাতে ৭০,০০০ এবং কুহিস্তান প্রদেশের তুন নগরে ১২,০০০ লোককে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। মধ্যযুগের ঐতিহাসিকগণ কীভাবে নিহতের সংখ্যা নিরূপণ করেছিলেন?

ইলখাঁর ফার্সি ইতিবৃত্তকার জুবেনি বলেছিলেন, মার্ভেতে ১৩,০০,০০০ লোককে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি তেরো দিন ধরে প্রতিদিন ১,০০,০০০ মৃতদেহ গণনা করে মৃত্যুর মোট সংখ্যাটা অনুমান করেছিলেন।

উল্টো পৃষ্ঠায় ইউরোপীয় চারুশিল্পীর দ্বারা 'বর্বরদের কল্পিত চিত্র।

মোঙ্গাল সৈন্যরা সুলতান মহম্মদের পশ্চাদ্ধাবন করে আজারবাইজান পর্যন্ত চলে এসেছিল এবং ক্রিমিয়াতে রাশিয়ান সেনাদের পরাজিত করার সাথে সাথে তারা কাস্পিয়ান সাগরকে অধিকৃত করে নিয়েছিল। অপর সৈন্যদল সুলতান পুত্র জালালউদ্দিনকে অনুকরণ করে আফগানিস্তান থেকে সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিল। সিন্ধু নদীর তটবর্তী অঞ্চলে এসে চেঙ্গিস খান উত্তর ভারত ও অসম হয়ে মঙ্গোলিয়া ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রচণ্ড গরম, প্রাকৃতিক বাসস্থান এবং তাঁর গনৎকার বিপদ চিহ্নের আভাস দিলে তিনি নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।

জীবনের অধিকাংশ সময় সামরিক যুদ্ধে কাটানোর পর ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সামরিক সাফল্যগুলো ছিল বিস্ময়কর এবং মূলত নতুন নতুন সামরিক কৌশল উদ্ভাবন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বনের ফলে তিনি এই সাফল্য লাভ করেছিলেন।

মোঙ্গাল এবং তুর্কিদের অশ্বচালনার দক্ষতা তাঁর সৈন্যবাহিনীকে গতিশীলতা দান করে। ঘোড়ার পিঠে বসে দক্ষতার সাথে দ্রুত তিরন্দাজী করার কৌশল তারা প্রতিদিনের জীবনে জঙ্গাল থেকে পশু শিকার করার অভ্যাসের মাধ্যমে রপ্ত করেছিল। স্টেপ অঞ্চলের অশ্বারোহীরা সবসময় ক্ষিপ্রতার সাথে দ্রুত চলাচল করত, এরপর তারা তাদের আশেপাশের ভূ-খণ্ড এবং আবহাওয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, যার ফলে তারা অভাবনীয় কাজ করার ক্ষমতা লাভ করে। তারা প্রচণ্ড শীতে তাদের যুদ্ধ অভিযান শুরু করে, শত্রুর শহর এবং শিবিরে প্রবেশ করার জন্য তারা হিমায়িত নদীকে রাজপথ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। যাযাবররা সাধারণত প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত শিবিরকে ধ্বংস করতে সক্ষম ছিল না, কিন্তু চেঙ্গিস খাঁ খুব তাড়াতাড়ি অবরোধ-যন্ত্র (siege-engine) এবং পেট্রোল গোলাবর্ষণ এর ব্যবহার গুরুত্ব দিয়ে শিখেছিলেন। তাঁর প্রকৌশলীরা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যবহার করার জন্য হালকা এবং সহজে বহন করা যায় এরকম অস্ত্র নির্মাণ করে, যার দ্বারা তারা শত্রুপক্ষের উপর বিধ্বংসী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।

১১৬৭ খ্রিঃ প্রায়	তেমুজিন এর জন্ম
১১৬০ থেকে ৭০ এর দশক	দাসত্ব এবং সংঘর্ষের বছর
১১৮০ থেকে ৯০ এর দশক	সন্ধি স্থাপনের কাল
১২০৩-২৭	বিস্তার এবং বিজয়
১২০৬	তেমুজিনকে চেঙ্গিস খাঁ, তথা 'বিশ্বজনীন শাসক' বলে ঘোষণা করা হয়।
১২২৭	চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যু
১২২৭-৬০	তিন মহান খাঁর শাসন এবং মোঙ্গাল ঐক্য স্থাপন
১২২৭-৪১	চেঙ্গিস খাঁর পুত্র ওগোদেই এর শাসন কাল
১২৪৬-৪৯	ওগোদেই এর পুত্র গুয়ুক এর সময়কাল
১২৫১-৬০	চেঙ্গিস খাঁর ছোটো ছেলে তুলুই এর পুত্র মঙ্কের সময়কাল
১২৩৬-৪২	বাটুর অধীনে রাশিয়া, হাঙ্গোরি, পোল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়াতে আক্রমণ। বাটু চেঙ্গিস খাঁর সবচেয়ে বড়ো ছেলে জোচির পুত্র ছিল।
১২৫৩-৫৫	মঙ্কের অধীনে ইরান এবং চিনে নতুন করে অভিযান শুরু।

১২৫৮	বাগদাদ অধিগ্রহণ এবং আব্বাসিদ খিলাফতের সমাপ্তি। মঙ্কের ছোটো ভাই হুলেগুর অধীনে ইরানে ইল-খানিদ রাজ্য স্থাপন। জোচিদ এবং ইল খাঁর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু।
১২৬০	পিকিং এ 'মহান খাঁ' হিসেবে কুবিলাই খাঁর রাজ্যাভিষেক। চেঙ্গিস খাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ; মোঙ্গল রাজ্য ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—তোলুই, চখতাই এবং জোচি (অগোদেই বংশ পরাজিত হয় এবং তোলুয়িদ বংশে মিশে যায়)। তোলুয়িদ : চিনের য়ুয়ান বংশ এবং ইরানের ইল-খানিদ রাজ্য উত্তর তুরানের স্টেপি অঞ্চল এবং তুর্কিস্থানে চঘতাই সাম্রাজ্য রাশিয়ার স্টেপি অঞ্চলে জোচিদ বংশের রাজত্ব ছিল, পর্যবেক্ষকরা তাদের 'গোল্ডেন হোর্ডি' নামে বর্ণনা করত।
১৫৫৭-৬৭	বাটুর পুত্র বার্কের রাজত্বকাল। সোনালী যাযাবররা নেস্টিরিয়ান খ্রিস্টান ধর্মের পথ ছেড়ে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৩৫০ এর দশকে নিশ্চিতরূপে ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ইল খাঁর বিরুদ্ধে অভিযানের উদ্দেশ্যে 'গোল্ডেন হোর্ডি' ও মিশরীয়দের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।
১২৯৫-১৩০৪	ইরানে ইল-খানিদ শাসক গজন খাঁর শাসন কাল। তাঁর বৌদ্ধধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে অন্য ইলখানী সর্দারদেরও ধর্মান্তকরণ হওয়া শুরু হয়।
১৩৬৮	চিনে ইউয়ান রাজবংশের অবসান।
১৩৭০-১৪০৫	তৈমুরের শাসন, যিনি বরলাস হয়ে তিনি চ্যাংহাতাই বংশের মাধ্যমে নিজেকে চেঙ্গিস খাঁর বংশ বলে দাবি করেন। তিনি তলুই রাজত্বের চঘতাই এবং জোচি রাজ্যের কিছু (চিনকে ছেড়ে) অংশকে একত্র করে তিনি স্টেপ অঞ্চলে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি নিজেকে 'গুরেগেন'—বা 'রাজকীয় জামাই' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং চেঙ্গিস খাঁর বংশের এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন।
১৪৯৫-১৫৩০	তৈমুর এবং চেঙ্গিস খাঁর বংশধর জাহিরুদ্দিন বাবর, ফরগনা এবং সমরখণ্ডের তৈমুরী অঞ্চলের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁকে অপসারণ করা হয়। তিনি কাবুলকে লুণ্ঠন করেন এবং ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি এবং আগ্রাকে দখল করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।
১৫০০	জোচির কনিষ্ঠ পুত্র শিবানের বংশধর শায়াবানী খান তুরানে আধিপত্য স্থাপন করেন। তুরানে শায়বানী শক্তিকে(শায়বানীদের উজবেগ বলে অভিহিত করা হত যাদের নাম অনুসারে বর্তমান উজবেকিস্তান দেশের নামকরণ হয়) মজবুত করা হয় এবং এই অঞ্চল থেকে বাবর এবং তৈমুরের বংশধরদের বিতারিত করা হয়।
১৭৫৯	চিনের মাঞ্চুবংশ মঙ্গোলিয়া জয় করে।
১৯২১	মঙ্গোলিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

চেঙ্গিস খাঁর পরবর্তীকালের মোঙ্গলরা

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর আমরা মোঙ্গাল সাম্রাজ্যকে দুটি ধাপে স্পষ্ট ভাবে ভাগ করতে পারি। প্রথম ধাপ ছিল ১২৩৬-১২৪২ পর্যন্ত, যখন তারা রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চল, বুলঘার, কীব, পোল্যান্ড এবং হাঙ্গোরিতে প্রচুর সফলতা লাভ করেছিল। দ্বিতীয় ধাপ ছিল ১২৫৫-১৩০০ পর্যন্ত, যখন তারা সমস্ত চিন (১২৭৯ খ্রিস্টাব্দ) ইরান, ইরাক এবং সিরিয়াতে সাম্রাজ্য বিস্তারে সাফল্য লাভ করেছিল। এই অভিযানের পরে সাম্রাজ্যের সীমান্ত স্থিতিশীল হয়েছিল।

১২০৩ এর পরবর্তীকালের দশকগুলোতে মোঙ্গাল সামরিক বাহিনীকে খুব কমই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে ১২৬০ এর দশকের পরে পশ্চিমে সৈন্য অভিযানের প্রারম্ভিক সাফল্য ধরে রাখা সম্ভবপর হয়নি। যদিও ভিয়েনা এবং এর বাইরের পশ্চিমী ইউরোপ এবং মিশর মোঙ্গাল সেনাদের দখলেই ছিল। তবুও তাদের হাঙ্গোরির স্টেপ অঞ্চল থেকে পশচাদপসরণ করতে হয় এবং মিশরের সৈন্যবাহিনীর হাতে পরাজিত হওয়ার পর নতুন রাজনৈতিক প্রবণতার উত্থান দেখা দেয়। এই ঘটনার পেছনে দুই ধরনের মতামত কাজ করেছিল। প্রথমত, মোঙ্গাল পরিবারের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ছিল যেখানে প্রথম দুই প্রজন্মের জোচি এবং ওগোডাই বংশের উত্তরাধিকারীরা মহান খাঁর রাজ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য একজোট হয়েছিল। এই কারণে ইউরোপ অভিযান করার চেয়ে নিজেরে নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলকে রক্ষা করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যখন চেঙ্গিস খানের বংশধরদের তেলুয়িড শাখার উত্তরাধিকারীরা জোচি এবং ওগোডাই বংশকে দুর্বল করে দিয়েছিল। মঙ্কে, যিনি চেঙ্গিস খানের সবচেয়ে ছোটো পুত্র তলুইয়ের বংশধর ছিলেন, তাঁর রাজ্যাভিষেকের পরেই তিনি ১২৫০ এর দশকে ইরানে শক্তিশালী অভিযান করেন। কিন্তু ১২৬০ দশকে তলুই এর বংশধররা চিনে জয়লাভ করার উদ্দেশ্যে, মোঙ্গালিয়া সাম্রাজ্যের মূল ভূ-খন্ডের দিকে সৈন্যবাহিনী এবং বিভিন্ন সামগ্রী দ্রুত সরবরাহ করতে লাগল। এই ঘটনার পরিণামস্বরূপ মিশরের সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার জন্য মোঙ্গালরা অল্পসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করতে সক্ষম হয়। মোঙ্গালদের পরাজয় এবং তলুই পরিবারের চিনের প্রতি ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপের জন্য তাদের পশ্চিম দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের অবসান ঘটে। একই সময়ে, বুশ এবং চিনের সীমান্তে জোচি এবং তলুইদের বংশধরদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব জোচিদের ইউরোপে সম্ভাব্য অভিযান থেকে সরিয়ে দিয়েছিল।

পশ্চিমে মোঙ্গালদের বিস্তার বন্ধ হয়ে গেলেও চিনে তাদের অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, মূলতঃ মোঙ্গালরাই চিনকে একত্রীকরণ করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত মনে হলেও সবচেয়ে বেশি সফলতা প্রাপ্ত করার সময় শাসক-পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ অশান্তি দেখা দিয়েছিল। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অনুচ্ছেদে মোঙ্গালদের রাজনৈতিক উদ্যোগের সাফল্যের কারণ নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই উদ্যোগের ফলে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে অনেক বাধাও এসেছিল।

সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক সংগঠন

মোঙ্গাল এবং অন্য অনেক যাযাবর সমাজে প্রত্যেক সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অস্ত্রবহন করত, প্রয়োজন হলে তাদের মধ্য থেকেই সশস্ত্র সেনাবাহিনী গঠন করা হত। বিভিন্ন মোঙ্গাল উপজাতি গোষ্ঠীগুলোকে একত্রীকরণ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে চেঙ্গিস খাঁর সৈন্যবাহিনীতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এর ফলে এই সৈন্যবাহিনী অপেক্ষাকৃত ছোটো ও জটিল এবং অবিশ্বাস্যরকম বৈচিত্র্যময় সংগঠনে পরিণত

হয়েছিল এর মধ্যে তাঁর কর্তৃত্বকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেওয়া তুর্কি উইঘুর সম্প্রদায়ের লোকেরাও সামিল ছিল। কিরায়িত জাতির মতো পরাজিত লোকেরাও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদের সাথে পুরোনো শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে মহাসঙ্ঘে সামিল করা হয়েছিল।

চেঙ্গিস খাঁ বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায় যারা তাঁর মহাসঙ্ঘে সামিল হয়েছিল, তাদের পুরাতন উপজাতীয় পরিচিতিকে মুছে ফেলতে দৃঢ় ভাবে সচেস্ট ছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী স্টেপ অঞ্চলের প্রাচীন দশমিক পদ্ধতি অনুসারে গঠন করা হয়; যা দশক, শতক, হাজার এবং (আনুমানিক) দশহাজার এককে বিভক্ত ছিল। পুরাতন পদ্ধতিতে বংশ, সমাজ বা গোষ্ঠী দশমিক এককে সহাবস্থান করত। চেঙ্গিস খান এই প্রথার পরিসমাপ্তি করেন। তিনি প্রাচীন উপজাতি গোষ্ঠীকে বিভক্ত করে তাদের সদস্যদের নতুন সামরিক বাহিনীতে বন্টন করে দেন। কোনও ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে তার দল থেকে বাইরে যেত, তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হত। সৈনিকদের বৃহত্তম এককটি প্রায় দশ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল যাতে বিভিন্ন উপজাতি এবং গোষ্ঠীর মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি স্টেপ-অঞ্চলের প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করেন এবং বিভিন্ন বংশ এবং গোষ্ঠীকে একত্রীকরণ করে তাদের একটি নতুন পরিচয় প্রদান করেন।

নতুন সৈন্যবাহিনী, যা তাঁর চার পুত্রের অধীন ছিল, এবং বিশেষ ভাবে নির্বাচিত সেনা অধিনায়কের অধীনে কাজ করত, তা নয়ান নামে পরিচিত ছিল। এই নতুন শাসন-ব্যবস্থাতে তাঁর অনুসারীদের এমন সম্প্রদায়ও সামিল ছিল যারা বহু বছর ধরে প্রতিকূল অবস্থাতেও চেঙ্গিস খাঁকে বিশ্বস্তভাবে সঙ্গ দিয়েছিল। চেঙ্গিস খাঁ অনেক ব্যক্তিকে আন্দা (রক্তের সম্পর্কের ভাই) বলে প্রকাশ্যে সম্মানিত করেছিলেন, আবার অনেক আন্দা নিম্নশ্রেণিভুক্ত ছিল যাদের চেঙ্গিস খাঁ নিজের বিশেষ দাসের পদমর্যাদা দিয়েছিলেন। দাস এর পদ তাদের নিজের প্রভুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চিহ্নিত করত। এভাবে নতুন বিন্যাস প্রক্রিয়ার ফলে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা সর্দারদের অধিকার আর সুরক্ষিত থাকল না। নতুন অভিজাতরা মোঙ্গালের মহানায়কের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

এই নতুন শ্রেণিব্যবস্থায় চেঙ্গিস খাঁ নিজের নতুন বিজয়ী মানুষদের শাসন করার দায়িত্ব নিজের চার পুত্রের উপর আরোপ করেছিলেন। এর ফলে উলুস (Ulus) গঠিত হয়েছিল, উলুস শব্দের মূল অর্থ মূলত একটি নির্দিস্ট অঞ্চলকে বোঝায় না। চেঙ্গিস খাঁর জীবনকালে তখনো নিরন্তর জয় এবং সাম্রাজ্যকে প্রসার করার বয়স ছিল, যেসব সাম্রাজ্যের সীমানা পরিবর্তনশীল ছিল। উদাহরণস্বরূপ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জোচী রাশিয়ার স্টেপ প্রদেশ পেয়েছিলেন, কিন্তু সাম্রাজ্যের দূরত্বসীমা (Ulus) অনির্ণীত ছিল, এই সাম্রাজ্য সুদূর পশ্চিম দিকে প্রসারিত ছিল যতদূর তাঁর ঘোড়া স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করতে পারত। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র, চাঘাতাই তুরান এর স্টেপ অঞ্চল এবং পামীর পর্বতের উত্তর অংশ পেয়েছিলেন, যা তাঁর ভাইয়ের প্রদেশের সন্নিহিত ছিল। সম্ভবত জোচি যত পশ্চিমদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন ততই তাঁর অধিকৃত অঞ্চল পরিবর্তিত হচ্ছিল। চেঙ্গিস খাঁ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর তৃতীয় পুত্র ওগোদেই তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন এবং তাঁকে মহান খাঁ উপাধি দেওয়া হবে এবং রাজপুত্র তাঁর রাজধানী কারাকোরামে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সবচেয়ে ছোটো পুত্র তোলুই তাঁদের পূর্বপুরুষদের ভূমি মঙ্গোলিয়া প্রাপ্ত হয়েছিলেন। চেঙ্গিস খাঁর পরিকল্পনা ছিল যে তাঁর পুত্ররা পরস্পর মিলেমিশে সাম্রাজ্য শাসন করবে এবং তার ফলে তিনি সব রাজকুমারদের জন্য প্রত্যেক উলুসে পৃথক সেনাবাহিনী (তামা) গঠন করেন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রাজ্যের ভাগবন্টন কুরিলতাই অর্থাৎ সর্দারদের পরিষদ এ নির্ধারিত হত যেখানে পরিবার বা রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ণয়, অভিযান, লুটের মালের বন্টন, পশুচারণ ভূমির উত্তরাধিকার যৌথভাবে নেওয়া হত।

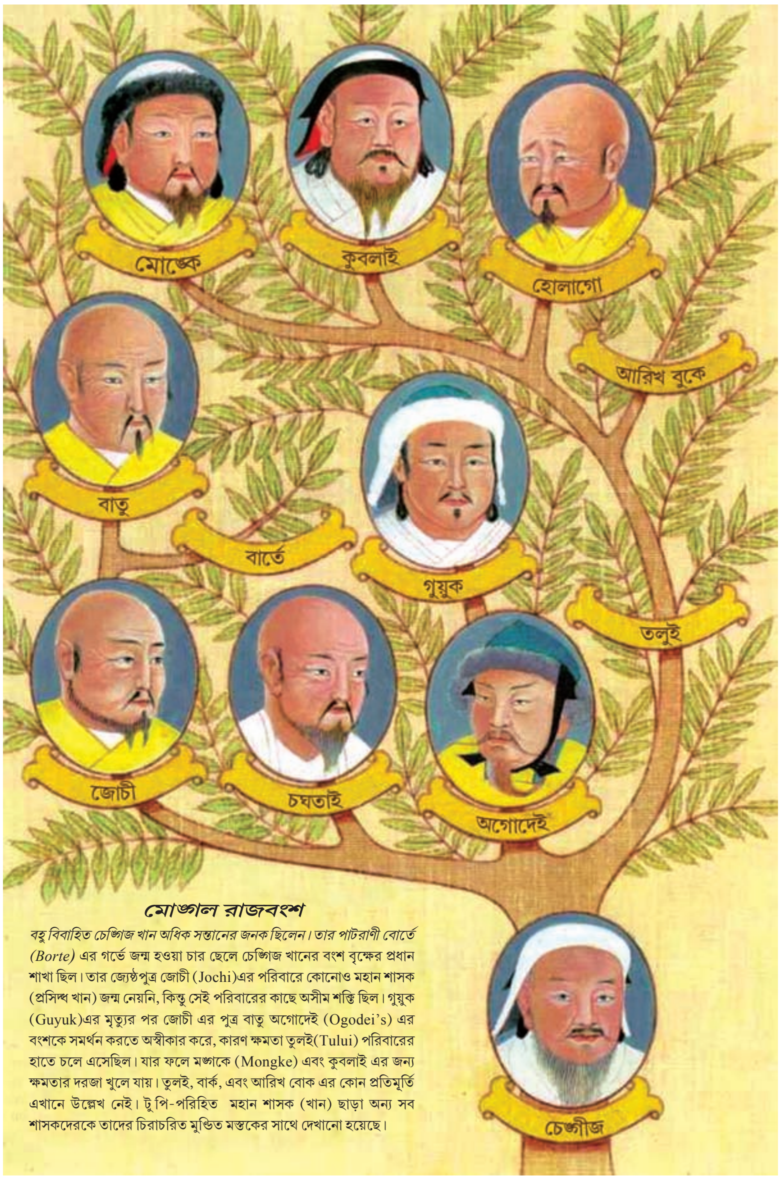

চেঙ্গীস খাঁর এর পারিবারিক বংশ-তালিকা

চেঙ্গিস খাঁ প্রথম থেকেই একটি দ্রুত সংবাদবাহক পদ্ধতি চালু করে রেখেছিল যার ফলে তাঁর রাজ্য থেকে দূরবর্তী প্রদেশগুলোর সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করা যেত। স্বল্প দূরবর্তীস্থানে নির্মিত সৈনিক চৌকিগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যবান ঘোড়া তথা বার্তাবাহক অশ্বারোহী মজুদ থাকত। এই যোগাযোগের পদ্ধতিটিকে চালু রাখার জন্য যাযাবর মোঙ্গল তার পশুগুলো থেকে নিজের ঘোড়া অথবা অন্যান্য পশু সমূহের এক দশমাংশ সরবরাহ করত। এই পদ্ধতিটিকে কুবকুর (qubcur tax) কর বলা হত। এই শুল্কটিকে (levy) যাযাবর লোকেরা নিজের ইচ্ছায় প্রদান করত, যার ফলে তারা একাধিক সুবিধা পেত। চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর এই ধাবণকারী পদ্ধতির (yam) মধ্যে আরও কিছু পরিবর্তন এসেছিল। এই পদ্ধতির গতি তথা বিশ্বাসযোগ্যতা যাত্রীদের অবাক করে তোলে। এর মাধ্যমে মহান শাসকরা (খাঁ) তাদের বিশাল মহাদেশীয় সাম্রাজ্যের সুদূর অঞ্চলে হওয়া ঘটনাগুলোকে নজরদারী করতে সক্ষম হত।

যাইহোক, বিজিত মানুষদের নতুন যাযাবর শাসকদের প্রতি কোনো অনুরক্তি ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হওয়া যুদ্ধে অনেক শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কৃষিজমি নষ্ট হয়, বাণিজ্যক্ষেত্র, হস্তজাত শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্র বাধাগ্রস্ত হয়। হাজার হাজার মানুষ মারা যায় এবং তার থেকেও বেশি মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা হয়। তার সঠিক সংখ্যা অতিরঞ্জিতপূর্ণ তথ্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে। অভিজাত সম্প্রদায় থেকে কৃষক সম্প্রদায় পর্যন্ত সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। তার ফলে উৎপন্ন অস্থিরতায় ইরানের শুষ্ক মালভূমির ভূগর্ভস্থ জলপথ (কানাত)গুলো নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। খাল তথা জলপথগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় মরুভূমি এমনভাবে বিস্তৃত হতে লাগল যার ফলে পরিবেশগত ধ্বংস হয়, পরিণামে খুরাসানের (Khurasan) কিছু অংশকে আর রক্ষা করা যায় নি।

সামরিক অভিযানের বিরতি ঘটার সাথে সাথে ইউরোপ এবং চিনের ভূখণ্ড পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। মোঙ্গাল বিজয়ের (Pax Mongolica) ফলে যে শান্তির সূচনা হয়, তাতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। মোঙ্গালদের অধীনে রেশম পথ (Silk route) দিয়ে বাণিজ্য এবং ভ্রমণ তার উন্নতির চরম

শিখরে পৌঁছেছিল, কিন্তু চিনের সাথে পূর্বের বাণিজ্যিক পথ বন্ধ হয়নি।

তারা উত্তরের দিকে মোঙ্গালিয়া তথা নতুন সাম্রাজ্যের কেন্দ্র কারাকোরামের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। মোঙ্গাল শাসনে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার আবশ্যকতা ছিল এবং যাত্রীদের জন্য সহজসাধ্য যাত্রা আবশ্যক ছিল। নিরাপদভাবে ভ্রমণের জন্য ভ্রমণকারীদের ছাড়পত্র (ফার্সীতে যাকে পাইজা

মানচিত্র: মোঙ্গালদের সামরিক অভিযান।

(Paiza) এবং মোঙ্গাল ভাষায় জেরেজ (Gerege) বলা হত) দেওয়া হত। উপরে উল্লিখিত সুবিধালাভের জন্য ব্যবসায়ীরা বাজ (baj) নামক শুল্ক প্রদান করত, যার অর্থ ছিল তারা মোঙ্গাল শাসক (খাঁ)দের প্রভাব প্রতিপত্তি তথা কর্তৃত্বকে স্বীকার করা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গাল সাম্রাজ্যে যাযাবর এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটেছিল। উদাহরণস্বরূপ ১২৩০ এর দশকে যখন মোঙ্গালরা উত্তর চিনের চিনা রাজবংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা অর্জন করেছিল, তখন মোঙ্গাল নেতাদের একটি চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রবল চাপ দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, সমস্ত কৃষকদের যাতে বেপরোয়া ভাবে হত্যা করা হয় এবং তাদের কৃষি জমিকে চারণভূমিতে পরিবর্তিত করা হয়। কিন্তু ১২৭০ এর দশকের দিকে শুঙ্গা রাজবংশের পরাজয়ের পরে দক্ষিণ চিনকে মোঙ্গাল সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখন চেঙ্গিস খানের পৌত্র কুবলাই খাঁ (মৃত্যু ১২৯৪) কৃষক এবং শহরগুলোর রক্ষাকর্তা রূপে আবির্ভূত হয়। ১২৯০ এর দশকে ইরানের মোঙ্গাল শাসক গজন খাঁ (মৃত্যু ১৩০৪), যিনি চেঙ্গিস খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তোলুই এর বংশধর ছিলেন, তিনি নিজের পরিবারের সদস্য এবং অন্য সেনাপতিদের সাবধান করেছিলেন যাতে তারা কৃষকদের লুটপাট করা থেকে বিরত থাকে। একবার তিনি একটি ভাষণের মধ্যে বলেছিলেন যে এরকম করার ফলে রাজ্যে স্থায়িত্ব এবং সমৃদ্ধি আসে না। চেঙ্গিস খাঁ বেঁচে থাকলে এই জ্বালাময়ী বক্তৃতা হয়তো তাকে শিহরিত করে দিত।

কার্যাবলি-২

রেশমপথের ক্ষেত্রগুলোর দিকে আলোকপাত করো এবং সেই বস্তুগুলোর দিকেও নজর দাও যেটা ওই রাস্তা দিয়ে এসে ব্যবসায়িকদের হাতে গিয়ে পৌঁছাত। এই মানচিত্রে যখন মোঙ্গাল শক্তি চরম শিখরে পৌঁছেছিল তখন পূর্ব সীমান্তের রেশম পথটির শেষ প্রান্তটিকে দেখানো হয়নি।

মানচিত্রে অনুপস্থিত শহরটিকে কি তোমরা বের করে দেখাতে পারবে? দ্বাদশ শতাব্দীতে এখানে কি কোনো রেশম পথ ছিল? যদি না থাকে তবে কেন?

কার্যাবলি-৩

পশুপালক এবং কৃষকদের মধ্যে সংঘাতের কারণ কি ছিল? চেঙ্গিস খান কী তার দেওয়া বক্তৃতাতে ভ্রাম্যমান সেনাপতিদের প্রতি এই ধরনের কোনো অনুভুতির প্রকাশ করেছেন?

গজন খাঁর এর ভাষণ

গজন খাঁ (১২৯৫-১৩০৪) প্রথম ইল-খানিদ শাসক ছিলেন যিনি ধর্ম পরিবর্তন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার মোঙ্গাল-তুরস্ক যাযাবর সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ভাষণ দিয়েছিলেন, যেটা সম্ভবত তাঁর পারসিক উজীর (Wazir) রশিদ উদ্দিন লিখেছিলেন এবং যেটা রাজমন্ত্রীর পত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা ছিল।

"আমি পারসিক কৃষকশ্রেণিদের পক্ষে ছিলাম না। যদি কৃষকদের লুটপাট করার কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে এটা করার জন্য আমার থেকে অধিক শক্তিশালী আর কেউ নেই। চলো আমরা সবাই মিলে তাদের লুটপাট করি। কিন্তু যদি তোমরা নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যতে ভোজনের জন্য দানাশস্য এবং খাদ্যসামগ্রী একত্রিত করতে চাও, তাহলে তোমাদের প্রতি আমাকে কঠোর হতে হবে। তোমাদের যুক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে কাজ শেখাতে হবে। যদি তোমরা কৃষকদের অপমান কর, কৃষকদের থেকে তাদের ষাঁড় এবং বীজ ছিনিয়ে নিয়ে যাও এবং তাদের জমির ফসলকে নষ্ট করে ফেলো, তবে তোমরা ভবিষ্যতে কী করবে? একটি আজ্ঞাবহ কৃষকশ্রেণি এবং একটি বিদ্রোহী কৃষক শ্রেণির মধ্যে পার্থক্যকে বুঝতে হবে....."

চেঙ্গিস খাঁর শাসনকাল থেকেই মোঙ্গালরা বিজয়ী রাজ্য থেকে বেসামরিক প্রশাসকদের (Civil administrators) নিজেদের জায়গাতে নিযুক্ত করত। তাদেরকে অনেক সময় একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রেরণ করা হত, যেমন—চিনদেশীয় সচিবদের ইরানে এবং পারসিক সচিবদের চিনে মোতায়ন করা হত। এভাবে তারা দূরবর্তী রাজ্যগুলোকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও সহায়তা করত এবং তাদের পরিবেশগত জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণের ফলে সেখানের জন জীবনের উপর যাযাবরদের লুটপাটের প্রবণতা কমে গিয়েছিল। মোঙ্গাল শাসকদের ও তাদের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস বজায় থাকত যতক্ষণ এই প্রশাসক তাদের প্রভুদের জন্য রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারত। তাদের মধ্যে কিছু প্রশাসক খুব প্রতিপত্তিশালী ছিল এবং এই প্রশাসকরা তাদের ক্ষমতার প্রয়োগ শাসকদের উপরও করতে পারত। উদাহরণস্বরূপ ১২৩০ এর দশকে চৈনিক মন্ত্রী ইয়ে-লু-সাই (Yeh-lu-chu-tsai) অগোদেই এর লুটপাট করার প্রবৃত্তিকে পরিবর্তিত করেছিল। জুবাইনি (Juwaini) পরিবার ও ইরানে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল। উজির রশিদউদ্দিন গজন খাঁর জন্য ভাষণটিও সেই সময়েই তৈরি করেছিলেন যখন তিনি মোঙ্গাল দেশবাসীদের সামনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং যার মধ্যে তিনি কৃষকশ্রেণিদের হয়রানি করার পরিবর্তে রক্ষা করার কথা বলেছিলেন।

স্থানবদ্ধভাবে বসবাস করার চাপ মোঙ্গালদের নতুন অঞ্চলগুলোর মধ্যে অধিক ছিল, সেই অঞ্চলগুলোর যাযাবরদের মূল স্টেপ আবাসস্থল থেকে দূরে অবস্থিত ছিল। ক্রমান্বয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি মিলেমিশে ব্যবহার করার পরিবর্তে বংশগতভাবে রাজবংশ বানানোর ভাবনা চলে এসেছিল এবং প্রত্যেকে নিজের উলুস (Ulus) শাসন করতে লাগল, যার অর্থ প্রত্যেকে এখন অধিকৃত অঞ্চলের প্রভুত্ব অর্জন করেছেন। এটা অংশত উত্তরাধিকারীদের সংগ্রামের পরিণাম ছিল যেখানে চেঙ্গিস খাঁর বংশধরদের মধ্যে মহান পদ এর জন্য এবং উৎকৃষ্ট চারণভূমি পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা হত। চিন এবং ইরানকে শাসন করার জন্য আগমন ঘটে তলুই এর বংশধরদের, যারা, ইউয়ান এবং ইল-খানিদ (Yuan and il-Khanid) রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। জোচি একটি সুবর্ণ দল (Golden Horde) গঠন করেছিলেন এবং রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চলগুলোর মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন। চঘতাই এর উত্তরাধিকারীরা ট্রান্সঅক্সিয়ানার স্টেপ অঞ্চলগুলোর মধ্যে রাজত্ব করেছিল যাকে বর্তমানে তুর্কিস্তান বলে জানা যায়। লক্ষনীয়ভাবে, মধ্যএশিয়া (চঘতাই এর বংশধর) তথা রাশিয়ার (গোল্ডেন হোর্ড) স্টেপ নিবাসীদের মধ্যে যাযাবর পরম্পরা সবচেয়ে বেশি সময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

চেঙ্গিস খাঁর বংশধরেরা ধীরে ধীরে আলাদা আলাদা শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যায়। তার অর্থ এই ছিল যে তাদের অতীত পরিবারের সাথে জড়িত স্মৃতি এবং ঐতিহ্যসমূহের সামঞ্জস্যতার মধ্যেও পরিবর্তন এসেছিল। স্পষ্টত, এটা ছিল তাদের বংশের সদস্যদের মধ্যে হওয়া প্রতিযোগিতার পরিণাম। এক্ষেত্রে তলুই এর বংশধররা নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি ইতিহাসে পারিবারিক বিবাদের বর্ণনা সুচতুরতার সঙ্গে দিয়ে দিত। এর কারণ হিসেবে ধরা যায় যে অনেকটা সময় পর্যন্ত, চিন এবং ইরান তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাই ব্যাপক মাত্রায় পন্ডিতবর্গদের নিজেদের জায়গাতে নিযুক্ত করত। পরিষ্কাতভাবে এটা বলা যায় যে অতীত থেকে আলাদা হওয়ার অর্থ, পূর্বের শাসকদের তুলনায় প্রচলিত শাসকদের গুণাবলিকে অধিক জনপ্রিয় করে তোলা এবং চেঙ্গিস খাঁও এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ যাননি। ইল-খানিদ ইরানের মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পারসিক ইতিহাস বিবরণীতে মহান শাসকদের রক্তরঞ্জিত হত্যালীলার বর্ণনাকে বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছিলেন, মৃতদের সংখ্যা অনেক বেশি করে দেখানো হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি অনুসারে বুখারার দুর্গটিকে রক্ষা করার জন্য ৪০০ সৈনিক মজুদ থাকত। অথচ একটি ইল-খানিদ ধারাবিবরণীতে এরকম বিবরণ দেওয়া হয়েছিল যে বুখারার দুর্গের মধ্যে হওয়া আক্রমণে ৩০,০০০ সৈনিক মারা গিয়েছে। যদিও ইল-খানিদ বিবরণীগুলোতে তখনও চেঙ্গিস খাঁর প্রশংসা করা হত, কিন্তু তার সাথে সন্তুষ্টির জন্য এটা বলা হত যে, সময় পরিবর্তন হয়েছে, এখন আগের মতো আর বিষম হত্যাকাণ্ড হয়না। চেঙ্গিস খাঁর বংশধররা উত্তরাধিকারসূত্রে যা কিছু পেয়েছিল, তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু জনগণের কাছে বিশ্বাসী নায়ক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতো অত্যাচারী রূপের পরিচয় দিত না।

ডেভিড আয়ালন (David Ayalon) এর গবেষণার পরে য়াসা (Yasa) তে সম্প্রতিকালে হওয়া কার্য (সেই নিয়ম সংহিতা, যেটার সম্পর্কে বলা হয় যে চেঙ্গিস খাঁ ১২০৬ সালে কুরিলতাই (quriltai) এ সেটা প্রচলন করেছিল) সেই জটিল নিয়মগুলোর বিস্তৃত বর্ণনা করেছিল, যেগুলোর মাধ্যমে সেই মহান শাসকের স্মৃতি রক্ষা করার জন্য তার উত্তরাধিকারীরা বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। প্রথমদিকে (Yasa) য়াসা শব্দটিকে (Yasaq) 'য়াসাক' রূপে লেখা হত যার অর্থ ছিল আইন, ফরমান বা আদেশ। প্রকৃতপক্ষে, যে সামান্য কিছু বিবরণ আমরা 'য়াসাক' সম্পর্কে পেয়েছি, তার সম্পর্ক প্রশাসনিক নিয়মকানুনের সাথে ছিল, যেখানে - অনুসন্ধান, সামরিক এবং ডাক বিভাগ প্রণালীর সংগঠন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোঙ্গালরা 'য়াসা' শব্দটির ব্যবহার খুব সাধারণভাবে শুরু করেছিল। যার অর্থ ছিল চেঙ্গিস খাঁর 'আইনি সংহিতা'।

যদি আমরা সেই সময়ে ঘটে যাওয়া অন্যান্য ঘটনাগুলোর দিকে আলোকপাত করি তবে বোধ হয় আমরা এই শব্দটিতে আসন্ন পরিবর্তনগুলোকে উপলব্ধি করতে পারব । ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোঙ্গালরা একটি সংঘবদ্ধ সম্প্রদায়রূপে আবির্ভূত হয়েছিল এবং তারা এই রকম একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল যেটা পৃথিবীতে এর আগে কখনো দেখা যায়নি। তারা অত্যন্ত জটিল শহুরে সমাজগুলোর উপর রাজত্ব করেছিল যাদের নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আইন ছিল। যদিও মোঙ্গালদের নিজের সাম্রাজ্যের অঞ্চলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক আধিপত্য ছিল, তবুও সংখ্যাগত দিক থেকে তারা কম ছিল। তাদের নিজের পরিচয় এবং বিশিষ্টতাকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় ছিল সেই পবিত্র আইনের দ্বারা অধিকার অর্জন, যা তারা পূর্বপুরুষদের থেকে পেয়েছিল। এই 'য়াসা' কথাটি সম্ভবত মোঙ্গাল উপজাতিদেরই প্রথাগত পরম্পরার একটি সংকলন। কিন্তু এটি চেঙ্গিস খাঁর নিয়ম-সংহিতা বলে মোঙ্গালরাও মুসা এবং সুলেমানদের মত নিজেদের জন্য একটি সংহিতার দাবি করেছিল, যার ফলে আইনের কর্তৃত্বগুলোকে জনগণের উপর আরোপ করা যেতে পারে। 'য়াসা' রা মোঙ্গালদের তাঁদের সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এবং নিয়মগুলোর সাথে যুক্ত থাকতে সাহায্য করত এবং এটি চেঙ্গিস খাঁ তথা তাদের বংশধরদের সাথে মোঙ্গালদের মিল থাকার কথা স্বীকার করেছে। তথাপি মোঙ্গালরাও স্থানবদ্ধ জীবনযাপনের কিছু দিক গুলোকে আত্মস্থ করে নিয়েছিল, তবুও 'য়াসা' তাদের নিজের জাতিগত পরিচয় ধরে রাখার জন্য এবং তাদের 'নিয়মগুলো'

পরাজিত লোকেদের মধ্যে আরোপ করার জন্য আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছিল। 'য়াসা' অত্যন্ত শক্তিশালী বিচার ধারা ছিল, হতে পারে যে চেঙ্গিস খাঁ প্রথমে এরকম নিয়মের কোনও পরিকল্পনা তৈরি করেন নি, কিন্তু এই নিয়ম-সংহিতা নিশ্চিতভাবে চেঙ্গিস খাঁর দূরদর্শিতা থেকে অনুপ্রাণিত ছিল, যিনি বিশ্বব্যাপী মোঙ্গল রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কার্যাবলি ৪

এই চার শতাব্দীর মধ্যে কি 'য়াসা' এর অর্থের কোনও পরিবর্তন হয়েছে, যা চেঙ্গিস খাঁকে আব্দুল্লা খান থেকে পৃথক করেছে? আব্দুল্লা খানের মুসলমান 'উৎসব প্রাঙ্গানে' অনুষ্ঠিত ধর্মীয় অনুপালন সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হাফিজ-ই-তানিশ চেঙ্গিস খাঁর 'য়াসা' এর উল্লেখ কেন করেছেন?

য়াসা

১২২১ সালে বুখারাতে বিজয়লাভ করার পরে, চেঙ্গিস খাঁ সেখানকার বিত্তশালী মুসলমানদের 'উৎসব প্রাঙ্গণে' একত্রিত করে তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। চেঙ্গিস খাঁ তাদের পাপী বলেছিল এবং সাবধান করেছিল যে এই পাপের প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ তাদের নিজেদের লুকিয়ে রাখা ধনরাশি চেঙ্গিস খাঁকে দিতে হবে। এটি বর্ণনাযোগ্য একটি নাটকীয় ঘটনা ছিল যা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষ স্মরণ রেখেছিল এবং তার উপর চিত্র বানানো হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে চেঙ্গিস খাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র জোচি-র আর এক বংশধর আব্দুল্লাখান, বুখারার সেই 'উৎসব প্রাঙ্গাণ'-এ গিয়েছিল। চেঙ্গিস খাঁর অপেক্ষা আব্দুল্লা খান সেখানে ছুটির দিনে নামাজ সম্পন্ন করতে গিয়েছিল। তার কাহিনিকার হাফিজ-ই-তানিশ নিজের মালিকের এই রকম মুসলিম ধর্মপরায়ণতার বিবরণ নিজের ইতিবৃত্ততে উল্লেখ করেছিল এবং সঙ্গে অবাক করে দেওয়ার মতো মন্তব্যও করেছিল: যে এইটি চেঙ্গিস খাঁর 'য়াসা' এর অনুযায়ী ছিল।

উপসংহার : বিশ্ব ইতিহাসে চেঙ্গিস খাঁ এবং মোঙ্গালদের অবস্থান

বর্তমানে যখন আমরা চেঙ্গিস খাঁকে স্মরণ করি তখন আমাদের কল্পনায় শুধুমাত্র একটি ছবি ফুটে উঠে, যেমন-একজন বিজয়ী, নগরের ধ্বংসকারী এবং যিনি হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চিন, ইরান এবং পূর্ব ইউরোপের শহরবাসী স্টেপ অঞ্চলের সেই বড়ো গোষ্ঠী তথা দলদের (Hordes) ভয় এবং ঘৃণার চোখে দেখত। তবুও মোঙ্গালদের জন্য চেঙ্গিস খাঁ এখন পর্যন্ত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তিনি মোঙ্গাল জাতিদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলতে থাকা জাতিগত যুদ্ধ এবং চিনাদের দ্বারা শোষণ থেকে মোঙ্গালদের মুক্ত করেছিলেন, সাথে সাথে তিনি মোঙ্গালদের সমৃদ্ধ করেন। একটি চমৎকার অর্ন্তদেশীয় সাম্রাজ্যের নির্মাণ এবং বাণিজ্যের পথ এবং বাজারগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার ফলে ভেনিসীয় মার্কো পোলো-এর মত দূরের যাত্রীরাও আকৃষ্ট হয়েছিল। চেঙ্গিস খাঁর পরস্পর বিরোধী চিত্রটি বৈসাদৃশ্যের মধ্যে এই প্রতিফলন তৈরি করে যে কীভাবে একজনের আধিপত্য অন্য সকলের আধিপত্যকে মুছে ফেলেছিল।

পরাজিত লোকেদের মতামতের বাইরে কিছু মুহুর্তের জন্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেই ছোটো মোঙ্গাল অধিরাজ্যের সম্পর্কে চিন্তা করো, যেটা বিভিন্ন মতে বিশ্বাসী সম্পন্ন লোকেদের একত্রিত করেছিল। যদিও মোঙ্গাল শাসক (খাঁ) নিজেরাও বিভিন্ন ধর্ম এবং ধর্মবিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল, যেমন— শমন (ওঝা, বৈদ্য), বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং পরিশেষে ইসলাম। কিন্তু তারা সর্বজনীন নীতিগুলোর উপর নিজেদের ব্যক্তিগত মতকে কখনো জোর করে চাপিয়ে দিত না। মোঙ্গাল শাসকেরা সব জাতিগোষ্ঠী এবং ধর্মের লোকেদের নিজেদের এখানে প্রশাসনিক এবং সশস্ত্র সৈন্য বাহিনীতে নিয়োগ করেছিল। মোঙ্গালদের শাসন ব্যবস্থা ছিল বহু জাতীয়, বহুভাষী এবং বহু ধর্মের, যার ফলে বহুত্ববাদী সংবিধানের কোনও ভয় ছিল না। এটা সেই সময়ের জন্য একটি অস্বাভাবিক বিষয় ছিল। ঐতিহাসিকেরা এখন কেবল সেই নিয়ম পদ্ধতিগুলো অধ্যয়ন করেন যার মাধ্যমে মোঙ্গালরা পরবর্তীকালে তাদের শাসন প্রণালীগুলোকে অনুসরণ করার জন্য আদর্শ

তৈরি করে যেতে পারে। (ভারতবর্ষের মোঘল শাসকদের মত)

মোঙ্গাল বা অন্য কোনও যাযাবর শাসন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত যেই ধরনের দলিল দস্তাবেজ ছিল, সেইগুলো থেকে এটা বোঝা বস্তুত অসম্ভব যে, এমন কোনও অনুপ্রেরণা ছিল যেটা সাম্রাজ্য নির্মাণের উচ্চাকাঙ্খাকে পূরণের জন্য অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত হওয়া লোকেদের সংঘবন্ধ করেছিল। পরিশেষে মোঙ্গল সাম্রাজ্য ভিন্ন-ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে পরিবর্তিত হয়েছিল। তথাপি মোঙ্গাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রেরণা একটি প্রভাবশালী শক্তি হয়ে রয়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে অন্য একজন রাজা তৈমুর, যিনি বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের জনা উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি নিজেকে রাজা ঘোষিত করার ক্ষেত্রে সঙ্কোচ বোধ করতেন, কেননা তিনি চেঙ্গিস খাঁর বংশধর ছিলেন না। যখন তিনি নিজের স্বাধীন সার্বভৌমত্বের ঘোষণা করেন, তখন তিনি নিজেকে চেঙ্গিস খাঁর পরিবারের জামাই হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণের কয়েক দশক পর, বর্তমানে, মোঙ্গালীয়রা তাদের নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করল স্বাধীন জাতি হিসেবে। মঙ্গোলিয়া চেঙ্গিস খাঁকে একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মেনে নিয়েছিল, যাকে সর্বজনীনভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এবং যার কৃতিত্বগুলোর বর্ণনা গর্বের সাথে করা হয়। মোঙ্গালীয়দের ইতিহাসের এই চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে চেঙ্গিস খাঁ আরও একবার মোঙ্গালদের জন্য একজন শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যা অতীতের অসাধারণ স্মৃতিগুলোকে জাগ্রত করে রাষ্ট্রের পরিচয় তৈরির লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে শক্তি প্রদান করার সাথে সাথে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে।

মোঙ্গালদের দ্বারা বাগদাদ দখল। চতুর্দশ শতাব্দীতে রশীদ অল-দীন, তবরিজ এর ইতিবৃত্ততে দেওয়া একটি ক্ষুদ্রকায় চিত্র।

একটি শিবিরে কুবলাই খান এবং চাবী।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দাও :

১। মোঙ্গালদের জন্য বাণিজ্য কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

২। চেঙ্গিস খাঁ কেন এই রকম ভেবেছিলেন যে মোঙ্গাল উপজাতিদের নতুন সামাজিক এবং সামরিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা প্রয়োজন?

৩। 'য়াসা'দের সম্পর্কে পরবর্তী মোঙ্গালদের চিন্তাধারা কীভাবে চেঙ্গিস খাঁর স্মৃতির সাথে জড়িত তার অস্বস্তিপূর্ণ সম্পর্ককে ব্যক্ত করে?

৪। ইতিহাস যদি শহরে বসবাসকারী সাহিত্যকারদের লিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করে, তবে যাযাবর সমাজ সম্পর্কে সর্বদা প্রতিকূল বিচারই থাকবে। তোমরা কি এই মন্তব্যটিতে সহমত পোষণ কর? মোঙ্গাল অভিযানের ফলে পারসিক ইতিবৃত্তে হতাহতের সংখ্যাকে বাড়িয়ে দেখানে হয়েছিল কেন—এর কারণ ব্যাখ্যা করো।

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর দাও:

৫। মোঙ্গাল এবং বেদুইন সমাজের যাযাবরদের উপাদান রক্ষার্থে তোমার মতে কী কী ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিন্নতা দেখা যায়? এই বিভিন্নতাগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা কী কী কারণ ব্যাখ্যা করবে?

৬। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোঙ্গালীয়দের দ্বারা সৃষ্ট পেক্স মোঙ্গালিকার কী কী বৈশিষ্ট নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে পাওয়া যায়?

ফান্সিসকান ভিক্ষু (সন্ন্যাসী), রুব্রুক নিবাসী উইলিয়ামকে সম্রাট (নবম) লুই IX রাষ্ট্রদূত বানিয়ে মহান শাসক (খাঁ) মঙ্কে এর রাজ দরবারে পাঠান, তিনি ১২৫৪ সালে মঙ্কের রাজধানী কারাকোরাম পৌঁছান এবং সেখানে তিনি লোরেইন (ফ্রান্সে অবস্থিত) এর একজন মহিলা পকেটি (Paquette) এর কাছে এসেছিলেন যাকে হাঙ্গোরী থেকে আনা হয়েছিল। এই মহিলাটি রাজকুমারের পত্নীদের মধ্যে এক পত্নী যিনি নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান ছিলেন। তিনি তার সেবার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রাজদরবারে একজন পারসিক স্বর্ণকার গুইলায়ামে বাউচার (Guillaume Boucher) এর সংস্পর্শে এসেছিলেন, যার ভাই প্যারিস এর 'গ্র্যান্ড পোন্ট' এ বাস করত। এই ব্যক্তিটিকে সর্বপ্রথম রাণী সোরহাকতানী (Sorghaqtan) এর কাছে কাজে রাখা হয়েছিল এবং তার পরে মোঙ্কে এর ছোট ভাই তাকে নিজের জায়গায় কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। উইলিয়াম দেখেছিলেন যে বিশাল রাজদরবারী উৎসবগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম নেস্টোরিয়ান পুরোহিতদের রাজদণ্ড তথা রাজপোশাকের সাথে আমন্ত্রণ করা হত এবং তার পর সেখানে মুসলমান, বৌদ্ধ ও তাও ধর্মের (Taoist) পুরোহিতদেরকে মহান শাসক (খাঁ) দের আশীর্বাদ করার জন্য আমন্ত্রিত করা হত....

III

ঐতিহ্যের পরিবর্তন (CHANGING TRADITIONS)

তিনটি শ্রেণি

ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির পরিবর্তন

সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব

ঐতিহ্যের পরিবর্তন
CHANGING TRADITIONS

সূচনা ঃ

আমরা দেখেছি কীভাবে নবম শতাব্দীতে এশিয়া এবং আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চলে বিশাল সাম্রাজ্যের বিকাশ এবং বিস্তার ঘটেছিল—এদের মধ্যে কেউ ছিল যাযাবর, আবার কোনো কোনো সাম্রাজ্য উন্নত নগর শৈলী এবং সেই সব নগরে গড়ে ওঠা ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। ম্যাসিডোনিয়া, রোমান এবং আরব সাম্রাজ্য এবং তাদের পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের (মিশর, অসিরিয়া, চিনা এবং মৌর্য) মধ্যে এটাই পার্থক্য ছিল যে এখানে উল্লিখিত প্রথম তিনটি সাম্রাজ্য বৃহত্তর এলাকা জুড়ে তাদের প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং মহাদেশীয় বা আন্তর্মহাদেশীয় প্রকৃতির ছিল। মোঙ্গাল সাম্রাজ্যও অনুরূপ ছিল।

সাম্রাজ্যের বিকাশ ও প্রসারে যেসব পরিবর্তন ঘটেছিল, সেসব পরিবর্তন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মোকাবিলার মধ্য দিয়ে ঘটেছিল। প্রায়শই কোনো একটি সাম্রাজের উত্থান আকস্মিকভাবে হত, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বহু কাল ধরে সাম্রাজ্য নির্মাণের লক্ষ্যে ন্যস্ত পরিবর্তনগুলোকেই এই আকস্মিক উত্থানের কারণ হিসাবে ধরা হয়।

বিশ্ব ইতিহাসের পরম্পরা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। পশ্চিম ইউরোপের নবম থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ধীরে ধীর অনেক কিছুর উন্নতি ঘটেছিল যেগুলো আমাদের আধুনিক সময়কালের সাথে সংযুক্ত হতে সাহায্য করেছে— যেমন, ধার্মিক বিশ্বাস অপেক্ষা ব্যবহারিক পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে জ্ঞানের বিকাশ, জনসেবার উদ্ভাবন, আইন প্রণয়ন এবং আইনের বিভিন্ন ধারাগুলোকে মাথায় রেখে সরকার গঠনের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা, এবং কৃষি ও শিল্পে প্রযুক্তির উন্নতি ইত্যাদি। এই পরিবর্তনগুলোর প্রভাব ইউরোপের বাইরেও প্রভূত বিস্তার লাভ করেছিল।

আমরা দেখেছি যে, পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্য অবক্ষয়িত হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপে বসবাসকারী আদিবাসীরা সেখানে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করে এবং রোমান সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশগুলোকে ধীরে ধীরে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা অনুযায়ী তাদের প্রশাসনে অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করে। তবে দূর প্রাচ্য দেশের তুলনায় পশ্চিম ইউরোপের নগর কেন্দ্রগুলো আয়তনে ছোটো ছিল।

নবম শতাব্দীতে বাণিজ্যকেন্দ্র এবং নগরকেন্দ্র যেমন, এক্স, লন্ডন, রোম, সিয়েনা, আকারে ছোটো হলেও খুব গুরত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল। নবম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের

গ্রামীণ অঞ্চলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চলে এসেছিল। চার্চ এবং রাজকীয় শাসন সেখানকার আদিবাসীদের প্রচলিত নিয়মকানুনের সমন্বয়ে কিছু রোমান প্রতিষ্ঠানের বিকাশ করেছিল। পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপে নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে শার্লেমনের সাম্রাজ্য এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এই সাম্রাজ্যের দ্রুত পতনের পর ও হাঙ্গেরীয় ও ভাইকিংদের ভয়ংকর আক্রমণ সত্ত্বেও সেখানকার নগরকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো স্থায়ী ছিল।

এই সমস্ত ঘটনার ফলস্বরূপ সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয়। দুর্গ এবং 'মেনর ভবন' এর চারপাশের জমিতে কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্র চিহ্নিত হত। সেইসব জমির অধিকারী ছিলেন মেনর-এর শাসকগণ, যারা সেখানে কৃষিকার্যে নিযুক্ত কৃষকদের কাছ থেকে আনুগত্য, পণ্য এবং সেবা আদায় করতেন। অপরদিকে, এই শাসকগণ পদমর্যাদায় আরও বড়ো শাসককে আনুগত্য প্রদর্শন করতেন যারা রাজাদের মধ্যে সামন্তরূপে আসীন ছিলেন। ক্যাথলিক চার্চ (যা পোপের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল) সামন্তবাদকে সমর্থন করত এবং চার্চের নিজস্ব জমিও ছিল। সংসারে যেখানে জীবনের অনিশ্চয়তা বিদ্যমান,ঔষধির নগন্য জ্ঞান এবং জীবনের প্রত্যাশা খুবই কম থাকাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, চার্চ মানুষকে এরকম ব্যবহারিক শিক্ষাদান করত, যাতে মৃত্যুর পর জীবন সহনীয় হতে পারে। প্রচুর মঠ নির্মিত হল যেখানে ধর্ম বিশ্বাসীরা ক্যাথলিক চার্চের নির্দেশানুসারে নিজেদেরকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, স্পেন থেকে বাইজেনটাইন অবধি বিস্তৃত মুসলিম রাজ্যগুলোতে চার্চ পাণ্ডিত্য-বিন্যাসের একটা বড়ো অংশ হিসাবে কাজ করত এবং ইউরোপের ক্ষুদ্র শাসকদের ভূমধ্যসাগর এবং তার বাইরের অঞ্চলগুলোর সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের ধারণা প্রদান করত।

ভেনিস এবং জিনোয়ার ভূমধ্যসাগরীয় উদ্যোক্তাদের থেকে প্রণোদিত হয়ে (দ্বাদশ শতাব্দী থেকে) সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, বাণিজ্য এবং শহরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের জাহাজ মুসলিম রাজ্যগুলো এবং পূর্বে অবস্থিত রোমান সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশগুলোর সাথে বাণিজ্য করত। এই অঞ্চলের সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, এবং যিশু খ্রিস্টের জীবনের সাথে যুক্ত 'পবিত্র স্থল' কে মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার করার ভাবনাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপীয় শাসকরা 'ধর্মযুদ্ধ' বা 'ক্রুসেড' এর মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে

চতুর্দশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ফ্রান্সের নগর এভিগ্‌নেনে পোপের প্রাসাদ

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভেনিসে ডোগের প্রাসাদ

পুনরায় যোগসূত্র স্থাপন করতে শুরু করেছিল। এর ফলে ইউরোপের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতি হয় (এই বাণিজ্য বাল্টিক সাগর এবং উত্তর সাগরের বন্দর শহরে এবং বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত বাণিজ্য মেলার উপরে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিল)।

বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের ফলে জীবনের মূল্য সম্পর্কিত মনোভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। ইসলামি শিল্প কলা এবং বাইজেনটাইন বাণিজ্যের ফলে ইউরোপে আগত গ্রিক কলা ও ভাবনা ইউরোপীয়দের বিশ্বকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে (যাকে 'নবজাগরণ' বলা হয়) বিশেষ করে উত্তর ইতালির নগরগুলোতে ধনীলোকেরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কম উদ্বিগ্ন ছিল, বরং জীবন নিয়ে অধিক ব্যস্ত ছিল। ভাস্কর, চিত্রশিল্পী এবং লেখক মনুষ্যজাতি এবং বিশ্বের বিভিন্ন আবিষ্কার নিয়ে অধিক আগ্রহী ছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভ্রমণ এবং আবিষ্কারে যে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, তা আগে কখনো দেখা যায় নি। বিভিন্ন জায়গা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে জলপথে অনেক নাবিক যাত্রা শুরু করে। স্পেনীয় এবং পর্তুগীজ, যারা উত্তর আফ্রিকার সাথে বাণিজ্য করত, তারা পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল থেকে আরও দক্ষিণ দিকে যেতে শুরু করল। এভাবে উত্তমাশা-অন্তরীপ হয়ে তারা ভারতে পৌঁছায় যা ইউরোপে মসলার বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। কলম্বাস ভারতে আসার জন্য একটি পশ্চিমি যাত্রাপথ খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন এবং এইভাবে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি দ্বীপে পৌঁছান যাকে ইউরোপীয়রা ওয়েস্ট-ইন্ডিজ নামে অভিহিত করে। অন্যান্য অভিযাত্রীরা উত্তর মেরু হয়ে (Arctic) ভারত এবং চিনে যাওয়ার পথ খোঁজার চেষ্টা করেছিল।

ইউরোপীয় পর্যটকরা ভ্রমণ করার সময় বিভিন্ন ধরনের লোকের সাথে মিশে এবং তাদের সাথে পরিচিত হয়। পর্যটকরা তাদের কাছ থেকে কিছু শিখতে আগ্রহী ছিল। পোপের শাসনকাল উত্তর আফ্রিকার ভূগোলবিদ এবং পর্যটক হাসান-আল-ওয়াজানকে (পরববর্তীকালে ইউরোপে লিও আফ্রিকানাস নামে পরিচিত) কাজ করতে উৎসাহিত করেছিল।

এই ভূগোলবিদ্ পোপ দশম লিওর জন্য ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রথম আফ্রিকার ভূগোল লিখেছিলেন। জেসুইট চার্চের সদস্যরা - ষোড়শ শতাব্দীতে জাপান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেই দেশ সম্পর্কে লিখে। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে উইল এডাম্স নামে একজন ইংরেজ ব্যক্তি জাপানি শগুন, তোকুগাওয়া ইয়েসুর বন্ধু এবং পরামর্শদাতা হয়ে ওঠে। আমেরিকা পৌঁছানোর পর ইউরোপীয় লোকদের সঙ্গে ওই জায়গায় বসবাসকারী লোকদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হাসান-আল-ওয়াজানের মতো আমেরিকার লোকেরা যে ইউরোপীয় লোকদের সম্মুখীন হয়েছিল, তারা প্রায়ই তাদের প্রতি আগ্রহ দেখায় এবং কখনো কখনো তাদের জন্য কাজও করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন আজতেক্ মহিলা যিনি পরবর্তীকালে ডোনা মেরিনা নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তার সাথে মেক্সিকোর স্পেনীয় বিজেতা কোর্টেস এর বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং তার জন্য তিনি দোভাষী এবং মধ্যস্থতাকারীর কাজ করেছিলেন।

ইউরোপবাসীরা নতুন লোকদের সম্মুখীন হওয়ার সময় কখনো কখনো সচেতন,আত্মবিলোপী এবং পর্যবেক্ষণশীল হত। তারা প্রায়শই অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বাণিজ্যে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত। এভাবেই পর্তুগীজরা ১৯৪৮ সালে কালিকট বন্দরে(বর্তমান নাম কোঝিকোড) ভাস্কো-দা-গামার আগমনের পর ভারতমহাসাগরীয় অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল। অন্যদিকে কখনো কখনো তারা উদ্ধত, আক্রমণাত্মক এবং নিষ্ঠুর হত এবং যাদের সাথেই তারা মিশত তাদেরকে মূর্খ মনে করে নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার চেষ্টা করত। ক্যাথলিক চার্চ এই দুই ধরনের মনোভাবকেই উৎসাহিত করত। চার্চ ছিল বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ভাষা অধ্যয়নের কেন্দ্র। কিন্তু চার্চ যাদের অ-খ্রিস্টান মানুষ হিসাবে দেখত, সেসব মানুষদের উপর আক্রমণে উৎসাহিত করত।

অ-ইউরোপীয়দের দৃষ্টিকোণ থেকে, ইউরোপের সাথে তাদের নানা ধরনের সম্পর্ক বা সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত অধিকাংশ ইসলামি অঞ্চল এবং ভারত ও চিন দেশের কাছে ইউরোপীয়রা কৌতূহলের বিষয় ছিল। তাদের বলিষ্ঠ ব্যবসায়ী বা নাবিক হিসেবে গণ্য করা হত যারা এই বড়ো বিশ্বকে জানার জন্য সামান্য অবদান রেখেছিল। জাপানিরা ইউরোপীয় প্রযুক্তির কিছু সুবিধা খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে তারা প্রচুর পরিমাণে গাদা বন্দুক উৎপাদন শুরু করেছিল। আমেরিকাতে, আজতেক সাম্রাজ্যের শত্রুরা তাদের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ইউরোপীয়দের ব্যবহার করেছিল। একই সাথে ইউরোপীয়দের সাথে আসা বিভিন্ন রোগ জনসংখ্যা ধ্বংস করে দিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে কোনো কোনো অঞ্চলে জনসংখ্যার নব্বই শতাংশের বেশি লোকের মৃত্যু ঘটে।

সময় তালিকা-৩
(১৩০০ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ)
TIMELINE III
(c. 1300 to 1700)

ইউরোপে বিচারাধীন কালে অনেক মহত্ত্বপূর্ণ বিকাশ হয়েছিল, যার মধ্যে কৃষি এবং কৃষকের জীবনে অনেক ধরনের পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। এছাড়া অনেক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও হয়েছিল। এই সময়রেখা বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে অনুপ্রাণিত করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এই ধরনের সম্পর্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিল এবং বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে ধ্যানধারণা, বিভিন্ন আবিষ্কার এবং পন্যের আদান-প্রদান হত, রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ, সম্পত্তি এবং বাণিজ্যপথকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রতিনিয়তই যুদ্ধ লেগে থাকত। এর ফলে পুরুষ ও নারীদের হত্যা করা হত, না হলে তাদের বাস্তুচ্যুত করে ক্রীতদাসে পরিণত করা হত। এভাবে মানুষের জীবন বিভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত হতে লাগল যার ফলে তাদের চেনা খুব কঠিন হয়ে গেল।

তারিখ	আফ্রিকা	ইউরোপ
১৩০০—২৫		স্পেনে আলুম্বা এবং গ্রেনেডা গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।
১৩২৫—১৩৫০	মিশরে প্লেগ রোগ (১৩৪৮—৫৫)	ইংলন্ড এবংফ্রান্সের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৩৩৭—১৪৫৩) সম্পূর্ণ ইউরোপে ব্লেক ডেথ (এক ধরনের প্লেগ রোগ) ছড়িয়ে পড়ে।
১৩৫০—৭৫	ইবনবতুতা সাহারা অন্বেষন করেন	ফ্লান্সের কৃষকরা উঁচু হারে করের বিরোধিতা করে(১৩৫৮)
১৩৭৫—১৪০০		ব্রিটেনে কৃষক বিদ্রোহ (১৩৮১) জেফ্রি চসার (Geoffrey chauces) দি ক্যান্টারবারি টেলস রচনা করেন, যা ইংরেজি ভাষার প্রাচীনতম সংকলন।
১৪০০—১৪২৫		
১৪২৫—৫০	পর্তুগিজরা দাস ব্যবসা (১৪৪২) শুরু করে।	
১৪৫০—৭৫	পশ্চিম আফ্রিকায় সংঘাই সাম্রাজ্যের স্থাপন করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল সাহারাতে বাণিজ্যের জাল বিস্তার করা, পর্তুগীজরা আফ্রিকার পশ্চিমি তটবর্তী অঞ্চলে (১৪৭১ সালের পর) আক্রমণ এবং বসতি স্থাপন করে।	ইউরোপে প্রথম মুদ্রিত বই প্রকাশিত হয়, লিওনার্দো-দা ভিঞ্চি (১৪৫২—১৫১৯) ইতালির চিত্রশিল্পী, স্থপতি এবং আবিষ্কারক
১৪৭৫—১৫০০	পর্তুগিজরা বকোঙ্গোর রাজাকে খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করে।	ইংল্যান্ডে টিউডর রাজবংশের পত্তন হয়।
১৫০০—২৫	আমেরিকার আখচাষের জন্য আফ্রিকার দাসদের নিয়ে যাওয়া হয় (১৫১০) অটোমান তুর্কিরা মিশরে জয় করে(১৫১৭)	প্রথমবার দক্ষিণ আমেরিকার কফি ইউরোপে খাওয়া হয় (১৫১৭) এবং তামাক, চকলেট, টমেটো এবং টার্কি প্রথম প্রয়োগ করা হয়, মার্টিন লুথার ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার সাধন করেন। (১৫২১)
১৫২৫—১৫৫০		কোপারনিকাস সৌর জগতের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। (১৫৪৩)
১৫৫০—৭৫		উইলিয়াম সেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) ইংল্যান্ডের নাট্যকার
১৫৭৫-১৬০০		জচরিয়াস জেন্সস (Zancharias Janssen) মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন।
১৬০০—২৫	নাইজেরিয়ার ওয়ো রাজত্ব শক্তির চরম শিখরে পৌছায়, যেখানে ধাতু শিল্পের অনেক কেন্দ্র ছিল।	প্রথম উপন্যাস, ডন কিহোতে, (Don Quixote) স্প্যানিশ ভাষায় রচনা করা হয়।
১৬২৫—৫০		উইলিয়াম হার্ভে প্রমাণ করেন যে রক্ত হৃদয় থেকে পাম্প হয়ে শরীরে পৌঁছায় (১৬২৮)
১৬৫০—৭৫	পর্তুগিজরা কঙ্গো রাজ্যকে ধ্বংস করে।(১৬৬২)	পঞ্চদশ লুইস ফ্রান্সের শাসক হিসেবে সিংহাসনে বসেন (১৬৩৮-১৭১৫)
১৬৭৫—১৭০০		মহান পিটার (১৬৮২-১৭২৫) রাশিয়ার আধুনিকীকরণ করে।

তারিখ	এশিয়া	দক্ষিণ এশিয়া
১৩০০—২৫		
১৩২৫—১৩৫০		বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৩৩৬)
১৩৭৫—৭৫	চিনে মিং রাজবংশ (১৩৬৮ থেকে)	
১৩৭৫-১৪০০		
১৪০০—২৫		আঞ্চলিক সুলতানি শাসনের অভ্যুদয়
১৪২৫—৫০		
১৪৫০—৭৫	অটোমান তুর্কিরা কন্সান্টিনোপল দখল করে (১৪৫৩)	
১৪৭৫—১৫০০		
১৫০০—২৫	পর্তুগিজরা চিনে প্রবেশ করে, তাদের ম্যাকাওর দিকে চালিত করা হয় (১৫২২)	
১৫২৫—৫০		বাবর উত্তর ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)
১৫৫০—৭৫		আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) মোগল সাম্রাজ্যকে দৃঢ় করেন।
১৫৭৫—১৬০০	জাপানে প্রথমে কাবুকি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। (১৫৮৬)। ফারসের শাহ আব্বাস ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সৈন্য প্রশিক্ষণ চালু করেন।	
১৬০০—২৫	জাপানে টকুগানা শগুনেট (tokugawa shogunate) প্রতিষ্ঠা করা হয়। (১৬০৩)	ব্রিটিশ ইস্ট- ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা (১৬০০)
১৬৫০—৭৫		
১৬৭৫—১৭০০		

তারিখ	আমেরিকা	অস্ট্রেলিয়া/ প্রশান্ত মহাসাগরীয়
১৩০০—২৫	টেনোচিটলান মেক্সিকোর এজটেক রাজধানী (১৩২৫) যেখানে অট্টালিকা, মন্দির, সেচ ব্যবস্থায় এবং হিসাব রক্ষণ প্রণালী উন্নত।	
১৩২৫—১৩৫০		
১৩৫০—৭৫		
১৩৭৫—১৪০০		
১৪০০—১৪২৫		
১৪২৫—৫০		
১৪৫০—৭৫	ইনসাকরা পেরুতে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে	
১৪৭৫—১৫০০	কলম্বাস ওয়েস্ট ইন্ডিসে পৌঁছান (১৪৯২)	
১৫০০—২৫	স্পেন মেক্সিকো বিজয় করে (১৫২১)	স্পেনের নৌচালক ম্যাগিলান প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছেন (১৫১৯)
১৫২৫—৫০	ফরাসি অনুসন্ধানকারী কানাডা পৌঁছালো	
১৫৫০—৭৫	স্পেন পেরুতে বিজয়লাভ করে (১৫৭২)	
১৫৭৫—১৬০০		ওলন্দাজ নাবিকরা আকস্মিকভাবে অস্টেলিয়া পৌঁছায়।
১৬০০—২৫	ইংলন্ড উত্তর আমেরিকাতে তাদের প্রথম বসতি স্থাপন করে (১৬০৭) সবচেয়ে প্রথম দাসক পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ভার্জিনিয়াতে নিয়ে আসা হয়। (১৬১৯)	স্পেনীয় নাবিক তাহিতিতে পৌঁছায় (১৬০৬)
১৬২৫—৫০	ওলন্দাজরা নিউ আমস্টারডাম উদ্ভাবিত করল, যা আজ নিউইয়র্ক নামে পরিচিত (১৬২৬) ম্যাসাচুসেটস এ প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। (১৬৩৫)	ওলন্দাজ নাবিক আবেল তাসমান (Abel Tasman) না জেনেই অস্ট্রেলিয়া পরিক্রমণ করেন। অতপর তিনি ভেন ডিমেন এ অবতরন করেন যাকে পরবর্তিকালে তাস্মানিয়া নাম দেওয়া হয়েছিল। তিনি তারপর নিউজিল্যান্ডও যান কিন্তু এই জায়গাটিকে তিনি বৃহত্তর ভু-খণ্ডের অংশ বলে মনে করেন।
১৬৫০—৭৫	ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রথমবার আখ চাষ শুরু হয় (১৬৫৪)	
১৬৭৫—১৭০০	মিসিসিপি অববাহিকায় ফরাসিরা উপনিবেশ স্থাপন করে এবং রাজা পঞ্চদশ লুই-এর নাম অনুসারে এই জায়গার নামকরণ করে লুর্সিয়ানা।	

কার্যক্রম

তোমরা এটা লক্ষ করে থাকবে যে অস্ট্রেলিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দীপপুঞ্জ স্তম্ভে খুব কম ঘটনার তারিখ লিপিভুক্ত করা হয়েছে। এটা এজন্য হয়েছে ওই অঞ্চলে বসবাসকারীরা প্রায়ই তারিখ তৈরি করার জন্য অন্য নিয়ম অবলম্বন করত যা ওপরে দেখানো হয়েছে। যে কোন একটি ঘটনা অবলম্বনে কর্ম পরিকল্পনা কর যা উপরে দেওয়া পাঁচটি স্তম্ভে দেখানো হয়েছে যেটি অস্ট্রেলিয়ার একজন চিত্রকার লিপিবন্ধ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। এভাবে অন্য আরো পাঁচটি ঘটনার তালিকা প্রস্তুত কর যেগুলো তাঁর কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল।

বিষয়

৬

তিনটি শ্রেণি

THE THREE ORDERS

এই অধ্যায়ে আমরা নবম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিম ইউরোপের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করব। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পূর্ব এবং মধ্য-ইউরোপ থেকে অনেক জার্মানবাসী ইতালি, স্পেন এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলকে দখল করে নিয়েছিল।

কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তির অনুপস্থিতিতে ঘন ঘন যুদ্ধ হত এবং নিজেদের দেশ রক্ষা করার জন্য সম্পদ সংগ্রহ অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাই সামাজিক সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা। এই বৈশিষ্ট্য রোমান ঐতিহ্য এবং জার্মান রীতিনীতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। খ্রিস্ট ধর্ম, যা চতুর্থ শতাব্দী থেকে রোমান সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম ছিল, রোমের পতনের পরেও তা বিদ্যমান ছিল এবং মধ্য এবং উত্তর ইউরোপে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। চার্চও ইউরোপে একটি প্রধান ভূমির স্বত্বাধিকারী এবং রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠে।

এই অধ্যায়ের কেন্দ্রবিন্দু তিন শ্রেণি যা তিনটি সামাজিক বিভাগকে বোঝায়ঃ খ্রিস্টান যাজক, ভূমিধারক অভিজাত শ্রেণি, এবং কৃষক। এই তিনটি শ্রেণির মধ্যে পরিবর্তনশীল সম্পর্ক কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় ইতিহাস গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গত একশো বছর ধরে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন অঞ্চলের, এমনকি প্রত্যেক গ্রামের ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত কাজ করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ মধ্যযুগীয় সময়ের ভূমির মালিকানা, মূল্য এবং আইনি মামলার বিবরণের প্রচুর নথিপত্র পাওয়া যায়- উদাহরণস্বরূপ, চার্চে জন্ম-মৃত্যু এবং বিবাহের নথিপত্র পাওয়া গেছে যার ফলে পরিবার এবং জনসংখ্যার কাঠামো বোঝা সম্ভব হয়েছে। চার্চে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে ব্যবসায়ী সমিতি সম্পর্কে তথ্য জানা যায় এবং গান এবং গল্পের মাধ্যমে উৎসব এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপের ধারণা পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকরা এই সব উপাদানগুলো আর্থিক এবং সামাজিক জীবন, দীর্ঘ সময়ের (যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি) অথবা স্বল্প সময়ের (যেমন কৃষক বিদ্রোহ) পরিবর্তনগুলো বোঝার জন্য ব্যবহার করেন।

ফ্রান্সের পণ্ডিতদের মধ্যে সামন্তবাদ নিয়ে প্রথম কাজ করেছেন ব্লচ। মার্ক ব্লচ (১৮৮৬-১৯৪৪) ফ্রান্সের সেসব পণ্ডিতদের মধ্যে একজন, যারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে ইতিহাসের বিষয়বস্তু রাজনৈতিক ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং মহান ব্যক্তিদের জীবনীর থেকেও অধিক বেশি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তিনি মানব ইতিহাস রচনা

করতে ভূগোলকে গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে মানুষের সমষ্টিগত আচরণ এবং তাদের মনোভাব বোঝা যায়।

ব্লচের 'ফিউডাল সোসাইটি' নামক বইটি ইউরোপীয়, বিশেষ করে ৯০০ থেকে ১৩০০ শতাব্দীর মধ্যবর্তী ফ্রান্সের সমাজের সামাজিক সম্পর্ক, শ্রেণিবিন্যাস, জমি ব্যবস্থাপনা এবং ওই সময়ের জনপ্রিয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অসাধারণ বিবরণ দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করলে তাঁর জীবনের বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে।

'মধ্যকালীন যুগ' শব্দটি পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী ইউরোপীয় ইতিহাসকে বোঝায়।

সামন্ততন্ত্রের সূচনা

ঐতিহাসিকরা 'সামন্তবাদ' শব্দের প্রয়োগ করেছেন মধ্যকালীন ইউরোপের অর্থনৈতিক, আইনসংক্রান্ত, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্ককে বর্ণনা করার জন্য। এটি জার্মান শব্দ 'ফিউড' থেকে উৎপন্ন হয়েছে,

মানচিত্র -১ : পশ্চিম ইউরোপ।

যার অর্থ হল ' এক টুকরা জমি' এবং এটি এমন একটি সমাজকে বোঝায় যা মধ্যযুগে ফ্রান্সে এবং পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ ইতালিতে বিকশিত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সামন্ততন্ত্র বলতে এক ধরনের কৃষি উৎপাদনকে বোঝায় যা সামন্তপ্রভু এবং কৃষকদের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কৃষকরা, নিজেদের জমির সাথে সাথে প্রভুর জমিতেও চাষ করত। কৃষকরা প্রভুদের জন্য শ্রমসেবা প্রদান করত, বিনিময়ে তারা তাদের সামরিক সুরক্ষা প্রদান করত। এছাড়াও কৃষকদের উপর সামন্ত প্রভুদের ব্যাপকভাবে বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল। এভাবে সামন্তবাদ শুধু অর্থনৈতিক জীবনে নয়, পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলোও প্রভাবিত করেছিল।

যদিও এর শেকড় রোমান সাম্রাজ্যের প্রচলিত রীতিনীতি এবং ফ্রান্সের রাজা শার্লমেন (Charlemagne742-814) এর সময়ে পাওয়া গেছে, তথাপি প্রতিষ্ঠিত জীবনের উপায় হিসেবে এগারশো শতাব্দীর পরে ইউরোপের বৃহত্তর অংশে সামন্তবাদের উৎপত্তি হয়েছিল।

ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড

রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ 'গল' এতে দুটি বিস্তৃত তটরেখা, পর্বতমালা, দীর্ঘ নদী, বন এবং কৃষিকাজের উপযুক্ত বিস্তৃত সমভূমি ছিল।

জার্মানির ফ্রান্স নামে এক উপজাতি গোষ্ঠী 'গল' প্রদেশকে নিজেদের নাম দিয়ে, ফ্রান্স নামকরণ করেছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এই প্রদেশ ফ্রাঙ্কিস অথবা ফ্রান্সের খ্রিস্টান রাজাদের দ্বারা শাসিত রাজ্য ছিল। ফরাসিদের সাথে চার্চের খুব দৃঢ় সংযোগ ছিল। যখন ৪০০ খ্রিস্টাব্দে পোপ রাজা শার্লমেনকে তাঁর সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য 'পবিত্র রোমান সম্রাটের' উপাধি দেন, তখন এই সংযোগ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

কনস্টানটিনোপলের 'ইস্টার্ন' চার্চের প্রধানের সাথে বাইজেনটাইনের সম্রাটের সমান সম্পর্ক ছিল

এগারশো শতাব্দীতে ফ্রান্সের নরম্যান্ডি প্রদেশের এক রাজা একটি সংকীর্ণ প্রণালী জুড়ে অবস্থিত ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড দ্বীপকে জয় করেছিলেন।

ফ্রান্সের প্রারম্ভিক ইতিহাস

৪৮১	ক্লোভিস ফ্রাঙ্কদের রাজা হন।
৪৮৬	ক্লোভিস এবং ফ্রাঙ্করা উত্তর গোলে বিজয় অভিযান শুরু করেন।
৪৯৬	ক্লোভিস এবং ফ্রাঙ্করা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়।
৭১৪	চালর্স মার্টিল রাজপ্রাসাদের মেয়র হন।
৭১৫	মার্টিল এর পুত্র পেপিন ফ্রাংকিসদের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজা হন এবং একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। যুদ্ধ বিজয়ের ফলে তাঁর রাজ্যের সীমানা দ্বিগুণ হয়েছিল।
৭৬৮	পেপিনের উত্তরাধিকারী হন তার পুত্র শার্লাম্যান/চালর্স দি গ্রেট
৮০০	পোপ তৃতীয় লিও শার্লাম্যান কে পবিত্র রোমান সম্রাট হিসেবে আখ্যায়িত করেন।
৮৪০	থেকে নরওয়ে থেকে ভাইকিংদের আক্রমণ।

তিন শ্রেণি

ফরাসি পাদরিরা একটি ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন যে মানুষ তার কাজের উপর ভিত্তি করে তিনটি শ্রেণির মধ্যে যে কোনো একটির সদস্য হয়। এই মর্মে একজন বিশপ বলেছিলেন 'এখানে শ্রেণি অনুযায়ী, কেউ প্রার্থনা করে, অন্যরা যুদ্ধ করে এবং বাকীরা এখনো অন্যদের কাজ করে' এভাবে সমাজ মুখ্যত যাজক/পাদরি, অভিজাত এবং কৃষক এই তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছিল।

আব্বে শব্দটি সিরিয়ার অব্ব থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ হল পিতা। আব্বে এবট বা আব্বেসের শাসনাধীন ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে, বিনগেন এর আব্বেস হিলডিগার্ড লিখেছিলেন 'কে তার সমস্ত পশুদের গরু, গাধা, ভেড়া, ছাগলকে আলাদা না করে একটি আস্তাবলে রেখে দেওয়ার চিন্তা করবে? তাই মানুষের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা প্রয়োজন যাতে তারা একে অপরকে ধ্বংস না করতে পারে... ঈশ্বর স্বর্গ এবং মর্ত্য সব জায়গাতেই তাঁর পালকদের মধ্যে পার্থক্য রাখেন, ঈশ্বর প্রত্যেককেই ভালবাসেন, তথাপি তাদের মধ্যে কোনো সমতা নেই।'

দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ অভিজাত বর্গ

পাদরিরা নিজেদের প্রথম শ্রেণিতে এবং অভিজাতবর্গকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক প্রক্রিয়ায় অভিজাতবর্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কারণ জমির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। এটি 'ভেসলেজ্'(Vassalage) নামক একটি রীতির দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল।

ফ্রান্সের রাজাদের সাথে জনগণের সম্পর্কের এক ধরনের প্রথা চালু ছিল যাকে ভেসলেজ্ বলা হত এবং জার্মানির জনগণের মধ্যে অনুরূপ ব্যবস্থা চালু ছিল যাদের মধ্যে ফ্রাঙ্করাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। বড়ো বড়ো ভূস্বামী অভিজাতবর্গরা রাজার অধীনস্থ ছিল এবং কৃষকরা ভূস্বামীর অধীনস্থ ছিল। একজন অভিজাত শ্রেণির লোক রাজাকে তাঁর প্রভু (Seigneur যার অর্থ হল Senior) হিসেবে মেনে নিত এবং তারা পারস্পরিক অঙ্গীকারবব্ধ ছিলেন: প্রভু (প্রভু এমন এক শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ ছিল যিনি রুটির যোগান দেন) তাঁর প্রজাদের রক্ষা করবেন এবং পরিবর্তে প্রজারা প্রভুর প্রতি আনুগত্য দেখাবে। এই সম্পর্কের মধ্যে ব্যাপক রীতিনীতি এবং শপথের বিনিময় হত যা বাইবেলের শপথ নিয়ে করা হত। এই অনুষ্ঠানে প্রজাদের তাঁর প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত জমির প্রতীক হিসেবে, প্রভুর দ্বারা একটি লিখিত অধিকার পত্র বা একখণ্ড মাটি দেওয়া হত।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আঁকা চিত্র যেখানে ফরাসি অভিজাতদের শিকারে যাওয়ার ছবি আঁকা হয়েছে।

অভিজাত শ্রেণির লোকেরা বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। তাঁর নিজের সম্পত্তির উপর স্থায়ীভাবে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ছিল। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী বাড়াতে পারতেন যাকে 'সামন্ত সৈন্য' বলা হত। তিনি তাঁর নিজের বিচারের ব্যবস্থা করতে পারতেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করতে পারতেন।

তিনি তাঁর অধিকৃত ভূমিতে বসবাসকারী সব মানুষের প্রভু ছিলেন। তিনি বিস্তৃত অঞ্চলের অধিকারী ছিলেন যেখানে তাঁর নিজস্ব ঘর, ব্যক্তিগত জমি, চারণভূমি, তাঁর ভাড়াটে কৃষকদের ঘরবাড়ি এবং তাদের কৃষিজমি ছিল। তাঁর বাসস্থানকে খামারবাড়ী বা 'মেনর' বলা হত। তাঁর ব্যক্তিগত জমিগুলো কৃষকেরা চাষ করত। এই কৃষকদের যুদ্ধের সময় পদাতিক সৈন্য হিসেবে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হত এবং সাথে সাথে তাদের নিজেদের জমিতেও চাষ করতে হত।

জমিদারি সম্পত্তি

প্রতিটি সামন্ত প্রভুর নিজস্ব খামার বাড়ি ছিল। তিনি গ্রামগুলো নিয়ন্ত্রণ করতেন। কোনো কোনো জমিদার অনেকগুলো গ্রাম নিয়ন্ত্রণ করতেন। সেখানে কৃষকরা বসবাস করত। একটি ছোটো জমিদারের খামার অঞ্চলে এক ডজন পরিবার থাকত এবং বড়ো জমিদারের খামার অঞ্চলে পঞ্চাশ বা ষাট পরিবার থাকত। দৈনন্দিন জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার প্রায় সবকিছুই জমিদারি অঞ্চলে পাওয়া যেত। শস্য ক্ষেত্রে শস্যের চাষ করা হত, কর্মকার ও কাঠমিস্ত্রিরা সামন্ত প্রভুর সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাঁর অস্ত্র মেরামত করত, রাজমিস্ত্রী তাদের অট্টালিকার যত্ন নিত। নারীরা সুতো কাটত এবং বস্ত্র বয়ন করত। তাদের শিশুরা সামন্ত প্রভুদের মদ তৈরির কলে কাজ করত। তাদের অধিকৃত অঞ্চলে বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি এবং বন ছিল যেখানে ভূস্বামীরা শিকার করতে যেত। জমিদারি অঞ্চলে চারণভূমিও ছিল যেখানে তাদের গবাদি পশু ও

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের একটি জমিদারী অঞ্চল

ঘোড়া চারণ করত। সেখানে একটি চার্চ এবং প্রতিরক্ষার জন্য একটি দুর্গও ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে কিছু কিছু বড়ো দুর্গ বানানো হয়েছিল যাতে নাইট পরিবারের বাসস্থান হিসেবে এটি ব্যবহার করা যায়। বাস্তবে নরম্যান বিজয়ের আগে ইংল্যান্ডর দুর্গ সম্পর্কে ধারণা ছিল না এবং সামন্ত ব্যবস্থার অধীনে রাজনৈতিক প্রশাসন ও সামরিক শক্তির কেন্দ্র হিসেবে এটি বিকশিত হয়েছিল।

জমিদারি পুরোপুরিভাবে স্বয়সম্পূর্ণ ছিল না। কারণ লবণ, মাইলফলক এবং ধাতু নির্মিত বাসনপত্র বাইরের উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হত। যেসব ভুস্বামীরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে চাইতেন এবং দামি সাজসরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্র এবং অলঙ্কার কিনতে আগ্রহী ছিলেন যা স্থানীয় ভাবে উৎপাদন হত না, ওই সমস্ত জিনিসপত্র অন্য জায়গা থেকে কিনতে হত।

নাইট (Knight) বা বীর যোদ্ধা

নবম শতাব্দী থেকে, ইউরোপে প্রায়শই স্থানীয় যুদ্ধ সংঘঠিত হত। অপেশাদার কৃষক-সৈন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না, এবং দক্ষ অশ্বারোহীর প্রয়োজন ছিল। এর ফলে এক শ্রেণির নতুন মানুষের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল যাদের নাইট (যোদ্ধা) বলা হত। তারা ভুস্বামীদের সাথে এভাবেই যুক্ত ছিল, ঠিক যেভাবে ভুস্বামীদের সাথে রাজাদের সম্পর্ক ছিল। ভুস্বামীরা নাইটদের একখণ্ড ভূমি (যাকে ফিফ Feef বা জায়গির বলা হত) দান করেছিলেন এবং তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ফিফ বা জায়গির উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যেত। এটি ১০০০-২০০০ একর বা তারও বেশি এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল যার মধ্যে নাইট এবং তার পরিবারের জন্য একটি ঘর, একটি চার্চ এবং তার অধীনস্ত ব্যক্তিদের জন্য থাকার ব্যবস্থাও ছিল। এর সাথে জলচক্র এবং মদ তৈরির কারখানাও ছিল। সামন্ত জমিদারদের মতো, নাইটদের জমিতেও কৃষকরা চাষ করত। বিনিময়ে, নাইটরা সামন্তপ্রভুদের নিয়মিতভাবে খরচ দিত এবং যুদ্ধে তার পক্ষ নিয়ে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দিত। নিজের সৈন্যদের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য, নাইটরা প্রতিদিন তলোয়ার চালনা এবং পুতুলের সাথে যুদ্ধ করে নিজেদের রক্ষা করার কৌশল আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করত। একজন নাইট অন্য জমিদারদেরও সেবা করত, কিন্তু তার প্রধান আনুগত্য ছিল তার নিজের জমিদারের প্রতি।

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ফ্রান্সের কবিরা বিভিন্ন জমিদারি অঞ্চলে ভ্রমণ করে রাজা এবং নাইটদের বীরত্বের কাহিনি গানের মাধ্যমে প্রচার করত যা কিছুটা ঐতিহাসিক এবং কিছুটা কাল্পনিক ছিল। সেই যুগে যখন অধিকাংশ মানুষ পড়তে পারত না এবং পাণ্ডুলিপিও বেশি ছিল না তখন এই চারণ কবিরা খুব জনপ্রিয় ছিলেন। অনেক জমিদার প্রাসাদের বড়ো ঘরের উপরে একটি সংকীর্ণ ব্যালকনি থাকত যেখানে জমিদারদের লোকেরা খাবারের জন্য জড়ো হত। এখানে গায়কদের জন্য এক লম্বা বারান্দা ছিল, যেখান থেকে গায়করা অভিজাত শ্রেণির লোকদের বিনোদন করত যখন তারা ভোজন করতেন।

প্রথম শ্রেণি : পাদরি বর্গ

ক্যাথলিক চার্চের নিজস্ব নিয়ম ছিল, শাসকদের দেওয়া জমির মালিক ছিল এবং তারা কর সংগ্রহ করতে পারত। এভাবে এটি একটি শক্তিশালী সংস্থায় পরিণত হয় যা রাজা বা শাসকের উপর নির্ভরশীল ছিল না। পশ্চিমাঞ্চলের চার্চের প্রধান ছিলেন পোপ, যিনি রোমে বসবাস করতেন। ইউরোপে খ্রিস্টানরা বিশপ তথা পাদরিদের দ্বারা পরিচালিত হত যারা প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধিকাংশ গ্রামের নিজস্ব চার্চ ছিল যেখানে জনগণ প্রতি রবিবার পাদরিদের ধর্মোপদেশ শোনার জন্য এবং সমবেত প্রার্থনা করার জন্য একত্রিত হত। সবার পাদরি হওয়ার যোগ্যতা ছিল না। যেমন, ভূমিদাস এর পাশাপাশি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের পাদরি

কার্যবলি-১

বিভিন্ন মানদণ্ড যেমন পেশা, ভাষা, ধন সম্পদ শিক্ষার উপর ভিত্তি করে সামাজিক অনুক্রমের আলোচনা করো। মধ্যযুগের ফ্রান্সের সাথে মেসোপটেমিয়া এবং রোমান সাম্রাজ্যের তুলনা করো।

যদি আমার প্রিয় প্রভু নিহত হয়, তবে আমিও তাঁর সাথে মৃত্যুবরণ করব যদি তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় তবে আমাকেও ফাঁসি দিও তাঁর পাশে, যদি তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয় তাঁর সাথে আমি পুড়ে মরব, যদি তিনি জলে ডুবে যান, তবে আমাকে তাঁর সাথে জলে ডুবে যেতে দাও।

ডুন দ্য মেয়ন্স, নাইট বা বীর যোদ্ধাদের অভিযান গুলোকে স্মরণ করে গাওয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি ফরাসি কবিতা।

হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। মহিলারা পাদরি হতে পারত না। পুরুষদের মধ্যে যিনি পাদরি হতেন তিনি বিবাহ করতে পারতেন না। বিশপদের একটি বিশেষ ধর্মীয় আভিজাত্য ছিল। জমিদারদের মতো বিশপরাও বিশাল সম্পত্তির মালিক ছিলেন এবং তারা বিশাল প্রাসাদে বসবাস করতেন। চার্চ এক বছর পর পর কৃষকদের উৎপাদিত সামগ্রীর দশভাগের একভাগ আদায় করত যাকে টাইথ (tithe) বলা হত। ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের কল্যাণের জন্য এবং মৃত্যুর পর নিজের আত্মীয়দের কল্যাণের জন্য যা কিছু দান করতেন, তার মাধ্যমেও চার্চের আয় হত।

চার্চ কর্তৃক পরিচালিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সামন্তবাদীদের আচার অনুষ্ঠানকে অনুসরণ করা হত। প্রার্থনার সময় হাঁটু গেড়ে বসা, হাত জোড় করে মাথা নত করা, নাইটদের দ্বারা নিজেদের প্রভুর প্রতি আনুগত্যের শপথ নেওয়ার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করত তার অবিকল প্রতিরূপ। একইভাবে, ঈশ্বরের জন্য 'লর্ড' শব্দের প্রচলন সামন্ত সংস্কৃতির আরেকটি উদাহরণ যা চার্চের উপাসনা কক্ষে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল। এভাবে, অনেক সাংস্কৃতিক সামন্ত রীতিনীতি এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সন্ন্যাসী

চার্চের পাশাপাশি, ধার্মিক খ্রিস্টানদের অন্য ধরনের সংস্থাও ছিল। কিছু কিছু অত্যধিক ধার্মিক ব্যক্তি, শহর ও গ্রামে জনসাধারণের মাঝে বসবাসকারী পাদরিদের বিপরীতে, একান্তে জীবন যাপন করতে পছন্দ করতেন। তাঁরা আবে বা মনেস্ট্রি (monastery) নামক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করতেন যেগুলো অধিকাংশই জনবসতি অঞ্চল থেকে দূরে অবস্থিত ছিল।

এর মধ্যে দুটি বিখ্যাত মঠ ছিল —৫২৯ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে সেন্ট বেনিডিক্ট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মঠ এবং ৯১০ খ্রিস্টাব্দে বার্গেন্ডিতে প্রতিষ্ঠিত ক্লুনি মঠ।

সন্ন্যাসীরা সারাজীবন মঠে থেকে প্রার্থনা করে, অধ্যয়ন এবং কৃষিকাজের মতো শারীরিক শ্রম দান করে সময় অতিবাহিত করার শপথ গ্রহণ করতেন। পাদরিদের জীবনের মতো না হয়ে, পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য এই ধরনের জীবন উন্মুক্ত ছিল—পুরুষদের মঙ্ক বা ভিক্ষু এবং মহিলাদের সন্ন্যাসিনী বা নান বলা হত। কিছু কিছু মঠ ছাড়া বেশিরভাগ মঠে একক লিঙ্গ সম্প্রদায়ের ব্যক্তি থাকতে পারতেন অর্থাৎ পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক-পৃথক আবে বা মঠ ছিল। পাদরিদের মতো সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীরাও বিয়ে করতে পারতেন না।

দশ বা বিশ জন পুরুষ/মহিলাদের ছোটো সম্প্রদায় থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মঠগুলো কয়েক শত সম্প্রদায়ের জন্য গড়ে ওঠে যেখানে বড়ো বড়ো অট্টালিকা, ভূসম্পত্তির সাথে সাথে স্কুল, কলেজ এবং হাসপাতালও সংযুক্ত থাকত। কলা বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের যথেষ্ট অবদান ছিল। আবেস হিল্ডেগার্ড (১৩৫ পৃষ্ঠা দেখো) একজন প্রতিভাশালী সংগীতজ্ঞ ছিলেন যিনি চার্চের সমবেত প্রার্থনা-সঙ্গীতের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সন্ন্যাসীদের কিছু সম্প্রদায়—যাদের ফ্রিয়ার (Friars) বলা হত, তারা মঠে না থেকে বরং বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে জনগণকে উপদেশ দিত এবং জনগণের দান গ্রহণ করে নিজের জীবনযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কার্যাবলি-২

মধ্যযুগে জমিদারিতে, প্রাসাদ এবং উপাসনার স্থান- এই তিন জায়গায় বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষের আচরণের নিদর্শন উদাহরণ সহ আলোচনা করো।

মোনেস্ট্রি শব্দটি গ্রিক শব্দ মোনোস থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হল এমন ব্যক্তি যিনি একা বসবাস করেন।

ইংল্যান্ডের ফার্নবোরোতে সেন্ট মাইকেলের বেনেডিক্টিন মঠ

বেনেডিক্টিন মঠে ৭৩ অধ্যায়ের একটি হাতে লেখা পুস্তক ছিল যেখানে সন্ন্যাসীদের জন্য বিভিন্ন নিয়ম লেখা ছিল যা সন্ন্যাসীরা বহু শতাব্দী ধরে অনুসরণ করেছিল। এই পুস্তকের কয়েকটি নিয়ম দেওয়া হল—

অধ্যায় ৬ : ভিক্ষুদের কথা বলার অনুমতি খুব কম দেওয়া উচিত।

অধ্যায় ৭ : নম্রতার অর্থ হচ্ছে আজ্ঞাবহ।

অধ্যায় ৩৩: কোনো সন্ন্যাসীর নিজস্ব সম্পত্তি রাখা উচিত নয়।

অধ্যায় ৪৭: আলস্য হচ্ছে আত্মার শত্রু, ফলে সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীদের নির্দিষ্ট সময় শারীরিক শ্রম এবং নির্দিষ্ট ঘণ্টায় পবিত্র পাঠ করা উচিত।

A Benedictine monk working on a manuscript, woodcut.

অধ্যায় ৪৮: মঠ এমনভাবে তৈরি করা দরকার যাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস যেমন - জল, পেষণযন্ত্র, বাগান, কর্মশালা সবকিছু এর চৌহদ্দির ভেতর থাকে।

কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে মঠের মহত্ব এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। ইংল্যান্ডে ল্যাংল্যান্ডের কবিতা 'পিয়র্স প্লাউম্যান' এ (১৩৬০-৭০ খ্রিস্টাব্দে) কোনো কোনো সন্ন্যাসীর আরামদায়ক এবং বিলাসী জীবন যাপনকে সাধারণ কৃষক, পশুপালক এবং গরিব মেহনতি মানুষের 'বিশুদ্ধ বিশ্বাসের' সাথে তুলনা করা হয়েছিল। ইংল্যান্ডে চসার 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স' রচনা করেছিলেন (নীচের বক্স দেখো) যেখানে সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসী এবং ফ্রাইর এর কৌতুক চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

চার্চ এবং সমাজ

যদিও ইউরোপীয়রা খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাদুবিদ্যা এবং পুরোনো রীতিনীতির বিশ্বাসকে তারা ত্যাগ করতে পারেনি। চতুর্থ শতাব্দী থেকে ক্রিসমাস এবং ইস্টার গুরুত্বপূর্ণ দিবস হয়ে উঠেছিল। ২৫ শে ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন পালন করা হত যা পুরোনো রোমান উৎসবের স্থান নিয়েছিল, এই দিবসটি সৌর ক্যালেন্ডার দ্বারা গণনা করা হত।

ইস্টার খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধকরণ এবং তাঁর পুনর্জীবিত হওয়ার প্রতীক ছিল। কিন্তু এই দিবসটি নির্দিষ্ট ছিল না। কারণ এটি চন্দ্রের পঞ্জিকার দ্বারা নির্ধারিত একটি প্রাচীন উৎসবের স্থান নিয়েছিল যা, দীর্ঘ শীতকালের পর বসন্তের আগমনকে স্বাগত জানানোর জন্য উদ্‌যাপন করা হত। ঐতিহ্যগতভাবে, সেদিন প্রতিটি গ্রামের মানুষ তাদের গ্রামের জমিকে বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করত। খ্রিস্টধর্ম আগমনের পরেও তারা এই রীতি চালু রেখেছিল। কিন্তু তখন তারা গ্রামকে প্যারিশ বলতে শুরু করেছিল (parish- একজন পাদরির তত্ত্বাবধানে থাকা অঞ্চল)। কাজের চাপে জর্জরিত কৃষকরা এই পবিত্র দিবসকে স্বাগত জানাত, কারণ ওই দিনগুলোতে তাদের কোনো কাজ করতে হত না। যদিও এই দিনগুলো ছিল প্রার্থনা করার, কিন্তু মানুষ সাধারনত এই দিনগুলোর অধিকাংশ সময় মজা করে এবং এক অপরকে ভোজন করিয়ে কাটাত।

তীর্থযাত্রা, খ্রিস্টানদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এবং বহু মানুষ শহীদদের সমাধি বা বড় গির্জাঘরে যাওয়ার জন্য অনেক দূর ভ্রমণ করতেন।

'যখন এপ্রিল মাসের হালকা বৃষ্টিধারায়
মার্চের শুষ্কতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায়
যখন ছোটো ছোটো পাখিরা সারারাত
খোলা চোখে মধুর স্বরে গান গায়
(এইভাবে প্রকৃতি তাদের হৃদয়ে জড়িত থাকে)
তখন মানুষ দীর্ঘ পথ তীর্থযাত্রায় যায়,
পামরেরা বিদেশের মঠে যেতে দূর ভ্রমণ করে,
দূরবর্তী অঞ্চলের সাধুসন্তদের সম্মান করে।
বিশেষত ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জেলা থেকে,
সবাই ক্যান্টারবেরির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।'

– জিওফ্রে চসার (১৩৪০-১৪০০) রচিত 'দি ক্যান্টারবেরি টেল্‌স' থেকে নেওয়া একটি অংশ। মূল কবিতার গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছিল। পরে আধুনিক ভাষায় এর অনুবাদ করা হয়।

*দূরবর্তী পুণ্যস্থান দর্শনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারী সাধুকে পামর (palmer) বলা হয়।

তৃতীয় শ্রেণি ঃ কৃষক, স্বাধীন এবং পরাধীন

এখন আমরা সেই বিশাল সংখ্যক জনগণ সম্পর্কে আলোচনা করব যারা প্রথম দুই শ্রেণির মানুষের ভরণ-পোষণ করত। দুই ধরনের কৃষক ছিল, যথাঃ স্বাধীন কৃষক এবং সার্ফ বা ভূমিদাস (ইংরেজি ক্রিয়াবাচক শব্দ to serve থেকে শব্দটি এসেছে)।

স্বাধীন কৃষক নিজের জমিতে সামন্ত প্রভুদের ভাড়াটেদের মতো বসবাস করত। পুরুষদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করা আবশ্যিক ছিল (বছরে অন্তত চল্লিশ দিন)। কৃষকের পরিবারকে সপ্তাহে তিনদিন বা এর বেশি দিন সামন্ত প্রভুদের জমিতে গিয়ে কাজ করতে হত। এই শ্রমে উৎপাদিত পণ্য যাকে 'শ্রম ভাড়া' বলা হত, তা সরাসরি সামন্ত প্রভুর কাছে চলে যেত। এছাড়াও তাদের দিয়ে অন্যান্য শ্রমসাধ্য পরিসেবা যেমন খনন কার্য, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা, বেড়া দেওয়া, এবং রাস্তা ও সড়ক মেরামত করানো হত এবং এই কাজের জন্য তাদের কোনো মজুরি দেওয়া হত না। জমিতে সাহায্য করার পাশাপাশি মহিলা এবং শিশুদের অন্যান্য কাজও করতে হত। তারা সুতো কাটা, কাপড় বোনা, মোমবাতি তৈরি এবং প্রভুর জন্য আঙ্গুর থেকে রস বের করে মদ তৈরি করত। এর সাথে টেইলি নামে একটি প্রত্যক্ষ কর দিতে হত যা রাজারা কখনো-কখনো কৃষকদের উপর আরোপ করত (পাদরি এবং অভিজাত শ্রেণির লোকেরা এই কর থেকে মুক্ত ছিল)।

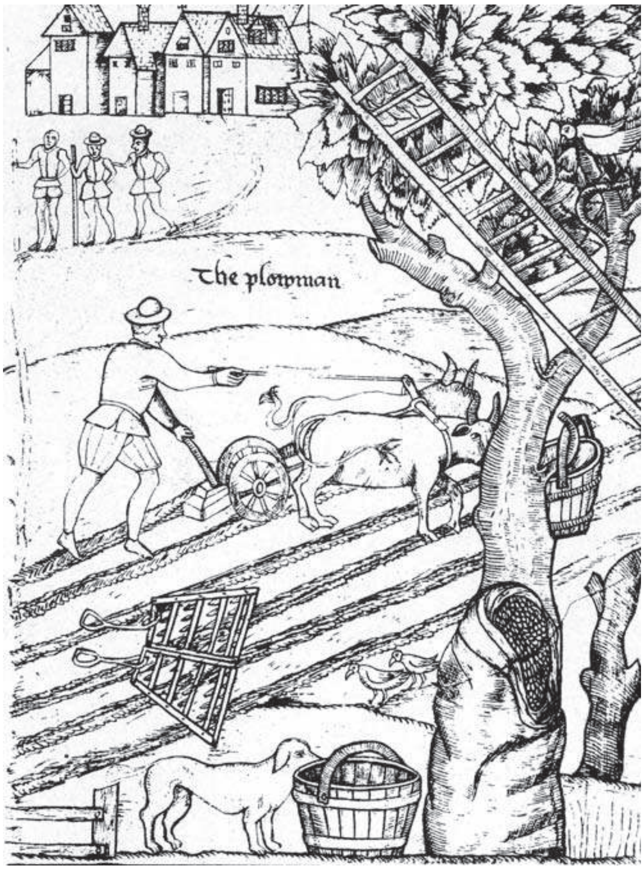

একজন ইংরেজ কৃষক ষোড়শ শতাব্দীর রেখাচিত্র

ভূমিদাসরা সে সকল জমি চাষ করত সেগুলো ছিল সামন্ত প্রভুদের। ফলে উৎপাদিত ফসলের অধিকাংশই সামন্ত প্রভুদের দিতে হত। তারা সেই সব জমিতেও চাষ করতে বাধ্য হত যা কেবলমাত্র সামন্ত প্রভুদের সম্পত্তি ছিল। এই কাজের জন্য কৃষককে কোনো মজুরি দেওয়া হত না এবং সামন্ত প্রভুদের অনুমতি ছাড়া সেই জমি ছেড়ে যেতে পারত না। সামন্ত প্রভুরা ভূমিদাসদের প্রতি একচেটিয়া অধিকার দাবি করতেন যার ফলে ভূমিদাসদের ক্ষতিও হতে পারত। ভূমিদাসরা কেবল তাদের প্রভুদের আটার কল নিজেদের আটা পিষতে ব্যবহার করতে পারত, রুটি তৈরির জন্য প্রভুর চুল্লি এবং মদ ও বিয়ার তৈরি করার জন্য প্রভুর ওয়াইন প্রেস ব্যবহার করতে পারত। ভূমিদাস কাকে বিবাহ করবে সেই সিদ্ধান্তও সামন্ত প্রভুই নিতেন বা ভূমিদাসদের পছন্দকেও আশীর্বাদ দিতে পারতেন কিন্তু তার জন্য তিনি কর নিতেন।

ইংল্যান্ড

একাদশ শতাব্দী থেকে ইংল্যান্ডে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্য-ইউরোপ থেকে এঙ্গোল এবং স্যাক্সনরা ইংল্যান্ডে বসতি স্থাপন করেছিল। 'এঙ্গোল ল্যান্ড' থেকে ইংল্যান্ড দেশের নামকরণ করা হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীতে, নরম্যান্ডির ডিউক, উইলিয়াম, একজন সেনাকে নিয়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যান্ডের স্যাক্সন রাজাকে পরাজিত করেন। এই সময় এলাকা ও বাণিজ্য নিয়ে বিতর্কের কারণে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড প্রায়শই যুদ্ধ লিপ্ত হত।

** ইংল্যান্ডের বর্তমান রানি প্রথম উইলিয়ামের উত্তরাধিকারী*

* ত্রয়োদশ শতাব্দী ইংল্যান্ডের হেভার দুর্গ

প্রথম উইলিয়াম ভূমির মানচিত্র তৈরি করেছিলেন এবং ১৮০ জন নরম্যান অভিজাতদের ভূমি বন্টন করে দিয়েছিলেন যারা তাঁর সাথে দেশান্তরে গমন করেছিল। যে ভূস্বামীরা রাজাকে সৈন্য সহায়তা করত, তারাই রাজার মুখ্য প্রজা হিসেবে গণ্য করা হত। তারা রাজাকে কিছু নাইট বা যোদ্ধা দিতে বাধ্য থাকতেন। তাঁরা শীঘ্রই কিছু ভূমি নাইটদের উপহার দিতে শুরু করেছিলেন। তারা যেমন সেবার আশা করত, তেমনি সেবা তারা রাজাকে করতেন, কিন্তু তারা ব্যক্তিগত যুদ্ধের জন্য নাইটদের ব্যবহার করতে পারতেন না, কারণ ইংল্যান্ডে তা নিষিদ্ধ ছিল। অ্যাংলো স্যাক্সন কৃষকরা বিভিন্ন স্তরের জমিদারদের প্রজা হয়ে ওঠে।

সামাজিক এবং আর্থিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করার কারণসমূহ

প্রথম দুই শ্রেণির সদস্যরা সামাজিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় দেখেছিল, কিন্তু তখন বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিল। এর মধ্যে কিছু প্রক্রিয়া, যেমন পরিবেশের পরিবর্তন, ক্রমাগত এবং প্রায় অদৃশ্য ছিল। অন্যান্য পরিবর্তন, যেমন কৃষি প্রযুক্তির পরিবর্তন এবং ভূমির ব্যবহার, অধিক চমকপ্রদ ছিল। এই পরিবর্তনের ফলে সামন্ত প্রভু ও জায়গিরদারের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল এবং এই সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিল। আমরা এই প্রক্রিয়াগুলোকে এক এক করে পরীক্ষা করে দেখব।

পরিবেশ

পঞ্চম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত, ইউরোপের অধিকাংশ এলাকা ঘন বনে আবৃত ছিল। ফলে কৃষি কাজের জন্য উপযুক্ত জমির অভাব ছিল। এছাড়া যেসব কৃষকরা নিজের পরিস্থিতির জন্য অসন্তুষ্ট ছিল, তারা অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বনে আশ্রয় নিতে পারত। এই সময় ইউরোপে তীব্র ঠান্ডা আবহাওয়া ছিল। এর ফলে শীতকাল তীব্র ও দীর্ঘ হত। ফসলের উৎপাদনের মরশুমও ছোটো হয়ে যায় এবং কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

একাদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে উষ্ণতার পর্যায় শুরু হয়। গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় যা কৃষির উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কৃষিকাজ করার জন্য কৃষকরা দীর্ঘ সময় পেল। কম ঠান্ডার সাপেক্ষে মাটিতে তুষারের প্রভাব কম হওয়ার ফলে চাষবাস করা সহজসাধ্য হয়। পরিবেশগত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হল, এর ফলে ইউরোপের অনেক অংশে বনাঞ্চল উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল। ফলে কৃষি জমির সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছিল।

ভূমির ব্যবহার

প্রথম দিকে, কৃষি প্রযুক্তি ছিল খুব প্রাচীন। কৃষকদের কাছে একমাত্র যান্ত্রিক সাহায্য ছিল কাঠের লাঙল যা একজোড়া বলদের সাহায্যে টানা হত। এই লাঙল মাটিতে শুধুমাত্র আঁচড় কাটতে পারত কিন্ত মাটির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারত না। তাই কৃষিকাজে অত্যধিক পরিশ্রম করতে হত। জমিকে প্রায় চার বছরে একবার হাত দিয়ে গর্ত করা হত এবং এতে কায়িক মানব শ্রমের প্রয়োজন ছিল।

এছাড়াও, ফসল চক্রের মতো একটি অকার্যকর পদ্ধতির প্রচলন ছিল। জমিকে দুভাগে ভাগ করা হত, এক ভাগে শরৎ ঋতুতে শীতকালের জন্য গম লাগানো হত। তখন অন্য জমিকে পতিত রাখা হত। পরের বছর এই পতিত জমিতে রাই জাতীয় শস্য রোপণ করা হত এবং বাকী অর্ধেক জমিকে খালি ফেলে রাখা হত। এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে ধীরে ধীরে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায় এবং প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দীর্ঘকালব্যাপী অপুষ্টি এবং বারংবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে গরিবদের পক্ষে জীবনধারণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। কৃষকরা এত সব কষ্টের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও সামন্ত প্রভুরা তাদের নিজেদের আয় বাড়ানোর জন্য উদগ্রীব থাকতেন। যেহেতু কৃষিজমি থেকে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব ছিল না, তাই গরিব কৃষকদের বাধ্য করা হত তারা যেন জমিদারির আওতায় থাকা সমস্ত জমিকে কৃষিকার্যের উপযোগী করে তোলে। ফলস্বরূপ কৃষকদের নির্ধারিত সময়সীমা থেকে বেশি সময় জমিদারবাড়ির কৃষিকার্যে লিপ্ত থাকতে হত। কিন্তু তারা এই অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেনি। যেহেতু গরিব কৃষকরা প্রকাশ্যে এই অত্যাচারের বিরোধিতা করতে পারত না, তাই তারা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ শুরু করে। কৃষকেরা নিজেদের জমিতে বেশি সময় ধরে কাজ করতে লাগল এবং উৎপাদনের একটা বড়ো অংশ নিজেদের ব্যবহারের জন্য রাখতে লাগল। তৃণভূমি ও বনভূমির ব্যবহার নিয়ে তারা প্রায়ই সামন্ত প্রভুদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে লাগল। কারণ কৃষকরা এই সমস্ত ভূসম্পদকে সমস্ত জনগোষ্ঠীর ব্যবহারযোগ্য সম্পদ বলে ভাবতেন, অথচ সামন্ত প্রভুরা এই সমস্ত জমিকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ বলে মনে করতেন।

নতুন কৃষি - প্রযুক্তি

একাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কাঠের লাঙলের পরিবর্তে কৃষকেরা ভারী লোহার ডগা যুক্ত লাঙল এবং ছাঁচ যুক্ত তক্তা ব্যবহার করতে শুরু করে। এই লাঙল অধিক গভীরে খনন করতে পারত এবং ছাঁচযুক্ত তক্তা উপরিভাগের মাটিকে সহজে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করতে পারত। এর দ্বারা মাটির উর্বরতার সঠিক ব্যবহার হত।

পশুদের লাঙলের সাথে যুক্ত করার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আসে। গলার পরিবর্তে পশুর কাঁধে লাঙল বাঁধা হতে লাগল, যার দ্বারা পশুরা অধিক শক্তি দিয়ে হাল চাষে সহায়তা করতে পারল, ঘোড়ার পা বা খুর সুরক্ষিত করার জন্য লোহার খুর এর ব্যবহার হতে লাগল। কৃষিক্ষেত্রে বায়ু শক্তি ও জন শক্তির ব্যাপক ব্যবহার হতে থাকে। শস্য চূর্ণ করার জন্য এবং আঙ্গুরের রস বের করার জন্য সমস্ত ইউরোপে জলশক্তি ও বায়ুশক্তি চালিত কারখানা তৈরি হয়।

ভূমি ব্যবহারের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আসে। সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছিল দ্বি-ফসলি ব্যবস্থাকে ত্রি-ফসলি ব্যবস্থায় পরিবর্তন। এই ব্যবস্থায় কৃষক একটি জমিকে তিন বছরের পরিবর্তে দুই বছর ব্যবহার করত, একবার শরৎকালে এবং আর একবার দেড় বছর পর বসন্তকালে। অর্থাৎ কৃষক তাদের জমিকে তিন ভাগে ভাগ করতে পারত। তারা মানুষের প্রয়োজনে এক জমিতে শরৎকালে গম বা রাই উৎপাদন করত। দ্বিতীয়টিতে বসন্তকালে মটর, সিম, ডাল, ঘোড়ার খাদ্য জই এবং যব উৎপাদন করত। তৃতীয় জমিটি পতিত থাকত। প্রতি বছরই জমির তিনটি অংশকে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হত। এসব পরিবর্তনের ফলে জমিটি থেকে খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে বেড়ে যায়। খাদ্য বস্তুর যোগান দ্বিগুণ হয়ে যায়। মটর ও সিম গাছের অধিক উৎপাদনের ফলে ইউরোপীয়দের খাদ্যের তালিকায় উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের গবাদি পশুর খাদ্যের উৎকৃষ্ট উৎসও তৈরি হয়। ফলে কৃষকেরা কম জমিতে বেশি উৎপাদন করতে পারত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কৃষকদের জমির আয়তন ১০০

একর থেকে সংকুচিত হয়ে ২০ থেকে ৩০ একরে এসে দাঁড়ায়। অপেক্ষাকৃত ছোটো জমি ভালোভাবে চাষ করা হত এবং এতে শ্রমও কম লাগত, যা কৃষকদের অন্যান্য কাজের জন্য সুযোগ করে দিত।

এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে মূলধনের প্রয়োজন ছিল। জলচক্র চালিত ও বায়ু চালিত কল স্থাপন করার জন্য কৃষকদের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। ফলে ভূস্বামীরা উদ্যোগ গ্রহণ করে। কৃষকেরাও চাষের জমি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা তিন বছরের শস্যাবর্তন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনে এবং লোহার ডগাযুক্ত লাঙল ও ঘোড়ার জন্য লৌহ নির্মিত খুর তৈরি করা ও সস্তায় মেরামত করার জন্য গ্রামে ছোটো ছোটো কামারশালা ও কারখানা তৈরি করে।

একাদশ শতাব্দী থেকে ব্যক্তিগত বন্ধন যা সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি ছিল, তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে, কারণ অর্থনৈতিক লেনদেন অতিমাত্রায় মুদ্রাভিত্তিক হয়ে পড়েছিল, ভূস্বামীরা শ্রম অপেক্ষা নগদে খাজনা আদায়কে সুবিধাজনক মনে করেন। কৃষকেরাও মুদ্রার বিনিময়ে ব্যবসায়ীদের কাছে শস্য বিক্রয় করত। ব্যবসায়ীরা সেসব দ্রব্য শহরে নিয়ে বিক্রয় করত। অর্থের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সংগৃহীত শস্যের পরিমাণ কম হওয়ার জন্য মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,১২৭০ এবং ১৩২০ খ্রিঃ মধ্যে ইংল্যান্ডে কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়।

চতুর্থ শ্রেণি ? নতুন শহর এবং শহরবাসী

কৃষির বিস্তারের সাথে সম্পর্কিত তিনটি বিষয় যেমন জনসংখ্যা, বাণিজ্য এবং নগর সমূহের বিকাশ হয়েছিল। মোটামুটিভাবে ইউরোপের জনসংখ্যা যা ১০০০ সালে প্রায় ৪২০ লক্ষ ছিল, এটা ১২০০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৬২০ লক্ষ এবং ১৩০০ সালে ৭৩০ লক্ষ হয়ে যায়। 'উত্তম আহার' কথাটির অর্থ ছিল একটি দীর্ঘ জীবনকাল। অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে জীবনের গড় আয়ু ছিল ১০ বছর বেশি। পুরুষদের তুলনায় মহিলা এবং বালিকাদের জীবনকাল অল্প আয়ুর হত, কেননা পুরুষেরা উত্তম আহার করত।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর সাম্রাজ্যটি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত পতিত জমিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে এবং নতুন নতুন শহর গড়ে উঠে। যেসব কৃষকদের কাছে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক খাদ্য শস্য থাকত, তারা সেসব দ্রব্য বিক্রয়ের প্রয়োজনে এমন একটি জায়গা খুঁজত যেখানে তারা বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে এবং যেখান থেকে তারা নিজেদের উপকরণ কাপড়াদি ক্রয় করতে পারে। এই প্রয়োজনীয়তাই নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর হাট বাজার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করে যার ফলে ছোট বিপণী কেন্দ্রের উন্নতি ঘটে। ফলে ধীরে ধীরে শহরের বৈশিষ্ট্যগুলো বিকশিত হতে থাকে, যেমন প্রশস্ত শহর, চার্চ এবং রাস্তাঘাট যেখানে ব্যবসায়ীরা দোকান এবং ঘর নির্মাণ করতে পারত, এবং একটি কার্যালয় যেখানে শহরের শাসন কর্তা এসে মিলিত হত। অন্যত্র একটি বিশাল দুর্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল শহর, যাজকের সম্পত্তি এবং বিশাল গির্জা। শহরের মানুষেরা পরিসেবার বদলে রাজস্ব প্রদান করত সেই জমিদারদের যাদের জমির উপর শহরটি গড়ে উঠেছিল। শহরগুলো কৃষক পরিবারের যুবকদের বেতনভিত্তিক কাজ প্রদান করত এবং জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির আশা দেখাত।

'শহরের হাওয়া স্বাধীন বানায়' এটি একটি প্রচলিত প্রবাদ ছিল। অনেক ভূমিদাস স্বাধীন হাওয়ার আকাঙ্খায় পালিয়ে গিয়ে শহরে লুকিয়ে থাকত। যদি কোনো একজন ভূমিদাস একবছর একদিন জমিদারের অগোচরে লুকিয়ে থাকতে পারত, তবে সে স্বাধীন নাগরিক হয়ে যেত। শহরে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ

সপ্তদশ শতাব্দীর একটি নকশাতে ফ্রান্সের ক্যাথিড্রাল শহর,রেইমস্ কে দেখানো হয়েছে।

কার্যাবলি -৩

ভালো করে ছবিটির দিকে আলোকপাত করো। মধ্যযুগের ইউরোপীয় শহরের কোন্ বিশেষ বৈশিষ্ট্যটিকে তোমরা লক্ষ করেছ? এই শহর গুলো অন্য স্থান এবং অন্য সময়ের শহরগুলো থেকে কীভাবে ভিন্ন ছিল?

হয়তো স্বাধীন কৃষক ছিল, না হয় পলাতক ভূমিদাস ছিল। যারা কাজের দিক থেকে ছিল অদক্ষ শ্রমিক। দোকানি এবং ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ছিল অনেক। পরবর্তীকালে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। (যেমন- মহাজন এবং আইনজীবি তথা উকিল) বড়ো বড়ো শহরগুলোর জনসংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার ছিল। বলা যেতে পারে, সম্ভবত তারাই সমাজের মধ্যে একটি 'চতুর্থ শ্রেণি' তৈরি করে।

অর্থনৈতিক সংগঠনের মূল ভিত্তি ছিল সমবায় সংঘ তথা নিগম(Guild)। প্রতিটি হস্তজাত শিল্প বা শিল্প সামগ্রী একটি সমবায় সংঘ তথা নিগমের মধ্যে নির্মাণ করা হত। এই সমবায় সংঘটি উৎপাদন সামগ্রীর গুণগত মান, তার মূল্য এবং বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করত। 'নিগম সভাঘর' প্রত্যেকটি শহরের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গা ছিল। এই সভাঘরটি আনুষ্ঠানিক সমাবেশের জন্য ছিল, যেখানে সমবায় সংঘ তথা নিগমের প্রধানেরা নিয়মমাফিক মিলিত হত। চৌকিদারেরা শহরের চারদিকে শান্তি বজায় রাখার জন্য টহল দিত, সঙ্গীত শিল্পীদের প্রীতিভোজ এবং নাগরিকদের শোভাযাত্রাতে কলা প্রদর্শনের জন্য ডাকা হত। এবং সরাইখানার মালিক যাত্রীদের দেখাশোনা করত।

একাদশ শতাব্দীর দিকে পশ্চিম এশিয়ার সাথে নতুন বাণিজ্যিক পথ তৈরি হয়। (অধ্যায় ৫ এ দেখো)। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার (Scandinavian) ব্যবসায়ীরা বস্ত্রের বিনিময়ে কোমল পশুলোম এবং শিকারি বাজপাখি নেওয়ার জন্য উত্তর সমুদ্র পথ থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পথে জলযাত্রা করত এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীরা টিন বিক্রয় করতে আসত। দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে ফ্রান্সে বাণিজ্য এবং হস্ত শিল্প উন্নত হতে থাকে। প্রথম দিকে হস্ত শিল্পীদের জমিদারের একটি খাস খামার থেকে অন্য একটি খাস খামারে যেতে হত, কিন্তু পরে তারা দেখল যে , স্থায়ীভাবে বসবাস করা অধিক সহজ, যেখানে তারা ফসল উৎপাদন এবং জীবন জীবিকার জন্য বাণিজ্য করতে পারত। শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে বাণিজ্যেরও বিস্তার হতে থাকে। শহরের ব্যবসায়ীরা অধিক ধনী এবং প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হতে লাগল। ফলে তারা আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

ক্যাথিড্রাল শহর

গির্জায় দান করা ছিল ধনী ব্যবসায়ীদের অর্থ ব্যয় করার অন্যতম একটি উপায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের বড়ো বড়ো গির্জা, যেগুলোকে ক্যাথিড্রাল বলা হত, তার নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এগুলো যদিও খ্রিস্টীয় মঠের সম্পত্তি ছিল, কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই মঠ নির্মাণে নিজেদের শ্রম, প্রয়োজনীয় বস্তু এবং অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছিল। এই ক্যাথিড্রাল গির্জাটি বহুমূল্য পাথরের দ্বারা নির্মিত হয় এবং এই গির্জাটিকে নির্মাণ করতে অনেক বছর সময় লাগে। যখন গির্জাটি নির্মিত হচ্ছিল, তখন ক্যাথিড্রালের চারপাশে বহু মানুষের বসতি গড়ে উঠে এবং যখন গির্জাটির নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয় তখন এটি একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। এভাবে তার চারদিকে ছোটো ছোটো শহর বিকশিত হতে থাকে।

ক্যাথিড্রাল গির্জাটিকে এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যাতে সভাগৃহে ব্যাপক সংখ্যায় উপস্থিত লোকেরা পাদরির আওয়াজ স্পষ্ট ভাবে শুনতে পারে। ফলে অতিমধুর কণ্ঠে খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসীদের গাওয়া গানও পুণ্যার্থীরা সভাগৃহ থেকে সহজে শুনতে পেত এবং তার সাথে প্রার্থনার জন্য বাজানো ঘণ্টার আওয়াজ মানুষেরা অনেক দূর থেকে শ্রবণ করতে পারত। জানালার জন্য রঙিন কাচ ব্যবহার করা হত। দিনের বেলা সূর্যের কিরণ রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে পুণ্যার্থীদের মধ্যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাত এবং সূর্যাস্তের পরে মোমবাতির আলো বাইরের মানুষের কাছে দৃশ্যমান হত। বাইবেলের গল্পগুলো গির্জার জানালার রঙিন কাচের মধ্যে ছবির আকারে বর্ণিত ছিল, এই বর্ণনাগুলোকে সাধারণ অশিক্ষিত মানুষেরাও সহজে পড়তে পারত।

** ইংল্যান্ডের সালিসবারি ক্যাথিড্রাল।*

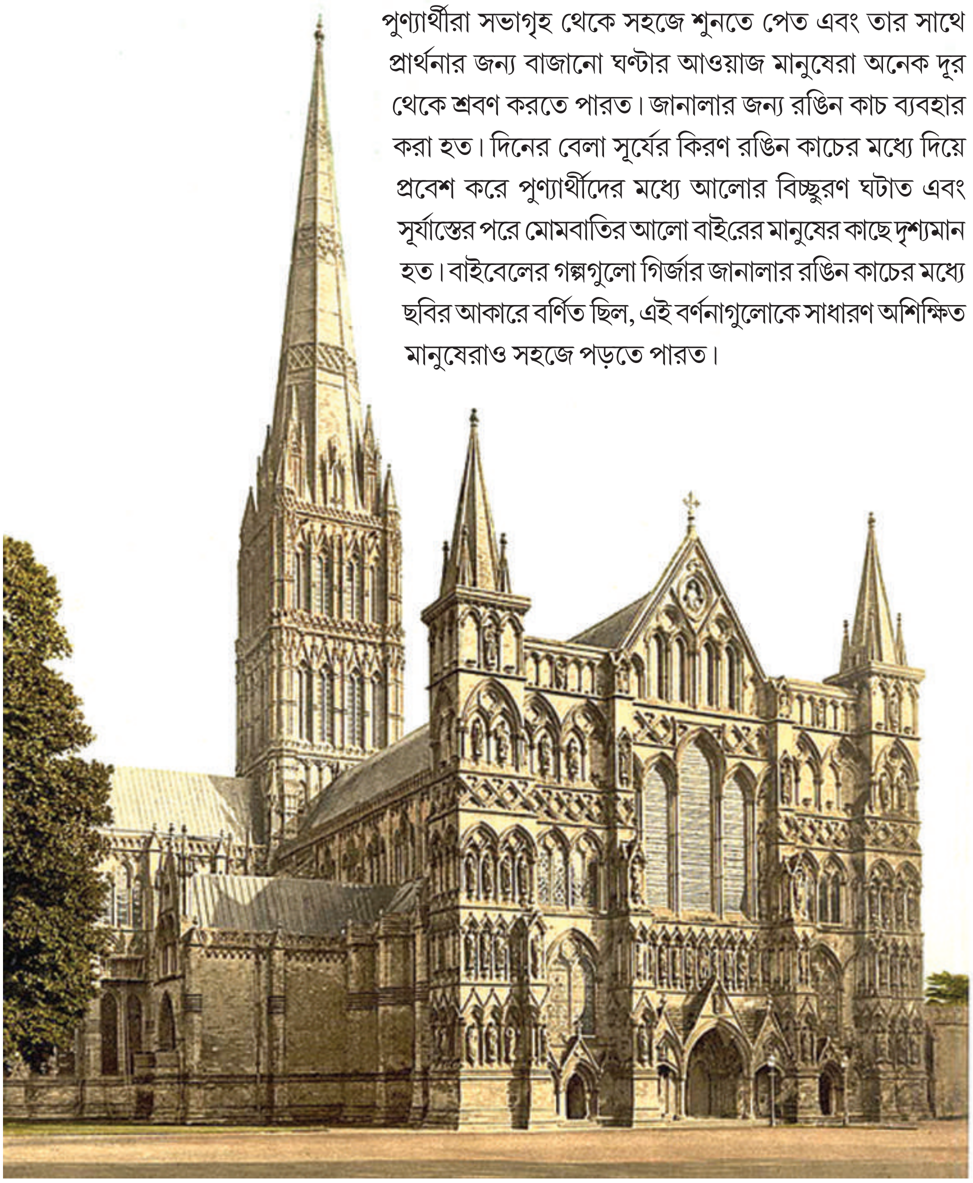

এবট্ সুগের (Abbot Suger,১০৮১-১১৫১) প্যারিসের অদূরে ডেনিসে অবস্থিত গির্জা সম্পর্কে লিখেছেন, আনন্দোৎসবের (Feast Days) দিনে আমরা প্রায়ই অনুভব করি যে গির্জার ভেতরে স্থানসংকীর্ণতার কারণে মহিলারা পুরুষের মাথার উপরের দিকে অবস্থিত বেদির দিকে সরে যেতে বাধ্য হয়। এর ফলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা, কোলাহল ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। একারণেই আমরা পবিত্র চার্চকে সম্প্রসারিত করা এবং প্রশস্ত করার সিদ্ধান্ত নিই।.....

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত দক্ষ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিভিন্ন রঙিন চমৎকার জানালা তৈরি করানো হয়। এসব জানালায় বিস্ময়কর কাজ, অঙ্কিত কাচ ও নীলকান্তমণি কাচ ছিল যা অতি মূল্যবান, এগুলো রক্ষার জন্য একজন সরকারি প্রধান শিল্পকার এবং স্বর্ণকারকে নিযুক্ত করা হয়। তারা তাদের ভাতা বা বেতন পূজাবেদি থেকে নিতে পারত এবং খাদ্যসামগ্রী সহকর্মীদের সর্বজনীন ভাণ্ডার থেকে নিতে পারত। তারা কখনও শিল্পাকলার তত্ত্বাবধান করার দায়িত্বকে অবহেলা করত না।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের ক্যাথিড্রাল গির্জার রঙিন কাচের জানালা।

চতুর্দর্শ শতাব্দীর সংকটকাল

চতুর্দর্শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপের আর্থিক বিকাশের গতি মন্থর হয়ে পড়ে। এর পশ্চাতে তিনটি কারণ ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে উত্তর ইউরোপে বিগত তিনশ বছরের উষ্ণ গ্রীষ্ম ঋতুর স্থান দখল করে ঠান্ডা গ্রীষ্ম ঋতু। ফসল উৎপাদনের সহায়ক মরশুম সীমিত হয়ে পড়ে এবং উঁচু জমিতে শস্য উৎপাদন করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঝড় এবং সামুদ্রিক বন্যা অনেক কৃষি খামার ধ্বংস করার ফলে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ কম হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব সময়ে ইউরোপে কৃষিকার্যের অনুকূল জলবায়ু ও পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। তাই তখন বড়ো মাত্রায় বনভূমি এবং তৃণভূমি পুনরুদ্ধার করে সেগুলোকে কৃষির উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু তিন ক্ষেত্র বিশিষ্ট শস্যাবর্তন পদ্ধতির প্রচলন সত্ত্বেও গভীর হলকর্ষণ জমির উর্ব্বরতা শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। মাটি সংরক্ষণের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা না থাকার ফলে এই ক্ষতি হয়। চারণ ভূমির স্বল্পতার কারণে পশুর সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকে। দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পরিমাণকে ছাপিয়ে যায়, যার প্রত্যক্ষ ফল ছিল দুর্ভিক্ষ। ১৩১৫ এবং ১৩১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। ১৩২০ খ্রিঃ অগণিত পশুর মৃত্যু হয়।

এর সঙ্গে অস্ট্রিয়া এবং সার্বিয়ার রূপার খনিতে উৎপাদন কমে যাওয়ায় ধাতু মুদ্রার স্বল্পতা দেখা দেয় যা বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। এর ফলে সরকার মুদ্রাতে রূপার পরিমাণ কমিয়ে অন্যান্য সস্তা ধাতুর মিশ্রণ ঘটায়।

এরপর আরও খারাপ সময় অপেক্ষমান ছিল, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে দূর দূরান্তের দেশ থেকে বাণিজ্য জাহাজ ইউরোপের বন্দরগুলোতে আসতে শুরু করে। তার সঙ্গে আগমন ঘটে ইঁদুরের। ফলে ইঁদর থেকে সংক্রামিত গ্রন্থির প্রদাহ লক্ষনযুক্ত মারাত্মক প্লেগ (ব্ল্যাক ডেথ) রোগ দেখা দেয়। শতাব্দীর গোড়ার দিকে পশ্চিম ইউরোপে যারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল ১৩৪৭ থেকে ১৩৫০ খ্রিঃ মহামারির দ্বারা মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আধুনিক হিসাব অনুযায়ী ইউরোপের জনসংখ্যার প্রায় ২০% মহামারির শিকার হয়, কোনো কোনো স্থানে জনসংখ্যার ৪০% মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কত সাহসী পুরুষ ও সুন্দরী মহিলা তাদের আত্মীয়জনের সঙ্গে প্রাতঃভোজন করে সেই রাত্রিতেই পরলোকে তাদের পূর্বপুরুষদের সাথেও ভোজন করেছিলেন। মানুষের করুণ অবস্থা অবলোকন করা কষ্টকর ছিল। হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন রোগগ্রস্থ হত এবং সঙ্গীহীন অবস্থায় কোনো সহায়তা ছাড়া মারা যেত। শত শত মানুষ খোলা রাস্তায় মারা যেত, পচাগলা মৃতদেহের দুর্গন্ধ থেকে বোঝা যেত অনেকের মৃত্যু হত তাদের ঘরের ভিতর। প্রতিস্থাপিত সমাধিক্ষেত্র এত মৃতদেহ কবর দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না, তাই জাহাজের খোলে মাল রাখার মত শত শত মৃতদেহগুলো গর্তের মধ্যে স্তূপীকৃত করা হত এবং সামান্য মাটি চাপা দেওয়া হত।

ইতালীয় লেখক — জিওভানি বোকাকিও (Govanni Boccaciao ১৩১৩-৭৫) এর লেখা।

ব্যবসার কেন্দ্র শহরগুলো এর দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। কিছু বিশেষ সম্প্রদায় যেমন মঠ ও আশ্রমগুলোতে কোনো এক ব্যক্তি প্লেগ রোগের শিকার হলে অন্যরাও সংক্রমিত হত এবং প্রায় সব ক্ষেত্রে কেউ বেঁচে থাকত না। প্লেগে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবাই সংক্রামিত হত। এরপর ১৩৬০ এবং ১৩৭০ এর দশকে প্লেগের প্রাদুর্ভাব কিছুটা হ্রাস পায়। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের জনসংখ্যা যেখানে ৭৩০ লক্ষ ছিল, ১৪০০ খ্রিঃ তা হ্রাস পেয়ে ৪৫০ লক্ষ হয়।

এই বিনাশলীলার সাথে অর্থনৈতিক মন্দা যুক্ত হয়ে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন আনে। জনসংখ্যা হ্রাসের সাথে সাথে শ্রমিকের সংখ্যাও হ্রাস পায়, কৃষি ও উৎপাদনের মধ্যে অসাম্য তৈরি হয়, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করার মতো লোকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। ক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়ায় কৃষিপণ্যের মূল্যও হ্রাস পায়। প্লেগ রোগের পর ইংল্যান্ডে শ্রমিক, বিশেষত কৃষি শ্রমিকরা বেশি মজুরি দাবি করে। ফলে মজুরির পরিমাণ ২৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বেঁচে থাকা শ্রমিকরা এখন তাদের আগের মজুরির দ্বিগুণ দাবি করতে পারত।

সামাজিক বিশৃঙ্খলা

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে জমিদার বা অভিজাতদের আয় আঘাত প্রাপ্ত হয়। কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস এবং শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির ফলে অভিজাতদের আয় হ্রাস পায়। বেপরোয়া হয়ে তারা অর্থের সংকোচন নীতি গ্রহণ করে এবং শ্রমিক সেবা পুনরায় চালু করে। ফলে কৃষকেরা বিশেষ করে শিক্ষিত এবং সমৃদ্ধশালী কৃষকেরা হিংসাত্মক বিরোধিতা করে। ১৩২৫ খ্রি. ফ্ল্যান্ডার্স এ, ১৩৫৮ খ্রি. ফ্রান্স এ এবং ১৩৮১ খি. ইংল্যান্ডে বিদ্রোহ হয়।

যদিও নির্মমভাবে এই বিদ্রোহগুলোকে দমন করা হয়, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে স্থানগুলো আর্থিকভাবে বেশি সমৃদ্ধ ছিল, সেই স্থানগুলোতেই বিদ্রোহ হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। এটি ইঙ্গিত করছিল যে, বিগত শতাব্দী ধরে তারা যে লাভ করেছে তা রক্ষা করার উদ্যোগ তারা নিয়েছে, দমন পীড়ন সত্ত্বেও কৃষক বিদ্রোহের তীব্রতা এটা নিশ্চিত করেছিল যে পুরোনো সামন্ত ব্যবস্থাকে পুনঃস্থাপিত করা যাবে না। মুদ্রা অর্থনীতি যা অনেকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল তা পাল্টানো সম্ভব নয়। যদিও অভিজাতরা বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়, কিন্তু কৃষক বিদ্রোহ এটা সুনিশ্চিত করে যে, পুরানো দাস ব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনা যাবে না।

একাদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর কালপঞ্জী	
১০৬৬	নর্মান জাতি অ্যাংলো স্যাক্সন লোকদের পরাজিত করে ইংল্যান্ড জয় করেছিল।
১১০০	ফ্রান্সে ক্যাথিড্রাল নির্মাণ শুরু হয়।
১৩১৫-১৭	ইউরোপের ব্যাপক দুর্ভিক্ষ।
১৩৪৭-৫০	প্লেগ মহামারি (Black Death)
১৩৩৮-১৪৬১	ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে ‘ একশো বর্ষীয় যুদ্ধ’
১৩৮১	কৃষক বিদ্রোহ।

কার্যাবলি -৪

সন তারিখ গুলোর সাথে দেওয়া ঘটনাবলি এবং প্রক্রিয়াসমূহকে পড়ো এবং সেই গুলোকে বর্ণনাত্মকভাবে ব্যক্ত করো।

রাজনৈতিক পরিবর্তন

রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সামাজিক প্রক্রিয়া সমূহের সাথে একই সঙ্গে হয়েছিল। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর দিকে ইউরোপীয় রাজারা সামরিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যধিক শক্তিশালী ছিল। রাজাদের দ্বারা সৃষ্ট নতুন নতুন শক্তিশালী রাজ্যগুলো সেই সময় ইউরোপে হওয়া অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এজন্যই ঐতিহাসিকেরা এই রাজাদের নতুন শাসক বলে অভিহিত করেছিল। ফ্রান্সের একাদশ লুই, অস্ট্রেলিয়ার ম্যাক্সিমিলান, ইংল্যান্ডের সপ্তম হেনরি এবং স্পেন এর ইসাবেলা ও ফার্ডিনান্দ তারা সবাই ছিল স্বৈরতন্ত্রের প্রবক্তা। তারা সংঘবদ্ধ সৈন্যবাহিনী, একটি স্থায়ী আমলাতন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় কর ব্যবস্থা স্থাপন করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। ইউরোপীয় সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে স্পেন এবং পর্তুগাল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল (অধ্যায় ৮ এ দেখো)।

দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে হওয়া সামাজিক পরিবর্তনই এই রাজতন্ত্রগুলোর সফলতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। জায়গিরদার এবং ভূস্বামীদের কর্তৃত্বযুক্ত সামন্তপ্রথার অবসান এবং আর্থিক বিকাশের মন্থর গতি এই শাসকদের শক্তিশালী করে তোলে যা সাধারণ জনগণের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ এনে দিয়েছিল। শাসকেরা তাদের সৈন্যবাহিনীর জন্য সামন্ত প্রথায় কর আদায় করা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তার পরিবর্তে বন্দুক এবং কামান গোলাতে প্রশিক্ষিত সৈন্য তৈরি করেছিল, যারা সম্পূর্ণভাবে আজ্ঞাবহ হত। (অধ্যায় ৫ এ দেখো) অভিজাত শ্রেণিদের প্রতিরোধ রাজাদের প্রবল শক্তির সামনে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে, ইংল্যান্ডের রাণি প্রথম এলিজাবেথের একটি বনভোজনের দৃশ্য।

নতুন শাসক	
১৪৬১-১৫৫৯	ফ্রান্সের নতুন শাসক
১৪৭৪-১৫৫৬	স্পেনের নতুন শাসক
১৪৮৫-১৫৪৭	ইংল্যান্ডের নতুন শাসক

সাধারণ জনগণের উপর খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করে রাজারা সুবিশাল একটি সামরিক বাহিনী তৈরি করতে পেরেছিল। এই সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় রাজারা রাজ্যের সীমানাকে রক্ষা এবং বিস্তার করে, তথা রাজকীয় কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে হওয়া অভ্যন্তরীণ বিরোধকেও দমন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অভিজাত শ্রেণির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয়করণের কোনও বিরোধিতা হয়নি। রাজতন্ত্র তথা শাসকদের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধীদের একযোগে জিজ্ঞাসা ছিল অধিক কর ব্যবস্থাকে নিয়ে। ইংল্যান্ডে ১৪৯৭, ১৫৩৬, ১৫৪৭, ১৫৪৯ এবং ১৫৫৩ সালে হওয়া রাজবিদ্রোহগুলোকে দমন করা হয়। ফ্রান্সে ডিউক (Dukes) এবং রাজকুমারদের বিরুদ্ধে লুই XI (একাদশ) (১৪৬১-৮৩) দীর্ঘকাল ব্যাপী একটি যুদ্ধ চালিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত ছোটো অভিজাত বর্গ এবং অধিকতর স্থানীয় সভার সদস্যরাও তাদের ক্ষমতার সংকোচনের বিরোধিতা করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে ফ্রান্সে হওয়া 'ধর্মযুদ্ধ' গুলো ছিল রাজকীয় সুযোগ সুবিধা এবং আঞ্চলিক স্বাধীনতার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের নিমুরস্ (Nemours) দুর্গের একটি ছবি।

অভিজাত শ্রেণিরা তাদের অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য একটি কৌশলী পদক্ষেপ নিয়েছিল। নতুন শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে থাকার পরিবর্তে অভিজাত শ্রেণিরা খুব দ্রুত রাজভক্ততে পরিণত হয়। এজন্যই রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রকে সামন্ততন্ত্রদের পরিবর্তিত রূপ বলা হয়। যথাযথভাবে এই শ্রেণির লোকেরা যারা সামন্ত ব্যবস্থায় শাসক ছিলেন, অর্থাৎ জমিদার শ্রেণি, তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রাধান্য চালাতে লাগল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদের স্থায়ী পদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নতুন শাসন-ব্যবস্থা কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে পৃথক ছিল।

রাজাদের অবস্থান আর পিরামিডের শীর্ষে ছিল না, আনুগত্য নির্ভর ছিল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাসের উপর। রাজা এখন বিস্তৃত রাজসভাসদ সমাজ এবং আশ্রয়দাতা অনুযায়ী রাজতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল। দুর্বল বা শক্তিশালী সমস্ত রাজতন্ত্রগুলো, রাজক্ষমতা সম্পন্ন শক্তিশালী রাজাদের সহযোগিতা চাইত। পৃষ্ঠপোষকতা এভাবে সহযোগিতাকে সুনিশ্চিত করার একটি মাধ্যম হয়ে উঠে এবং এই পৃষ্ঠপোষকতা অর্থের মাধ্যমে প্রদান বা প্রাপ্ত করা যেত। একারণেই অপেক্ষাকৃত কম সম্ভ্রান্তশালী শ্রেণি, যেমন—ব্যবসায়ী এবং স্বর্ণকার তথা মহাজনদের জন্য রাজদরবারে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই শ্রেণির লোকেরা রাজাদের ঋণ হিসেবে অর্থ দিত, যার প্রয়োগ রাজারা সৈনিকদের বেতন দিতে খরচ করত। শাসকেরা ঠিক এভাবে রাজ-ব্যবস্থার মধ্যে অ-সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের জন্য একটি জায়গা তৈরি করে।

ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের পরবর্তী ইতিহাসটি তৈরি হয়েছিল শক্তি পরিকাঠামোর পরিবর্তনের দ্বারা। ১৬১৪ সালে ফ্রান্সের নাবালক শাসক ত্রয়োদশ লুই এর রাজত্বকালে ফ্রান্সের 'পরামর্শদায়ক সভাগৃহ' যাকে 'এস্টেট জেনারেল' (Estates-General) বলা হত (যার আইন সভা প্রতিনিধিত্ব করত তিনটি শ্রেণি।

যেমন যাজক বর্গ, অভিজাতবর্গ এবং সাধারণ শ্রেণি) তার মধ্যে একটি অধিবেশন হয়েছিল। তার পরে আরও দুই শতাব্দী, ১৭৮৯ পর্যন্ত তাদের আর ডাকা হয়নি কেননা এই তিনটি শ্রেণির সাথে রাজা তার ক্ষমতার অংশীদারিত্বে ইচ্ছুক ছিলেন না।

ইংল্যান্ডে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ছিল একটি অন্যরকমের। নর্মান বিজয়ের পূর্বে অ্যাংলো-স্যাক্সন লোকেদের একটি বিশাল পরিষদ ছিল। যেকোনও প্রকার কর চালু করার পূর্বে রাজা পরিষদের পরামর্শ নিতেন। পরবর্তী সময়ে পরিষদটি সংসদে (Parliament) পরিণত হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল হাউজ অফ লর্ড এবং তার সদস্য হত লর্ড এবং পাদরি। শহর এবং গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করত হাউজ অফ কমন্‌স। রাজা প্রথম চার্লস্ সংসদে কোনো অধিবেশন না ডেকেই ১১ বছর তাঁর শাসন (১৬২৯-৪০) চালিয়ে যান। অর্থের প্রয়োজনে রাজা যখন একবার সংসদে অধিবেশন ডাকেন, তখন একটি পক্ষ রাজার বিরুদ্ধে চলে যায় এবং পরবর্তী সময়ে এই বিরোধিরা রাজাকে প্রাণদণ্ড দিয়ে আবার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়নি। প্রতিনিয়ত সংসদে অধিবেশন ডাকা হবে এই শর্তে রাজতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।

বর্তমানে ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত এবং ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্র বিরাজমান। এর কারণ হল সপ্তদশ শতকের পরে এই দুটি দেশ ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ অনুসরণ করেছিল।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। ফ্রান্সের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দুটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

২। জনসংখ্যার স্তরের দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন কীভাবে ইউরোপের অর্থনীতি এবং সমাজকে প্রভাবিত করে?

৩। কেন নাইটরা একটি স্বতন্ত্র দল হয়ে ওঠে এবং কখন তাদের পতন হয়?

৪। মধ্যযুগীয় মঠের কার্যাবলি কী ছিল?

সক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর দাও:

৫। মধ্যযুগে ফ্রান্সের কোনো একটি শহরের একজন কারুশিল্পীর জীবন কল্পনা করো এবং তা বর্ণনা করো।

৬। ফরাসি দাস এবং রোমান ক্রীতদাস জীবনের বিভিন্ন অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করো।

বিষয়
৭

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিবর্তন
CHANGING CULTURAL TRADITIONS

চতুর্দশ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপের অনেক দেশে নগর গড়ে উঠেছিল। একটি স্বতন্ত্র নগর-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। নগরের জনগণ নিজেদের গ্রামের জনগণ অপেক্ষা অধিক সভ্য বলে ভাবতে লাগল। বিভিন্ন নগর—বিশেষ করে ফ্লোরেন্স, ভেনিস এবং রোম প্রভৃতি শিল্প এবং শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। ধনী এবং অভিজাত সম্প্রদায় শিল্পী এবং লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সেই সময় মুদ্রণ শিল্পের আবিষ্কারের ফলে বই এবং মুদ্রণ কাজ জনগণের কাছে সহজলভ্য হয়েছিল, দূরবর্তী শহর বা দেশে বসবাসকারীরাও তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ইউরোপে ইতিহাসের ধারণা বিকশিত হয়েছিল এবং জনগণ তাদের 'আধুনিক বিশ্বকে' প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সভ্যতার সঙ্গে তুলনামূলক পার্থক্য করতে শুরু করেছিল।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম বেছে নেবার অধিকার লাভ করেছিল। গির্জার পার্থিব-কেন্দ্রিক বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিকরা ভুল প্রমাণিত করে। কারণ তারা তখন সৌরজগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পেরেছিলেন এবং নতুন 'ভৌগোলিক জ্ঞান' ইউরোপ-কেন্দ্রিক ধারণাকে পাল্টে দিয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল ভূমধ্যসাগর বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত।

চতুর্দশ শতক থেকে ইউরোপের ইতিহাসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়—যেমন দলিলপত্র, ছাপানো বই, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, বস্ত্র ইত্যাদি। এগুলোর অধিকাংশই সযত্নে ইউরোপ এবং আমেরিকার মহাফেজখানা, আর্ট গ্যালারী এবং জাদুঘরে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতক থেকে ঐতিহাসিকগণ 'নবজাগরণ' শব্দটি (যার আক্ষরিক অর্থ পুনর্জন্ম) ব্যবহার করেছেন সে যুগের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে বর্ণনা করার জন্য। সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত ঐতিহাসিক জেকব বার্কহার্ডট (১৮১৮-৯৭) এই বিষয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন। তিনি জার্মানির ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কের (১৭৯৫-১৮৮৬) ছাত্র ছিলেন। র‍্যাঙ্কে তাঁকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে সরকারি দপ্তর কাগজপত্র এবং ফাইল ব্যবহার করে ঐতিহাসিকরা রাজ্য এবং রাজনীতির ইতিহাস সম্পর্কে লেখার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বার্কহার্টড এই সব সীমিত লক্ষ্যে অসন্তুষ্ট ছিলেন যা তাঁর শিক্ষক তাঁর জন্য রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে রাজনীতিই ইতিহাস লেখার প্রথম ও শেষ বিষয় নয়, ইতিহাস যতটা রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ততটাই সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির সাথে।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি একখানি বই লিখেছিলেন যার নাম 'ইতালির নবজাগরণের সভ্যতা' যেখানে তিনি তার পাঠকদের সাহিত্য, স্থাপত্য এবং চিত্রকলায় মনোযোগ আকর্ষণ

করতে চেয়েছেন এবং চতুর্দশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতালীর শহরগুলোতে কীভাবে একটি নতুন মানবতাবাদী সংস্কৃতি প্রস্ফুটিত হয়েছিল তা বর্ণনা করেন। তিনি লিখেছেন এই সংস্কৃতি একটি নতুন বিশ্বাস ঘটিয়েছিল যে মানুষ একজন ব্যক্তি হিসেবে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে এবং দক্ষতা বাড়াতে পারেন। মধ্যযুগের যেসব মানুষের চিন্তাধারা গির্জা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত, তাদের তুলনায় তিনি আধুনিক মানুষ ছিলেন।

ইতালির নগরের পুনরুজ্জীবন

পশ্চিমি রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইতালির অধিকাংশ শহর ধ্বংস হয়ে যায় যেগুলো ইতালির রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হত। সেখানে কোনো ঐক্যবদ্ধ সরকার ছিল না। রোমের পোপ নিজ রাজ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করলেও রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী ছিলেন না।

যখন পশ্চিম ইউরোপ সামন্ততন্ত্রবাদ এবং ল্যাটিন গির্জার অধীনে ঐক্যবন্ধ হচ্ছিল এবং পূর্ব ইউরোপ বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের অধীনে পুনগঠিত হয়েছিল, তখন ইসলাম ধর্ম দূর পশ্চিমে একটি যৌথ সভ্যতা তৈরি করছিল। ইতালি ছিল দুর্বল এবং বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত। যাই হোক, এমন অনেক বিকাশ ইতালীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করেছিল।

বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য এবং ইসলামিক দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের সাথে সাথে ইতালির উপকূলবর্তী বন্দরগুলো পুনর্জীবিত হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে মঙ্গোলিয়া চিনের সাথে রেশম পথের (পঞ্চম অধ্যায় দেখো) মধ্য দিয়ে বাণিজ্য শুরু করে এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোতে বাণিজ্য বৃদ্ধি

মানচিত্র ১ : ইতালির রাজ্য

করতে ইতালীয় শহরগুলো একটি বিশাল ভূমিকা পালন করেছে।

তারা আর নিজেদের একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অংশ মনে করত না, কিন্তু একটি স্বাধীন নগর-রাষ্ট্রের অংশ মনে করত। ফ্লোরেন্স এবং ভেনিস এই দুই রাজ্য ছিল প্রজাতান্ত্রিক এবং অন্যান্য অনেক কোর্টসিটিস বা প্রাসাদ-নগর রাজপুত্রদের দ্বারা শাসিত হত।

অধিক স্পন্দনশীল নগরগুলোর মধ্যে একটি ছিল ভেনিস, অন্যটি জেনেভা। ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল থেকে তারা পৃথক ছিল- যাজকরা এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতেন না, কোনো শক্তিশালী সামন্ত প্রভুও সেখানে ছিলেন না। ধনী ব্যবসায়ীরা এবং ব্যাংকের মালিকরা সক্রিয়ভাবে নগরশাসনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তা নাগরিকত্বের মূল ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। এমনকি এই শহরগুলোতে যখন স্বৈরাচারী সেনাবাহিনী শাসন করত, তখনও নগরে বসবাসকারীদের নাগরিকত্ব লাভের গর্ব এতে দুর্বল হয়ে পড়েনি।

নগর রাষ্ট্র

কার্ডিনাল গেসপারো কন্টারিনি (১৪৮৩-১৫৪২) তাঁর নগররাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সরকার সম্পর্কে 'দি কমনওয়েলথ অ্যান্ড গর্ভমেন্ট অব ভেনিস' (১৫৩৪) গ্রন্থে লিখেছেন .... ভেনেসিয় কমনওয়েলথের সংস্থা সম্পর্কে জানতে পারলে দেখা যায় যে, এই নগরের সমস্ত কর্তৃত্ব নিহিত আছে একটি কাউন্সিলে যার মধ্যে নগরের সকল ভদ্রলোকগণ তাদের বয়স ২৫ বছর অতিক্রম করলেই প্রবেশাধিকার পান ...। এখন প্রথম আমি একটি হিসাব দেখাচ্ছি কীভাবে এবং কীরূপ জ্ঞানে তা পূর্বপুরুষদের দ্বারা নিয়োজিত হয়েছিল যার ফলে সাধারণ জনগণ এই নাগরিকদের প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না যার কর্তৃত্বে নিহিত ছিল কমনওয়েলথের সমস্ত ক্ষমতা। কারণ ওইসব নগরে অনেক সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল যেখানে সরকার সাধারণ জনগণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল.... অনেকে আবার বিরুদ্ধ মতামত দিয়েছেন এই বিবেচনা করে যে, এটি ভালো হত যদি কমনওয়েলথের শাসন পদ্ধতি সামর্থ্য এবং ধনের প্রাচুর্যের দ্বারা নির্ধারিত হত। পক্ষান্তরে সৎ নাগরিক এবং যারা উদারনৈতিক ভাবে প্রতিপালিত হয়েছে, তারা প্রায়শই দরিদ্র্যের সম্মুখীন হত। এজন্য আমাদের জ্ঞানী ও পরিণামদর্শী পূর্বপুরুষরা আদেশ দিয়েছিলেন যে এই জন-শাসনের সজ্ঞা সম্পদের হিসাবের পরিবর্তে জাতির আভিজাত্যে নির্বাচিত হওয়া উচিত। তথাপি শর্তানুযায়ী সর্দার এবং সর্বোচ্চ অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষে একাকী এই শাসন চালানো উচিৎ নয়। (কারণ এর ফলে কয়েকজনের শক্তি বৃদ্ধি হবে কিন্তু কমনওয়েলথের শক্তি বাড়বে না)। কিন্তু অন্যান্য নাগরিক যারা নিচুবংশজাত নয়, যারা জন্মসূত্রে অভিজাত অথবা বিবিধ গুণের অধিকারী তারাই সরকার গঠন করার অধিকারী হবে।"

১৫০০ খ্রিস্টাব্দে জি. বেলিনি কর্তৃক আঁকা 'দি রিকোভারি অব দি রেলিক অব দি হোলিক্রস'। যা ১৩৭০ সালের একটি ঘটনাকে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর সাজানো ভেনিস নগরীকে স্মরণ করে আঁকা হয়েছিল।

	চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দী
১৩০০	ইতালির পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবতাবাদ শিক্ষা
১৩৪১	রোমে পেটার্ককে, 'কবিশ্রেষ্ঠ' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।
১৩৪৯	ফ্লোরেন্সে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
১৩৯০	জিওফ্রে চোসারের ক্যান্টারবেরি টেল্‌স প্রকাশিত
১৪৩৬	ব্রুনেলেস্‌চি ফ্লোরেন্সের ডুমোর পরিকল্পনা করেন।
১৪৫৩	অটোমান তুর্কিরা কনস্টান্‌টিনোপলের বাইজেনটাইন শাসককে পরাজিত করেছিলেন।
১৪৫৪	গুনেনবার্গ ভ্রাম্যমান আকারে বাইবেলকে ছাপিয়েছিলেন।
১৪৮৪	পর্তুগিজ গণিতজ্ঞরা সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করে অক্ষাংশের মান নির্ণয় করেন।
১৪৯২	কলম্বাস আমেরিকায় পৌঁছান
১৪৯৫	লিওনার্দো দা ভিঞ্চি 'দি লাস্ট সাপার' অঙ্কন করেন।
১৫১২	মাইকেলেঞ্জো 'সিসটাইন চ্যাপেল সিলিং' অঙ্কন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং মানবতাবাদ

ইউরোপের প্রথমদিকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইতালির শহরে স্থাপিত হয়েছিল। একাদশ শতাব্দী থেকে পাড়ুয়া এবং বোলোগ্না বিশ্ববিদ্যালয় আইন শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বাণিজ্য শহরের প্রধান কাজকর্ম হওয়ায় সেখানে আইনজীবী ও দলিল-লেখ্য কর্মচারীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখা দিয়েছিল। (আইনজীবী এবং নথিপত্র রক্ষকদের সমন্বয়) কারণ তাদের সাহায্য ছাড়া লিখিত চুক্তি সম্পাদন ও ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল না এবং বহুল পরিমাণে বাণিজ্য করা সম্ভবপর ছিল না। এজন্য আইন বিষয়ে পড়াশুনা খুব জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু এখন পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন রোমান সংস্কৃতির সূত্র ধরে এটা অধ্যয়ন করা হত। ফ্রান্সিসকো পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৮) এই পরিবর্তনের উপস্থাপন করেছিলেন। পেত্রার্কের মতে প্রাচীনত্ব ছিল একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক সভ্যতা যা প্রাচীন রোমান ও গ্রিকদের লেখা থেকে ভালোভাবে জানা যায়। এজন্য তিনি প্রাচীন লেখকদের রচনা ভালোভাবে পড়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

এই শিক্ষা-কর্মসূচী থেকে জানা যায় আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে সব শিক্ষা দেওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকগণ এই সংস্কৃতির নাম দিয়েছেন 'মানবতাবাদ'। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে শিক্ষকরা ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, কবিতা , ইতিহাস এবং নৈতিক দর্শন শিক্ষা দিতেন, তাঁরাই 'মানবতাবাদ' (Humanist) শব্দটি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করতেন। ল্যাটিন শব্দ 'হিউমেনিটাস' থেকে 'হিউমেনিটিস' শব্দ এসেছে, যা বহু শতাব্দী আগেই জুলিয়াস সিজারের সমসাময়িক রোমান আইনজীবী ও লেখক 'সিসারো' সংস্কৃতিকে বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এই বিষয়গুলোর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং ব্যক্তি বিশেষের দক্ষতার জন্য আলোচনা ও বিতর্কের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

কার্যাবলি-১

ইতালির মানচিত্রে ভেনিস নগরকে চিহ্নিত করো এবং ১৫৪ নং পৃষ্ঠার অঙ্কিত চিত্রকে ভাল করে লক্ষ করো। তুমি কীভাবে শহরের বর্ণনা করবে এবং একটি ক্যাথেড্রাল শহর থেকে এর কী পার্থক্য ছিল?

গিওভান্নি পিকোডেল্লা মিরানডোলা (১৪৬৩-৯৪) যিনি ফ্লোরেন্সের একজন মানবতাবাদী ছিলেন, তিনি বিতর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর 'On the Dignity of Man' (ওন দি ডিগনিটি অব ম্যান) গ্রন্থে লিখেছেন... প্লেটো এবং এরিস্টটলের মতে সত্যের অনুসন্ধান করার জন্য এবং সত্যের সাথে যুক্ত থাকার জন্য যতটুকু সম্ভব বিতর্কে অংশগ্রহণ করা উচিত। শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য যেমন ব্যায়াম করা প্রয়োজন, তেমনি মনের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য শব্দ ভান্ডারের সাথে কুস্তির ময়দানে নামতে হবে; এতে মনের শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে মনের বিকাশ ঘটে।

এই বৈপ্লবিক ধারণাগুলো আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, বিশেষ করে পেত্রার্কের নিজস্ব শহর ফ্লোরেন্সের বিশ্ববিদ্যালয় এরমধ্যে অন্যতম। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত এই শহর বাণিজ্য বা শিক্ষায় বিশেষ উন্নতি লাভ করতে পারেনি, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে নাটকীয়ভাবে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। একটি শহর তার মহান নাগরিক এবং তার সম্পদ দ্বারা পরিচিত হয়। কিন্তু ফ্লোরেন্স এর সমৃদ্ধির জন্য দুজন লোকের অবদান ছিল। এরমধ্যে একজন দান্তে আলিঘিরি (১২৬৫-১৩২১)

ফ্লোরেন্স, ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দে আঁকা একটি লেখাচিত্র

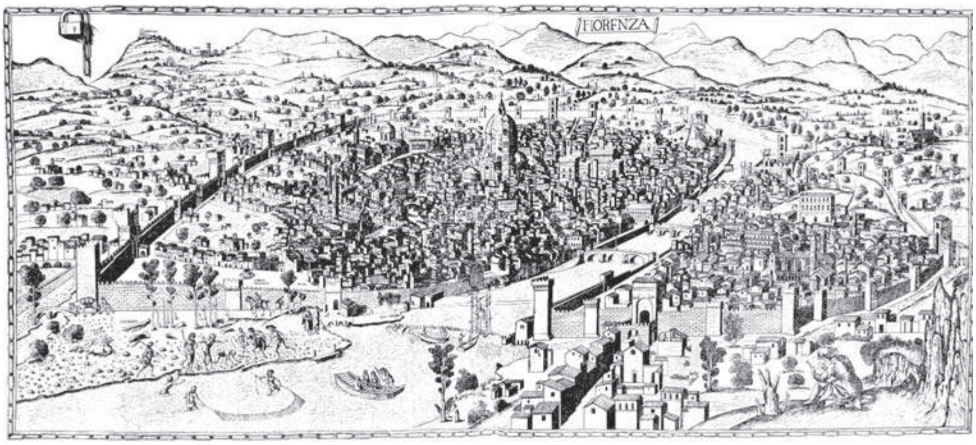

নামে একজন সাধারণ লোক যিনি ধর্মীয় বিষয়ে লিখেছিলেন এবং আরেকজন হচ্ছেন গিট্টো (১২৬৭-১৩৩৭) যিনি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর আকা চিত্র প্রথম দিকের শিল্পীদের আঁকা চিত্রের মত দুর্বোধ্য ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে ফ্লোরেন্স ইতালির বৌদ্ধিক এবং শিল্প সৃষ্টির কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হল। 'রেনেসাঁ ব্যক্তি' শব্দের প্রয়োগ প্রায়শই ব্যবহৃত হত এমন ব্যক্তিদের জন্য যাদের অনেক কৌতূহল এবং দক্ষতা ছিল কারণ এই সময়কালে অনেক মহান ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা অনেক বিষয়ে কৌতুহল প্রকাশ করতেন এবং অনেক বিষয়ে দক্ষতা ছিল। একজন ব্যক্তি পণ্ডিত-কূটনীতিবিদ্-ধর্মতত্ত্ববিদ্ এবং শিল্পী হতে পারতেন।

গিট্টোর আঁকা শিশু যীশু চিত্র, অসিসী ইতালি

ইতিহাসের মানবতাবাদী ধারণা

মানবতাবাদীরা ভেবেছিলেন যে তারা অন্ধকারময় শতাব্দীর পর 'সত্যিকারের সভ্যতা' ফিরিয়ে আনবেন, কারণ তারা বিশ্বাস করতেন যে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর 'অন্ধকারযুগ' শুরু হয়েছিল। তাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে পণ্ডিতরা বিনা প্রশ্নে এটা মেনে নিয়েছিলেন যে চতুর্দশ শতক থেকে ইউরোপে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছিল। মধ্যযুগ / মধ্যযুগীয় সময় শব্দটি রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী একহাজার বছরের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাঁরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে মধ্যযুগে মানুষের মনের উপর চার্চের

সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল যার ফলে মানুষের মন থেকে গ্রিক ও রোমের সমস্ত শিক্ষা মুছে গিয়েছিল। মানবতাবাদীরা 'আধুনিক' শব্দের প্রয়োগ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু হওয়া সময়কালের জন্য করেছেন।

মানবতাবাদীগণ এবং পরবর্তীকালের পন্ডিতগণ কর্তৃক ব্যবহৃত সময়কাল ঃ-

পঞ্চম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী	মধ্যযুগ
পঞ্চম থেকে নবম শতাব্দী	অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ
নবম থেকে একাদশ শতাব্দী	প্রারম্ভিক মধ্য যুগ
একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী	পরবর্তী মধ্য যুগ
পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে	আধুনিক যুগ

সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকগণ এই কাল বিভাজন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই সময়কালের ইউরোপ সম্পর্কে অনেক গবেষণা করার ফলে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে পন্ডিতরা বিভিন্ন শতাব্দীর সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি অথবা অসমৃদ্ধিকে ভিত্তি মেনে চূড়ান্তভাবে বিভাগ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কোনো সময়কালকে 'অন্ধকার যুগ' বলে আখ্যা দেওয়া তাঁদের কাছে অনুচিত মনে হয়েছিল।

বিজ্ঞান এবং দর্শন :
আরবদের অবদান

গ্রিক এবং রোমান পন্ডিতদের অধিকাংশ রচনা সম্পর্কে মধ্যযুগের সন্ন্যাসী ও পাদরিরা জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এই রচনাগুলোর প্রচার-প্রসার করেন নি। চতুর্দশ শতাব্দীতে, অনেক পন্ডিতরা গ্রিক লেখক তথা প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের অনুবাদ - গ্রন্থ পড়তে শুরু করেন। এর জন্য তাঁরা শুধু নিজেদের পন্ডিতদের নিকট ঋণী ছিলেন যারা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি অনুবাদ করেছিলেন এবং সাবধানে সংরক্ষণ করেছেন। (আরবী ভাষায় প্লেটো আফলাটুন নামে এবং অ্যারিস্টটল এরিস্টু নামে পরিচিত ছিলেন)।

যখন কোনো কোনো ইউরোপীয় পন্ডিত গ্রিক রচনার আরবী অনুবাদের অধ্যয়ন করছিলেন তখন অন্যদিকে গ্রিক পন্ডিতরা আরবী এবং ফারসী পন্ডিতদের রচনা অন্যান্য ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রসার করার জন্য অনুবাদ করছিলেন। এই গ্রন্থগুলো ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, ঔষধিবিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। টলেমির অ্যালমাজেস্ট (জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর রচিত গ্রন্থ যা ১৪০ খ্রিস্টাব্দের আগে গ্রিক ভাষায় লেখা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল) গ্রন্থে আরবী ভাষার বিশেষ উপপদ 'আল' (al) এর উল্লেখ আছে যা গ্রিক ভাষার সাথে আরবীভাষার সম্পর্ককে প্রকাশ করে। মুসলিম লেখকদের মধ্যে যারা ইতালির জগতে জ্ঞানী লোক বলে পরিচিত ছিলেন তারা হলেন ইবন সিনা (ল্যাটিন ভাষায় এভিসিনা ৯৮০-১০৩৭) যিনি ছিলেন মধ্যএশিয়ার বুখারার একজন আরবী চিকিৎসক ও দার্শনিক এবং আয়ুর্বেদিক বিশ্বকোশের লেখক আল-রাজী (রাজেস)। স্পেনের আরবী দার্শনিক ইবন রুশদ (ল্যাটিন ভাষায় এভেরস, ১১২৬-৯৮) দার্শনিক জ্ঞান (ফায়লাসুফ) এবং ধার্মিক বিশ্বাসের মধ্যে চাপা উত্তেজনাকে সমাধান করার চেষ্টা করেন। তাঁর পদ্ধতি খ্রিস্টান চিন্তাবিদদের দ্বারা গহীত হয়।

এই ব্য:ক্তিদের নামে ইউরোপীয় বানান দেখে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের এটা ভাবতে বাধ্য করেছিল যে তারা ইউরোপীয় ছিলেন।

মানবতাবাদীরা নিজেদের কথা বিভিন্নভাবে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে শুরু করেছিলেন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে আইন, ঔষধি এবং ধর্মশাস্ত্রের বাড়বাড়ন্ত ছিল, তথাপি মানবতাবাদী বিষয়গুলোকেও ধীরে ধীরে স্কুলগুলোতে পড়ানো শুরু হয় যা শুধুমাত্র ইতালিতে নয়, ইউরোপীয় অন্যান্য দেশেও শুরু হয়েছিল।

ওই সময়ে বিদ্যালয় শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য ছিল।

শিল্পী এবং বাস্তববাদ

ওই সময়ের মানুষের মনের শক্তি গড়ে তোলার জন্য রীতিসিদ্ধ শিক্ষাই একমাত্র উপায় ছিল না। শিল্পকলা, স্থাপত্য এবং বিভিন্ন পুস্তকও মানবতাবাদী ধারণাকে প্রসারিত করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল।

শিল্প প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। যিনি এটি নিষ্কাশন করতে পারেন এটি তারই প্রাপ্ত ... অধিকন্তু, তুমি জ্যামিতির সাহায্যে তোমার শিল্প প্রদর্শন করতে পারবে। তোমার চিত্রে যত বেশি জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে, ততই তা আরও সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হবে... কোনো মানুষ কখনো নিজের কল্পনার বাইরে গিয়ে একটি সুন্দর চিত্র তৈরি করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার মনে জীবনের প্রতিচ্ছবিকে ভালোভাবে সঞ্চয় করতে পারবে।

আলব্রেশ্‌ট ডুয়েরার (Albrecht Durer, ১৪৭১-১৫২৮)

ডুয়েরার দ্বারা অঙ্কিত (প্রার্থনারত হাত) চিত্র দ্বারা আমরা ষোড়শ শতকের ইতালিয় সংস্কৃতির একটি ধারণা করতে পারি যে সেখানকার মানুষ খুব ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু তাদের মানুষের যোগ্যতার উপরও আস্থা ছিল যে তারা আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারবে এবং বিশ্ব তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উন্মোচন করতে পারে।

প্রার্থনারত হাত ডুয়েরারের তুলি দিয়ে আঁকা চিত্র ১৫০৮

"দি পিটা" চিত্রে মাইকেল দেবদূত মেরী কে যীশুর দেহ ধারণ করিয়ে চিত্রিত করেছেন।

অতীতের শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত চিত্রের অধ্যয়ন করে নতুন শিল্পীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। রোমান সংস্কৃতির উপাদানের অবশিষ্টাংশ ততটাই উৎসাহের সাথে অনুসন্ধান করা হয়েছিল যতটা উৎসাহ নিয়ে অতীতে প্রাচীন গ্রন্থ অনুসন্ধান করা হয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের এক হাজার বছর পর প্রাচীন রোম এবং অন্যান্য নির্জন শহরে খণ্ড খণ্ড শিল্পকলা পাওয়া যায়। বহু শতাব্দী আগে ভাস্কর্যে পুরুষ এবং মহিলাদের প্রতিমূর্তির প্রশংসা করা হত যা ইতালির ভাস্কর্য শিল্পীদের সেই পরম্পরাকে বহাল রাখতে উৎসাহিত করেছিল। ১৪১৬ খ্রিস্টাব্দে দান্তে (১৩৮৬-১৪৬৬) জীবন্ত মূর্তি তৈরি করে নতুন পরম্পরা তৈরি করেন।

শিল্পীদের দ্বারা মূল আকৃতির মূর্তি তৈরি করার যে চাহিদা তা বৈজ্ঞানিকদের কাজ থেকে সহায়তা পেয়েছিল। হাড়ের গঠন সম্পর্কে জানতে হলে শিল্পীদের মেডিকেল কলেজের পরীক্ষাগারে যেতে হত। এনড্রিস ভেসালিয়াস (Andreas-Vesalius, ১৫১৪-৬৪) যিনি বেলজিয়ামের নাগরিক এবং পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি প্রথম মানব শরীরের ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। ওই সময় থেকেই আধুনিক শারীরবিদ্যার সূচনা হয়েছিল।

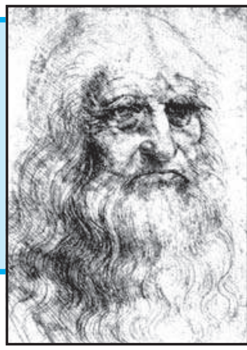

এই আত্মপ্রতিকৃতিটি লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির (১৪৫২-১৫১৯) যার উদ্ভিদবিদ্যা এবং শারীর বিজ্ঞান থেকে শুরু করে গণিত শাস্ত্র এবং কলা বিষয়ে আশ্চর্যজনক অভিরুচি ছিল। তিনি মোনালিসা এবং দি লাস্ট সাপার এর চিত্রের অঙ্কন করেছিলেন।

তিনি আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তিনি বহু বছর আকাশে উড়ন্ত পাখির নিরীক্ষণ করেন এবং উড়ন্ত মেশিনের (flying machine) নকশা তৈরি করেন।

তিনি নিজেকে 'লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, পরীক্ষার অনুরাগী, নামে নামাঙ্কিত করেন।

চিত্রশিল্পীদের কাছে নমুনা হিসেবে কোনো প্রাচীন প্রতিকৃতি ছিল না। কিন্তু ভাস্করদের মতো তারাও বাস্তবধর্মীচিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করেন। তারা এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে জ্যামিতির জ্ঞানের সাহায্যে চিত্রকাররা চিত্রাঙ্কনবিদ্যা ভালোভাবে বুঝতে পারছেন এবং আলোর গুণগত পরিবর্তন করে তাদের চিত্রগুলোকে ত্রি-মাত্রিক রূপ দেওয়া যায়। চিত্রাঙ্কনের জন্য তেল ব্যবহার করা হলে আগের চেয়ে চিত্রের রঙে প্রচুর সমৃদ্ধি আসে। অনেক চিত্রের পোশাক এবং নকশাতে চিনা এবং ফার্সি শিল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যা মঙ্গোলদের মাধ্যমে তারা পেয়েছিল। (পঞ্চম অধ্যায়)

এইভাবে শারীরবিজ্ঞান, জ্যামিতি, ভৌতবিজ্ঞান এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ইতালিয় শিল্পকে এক নতুন মাত্রা প্রদান করেছিল, যাকে "বাস্তববাদ" বলা হয় এবং যা উনবিংশ শতাব্দী অবধি অব্যাহত ছিল।

কার্যাবলি-২

যোড়শ শতাব্দীর ইতালিয় চিত্রশিল্পীদের চিত্রকলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপাদানগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করো।

স্থাপত্য শিল্প

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোম নগরী চমৎকারভাবে পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছিল। ১৪১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে পোপ রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। কারণ ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পোপের নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। তাঁরা রোমের ইতিহাস অধ্যয়নকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করেছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের (প্রত্নতত্ত্ব এক নতুন ধরনের দক্ষতা ছিল) দ্বারা সাবধানে রোমের ধ্বংসাবশেষ খনন করা হয়। এটি স্থাপত্যের এক "নতুন" শৈলীকে অনুপ্রাণিত করেছিল যা প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান শৈলীর পুনরুজ্জীবন যাকে এখন 'শাস্ত্রীয়' শৈলী বলা হয়। পোপ, ধনী ব্যবসায়ী এবং অভিজাত শ্রেণির মানুষরা এই স্থপতিদের নিজেদের গৃহাদি নির্মাণের জন্য নিযুক্ত করতেন যারা শাস্ত্রীয় স্থাপত্যবিদ্যার সাথে পরিচিত ছিলেন। চিত্রকার এবং ভাস্কর্যশিল্পীরা প্রাসাদকে চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য শিল্প এবং বিভিন্ন নক্সায় সুসজ্জিত করত।

যোড়শ শতাব্দীর ইতালিয় স্থাপত্যশিল্পে রোমের রাজকীয় স্থাপত্যের অনেক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

কোনো কোনো ব্যক্তি চিত্রশিল্পী, ভাস্কর এবং স্থপতি হিসেবে সমানভাবে দক্ষতা সম্পন্ন ছিল। এর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মাইকেলেঞ্জেলো বুয়ানারোট্টি (Michelangelo Buonarroti (১৪৭৫-১৫৬৪)) যিনি পোপ এর জন্য সিস্টন চ্যাপেলের প্রাসাদের ভেতরের ছাদের লেখচিত্র, 'দি পিটা' নামক মূর্তি এবং সেন্ট পিটারস্ গীর্জার গম্বুজের নকশা তৈরি করে অমর হয়ে আছেন। এই সমস্ত শিল্পকর্ম রোমেই দেখতে পাওয়া যায়। ফিলিপ্পো ব্রুনেলেশি

(১৩৩৭-১৪৪৬)নামে এক স্থাপত্যশিল্পী যিনি ফ্লোরেন্সে এক দর্শনীয় গম্বুজের প্রতিরূপ তৈরি করেছিলেন, তিনি একজন ভাস্কর্য শিল্পী হিসেবে নিজের জীবন শুরু করেছিলেন। সেই সময়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল, শিল্পীরা ব্যক্তিগতভাবে নিজ নামে পরিচিত হতেন, আগের মতো কোনো সংঘ বা সংস্থার সদস্য হিসেবে নয়।

দি ডয়ুমো (The Duomo) ব্রুনেলেশীর দ্বারা ডিজাইন করা ফ্লোরেন্স এর ক্যাথিড্রালের গম্বুজ

লিওন বতিস্তা অলবার্টি (১৪০৪-৭২) শিল্প তত্ত্ব এবং স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কে লিখেছিলেন— "আমি তাঁকেই স্থপতি মনে করি যিনি নতুন-নতুন পদ্ধতির আবিস্কার করে তাঁর নির্মানকার্য সম্পন্ন করবেন যাতে তার মধ্যে ভারী ওজনের কিছু সঠিকভাবে বসানো যায় এবং সম্পূর্ণ কাজের সংযোজন এবং দৃশ্যমানে এমন একটি তালমিল থাকবে যাতে তার সৌন্দর্য পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয় এবং মানবজাতির ব্যবহারের উপযোগী হয়।"

প্রথম মুদ্রিত বই

অন্যান্য দেশের লোকদের যদি মহান শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত চিত্র, ভাস্কর্য যা প্রাসাদ দেখতে হত তাহলে তাদের ইতালিতে যেতে হত। কিন্তু লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে, যা ইতালিতে লেখা হয়েছিল তা অন্যান্য দেশে পৌঁছেছিল। এর কারণ হল ষোড়শ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব— যা মুদ্রণ শিল্পের দক্ষতার ফলে ঘটেছিল। এর জন্য ইউরোপীয়রা মুদ্রণের জন্য চিন এবং মঙ্গোল শাসকদের কাছে ঋণী ছিল কারণ ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও কূটনীতিকরা মঙ্গোল শাসকদের রাজ-দরবার পরিদর্শনের কারণে এই প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হন। (এমন আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন—আগ্নেয়াস্ত্র, কম্পাস এবং স্তম্ভশীর্ষ ফলক এর ক্ষেত্রেও হয়েছিল)

এর আগে, কয়েকটি গ্রন্থের লিখিত কপি বিদ্যমান ছিল। ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির নাগরিক জোনানেস গুটেনবার্গ (১৪০০-১৪৫৮) প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কর্মশালায় ১৫০ কপি বাইবেল ছাপা হয়েছিল। এর আগে এই সময়ের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী মাত্র এক কপি বাইবেল লিখতে পারতেন।

পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ইতালিতে ছাপা হয়েছিল যার মধ্যে অধিকাংশ ল্যাটিন গ্রন্থ ছিল। যেহেতু ছাপা বই উপলব্ধ হচ্ছিল এবং তা ক্রয় করা যাচ্ছিল ফলে শিক্ষার্থীদের কেবল অধ্যাপকদের বক্তৃতার দ্বারা নির্মিত নোটের উপর নির্ভরশীল থাকতে হত না। এখন চিন্তাভাবনা, মতামত এবং খবর আগের চেয়ে আরও ব্যাপকভাবে এবং আরও দ্রুত সম্প্রসারিত হতে লাগল। নতুন নতুন ধারণা নিয়ে লেখা একটি ছাপা পুস্তক অতি দ্রুত শতশত পাঠকের নিকট পৌঁছে যেতে পারত। এখন পাঠক একান্তে বসে বই পড়তে পারতেন, কারণ তিনি বাজার থেকে বই ক্রয় করতে পারতেন। এর ফলে মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস তৈরি হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আল্পস পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে ইতালির মানবিক সংস্কৃতি আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ হল সেখানে মুদ্রিত বইয়ের প্রচলন ছিল। এর থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে প্রথমদিকের বৌদ্ধিক আন্দোলন কী কারণে কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মানবজাতি সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা

মানবতাবাদী সংস্কৃতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মানবজাতির জীবনে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের শিথিলতা। ইতালির নাগরিকরা বস্তুগত সম্পদ, শক্তি এবং গৌরবের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু এর মানে তা নয় যে তারা অধার্মিক ছিল। ফ্রান্সেসকো বারবারো (১৩৯০-১৪৫৪) নামে ভেনিসের একজন মানবতাবাদী

একটি পুস্তিকাতে ‘সম্পদ অর্জন করাকে’ এক বিশেষ গুণ বলে প্রশংসা করেছেন। লরেঞ্জো ভাল্লা (১৪০৬-১৪৫৭) যিনি বিশ্বাস করতেন ইতিহাস চর্চা মানুষের জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য সংগ্রাম করতে প্রেরণা জোগায়, তিনি তাঁর গ্রন্থ ‘অন প্লেজার’ এ তিনি আমোদ-প্রমোদের বিরুদ্ধে খ্রিস্ট্রিয় আদেশনামার সমালোচনা করেছেন। সেই সময় মানুষের মধ্যে ভালো আচরণের প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। কীভাবে একজনের সাথে নম্রভাবে কথা বলা উচিত, কীভাবে সঠিক পোশাক পরা উচিত এবং একজন সভ্য মানুষের কোন্ বিষয়ে দক্ষতা থাকা উচিত। মানবতাবাদ এটাও বোঝায় যে, যে কোনো ব্যক্তি ক্ষমতা ও অর্থের পেছনে না ছুটে অন্য কোনোভাবে নিজের জীবনকে রূপ দিতে পারে। এই আদর্শ ঘনিষ্ঠভাবে এই বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত যে মানুষের স্বভাব বহুমুখী, যা তিনটি পৃথক শ্রেণিতে বিশ্বাসী সামন্তবাদী সমাজের বিরুদ্ধে গিয়েছিল।

নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী তাঁর গ্রন্থ ‘দি প্রিন্স’ (১৫১৩) এর পঞ্চদশ অধ্যায়ে মানবজাতির প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছেন—

‘কাল্পনিক বিষয়বস্তুকে ছেড়ে যদি শুধুমাত্র সত্যিকারের বিষয় নিয়ে ভাবা যায়, তাহলে আমি বলতে পারি যে যখনই মানুষকে নিয়ে আলোচনা করা হয় (বিশেষ করে রাজকুমারী, যারা জনতার জন্য উন্মুক্ত) তাহলে তারা অনেক গুণাবলীর জন্য সুপরিচিত হন যার কারণে তিনি প্রশংসা বা নিন্দার যোগ্য হন। উদাহরণস্বরূপ, কাউকে উদার মানা হয় আর কাউকে কৃপণ। কাউকে পৃষ্ঠপোষক বলে মানা হয়, কাউকে লোভী, কিছু মানুষ খল প্রকৃতির, কোনো কোনো মানুষকে দরদি বলা হয়, একজন বিশ্বস্ত তো আরেকজন অবিশ্বস্ত। একজন পৌরুষহীন ও কাপুরুষ, আরেকজন হিংস্র ও পরাক্রমশালী , একজন জেদী আরেকজন নম্র; একজন রাশভারী আরেকজন চপল; একজন ধার্মিক আরেকজন নাস্তিক।’

ম্যাকিয়াভেলি বিশ্বাস করতেন যে, সব মানুষ খারাপ এবং সে নিজের দুষ্ট স্বভাবগুলো প্রদর্শন করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকে, কারণ মানুষের ইচ্ছাগুলো আংশিকভাবে অতৃপ্ত থাকে। ম্যাকিয়াভেলি দেখেছেন এর পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল মানুষ প্রতিটি কাজে নিজের স্বার্থ দেখে।

নারীদের আকাঙ্খা

ব্যক্তিত্ব এবং নাগরিকত্বের নতুন আদর্শ থেকে নারীদের দূরে রাখা হয়েছিল। অভিজাত পরিবারের পুরুষরা সর্বজনীন জীবনে কর্তৃত্ব করতেন এবং তাঁদের পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ওই সময়ের লোকেরা তাদের পুত্রদের এমনভাবে শিক্ষা দিত, যাতে তাদের পরবর্তীকালে তারা তাদের পারিবারিক পেশা এবং লৌকিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। কখনো কখনো তারা তাদের পুত্রদের ধর্মীয় কাজ করার জন্য চার্চে পাঠিয়ে দিত। যদিও বিবাহে প্রাপ্ত যৌতুক তারা পারিবারিক ব্যবসাতে বিনিয়োগ করত তথাপি নারীদের তাদের স্বামীকে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো মতামত দেওয়ার অধিকার ছিল না। প্রায়শই ব্যবসায়িক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার জন্য দুই পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হত। পর্যাপ্ত যৌতুকের সংস্থান না হলে মেয়েদের খ্রিস্টান মঠে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হত। নারীদের সর্বজনীন ভূমিকা স্পষ্টতই খুব সীমিত ছিল এবং তাদের পরিবার-প্রতিপালক রূপেই দেখা হত।

বণিক পরিবারে নারীদের অবস্থান কিছুটা ভিন্ন ছিল। দোকানদারদের স্ত্রীরা দোকান পরিচালনা করতে প্রায়শই সহায়তা করত। বণিক এবং মহাজন পরিবারের পুরুষরা যখন ব্যবসার জন্য দূরদূরান্তে যেত তখন তাদের গৃহিণীরা ব্যবসার কার্য পরিচালনা করত। একজন বণিকের অল্প বয়সে মৃত্যু হলে তার বিধবা পত্নি বড়ো মাপের সর্বজনীন ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হত। অভিজাত পরিবারের যা খুব কম হত।

কয়েকজন নারী বৌদ্ধিকভাবে মানবিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে খুব সৃজনশীল এবং সংবেদনশীল ছিল। ভেনিসের নাগরিক ক্যাসেন্দ্রা ফেডেলে (১৪৬৫-১৫৫৮) লিখেছেন "যদিও নারীদের অক্ষর জ্ঞান কোনো পুরস্কার বা মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় না, তথাপি নারীদের সব ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করার ইচ্ছা রাখা উচিত এবং তা গ্রহণ করা উচিত।" তিনি সেই সময়ের মুষ্টিমেয় নারীর মধ্যে একজন ছিলেন যিনি ওই সময়ের বিচারধারা যে একজন মানবতাবাদী পণ্ডিতের গুণাবলী অর্জনে নারীরা অসমর্থ ছিল তা অস্বীকার করেছিলেন। ফেডেল গ্রিক এবং ল্যাটিন ভাষায় পারদর্শিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাঁকে পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

ইসাবেল্লা দি এস্তে

ফেডেলের লেখাগুলো থেকে জানা যায় যে সেই যুগে সবাই শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। ভেনিসের লেখিকাদের মধ্যে তিনি ছিলেন এমন একজন যিনি প্রজাতন্ত্রের সমালোচনা করেছিলেন "স্বাধীনতার একটি অত্যন্ত সীমিত সংজ্ঞা তৈরির জন্য যা নারীদের থেকে পুরুষদের আকাঙ্খাকে বেশি সমর্থ করত"।

আরেকজন উল্লেখযোগ্য মহিলা ছিলেন মান্টুয়ার মার্চেসা ইসাবেল্লা দি এস্তে (১৪৭৪-১৫৩৯)। তিনি নিজের স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের রাজ্য শাসন করেছিলেন। যদিও মান্টুয়া একটি ছোটো রাজ্য ছিল তথাপি বৌদ্ধিক প্রতিভার জন্য এর রাজদরবার খ্যাতি লাভ করেছিল। মহিলাদের লেখাগুলো থেকে তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশিত হয় যে পুরুষ প্রধান সমাজে নিজেদের পরিচিতি লাভের জন্য অর্থনৈতিক শক্তি, সম্পত্তি এবং শিক্ষিত হওয়া দরকার।

কার্যাবলি-৩

নারীদের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে একজন নারীর (ফেডেল) এবং একজন পুরুষের (ক্যাস্টিগ্লিওনি) অভিব্যক্তির তুলনা করো। তাদের ভাবনায় কি কোনো বিশেষ শ্রেণির নারীরা ছিল?

লেখক এবং কূটনীতিবিদ, বালথাসার কাস্টিগ্লিওনি তাঁর গ্রন্থ দি কোর্টিয়ার (১৫২৮) এ লিখেছেন—

'আমি মনে করি, নারীদের জীবনযাত্রার ধরন, আচরণ, কথা বলার ভঙ্গিমা, অঙ্গাভঙ্গি ও সহনশীলতা, কোনোটাই পুরুষদের অনুরূপ হওয়া উচিত নয়। একজন পুরুষকে যেমন বলিষ্ঠ এবং শক্তিশালী হওয়া দরকার তেমনি একজন নারীর মধ্যে কোমল ও শান্ত গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে প্রত্যেকটি চালচলন এবং সে যা কিছু করবে সবকিছুতে কোমলতা থাকা দরকার যাতে নারীর সবগুণ পুরুষের সাদৃশ্য ছাড়া একজন স্ত্রীলোক হিসেবেই প্রদর্শিত হয়। যদি এই নিয়মের সাথে শাসনকর্তাদের দ্বারা শেখানো নিয়মকে যুক্ত করা হয় তাহলে নারীরা অনেক কিছু করতে সক্ষম হবে এবং নিজেদের নানাবিধ গুণে সুসজ্জিত করতে পারবে। কারণ আমি মনে করি যে এমন কিছু গুণ আছে যা মহিলাদের জন্য ততটাই আবশ্যক যতটা পুরুষদের জন্য আবশ্যক যেমন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য হওয়া, ভান পরিবর্জন করা, ক্ষমতাশীল হওয়া, ভদ্রতা, চতুর এবং বুদ্ধিমান হওয়া, কখনই অহংকারী, ঈর্ষান্বিত, দুস্ট এবং উদ্ধত না হওয়া .... যাতে নারীরা সেই সব ক্রীড়াকে শিস্টতা এবং শৃঙ্খলার সাথে সম্পন্ন করতে পারে, যা তাদের জন্য উপযুক্ত।

খ্রিস্টানদের মধ্যে বিতর্ক

বাণিজ্য এবং ভ্রমণ, সামরিক বিজয় এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের ফলে ইতালির নগর এবং রাজদরবারের সাথে বহির্বিশ্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই নতুন সংস্কৃতি শিক্ষিত এবং সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির দ্বারা শুধু প্রশংসিত হয়েছিল তা নয়, তারা এই সংস্কৃতির অনুকরণ করেছিল। কিন্তু এই নতুন ধারণাগুলো খুব কমই সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছেছিল, কারণ তারা পড়তে বা লিখতে জানত না।

পঞ্চদশ শতাব্দী এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মানবতাবাদী ধ্যানধারণায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইতালির সহকর্মীদের মত তাঁরাও গ্রিস এবং রোমের ধ্রুপদী গ্রন্থ এবং খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের দিকে তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করেছিলেন। কিন্তু ইতালি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় যেখানে পেশাদার পণ্ডিতগণ মানবতাবাদী আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল, উত্তর ইউরোপে মানবতাবাদ চার্চের অনেক সদস্যকে আকৃস্ট করেছিল। তারা খ্রিস্টানদের তাদের পুরোনো ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী ধর্মচর্চা করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। সাথে সাথে অপ্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানগুলো বাতিল করার কথা বলেছিলেন এবং যাকে তারা পরবর্তীকালে একটি সরল ধর্মে সংযোজন করার জন্য নিন্দা করেছিলেন। মানুষ সম্পর্কে মানবতাবাদীদের পুরোপুরি নতুন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হয়েছিল কারণ তারা তাদের মুক্ত এবং বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন কার্যকর্তা মনে করতেন।

পরবর্তীকালের দার্শনিকরা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দূরবর্তী ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তারা এটা মানতেন যে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মানুষকে নিজের জীবন স্বচ্ছন্দভাবে চালানোর জন্য পুরোপুরি স্বাধীনতাও দিয়েছেন। তাঁরা এটাও মানতেন যে মানুষকে সর্বত্র সুখ সৌভাগ্য খুঁজে নিতে হয়।

ইংল্যান্ডের থমাস মোর (১৪৭৮-১৫৩৫) এবং হলান্ডের ইরেসমাস (১৪৬৬-১৫৩৬) এর মত খ্রিস্টান মানবতাবাদীরা অনুভব করেছিলেন যে গির্জা এমন একটি লোভী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যেখানে সাধারণ মানুষদের ভয় দেখিয়ে জোর করে অর্থ আদায় করা হয়। পাদরিদের লোক ঠকানোর পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সরল পদ্ধতি ছিল 'পাপ-স্বীকারোক্তি' নামক দস্তাবেজ বিক্রি করা যা আপাত দৃষ্টিতে ক্রেতাকে পাপের বোঝা থেকে মুক্তি পাবে বলে প্রচার করা হত। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা স্থানীয় ভাষায় ছাপা বাইবেলের অনুবাদ থেকে অনুভব করলেন যে তাদের ধর্মে এ ধরনের প্রথার প্রচলন নেই।

ইউরোপের প্রায় সকল অংশেই কৃষকরা চার্চ কর্তৃক আরোপিত করের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল যখন সাধারণ মানুষ পাদরিদের অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ করে, রাজারাও রাজকার্যে চার্চের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। মানবতাবাদীরা যখন তাদের দেখিয়েছিলেন যে পাদরিদের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর দাবীর উৎপত্তি হয়েছিল 'ডোনেশন অব কনস্টানটাইন' নামক দলিল থেকে যা সম্ভবত প্রথম খ্রিস্টান রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন জারি করেছিলেন, তখন রাজারা খুব খুশি হয়েছিলেন। মানবতাবাদী পণ্ডিতরা এই সত্যটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে কনস্টানটাইনের এই দলিলটি আসল নয় বরং পরবর্তীকালে তা জাল করা হয়েছিল।

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে মার্টিন লুথার কিং নামে একজন তরুণ জার্মান সন্ন্যাসী (১৪৮৩-১৫৪৬) ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তির সাথে ঈশ্বরের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য পাদরিদের প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর অনুগামীদের ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে বলেছিলেন, কারণ তাদের বিশ্বাসই তাদেরকে সঠিক জীবনযাপন করতে এবং তাদেরকে স্বর্গে প্রবেশ করার পথপ্রদর্শক হতে পারে। এই আন্দোলনকে প্রটেস্টান্ট ধর্মসংস্কার নাম দেওয়া হয়েছিল যার ফলে জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডের চার্চের সাথে পোপ এবং ক্যাথলিক চার্চের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। সুইজারল্যান্ডে লুথারের মতবাদকে উলরিচ জুইংগলি (১৪৮৪-১৫৩১) এবং পরবর্তীকালে জিন ক্যালভিন (১৫০৯-৬৪) জনপ্রিয় করেছিলেন। ব্যবসায়ীদের দ্বারা সমর্থন পাওয়ার ফলে শহরে সংস্কারকদের জনপ্রিয়তা ছিল, তবে

তখনও গ্রামাঞ্চলে ক্যাথলিক চার্চ তার প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যান্য জার্মান সংস্কারক, যেমন অ্যানাব্যাপটিস্টরা আরও বেশি সংস্কারবাদী ছিল: তারা পরিত্রাণের ধারণাকে সমস্ত ধরনের সামাজিক নিপীড়নের পরিসমাপ্তির সাথে মিশ্রিত করেছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল যেহেতু ঈশ্বর সব মানুষকে সমান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তাই তাদের কাছ থেকে কর আদায়ের প্রত্যাশা করা উচিত নয় এবং তাদের নিজেদের পাদরি নির্বাচন করার অধিকার থাকা উচিত। সামন্ততন্ত্রবাদের দ্বারা নিপীড়িত কৃষকরা এতে উজ্জীবিত হয়েছিল।

বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অধ্যায়ে প্রারম্ভিক অনুসারী, জীবনী এবং অনুশাসনের উল্লেখ রয়েছে।

১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম টিন্ডেল নামে একজন লুথারবাদী ইংরেজ যিনি ইংরেজি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন, তিনি প্রোটেস্ট্যান্টবাদদের সমর্থনে বলেছিলেন—
"এ ব্যাপারে সবাই একমত হবেন যে আপনাকে ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান থেকে দূরে রাখার জন্য তারা চায় আপনার মাতৃভাষায় যাতে ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ না হয়, যাতে পৃথিবী অন্ধকারেই থেকে যায় এবং তারা (পাদরিরা) যাতে মানুষের অন্তঃকরণে থাকতে পারে, যাতে তাদের দ্বারা তৈরি করা কুসংস্কার এবং মিথ্যা ধর্মমতবাদ বিশ্বাস করে, যার মাধ্যমে তাদের উচ্চাকাঙ্খা এবং চাহিদাপূরণ হতে পারে। এই ভাবেই যাতে তারা রাজা, সম্রাট এবং ঈশ্বরের চেয়েও উচ্চস্থানে থাকতে পারে ..... এগুলোই বিশেষত আমাকে নিউ টেস্টামেন্ট এর অনুবাদ করার প্রেরণা দেয়। কারণ আমি অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করেছি যে, সাধারণ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মাতৃভাষায় তাদের ধর্মগ্রন্থকে উপলব্ধ করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সত্যের অনুধাবন করতে পারবে না। এই অনুবাদের ফলে তারা ধর্মগ্রন্থের প্রণালী, বিন্যাস এবং অর্থ বুঝতে পারবে।"

লুথার আমূল পরিবর্তনকে সমর্থন করতেন না। তিনি জার্মান শাসকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন কৃষক বিদ্রোহ দমন করার জন্য যা তারা ১৫২৫ সালে করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমূল পরিবর্তন চলতে থাকল এবং তা ফ্রান্সে প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে মিশে গিয়েছিল। তারা ক্যাথলিক শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত হওয়ার দরুণ অত্যাচারী শাসককে অপসারণ করার এবং সেই জায়গায় নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী শাসক নির্বাচন করার দাবি জানায়। শেষ পর্যন্ত ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ফ্রান্সেও ক্যাথলিক চার্চ প্রোটেস্ট্যান্টদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী উপাসনা করার অনুমতি দেয়। ইংল্যান্ডে শাসকরা পোপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তখন থেকে রাজা অথবা রানি চার্চের প্রধান হন।

ক্যাথলিক চার্চ এইসব ধারণার প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না এবং আন্তরিকতার সাথে নিজের সংস্কার শুরু করে। স্পেন এবং ইতালিতে পাদরিরা সহজ সরল জীবন যাপন এবং গরিবদের সেবার প্রতি জোর দিয়েছিলেন। স্পেনে প্রোটেস্ট্যান্টদের সাথে সংঘর্ষ করার জন্য ইগনেলিয়াস লয়লা ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে 'সোসাইটি অফ জেসাস' নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অনুগামীদের জেসুইট নামে অভিহিত করা হত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গরিবদের সেবা করা এবং অন্যান্য সংস্কৃতি সম্পর্ক বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করা।

কার্যাবলি-৪

কোন্ বিষয়ে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের অনুগামীরা ক্যাথলিক চার্চের সমালোচনা করত?

	ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী
১৫১৬	থমাস মুর এর ইউটোপিয়া প্রকাশিত হয়।
১৫১৭	মার্টিন লুথার "দ্যা নাইনটি-ফাইভ থিসিস" লিখেছিলেন।
১৫২২	লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেছিলেন।
১৫২৫	জার্মানিতে কৃষক বিদ্রোহ।
১৫৪৩	এনড্রিস ভেসালিয়াস শারীরবিদ্যা সম্পর্কে লিখেছেন।
১৫৫৯	ইংল্যান্ডে অ্যাঙ্গালিকান চার্চের প্রতিষ্ঠা, রাজা/রানি চার্চের প্রধান হন।
১৫৬৯	গারহারডাস মারকাটর পৃথিবীর নলাকার মানচিত্র তৈরি করেন।
১৫৮২	পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি কর্তৃক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন।
১৬২৮	উইলিয়াম হার্ভে রক্তসঞ্চালনের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগের কথা বলেন।
১৬৭৩	প্যারিসে একাডেমি অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠা।
১৬৮৭	আইজাক নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা প্রকাশ।

কোপারনিকাসের বিপ্লব

নভস্থিত (cetestial) এর মানে হল স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক, যা বিশ্বব্যাপী পার্থিব জগতকে বোঝায়।

বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পাপী মানুষদের সম্পর্কে খ্রিস্টান মতামত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কোপারনিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩) কাজের মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞানচর্চা এক নতুন মোড় নেয়। তিনি মার্টিন লুথারের সমসাময়িক ছিলেন। খ্রিস্টানধর্মালম্বীদের ধারণা ছিল পৃথিবী একটি পাপী স্থান এবং পাপের বোঝা ভারী হওয়ার ফলে তা অচল হয়ে গেছে। পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে ছিল যার চারপাশে নভস্থিত (celestial) গ্রহগুলো ঘুরত।

কোপারনিকাস দাবি করেছিলেন যে পৃথিবী সহ সবগুলো গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। কোপারনিকাস একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান ছিলেন এবং ঐতিহ্যবাদী পাদরিদের দ্বারা তার তত্ত্বের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভীত ছিলেন। এই কারণেই তিনি নিজের পাণ্ডুলিপি 'দি রেভল্যুশনিবাস" (পরিভ্রমণ) কে প্রকাশ করতে চাননি। যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন তখন তিনি এই পাণ্ডুলিপিটি তাঁর অনুগামী জোয়াসিম রেটিকাসকে প্রদান করেছিলেন। তাঁর তত্ত্বকে গ্রহণ করতে মানুষের কিছুটা সময় লেগেছিল। অনেকদিন পর—অর্ধ শতাব্দীরও পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস কেপ্লার (১৫৭১-১৬৩০) এবং গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪-১৬৪২) তাঁদের লেখার মাধ্যমে 'স্বর্গ' এবং পৃথিবীর মধ্যে যে পার্থক্য তা বুঝিয়েছিলেন। কেপ্লার তাঁর গ্রন্থ 'কসমোগ্রাফিকেল মিস্ট্রি'র দ্বারা সূর্যকেন্দ্রিক সৌরমণ্ডলের তত্ত্বটিকে জনপ্রিয় করেছিলেন যাতে তিনি দেখিয়েছেন গ্রহগুলো সূর্যের চারপাশে বৃত্তাকারে নয় বরং উপবৃত্তাকারে পরিক্রমণ করে। গ্যালিলিও তাঁর গ্রন্থ 'দি মোশন' (The Motion) এর দ্বারা গতিশীল বিশ্বের ধারণাকে সুদৃঢ় করেন। বিজ্ঞানের জগতের এই আমূল পরিবর্তন নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

কোপারনিকাসের আত্মপ্রতিকৃতি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধ্যয়ন

গ্যালিলিও একবার মন্তব্য করেছিলেন যে বাইবেল যেভাবে স্বর্গের রাস্তাকে আলোকিত করে, সেই স্বর্গের কাজ কীভাবে হয় সে বিষয়ে কিছু বলা হয় নি। এই চিন্তাবিদ্‌রা আমাদের দেখিয়েছেন যে জ্ঞান, বিশ্বাস থেকে পৃথক হয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যখন বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা নিরীক্ষার পথ দেখিয়েছিলেন তখন ভৌতবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা এবং জীব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ দ্রুত প্রসারিত হতে শুরু করে। ঐতিহাসিকরা মানুষ ও প্রকৃতি এই নতুন দৃষ্টিকোণকে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন।

ফলস্বরূপ, সন্দেহবাদী ও নাস্তিকদের মনে সৃষ্টির উৎস হিসেবে ঈশ্বরের পরিবর্তে প্রকৃতি পুনঃস্থাপিত হয়। এমনকি যারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস বজায় রেখেছিল, তারাও এক দূরবর্তী ঈশ্বর সম্পর্কে মন্তব্য করতে শুরু করেছিল, যিনি পার্থিব জগতের জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন না। বৈজ্ঞানিক সংস্থার মাধ্যমে এই ধারণাগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল যা জনসাধারণের মধ্যে এক নতুন বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত প্যারিস একাডেমি এবং ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে বাস্তব জ্ঞানের প্রসারের জন্য লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত রয়েল সোসাইটি জনসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বক্তৃতার আয়োজন করেছিল এবং সর্বজনীন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীতে কি ইউরোপে নবজাগরণ হয়েছিল ?

এখন আমরা নবজাগরণের ধারণা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করব। আমরা কি এটা বলতে পারি যে এই সময়কাল অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং গ্রিক ও রোমান ঐতিহ্যের ধারণার পুনর্জন্ম হয়েছিল? তার আগের কাল কি (দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী) অন্ধকারের যুগ ছিল?

সাম্প্রতিক কালের লেখকগণ, যথা ইংল্যান্ডের পিটার বার্কের মতে বার্কহার্ডের এই বক্তব্য অতিরঞ্জিত ছিল। বার্কহার্ড এই সময় এবং এর পূর্ববর্তী সময়ের পার্থক্যকে রঙ চড়িয়ে পেশ করেছিলেন, যার জন্য তিনি রেনেসাঁ শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন। যা ওই সময়ের গ্রিক ও রোমান সভ্যতার পুনরুত্থানকে বোঝায় এবং এই সময়ের পণ্ডিত এবং শিল্পীরা খিস্টান ধর্মালম্বীদের কাছে খ্রিস্ট-পূর্ব বিশ্বধারণার প্রচার ও প্রসার করেছিলেন। প্রাচীন শতাব্দীর পণ্ডিতগণ গ্রীক এবং রোমান সংস্কৃতির সাথে পরিচিত ছিলেন এবং সেই সময়ে মানুষের জীবনে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

নবজাগরণের যুগকে গতিশীলতা এবং শৈল্পিক সৃজনশীলতার যুগ হিসেবে গণ্য করলে এবং মধ্যযুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিকাশহীন যুগের সঙ্গে তুলনা করলে বেশি সরলীকরণ করা হবে। ইতালিতে নবজাগরণের সাথে যুক্ত অনেক উপাদান দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাওয়া যেতে পারে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে নবম শতাব্দীতে ফ্রান্সে অনুরূপ সাহিত্য এবং শৈল্পিক সত্ত্বা সমৃদ্ধিলাভ করেছিল।

ইউরোপে সেই সময় যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছিল তাতে শুধু রোম এবং গ্রিক "শাস্ত্রীয়" সভ্যতার ভূমিকা ছিল তা নয়, রোমান সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদানের পুনরুদ্ধারও সেই সভ্যতার প্রতি মহান শ্রদ্ধার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এশিয়াতে প্রযুক্তি ও দক্ষতা গ্রিক ও রোমানদের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ছিল। বিশ্বের অনেক অঞ্চল একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং নৌযাত্রার (navigation)(অষ্টম অধ্যায় লক্ষ করো) নতুন কৌশল আবিষ্কার হওয়ার ফলে মানুষের পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলে ভ্রমণ করা সম্ভব হয়েছিল। ইসলামের বিস্তার এবং মঙ্গোলদের বিজয়ের ফলে এশিয়া এবং উত্তর

আফ্রিকা ইউরোপের সাথে রাজনৈতিক ভাবে নয়, বরং ব্যবসাবাণিজ্য ও কর্ম কুশলতা শেখার জন্য যুক্ত হয়েছিল। ইউরোপীয়রা শুধু গ্রিক এবং রোমানদের থেকেই শিখেনি— তারা ভারত, আরব, ইরান, মধ্য এশিয়া এবং চিন থেকেও জ্ঞান লাভ করেছিল। দীর্ঘদিন এই ঋণ স্বীকার করা হয়নি। কারণ যখন ওই সময়ের ইতিহাস লেখার কাজ শুরু হয়েছিল তখন ঐতিহাসিকরা এটিকে ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে ধীরে ধীরে 'ব্যক্তিগত' এবং 'সর্বজনীন' এই দুই ক্ষেত্র পৃথক হতে শুরু করে। সর্বজনীন ক্ষেত্রের তাৎপর্য সরকারের কার্যক্ষেত্র ও আনুষ্ঠানিক ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে পরিবার ও ব্যক্তির নিজের ধর্ম অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির দুই ধরনের ভূমিকা পালন করতে হত —একটি ব্যক্তিগত আরেকটি সর্বজনীন। তিনি কেবল তিন শ্রেণির মধ্যে যেকোনো একটি শ্রেণির সদস্য ছিলেন না; তিনি নিজে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন। একজন শিল্পী শুধুমাত্র কোনো সংস্থার সদস্য ছিলেন তা নয়, তিনি তার ব্যক্তিগত প্রতিভার জন্যও খ্যাত ছিলেন। অস্টাদশ শতাব্দীতে ব্যক্তি সম্পর্কে এই ধারণা রাজনৈতিক ভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল এই বিশ্বাসের সাথে যে, সকল ব্যক্তির সমান রাজনৈতিক অধিকার আছে।

এই সময়ের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব ছিল। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল ভাষার উপর ভিত্তি করে তাদের পৃথক পরিচয় তৈরি করতে শুরু করে। প্রথম দিকে আংশিকভাবে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বারা এবং পরবর্তীকালে ল্যাটিন ভাষা এবং খ্রিস্টান ধর্মের দ্বারা ঐক্যবন্ধ ইউরোপ এখন আলাদা-আলাদা রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল ফলে প্রতিটি রাজ্য একটি সাধারণ ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও

১। চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রিক এবং রোমান সংস্কৃতির কোন্ উপাদানগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল?

২। এই সময়ের ইতালির স্থাপত্যকলা এবং ইসলামী স্থাপত্যকলার বিস্তারিত তুলনা করো।

৩। মানবতাবাদের ধারণার অভিজ্ঞতা সবচেয়ে প্রথম ইতালির শহরে কেন হয়েছিল?

৪। ভেনেসীয়দের 'ভালো সরকার' সম্পর্কে ধারণার সঙ্গে সমসাময়িক ফ্রান্সের প্রচলিত ব্যবস্থার তুলনা করো।

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখো

৫। মানবতাবাদী ধারণার বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

৬। সপ্তদশ শতকের ইউরোপীয়দের কাছে বিশ্ব কীভাবে বিভিন্ন রূপে উপস্থিত হয়েছিল সেই সম্পর্কে এক সুচিন্তিত বিবরণ লেখো।

বিষয় ৮

সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব
CONFRONTATION OF CULTURES

এই অধ্যায়ে আমেরিকা ও ইউরোপীয় জনগণের মধ্যে পঞ্চদশ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে মুখোমুখি হবার কিছু বিষয় আলোচনা করা হবে। কিছু ইউরোপবাসী অচেনা সমুদ্রে বাণিজ্য পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য সেই সমস্ত স্থানে পাড়ি দিয়েছিল যেখানে মশলা এবং রৌপ্য পাওয়া যেত। স্পেনীয় এবং পর্তুগীজরাই প্রথম এই পথে এগিয়ে এসেছিল। তারা পোপকে প্ররোচিত করেছিল তাদের যে কোন নতুন অঞ্চল শাসনের অধিকার দিতে যেগুলি তারা নির্ধারিত করবে। একজন ইতালীয়, ক্রিস্টোফার কলম্বাস স্পেনের শাসকদের নিকট থেকে সাহায্য পেয়ে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমে সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন। তিনি চিন্তা করেছিলেন যে তিনি যে দেশে পৌঁছেছেন, তা ছিল 'দি ইন্ডিজ' (ভারত এবং পূর্ব-ভারতের দেশগুলি সম্পর্কে যা তিনি মার্কো পোলের ভ্রমণ বৃত্তান্তে পড়েছিলেন)।

পরবর্তীকালের অনুসন্ধান নির্দেশ করে যে, নতুন বিশ্বের ভারতীয়রা প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন সংস্কৃতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এশিয়ার অংশ ছিল না। আমেরিকানদের মধ্যে দুই ধরনের সংস্কৃতি দেখা যায়। ক্যারিবিয়ান অঞ্চল এবং ব্রাজিলে ক্ষুদ্র জীবন ধারণের অর্থনীতির অস্তিত্ব ছিল। সেখানে সুগঠিত খনি ও কৃষির উপর ভিত্তি করে শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। পেরুর ইনকা এবং মধ্য-আমেরিকার অ্যাজটেক এবং মায়া সভ্যতার মতো তাদেরও স্মারক স্থাপত্য ছিল।

এই অনুসন্ধান এবং পরে দক্ষিণ আমেরিকার উপস্থিতি স্থানীয় লোকজন ও তাদের সংস্কৃতির উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। এটি দাস-ব্যবসার শুরুর ঘটনা হিসাবেও চিহ্নিত হয়ে রইল। আফ্রিকার থেকে ইউরোপিয়ানদের কাছে দাস বিক্রি করা হত আমেরিকার আবাদী জমি এবং খনিতে কাজ করার জন্য।

ইউরোপীয়রা আমেরিকার বিজয়ের সাথে সাথে খুব নিষ্ঠুরভাবে তাদের পাণ্ডুলিপি এবং স্মৃতিস্তম্ভগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মানব বিজ্ঞানীরা (নৃবিজ্ঞানীরা) এই সংস্কৃতির পুনরায় অধ্যয়ন শুরু করেন। এখনো প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাচ্ছেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মাচু পিচ্চুর ইনকা শহর পুনঃ আবিষ্কার হয়েছিল। সম্প্রতি মহাকাশ থেকে তোলা আলোকচিত্রে এই সভ্যতার অনেক শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলি এখন বনভূমিতে আবৃত।

অপর দিকে, ইউরোপীয় দিক থেকে এই মোকাবিলা ছিল খুবই বড় ধরনের। ইউরোপীয়রা, যারা আমেরিকায় গিয়েছিল, তারা তাদের ভ্রমণের রোজনামচা এবং দিনপঞ্জির বিবরণ লিখেছিলেন। সরকারি কর্মকর্তাদের এবং জেসুইট মিশনারীদের বিবরণে তা দেখা গিয়েছিল। ইউরোপীয়রা তাদের আমেরিকা আবিষ্কার সম্বন্ধে লিখেছিলেন, যখন প্রথম আমেরিকা দেশের ইতিহাস লেখা হয়, তখন ইউরোপীয়দের বসতির কথাই বেশি লেখা হয়েছিল এবং স্থানীয় লোকদের কথা খুব কম উল্লেখ করা হয়েছিল।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জে সহস্র বছর ধরে জনগণ বাস করছিল এবং অনেকে এশিয়া এবং দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপপুঞ্জ থেকে দেশান্তরিত হয়ে এখানে এসে তাদের স্থান করে নিয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকা গভীর অরণ্য এবং পর্বত সংকুল ছিল এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী আমাজন গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে মাইলের পর মাইল প্রবাহিত হয়। মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায় সমতল ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল ছিল। অপরদিকে গ্রামগুলি বনাঞ্চলের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল।

ব্রাজিল এবং ক্যারিবিয়ান সম্প্রদায়

আরাওয়াকিয়ান লুকায়ুসরা ক্যারিবিয়াণ সাগরের শত শত গুচ্ছ ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে বাস করত, যা বর্তমানে বৃহত্তর এন্টিলিস ও বাহামাস, নামে পরিচিত। তারা ক্যারিব্স নামক এক হিংস্র উপজাতি কর্তৃক ক্ষুদ্রতর এন্টিলিস থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। তাদের তুলনায় আরাওয়াক্সরা ছিল এক ধরনের লোক যারা দ্বন্দ্বের পরিবর্তে চুক্তির ভিত্তিতে কথাবার্তা বলার উপর অগ্রাধিকার দিত। দক্ষ নৌকা নির্মাতা হিসাবে তারা উন্মুক্ত সমুদ্রে ডোঙা নৌকায় যাত্রা করত (নৌকাগুলি তৈরি হত ফাঁপা গাছের তক্তা দিয়ে)। তারা জীবিকা নির্বাহ করত পশু শিকার, মাছধরা, কৃষিকাজ, শস্য উৎপাদন, মিষ্টিআলু , ওল ও কাসাভ বৃক্ষের মূল খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে।

জনগণের সংগঠন যা যৌথভাবে খাদ্য উৎপাদন করত, এর একটা প্রধান সাংস্কৃতিক মান ছিল এবং এটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাদ্য সরবরাহ করত। তারা সংঘবদ্ধ থাকত বয়োজ্যেষ্ঠ উপজাতির অধীনে। বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আরাওয়াক্সরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী ছিল। অন্যান্য অনেক সমাজের মতো এখানেও শমন-রা এই বিশ্ব এবং অলৌকিক জগতের মধ্যে আরোগ্যকারী ও মধ্যস্থাতাকারী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

বহুপ্রাণবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান যে বস্তুগুলোকে জড় হিসাবে মনে করে, সেইগুলোতেও প্রাণ বা আত্মা আছে।

মানচিত্র-১
মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ।

কার্যাবলি-১

আরাওয়াক্স এবং স্পেনিয় এর মধ্যে তুলনা করো। কোন্ পার্থক্যগুলোকে তুমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করো এবং কেন ?

আরাওয়াক্সরা অলংকারের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করত। কিন্তু ইউরোপীয়রা যেভাবে ধাতুটিকে গুরুত্ব দিত, তারা সেই গুরুত্ব প্রদান করত না। তারা খুব সন্তুষ্ট ছিল সোনার বিনিময়ে কাচের পুঁতি ব্যবহার করতে যা ইউরোপীয়রা এনেছিল, কারণ এগুলো বেশি সুন্দর দেখতে। বয়ন শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। তাদের অন্যতম বিশেষত্ব ছিল ক্যানভাস বা নেটের ঝোলানো শয্যা যা ইউরোপীয়দের কল্পনাকে আকর্ষণ করেছিল।

আরাওয়াক্সরা ছিল উদার প্রকৃতির এবং তারা সন্তুষ্ট ছিল স্পেনীয়দের সহযোগিতায় স্বর্ণের সন্ধান করতে। কিন্তু যখন স্পেনীয় নীতি নির্দয় হয়ে উঠল তারা বাধ্য হল প্রতিরোধ করতে। কিন্তু এটি তাদের জন্য অমঙ্গল জনক ফলাফল সৃষ্টি করল। স্পেনীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ২৫ বৎসরের মধ্যে আরাওয়াক্স এবং তাদের জীবনধারার খুব কম অংশই অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল।

টুপিনামবা নামক জনগণ দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলে এবং বনাঞ্চলের গ্রামগুলোতে বসবাস করত ('ব্রাজিল' নামটির উৎপত্তি হয়েছে ব্রাজিলউড গাছ থেকে)। তারা চাষের জন্য গভীর অরণ্য পরিষ্কার করতে পারে নি, যেহেতু তাদের কাছে লোহার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু তাদের কাছে ছিল সতেজ ও প্রচুর পরিমাণে ফল, শাকসব্জি এবং মাছের যোগান, যার জন্য তাদের কৃষির উপর নির্ভর করতে হত না। যে সব ইউরোপীয়গণ তাদের সাথে সাক্ষাৎ করত তারা তাদের সুখ ও স্বাধীনতায় ঈর্ষান্বিত হত, কারণ, তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কোনো রাজা, সামরিক বাহিনী বা গির্জা ছিল না।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র -ব্যবস্থা

ক্যারিবিয়ান ও ব্রাজিলদের তুলনায় মধ্য-আমেরিকায় কিছু উচ্চ পর্যায়ে সংগঠিত রাষ্ট্র ছিল। সেখানে উৎপাদিত শস্য প্রচুর পরিমাণে উদবৃত্ত হত যা ইনকা, মায়া এবং অ্যাজটেকদের নগরায়ণ সভ্যতার মূল ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এই সকল নগরগুলোর স্মারক-স্থাপত্য নিদর্শনগুলো আজও দর্শকদের মুগ্ধ করে।

অ্যাজটেক (The Aztecs)

একটি বলাকৃতি মার্কার যার মধ্যে খোদিত আছে তারিখ, মায়া সংস্কৃতি, চিয়াপাস, ষষ্ঠ শতাব্দী।

বিংশ শতাব্দীতে অ্যাজটেকরা স্থানান্তরিত হয়েছিল উত্তর থেকে মেক্সিকোর মধ্য উপত্যকায় (যার নামকরণ হয়েছে তাদের দেবতা মেক্সিট্‌লি থেকে)। তারা তাদের সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল বিভিন্ন উপজাতিদের পরাজিত করে, যারা রাজস্ব প্রদান করতে বাধ্য হয়েছিল।

অ্যাজটেকদের সমাজ ছিল পুরোহিততান্ত্রিক। অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল জন্মের দিক থেকে যারা অভিজাত ছিল। পুরোহিত এবং অন্যান্যরাও বিশেষ পদমর্যাদার অধিকারী ছিল। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অভিজাত সম্প্রদায় সংখ্যায় খুব কম ছিল এবং তারা সরকারের সামরিক বাহিনী এবং যাজকতন্ত্রের প্রধান পদের অধিকারী ছিলেন। অভিজাতরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান নেতা হিসাবে বেছে নিত যিনি আজীবন শাসন করতেন। রাজাকে পৃথিবীতে সূর্যের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হত। যোদ্ধা, পুরোহিত এবং পারিষদবর্গরা ছিল সবচেয়ে বেশি সম্মানিত গোষ্ঠী। কিন্তু ব্যবসায়ীরাও অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করত এবং প্রায় তারা সরকারের দূত বা গুপ্তচর হিসাবে কাজ করত। বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন কারিগর, চিকিৎসক এবং জ্ঞানী শিক্ষকরাও সম্মানিত হতেন।

জমির পরিমাণ সীমিত থাকায় অ্যাজটেকরা জমি পুনরুদ্ধারের কাজ হাতে নিয়েছিল। তারা মেক্সিকো হ্রদে চিনামপাশ নামে একটি কৃত্রিম দ্বীপপুঞ্জ তৈরি করে। নল-খাগড়ার মাদুর

তৈরি করে এবং তাকে ঢেকে দেওয়া হত কাদামাটি ও গাছপালা দিয়ে। এই উর্বরতাপূর্ণ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে খাল তৈরি করা হয়, যার উপর ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানী শহর টেনোচ্টিটলান তৈরি করা হয়েছিল। এর প্রাসাদগুলো এবং পিরামিড বা শিখর হ্রদের নাটকীয়ভাবে মধ্য থেকে উঠেছিল । কারণ অ্যাজটেকদের প্রায়ই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হত। তাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মন্দিরগুলো যুদ্ধের দেবতা এবং সূর্য দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত করা হয়েছিল।

পতিত জমিকে উদ্ধার করে উপযুক্ত বাসস্থান বা কৃষিজমিতে পরিবর্তন করা হয়।

তাদের সাম্রাজ্য গ্রামীণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জনগণ চাষ করত ভুট্টা, বীন, স্কোয়াশ, কুমড়া, আলু এবং অন্যান্য শস্যাদি। জমির মালিকানা ব্যক্তি বিশেষের ছিল না— জাতি বা উপজাতি গোষ্ঠীর ছিল, যারা জনসাধারণের নির্মাণমূলক কাজ সংগঠিত করত। ইউরোপীয় সার্ফের মত কৃষকরা অভিজাতদের মালিকানাধীন জমির সাথে সংযুক্ত ছিল এবং উৎপন্ন শস্যের এক অংশের বিনিময়ে জমি চাষ করত। গরীবরা কোনো কোনো সময় তাদের শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দিত। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রধানত ছিল শুধুমাত্র সীমিত সময়ের জন্য এবং ক্রীতদাসরা তাদের স্বাধীনতাকে পুনরায় ফিরে পেতে পারত।

একটি বিষয় অ্যাজটেকেরা নিশ্চিত করেছিল যে, তাদের সমস্ত শিশুরা বিদ্যালয়ে যেত। অভিজাত সম্প্রদায়ের শিশুরা যোগদান করত ক্যালমেকাস নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং প্রশিক্ষিত হত সামরিক ও ধর্মীয় নেতা হবার জন্য। অনান্যরা যেত তাদের কাছাকাছি বিদ্যালয়ে (টেপোচকাল্লি) যেখানে তারা শিক্ষা লাভ করত ইতিহাস, পৌরাণিক কথা, ধর্ম আনুষ্ঠানিক গান। বালকেরা সামরিক বিষয়ে , কৃষিকাজে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষতা অর্জনের জন্য এবং মেয়েরা গৃহস্থালির কাজে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ নিত।

ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে অ্যাজটেক সাম্রাজ্য অত্যাধিক খাটুনিজনিত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। সেসময় বিজিত জনগণের মধ্যে অসন্তোষের ফলে এরূপ ঘটেছিল, যা সুযোগের সন্ধান দিয়েছিল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন হওয়ার জন্য।

মায়া মন্দির – টিকাল, গুয়াতেমালা—অষ্টম শতাব্দী

মায়া সংস্কৃতি (The Mayas)

একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে মেক্সিকোর মায়া সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে অ্যাজটেকদের চেয়ে তাদের কম রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল। ভুট্টা চাষ তাদের সংস্কৃতির মূল কেন্দ্রস্থলে ছিল এবং বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির কেন্দ্রীভূত ছিল বৃক্ষরোপণ, যত্নের সঙ্গে ভুট্টা চাষ এবং উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হত। দক্ষ কৃষি উৎপাদন জন্ম দেয় উদ্বৃত্ত শস্যের যা শাসক শ্রেণি, পুরোহিত এবং প্রধানদের সাহায্য করেছিল অংক, জ্যোতির্বিদ্যা এবং স্থাপত্যের জন্য বিনিয়োগ করতে। মায়ারা আবিষ্কার করেছিল লিখন এর চিত্র গঠন পদ্ধতি যা আংশিকভাবে উদ্ধার করা হয়েছে।

মায়া মন্দির।

পেরুর ইনকা (The incas of Peru)

দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বৃহত্তম দেশীয় সভ্যতার অন্যতম ছিল কিউচুয়াস বা পেরুর ইনকা। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রথম ইনকা মানকো কাপক তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিল কুজকোতে। সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ শুরু হয়েছিল নবম ইনকার অধীনে । এই সাম্রাজ্যের ইকোয়েডর থেকে চিলি পর্যন্ত বিস্তৃতি ছিল ৩,০০০ মাইল।

সাম্রাজ্য ছিল অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত; রাজাই ছিলেন সমস্ত শক্তির উৎস এবং কর্তৃত্বের অধিকারী। নতুন বিজিত উপজাতিগুলোকে কার্যকরীভাবে গ্রহণ করা হতো এবং প্রত্যেক প্রজাকে কিউচুওয়া ভাষায় কথা বলতে হত যা ছিল রাজদরবারের ভাষা। প্রত্যেক উপজাতি স্বাধীনভাবে শাসিত হত বয়োজ্যেষ্ঠদের নিয়ে গঠিত সমিতি দ্বারা। কিন্তু সামগ্রিক চিন্তায় উপজাতিদের আনুগত্য থাকত শাসকের প্রতি। একই সময়ে স্থানীয় শাসকরা সামরিক সহায়তার জন্য পুরস্কৃত হতেন। এইভাবে অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের মতো ইনকা সাম্রাজ্য একটি রাষ্ট্রসংঘের অনুরূপ ইনকাদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। জনগণের সঠিক কোনো সংখ্যা জানা ছিল না। কিন্তু এরূপ মনে হয় যে জনসংখ্যা সে সময় এক মিলিয়নেরও বেশি ছিল।

MAP 2: South America

অ্যাজটেকদের মতো ইনকারাও ছিল দক্ষ নির্মাতা। ইকোয়েডর থেকে চিলি পর্যন্ত পাহাড়ের মধ্য দিয়ে তারা রাস্তা তৈরি করেছিল। তাঁদের দুর্গগুলো পাথরের ফলক দিয়ে তৈরি ছিল এবং এগুলো এত সুন্দরভাবে কাটা হয়েছিল যে এর জন্য কোনো হামানদিস্তার প্রয়োজন ছিল না। নিকটবর্তী পাহাড় থেকে খণ্ড খণ্ড করে পাথর কাটা এবং এগুলোকে সরিয়ে নেবার জন্য তারা শ্রমভিত্তিক প্রযুক্তি-বিদ্যার ব্যবহার করেছিল। রাজমিস্ত্রি অট্টালিকাকে আকৃতি দিয়েছিল খুব আকর্ষণীয় এবং সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে, যাকে বলা হয় স্তরে স্তরে সজ্জিত পদ্ধতি। অনেকগুলো পাথরের ওজন ছিল ১০০ মেট্রিক টনের বেশি। কিন্তু এগুলো নিয়ে যাবার জন্য তাদের কোনো চাকাযুক্ত গাড়ি ছিল না। এ জন্য খুব কঠোরভাবে শ্রমিকদের সংগঠিত করা হয়েছিল।

ইনকা সভ্যতার মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। অনুর্বর জমিতে কাজ করতে গিয়ে তারা পর্বতের ঢালু স্থান উচ্চ সমতলে পরিণত করেছিল এবং জল নিকাশী ও সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। সম্প্রতি এটা প্রকাশিত হয়েছে যে ১৫০০ শতাব্দীতে অ্যান্ডিয়ান উচ্চভূমির কৃষিকাজ আজকের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ছিল। ইনকারা ভুট্টা ও আলু উৎপাদন করত এবং খাদ্য ও শ্রমের জন্য ইলামাস পালন করত।

সে সময় ইনকাদের বস্ত্রবয়ন শিল্প ও মৃৎপাত্র শিল্প ছিল অত্যন্ত উচ্চ মানের। তারা লিখন শিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারেনি। তবে হিসাব রক্ষার একটি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সেটা হল দড়িতে গাঁট দিয়ে রাখা এবং এই গাঁটগুলো ব্যবহৃত হত গণিত সংক্রান্ত একক বোঝার জন্য। কোনো কোনো পন্ডিতরা সুপারিশ করেছেন

বহু পর্যটক ইন্‌কার অবিস্মরণীয় শিল্পকলার দক্ষতা দেখে বিস্মিত হন। যদিও চিলির বিখ্যাত কবি নেরুদার মতে এ ধরনের কঠিন ও বিপরীত পরিবেশে কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য, উল্লেখ্যনীয় শিল্প স্থাপত্য এবং সূক্ষ্ম হস্তশিল্পের এই অভাবনীয় উন্নতির জন্য হাজার হাজার শ্রমিকদের কঠোর শ্রমদানে বাধ্য করা হয়।

পাহাড়ের চূড়ায় গড়ে উঠেছে মাচু পিচ্চু শহর। শহরটি স্পেনীয়দের নজরে আসেনি বলে ধ্বংস হয়ে যায়নি।

পৃথিবীর গভীর থেকে আমাকে কর নিরীক্ষণ
জমিকর্ষণকারী, তাঁতী ও স্বল্পভাষী মেষ পালকগণ
......
ঝুঁকিপূর্ণ উঁচু মাচান থেকে রাজমিস্ত্রি যত
এণ্ডিনের বরফাচ্ছাদিত মানুষের অশ্রুঝরে অবিরত।
ক্ষতবিক্ষত আঙ্গুল দিয়ে জহুরি যারা
ছড়ানো ফসলের জন্য চিন্তাক্লিস্ট কৃষকেরা,
মাটিতে মিশে যায় কুমোরের শ্রম
অতীতের সকল দুঃখ চাপা দিয়ে এখন
নিয়ে এসো এক পেয়ালা নতুন জীবন।।
দেখাও তোমার রক্ত তোমার ক্ষত বিক্ষত মুখ
নির্ভয়ে বলো, তারা এখানে তোমাকে মেরেছে নিষ্ঠুর চাবুক
অপরাধ ছিল, পালিশ করা হিরা হয়নি ততটা পালিশ
দিতে পারনি সময়ে ফসল আর পর্যাপ্ত পাথর,-ছিল শুধু এই নালিশ।।
— পাবলো নেরুদা (১৯০৪-৭৩) (দি-হাইট্‌স অফ মাচু পিচ্চু-১৯৪৩ অংশ বিশেষের বঙ্গানুবাদ)

যে, এই সুতাগুলোর মধ্যে ইনকা বোনার বিধান সাজিয়ে রাখা হয়েছে।
ইন্‌কা সাম্রাজ্যের সংগঠন ছিল পিরামিডের মতো। সাম্রাজ্যের কাঠামো বলতে বোঝায়, যদি ইনকা আক্রান্ত হয় তবে প্রধানের আদেশ বা নির্দেশের শৃঙ্খলও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ত। এটা সুস্পষ্ট হয় যখন স্পেনীয়রা তাদের দেশ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

অ্যাজটেক এবং ইন্‌কাদের সংস্কৃতির সাধারণভাবে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং ইউরোপীয়দের সংস্কৃতি থেকে তা অত্যন্ত পৃথক ছিল। সমাজ ছিল পুরোহিততান্ত্রিক কিন্তু সেখানে ইউরোপের মতো কিছু লোকের সম্পদের বেসরকারি মালিকানা স্বত্ব ছিল না। যদিও পুরোহিত ও শমনদের মর্যাদাপূর্ণ স্থান ছিল এবং বড় বড় মন্দির নির্মিত হয়েছিল, যেখানে প্রথা মতে স্বর্ণ ব্যবহার হয়েছিল স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের পৃথক কোনো মূল্য ছিল না। সমসাময়িক ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে এটি ছিল একটি বড় পার্থক্য।

ইউরোপীয়দের দ্বারা সমুদ্রযাত্রাপথের অনুসন্ধান
(Voyages of Exploration by Europeans)

দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের জনগণ ইউরোপীয় জনগণের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে যখন তারা আটলান্টিক সাগর অতিক্রমের জন্য সমুদ্রযাত্রা শুরু করেছিল। ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র যা প্রধান বিন্দু বা লক্ষ্য স্থান সনাক্ত করতে সাহায্য করে, তার সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু একমাত্র পঞ্চদশ শতকে লোকেরা এর ব্যবহার শুরু করে, যখন তারা অজানা স্থানে সমুদ্র যাত্রার মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের জলপথে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি ঘটে। শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য বড় বড় জাহাজ নির্মিত হয়েছিল, যেগুলো বেশি পরিমাণে মাল এবং অস্ত্রশস্ত্র বহন করতে পারত। ভ্রমণ সংক্রান্ত সাহিত্য প্রচার এবং বিশ্বগঠনতত্ত্ব ও ভূগোল সংক্রান্ত গ্রন্থাদি পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই সুদূর প্রসারী উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল।

কার্যাবলি-২
দক্ষিণ আমেরিকার প্রাকৃতিক মানচিত্রটি বিশদভাবে পরীক্ষা করো। ইন্‌কা সাম্রাজ্য উন্নতির জন্য ভৌগোলিক প্রভাব কতটা প্রভাবিত করেছে বলে তুমি মনে করো?

ভূবিবরণ বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মানচিত্র বুঝতে সাহায্য করে। এটি আকাশ এবং পৃথিবী উভয় সম্পর্কে বর্ণনা দেয়। কিন্তু ভূগোল এবং জ্যোতির্বিদ্যা থেকে এটি স্বতন্ত্র ছিল।

১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দে টলেমির এর লেখা 'জিওগ্রাফি' বইটি (১৩০০ বছর পূর্বে লেখা হয়েছিল) ছাপা সহজলভ্য হয় এবং বিস্তৃতভাবে এর পাঠ শুরু হয়। মিশরীয় টলেমির মতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলগুলোর অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের উপর ভিত্তি করে। এই পুস্তকগুলো পাঠ করে ইউরোপীয় জনগণ বিশ্ব সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ করে এবং তারা বুঝতে পারে যে বিশ্বে তিনটি মহাদেশ আছে। এগুলোর নাম হল ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা। টলেমি বলেছিলেন যে পৃথিবী গোলাকার, কিন্তু তিনি সমুদ্রের প্রস্থকে কমিয়ে আনলেন। ভূমিতে পৌঁছানোর আগে তারা আটলান্টিক অতিক্রমের জন্য কতদূর ভ্রমণ করবে, সে সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের কোনো ধারণা ছিল না। তখন থেকে তারা কল্পনা করেছিল যে, এটি একটি সংক্ষিপ্ত সমুদ্রযাত্রা, সেখানে অনেকেই পরিচিত সমুদ্রের বাইরে অচেনা অভিযানে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

আইবেরিয়ান উপদ্বীপ থেকে যে সব জনগণ এসেছিলেন তাদের মধ্যে পর্তুগিজ এবং স্পেনীয়রা ছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর সমুদ্রযাত্রা আবিষ্কারের অগ্রদূত। দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহাসিকরা এই সমুদ্রযাত্রাকে প্রারম্ভিক আবিষ্কারের যাত্রা বলে অভিহিত করতেন। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ যুক্তি দেখিয়েছেন যে এইগুলো প্রথম সমুদ্রযাত্রা ছিল না। এর আগেও প্রাচীন বিশ্বের জনগণ পাড়ি দিয়েছিল অজানা দেশের উদ্দেশ্যে, যেমন আগেও আরব, চৈনিক, ভারতীয় এবং প্রশান্ত দ্বীপ সমূহের নাবিকরা নিজেদের সমুদ্র জলযান করে বড় বড় মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল। নরওয়ের জলদস্যুরা একাদশ শতকে এভাবে উত্তর আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছিল।

কেন স্পেনীয় ও পর্তুগিজ শাসকরা সমুদ্র যাত্রার জন্য অর্থ ব্যয় করেছিলেন? কী ভাবাবেগ তাদের মধ্যে স্বর্ণ, সম্পদ, গৌরব ও উপাধি লাভের প্রেরণা দিয়েছিল? অর্থনীতি, ধর্ম এবং রাজনীতি—এই তিনটি উদ্দেশ্য সমন্বয়ের মধ্যে উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

ইউরোপীয় অর্থনীতি চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে ভেঙে পড়েছিল। (বিষয় ৬-এ দেখ)। প্লেগ রোগ এবং যুদ্ধের ফলে ইউরোপের বহু স্থানে জনসংখ্যা হ্রাস পায় এবং ব্যবসা শিথিল হয়ে পড়ে। ইউরোপীয় মুদ্রা তৈরির জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের ঘাটতি ঘটে। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় এই পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত পৃথক (একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত) যখন ইতালীয় নগর-রাষ্ট্রে গড়ে ওঠা স্ফীত ব্যবসায় প্রচুর পরিমাণ মূলধন সঞ্চিত হয়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে দূরবর্তী বাণিজ্যের অবসান হল এবং ১৪৫৩ খ্রি. তুর্কীদের কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর বাণিজ্য আরও কঠিন হল। ইতালীয়গণ তুরস্কের সঙ্গে ব্যবসা করার একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। কিন্তু এখন তাদের বাণিজ্যের জন্য উচ্চহারে কর দিতে হত। যাতে বেশি পরিমাণ লোক খ্রিস্টধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, এজন্য ভক্তপ্রাণ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইউরোপীয়গণ দুঃসাহসিক কাজে অগ্রসর হয়েছিল। যেমন ক্রুসেড তুরস্কের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ হিসাবে শুরু হয়েছিল (অধ্যায় চার দেখো)। কিন্তু তারা এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য বৃদ্ধি করেছিল এবং এশিয়ার উৎপাদিত সামগ্রী বিশেষ করে মশলার প্রতি তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছিল। যদি ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাণিজ্য অনুসৃত হত তাহলে গরম আবহাওয়া যুক্ত অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে তারা আরও বেশি সুবিধা পেত।

তারা স্বর্ণ ও মশলা পাওয়া যাবে এমন নতুন অঞ্চলের কথা চিন্তা করল। পশ্চিম আফ্রিকা সেরকম একটি সম্ভাবনাময় অঞ্চল ছিল যেখানে ইউরোপীয়গন এতদিন পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে বানিজ্য করেনি। ক্ষুদ্র দেশ পর্তুগাল ১১৩৯ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং মাছধরা ও সমুদ্র যাত্রার

দক্ষতা বৃদ্ধি করে এর নেতৃত্ব নিয়েছিল। পর্তুগালের রাজকুমার হেনরি (নাবিক হেনরি নামে পরিচিত) পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল সংগঠন করে ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে কিউটা আক্রমণ করেছিলেন। এরপর আরো অধিক অভিযান সংগঠিত হয়েছিল এবং পর্তুগিজরা একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করেছিল আফ্রিকার বোজাডোরের অন্তরীপে। আফ্রিকার জনগণ বন্দি হয়ে দাসে পরিণত হয়েছিল এবং মূল্যবান ধাতু স্বর্ণগুড়া উৎপন্ন করেছিল। স্পেনে অর্থনৈতিক কারণে ব্যক্তি বিশেষে উৎসাহিত হয়েছিল সমুদ্রের যোদ্ধা (নাইট) হতে। ধর্মযুদ্ধের স্মৃতি ও রেকনকুইস্টার সফলতা আইবেরিয় উপত্যকার সামরিক বিজয় বা চুক্তি-সাক্ষরের প্রেরণা দিয়েছিল এবং এই চুক্তির অধীনে স্পেনীয় শাসক নতুন বিজিত রাজ্যগুলোর উপর সার্বভৌমত্বের অধিকার দাবি করেছিল। অভিযানের নেতাদের উপাধিদানের মাধ্যমে এবং বিজয়ী স্থানের উপর শাসনের অধিকার দানের মাধ্যমেপুরস্কৃত করা হয়।

রেকনকুস্টা আরব থেকে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টান রাজাদের দ্বারা আইবেরিয়ান উপদ্বীপে সামরিক অভিযান করে পুনর্দখল করেছিলেন।

আটলান্টিক উত্তরণ (The Atlantic Crossing)

ক্রিস্টোফার কলম্বাস একজন সুশিক্ষিত মানুষ ছিলেন যিনি সাহসিক অভিযান এবং গৌরব চেয়েছিলেন। ভবিষ্যদ্বানির উপর আস্থা রেখে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর ভাগ্য নিহিত আছে পশ্চিমে সমুদ্র যাত্রার মাধ্যমে পূর্বদিকে একটি রাস্তা আবিষ্কার করার উপর। তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন,১৪১০ খ্রিস্টাব্দে কার্ডিনাল পিয়েরি ডিলাই এর লেখা 'ইমাগো মান্ডি' (জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলের উপর লেখা বই) বইটি পাঠ করে। তিনি তাঁর পরিকল্পনা পর্তুগিজ রাজার নিকট উপস্থাপিত করেছিলেন, কিন্তু রাজা সেটি মঞ্জুর করেননি। তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, কারণ স্পেনীস কর্তৃপক্ষ তাকে ছোটো একটি অভিযানের অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই তিনি ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩রা আগস্ট পালোস বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

সে যাই হোক, কলম্বাস এবং তাঁর নাবিকদল দীর্ঘ আটলান্টিক অতিক্রমের জন্য জাহাজে যাত্রা করেছিলেন। নৌবহর ছিল ছোটো কিন্তু দ্রুতগামী। দ্রুতগামী ছোটো নাও এর নাম ছিল সান্টা মারিয়া এবং দুটি দ্রুতগামী হাল্কা জাহাজ যাদের নাম ছিল পিন্টা ও নীনা। কলম্বাস নিজেই তার ৪০ জন যোগ্য নাবিক সহ সান্টা মারিয়া চালাতেন আয়ন বায়ুর মাধ্যমে। দীর্ঘ ৩৩ দিন এই দ্রুতগামী জাহাজগুলি সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। শুধুমাত্র সমুদ্র ও আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। এই সময়ে তাঁর নাবিক দল অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে আসার দাবি জানিয়েছিল।

নাওর অর্থ হল স্পেনীসের ভারী জাহাজ। ইহা উদ্ভূত হয়েছে আরব থেকে এবং ১৪৯২ সাল পর্যন্ত আরব অঞ্চলের দখলের ঘটনার দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১২ ই অক্টোবর, ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে তারা স্থলভূমি দেখতে পেল। তারা এমন স্থানে পৌছাল যা কলম্বাসের দৃষ্টিতে ছিল ভারত। কিন্তু এটি ছিল বাহামাস এর গুয়ানাহানি দ্বীপপুঞ্জ। (এই নামটি কলম্বাস নিজে দিয়েছিলেন। তিনি দ্বীপপুঞ্জগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন, চতুর্দিকে ভাসা ভাসা যা অগভীর সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত স্পেনের বাজামার মত) আরাওয়াক্সরা তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং তাঁরা খুব সন্তুস্ট ছিল যে খাদ্য সম্ভার ও অন্যান্য চুক্তিতে তাদের সাথে অংশ নেবে। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই উদারতা কলম্বাসের উপর এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কলম্বাস তাঁর লগ-বই এ তাদের দানশীলতার প্রশংসা করে লিখেছেন—তারা সব ব্যাপারে এত উদার এবং স্বাধীন ছিল যে কেউ না দেখলে এটা বিশ্বাস করতে পারবে না। তারা সব কিছুই ভোগদখল করত এবং যদি তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হত তখন তারা কখনো না বলত না। অপরদিকে, তারা তাদের সাথে অংশীদারিত্বের জন্য আমন্ত্রণ করত এবং ভালোবাসাও দেখাত যদি তাদের সাথে হৃদয় মিলে যায়।

কলম্বাস গুয়ানাহানিতে একটি স্পেনীয় পতাকা রোপণ করেছিলেন (যার পুনরায় নাম হয়েছিল

ইউরোপবাসীদের স্থানীয় আমেরিকাবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ—ইউরোপীয়ান কাঠে খোদিত খণ্ড চিত্র। ষোড়শ শতাব্দী

সান সালভাডোর) এবং একটি প্রার্থনা সভারও আয়োজন করেছিলেন। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলোচনা না করে নিজেকে ভাইসরয় বলে ঘোষণা করেন। তিনি তাদের সহযোগিতায় কিউবানাসকানের বৃহত্তর দ্বীপপুঞ্জ (কিউবা, যা তার মতে জাপান) এবং কিসকিয়া (যার পুনঃ নামকরণ হয়েছে হিসপানিওলা, বর্তমানে দুটি দেশে বিভক্ত হাইতি এবং ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র) প্রভৃতি স্থানে যেতে সক্ষম হন, তবে সেখানে যথেষ্ট স্বর্ণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু আবিষ্কারকেরা শুনতে পেয়েছিল যে হিসপানিওলার পর্বতের অভ্যন্তরে পার্বত্য নদীতে স্বর্ণ পাওয়া যায়।

কিন্তু তারা বেশ কিছু দূরে গেলে এই অভিযান একটি দুর্ঘটনার সন্মুখীন হয় এবং তারা হিংস্র কারিব উপজাতির বিরোধিতার বা শত্রুতার সম্মুখীন হয়। নাবিকরা গোলমাল বা চিৎকার করতে লাগল ফিরে আসার জন্য। তাদের সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে আসা অত্যন্ত কঠিন ছিল যেহেতু জাহাজগুলো কীটের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং নাবিকদল অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। পুরো সমুদ্রযাত্রার সময় লেগেছিল ৩২ সপ্তাহ। আরো তিনটি সমুদ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল যার মাধ্যমে কলম্বাস তার অনুসন্ধান বা আবিষ্কারের কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন বাহামাস এবং বৃহত্তর এন্টিলিস, দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ড এবং এর উপকুল অঞ্চলে। পরবর্তী সমুদ্র যাত্রাগুলো প্রকাশ করে যে এটি 'ইন্ডিস' ছিল না যা স্পেনীয়রা দেখেছিল কিন্তু এটি ছিল একটি নতুন মহাদেশ।

রাজার পরিবর্তে ভাইসরয় শব্দটি ব্যবহার করা হয়। (এই ক্ষেত্রে স্পেনের রাজাকে বোঝানো হয়েছে)

কলম্বাসের কৃতিত্ব ছিল অসীম সাগরের সীমানা আবিষ্কার করা এবং এটা প্রদর্শন করা যে পাঁচ সপ্তাহের জল যাত্রায় প্রাকৃতিক হাওয়ায় একজনকে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে নিয়ে যাওয়া যায়। স্থানগুলোর নাম প্রায়ই দেওয়া হত ব্যক্তি বিশেষের নামে এবং বেশ কৌতুহলের বিষয় যে কলম্বাস শুধুমাত্র আমেরিকার ক্ষুদ্র একটি জেলায় এবং উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ আমেরিকায় (কলম্বিয়ায়) স্মারক হয়ে আছেন, যদিও তিনি এই স্থানগুলোতে পৌঁছতে পারেননি। দুটি মহাদেশের নামকরণ হয়েছিল আমেরিগো ভেসপুচ্চির নামে যিনি ছিলেন ফ্লোরেন্সের ভূগোলবিদ। তিনি বুঝেছিলেন সে দুটো মহাদেশ কতটা বড়ো হতে পারে এবং তাদের বর্ণনা করেছিলেন 'নতুন বিশ্ব' নামে। আমেরিকা নামটি প্রথম ব্যবহার করেছেন একজন জার্মান প্রকাশক ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে।

	ইউরোপীয়দের সমুদ্রযাত্রা
১৪৯২	কলম্বাসের বাহামা দ্বীপপুঞ্জ এবং স্পেনের জন্য কিউবা দাবি।
১৪৯৪	'অনাবিষ্কৃত বিশ্ব' পর্তুগাল ও স্পেনের মধ্যে বিভক্ত।
১৪৯৭	জন কেবট্, একজন ইংরেজ আবিষ্কার করেন উত্তর আমেরিকার উপকূল।
১৪৯৮	ভাসকো ডা গামা কালিকটে পৌঁছান।
১৪৯৯	আমেরিগো ভেসপুচির দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল দর্শন।
১৫০০	পর্তুগালের জন্য ব্রাজিল কেব্রাল দাবি করে।
১৫১৩	বালবোয়ার পানামা ইসত্মাস অতিক্রম, প্রশান্ত মহাসাগর দর্শন।
১৫২১	কোর্টেস অ্যাজটেকদের পরাজিত করে।
১৫২২	ম্যাগেলান এর পৃথিবী প্রদক্ষিণ
১৫৩২	পিজারোর ইন্কা রাজধানী জয়।
১৫৭১	স্পেনীয়দের ফিলিপাইন্স জয়।
১৬০০	ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন।
১৬০২	ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন।

কার্যাবলি-৩

তোমার মতে কী কারণে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলোর মানুষেরা আবিষ্কারের যাত্রা করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন?

আমেরিকায় স্পেনের একটি সাম্রাজ্য স্থাপন

স্পেনীয় সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ নিহিত ছিল গান পাউডার ও ঘোড়ার ব্যবহারের সাথে সামরিক শক্তির প্রদর্শনের উপর। স্থানীয় লোকেরা বাধ্য ছিল- হয় কর দেবে অথবা স্বর্ণ ও রৌপ্য খনিতে কাজ করবে। প্রাথমিক আক্রমণ অনুসৃত হয়েছিল একটি ক্ষুদ্র বন্দোবস্ত স্থাপনে, যেখানে কিছু স্পেনীয়রা ছিল যারা স্থানীয় বসবাস কারীদের শ্রম বা সেবা পর্যবেক্ষণ করত। স্থানীয় সর্দাররা নথিভুক্ত হয়েছিল নতুন দেশ ও অধিক পরিমাণ স্বর্ণ উৎস আবিষ্কারের জন্য। স্বর্ণের জন্য অতিরিক্ত লোভে হিংসা বা ভয়ানক ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল যা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল বিরক্তিকর স্থানীয় প্রতিরোধ। স্পেনীয় মঠবাসী বার্টলোমি (Bartolome) দি লাস কাসাস, যিনি ছিলেন স্পেনীয় বিজয়ীদের কঠোর সমালোচক, লক্ষ করেছিলেন যে, স্পেনীয়রা প্রায়ই তাদের তরবারি পরীক্ষা করে আরাওয়াকাস এর কাঁচা মাংসে।

সামরিক দমন এবং বাধ্যতামূলক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মহামারির আক্রমণ। প্রাচীন বিশ্বের রোগের মধ্যে বিশেষ করে বসন্তরোগ আরাওয়াক্সদের উপর ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবে। ফলে বিশাল সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয়। স্থানীয় জনগণের ধারণা ছিল যে এই রোগের সৃষ্টি হয়েছিল অদৃশ্য বন্দুকের গুলিতে যার দ্বারা স্পেনীয়রা তাদের আক্রমণ করেছিল। আরাওয়াক্সদের বিলোপ এবং তাদের জীবনধারার সমস্ত চিহ্ন স্মরণ করিয়ে দেয় স্পেনীয়দের সাথে তাদের দুঃখজনক সংঘর্ষ।

কলম্বাসের সফল অভিযানের আবিষ্কারগুলি দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা অনুসরণ করেছিল। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই স্পেনীয়রা আবিষ্কার করেছিল পশ্চিম গোলার্ধের একটা বড় অঞ্চল এবং দাবি করেছিল উত্তরে ৪০ ডিগ্রী অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ৪০ ডিগ্রী-কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন না হয়ে।

এর পূর্বে স্পেনীয়রা ওই অঞ্চলের দুটি বড় সাম্রাজ্যের ভূখণ্ড জয় করেছিল। এর পিছনে দুজন ব্যক্তি বিশেষের অবদান ছিল-যথা হারনান কোর্টিস(১৪৮৮-১৫৪৭) এবং ফ্রান্সিসকো পিজারো (১৪৭৮-১৫৪১)। তাদের আবিষ্কারগুলির জন্য আর্থিক সাহায্য করেছিলেন স্পেনের ভূসম্পত্তি সম্পন্ন জেন্ট্রির সভ্যরা, মিউনিসিপাল কাউন্সিলের কর্মচারিরা এবং অভিজাতরা। অভিযানে যোগদানকারীরা তাদের নিজেদের সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল লুটের ভাগের বিনিময়ে, যা বিজয় থেকে প্রত্যাশিত ছিল।

কোর্টেস এবং অ্যাজটেক্স

কোর্টেস এবং তার সৈন্যরা (যাদের কন্‌কুইস্টাডোর বলা হত) দ্রুতগতিতে ও নিষ্ঠুরভাবে মেক্সিকো জয় করেছিলেন। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে কোর্টেস জয় যাত্রা শুরু করেন কিউবা থেকে মেক্সিকোতে, যেখানে তিনি বন্ধুত্ব করেন টোটোনেক্স নামক এক দলের সঙ্গে যারা অ্যাজটেক শাসন থেকে পৃথক হতে চেয়েছিল। অ্যাজটেক রাজা মন্টিজুমা একজন কর্মচারী পাঠিয়েছিলেন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে। তিনি স্পেনীয়দের আক্রমণ প্রবণতায় তাদের গানপাউডার এবং অশ্ববাহিনীর জন্য আতঙ্কিত হয়েছিলেন। মন্টিজুমা নিজেই আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে কোর্টেস ছিলেন একজন নির্বাসিত ভগবানের অবতার যিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য ফিরে এসেছেন।

ডোনা মারিনা

বার্নার্ড ডিয়াজ ডেল কাস্‌টিলো (1495-1584) তাঁর নিজের লেখা 'ট্রু হিস্ট্রি অফ মেক্সিকো'তে লিখেছেন যে টেবাস্কোর লোকেরা কোর্টেসকে ডোনা মেরিনা নামে একজন সাহায্যকারী দিয়েছিল। সে তিনটি ভাষা জানতো এবং কোর্টেসের জন্য দোভাষী হিসাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। 'এটা আমাদের জয়ের প্রধান সূচনা ছিল, আর ডোনা মেরিনার সাহায্য ছাড়া আমরা নতুন স্পেন এবং মেক্সিকোর ভাষা বুঝতে পারছিলাম না।'

ডিয়াজ ভাবত যে সে একজন রাজকুমারী। কিন্তু মেক্সিকোর লোকেরা তাকে বিশ্বাসঘাতিনী বলত। বিশ্বাসঘাতিনীর অর্থ হল যে ব্যক্তি অন্য জনের ভাষা ও পোশাক হুবহু নকল করে।

বার্নার্ড ডিয়াজ লিখেছেন— 'যখন আমি জলের মধ্যে নির্মিত এইসব শহর ও গ্রাম গুলোকে দেখেছিলাম এবং অন্য ঘরগুলোকে শুকনো জমির উপর দেখলাম আর এটাও দেখলাম যে মেক্সিকো নগর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সোজা এবং সমতল রাস্তা বানানো হয়েছে—আমি অবাক হয়ে গেলাম। এইসব নগর আর ঘর যেগুলো জলের মধ্যে দাঁড়ানো ছিল- সব পাথরের ছিল। আর এমন মনে হচ্ছিল যে, আমি 'আমাদিস' গল্পের কোনো অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি। সত্যি, আমার কিছু সৈনিকরা তো জিজ্ঞাসা করে বসল যে আমরা কোনো স্বপ্ন দেখছি না তো!"

স্পেনীয়রা তিয়াকস্‌কালান্‌স এর বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল। এরা ছিল হিংস্র যোদ্ধা এবং একটি অনমনীয় প্রতিরোধের পর তারা পরাজয় স্বীকার করে নেয়। স্পেনীয়রা অগ্রসর হয়েছিল নিষ্ঠুরভাবে তাদের হত্যা করার জন্য। তখন তারা তেনোচ্‌টিট্‌লানের দিকে অগ্রসর হয় এবং ৮ই নভেম্বর ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে সেখানে পৌঁছায়।

অভিযানকারী স্পেনীয়রা তেনোচ্‌টিট্‌লানের দর্শনে নির্বাক হয়ে গেল। এটি মাদ্রিদ থেকে পাঁচ গুণ বড়ো ছিল এবং এর বসবাসকারীর সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০ যা স্পেনের সবচেয়ে বড়ো শহর সেভিল থেকে দ্বিগুণ।

মন্টেজুমা আন্তরিকতার সাথে কোর্টেসকে গ্রহণ করেছিল। অ্যাজটেকরা স্পেনীয়দের শহরের মূল স্থানে আসতে বাধ্য করেছিল, যেখানে সম্রাট তাদের মুক্ত হস্তে উপহার দান করেছিলেন। তিয়াক্‌সকালান্‌সের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে তার জনগণ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। একজন অ্যাজটেকের বর্ণনা থেকে এই পরিস্থিতির বিষয় জানা যায় : যেমন তেনোচ্‌টিট্‌লান একটি দৈত্যকে আশ্রয় দিয়েছেন। তেনোচ্‌টিট্‌লানের জনসাধারণরা এটা অনুভব করে স্তম্ভিত হয়েছিল যে যদি সবাই মাশরুম খেয়ে ফেলে ... সন্ত্রাস সর্বত্র বিরাজমান; যদি সমস্ত বিশ্ব দৃঢ়ভাবে স্থাপিত না হয় তাহলে জনগণ ভীতিজনক নিদ্রায় নিমজ্জিত হবে।'

অ্যাজটেকদের ভীতি যে ভালোভাবে বিদ্যমান ছিল তা প্রমাণিত হল যখন কোর্টেস বিনা কৈফিয়তে সম্রাটকে গৃহবন্দী করে রাখেন এবং চেষ্টা চালিয়েছিলেন নিজ নামে শাসন করতে। স্পেনের নিকট রাজার আনুগত্য রীতিসিদ্ধ করার জন্য কোর্টেস অ্যাজটেক মন্দিরে খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কিত মূর্তি স্থাপন করলেন। মন্টেজুমা নিজে একটি মীমাংসার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং মন্দিরে অ্যাজটেক ও খ্রিস্টান এই উভয় মূর্তিই স্থাপন করা হল। এই সময়ে কোর্টেস তাঁর ডেপুটিকে দায়িত্ব দিয়ে কিউবাতে ফিরে গেলেন। স্পেনীয়দের উদ্ধত আচরণ এবং স্বর্ণের জন্য অধিকার দাবি একটি বিদ্রোহকে উত্তেজিত করে তুলল।

অলভারাডো হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন হুইজিল্পোচ্‌টলিতে অ্যাজটেকদের বসন্ত উৎসবের সময়। ১৫২০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে জুন যখন কোর্টেস ফিরলেন, তখন তার সামনে বিরাট সমস্যা দেখা দিল। পাথরে বাঁধানো উঁচু রাস্তা বা বাঁধ কেটে দেওয়া হল, সেতুগুলি উঠিয়ে নেওয়া হল। জাল বা ফাঁদ দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হল। স্পেনীয়দের মধ্যে প্রচণ্ড খাদ্য ও পানীয় জলের অভাব দেখা দিল। কোর্টেসকে ফিরে আসতে বাধ্য করা হল। এই সময়ে মন্টেজুমার মৃত্যু হল রহস্যজনক পরিস্থিতিতে। অ্যাজটেকরা স্পেনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে লাগল। ৬০০ দখলদার এবং টেলেক্সকালান মিত্রদের অনেকে নিহত হয়েছিলেন, যার জন্য এটাকে বলা হয় শান্তি নষ্টকারী রাত্রি। কোর্টেস বাধ্য হলেন টেলেক্সকালায় ফিরে আসতে এবং তার রণ- কৌশলের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে নতুন রাজার বিরুদ্ধে যার নাম ছিল কিউয়াটেমোক। ওই সময়ে অ্যাজটেকরা ইউরোপীয়দের নিকট থেকে আসা বসন্ত রোগে মারা যাচ্ছিল। ১৮০ জন সৈন্য ও ৩০টি ঘোড়া নিয়ে কোর্টিস টেনোচটিট্‌লানে আসলেন যেহেতু অ্যাজটেক প্রস্তুতি নিচ্ছিল তাদের সর্বশেষ প্রতিরোধের জন্য। অ্যাজটেকরা চিন্তা করছিল যে কোন অশুভ লক্ষণ তাদের পূর্ব থেকেই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে তাদের পতন বা সমাপ্তি অতি নিকটে এবং এই কারণে রাজা তার জীবন দিতে রাজী হলেন।

মেক্সিকো জয় করতে দুই বছর সময় লেগেছিল। কোর্টিস মেক্সিকোতে নতুন স্পেনের অধিনায়ক-জেনারেল হলেন এবং পঞ্চম চার্লস তাঁকে সন্মানে ভূষিত করেন। মেক্সিকো থেকে স্পেনীয়রা তাদের নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত করল গুয়াতেমালায়, নিকারাগুয়া এবং হন্ডুরাসের উপর।

উপরেঃ ষোড়শ শতাব্দীর তেনোকাইটলান এর একটি ইউরোপীয়ান চিত্র।

নীচেঃ তেনোকাইটলান এর কেন্দ্রে মন্দির নির্মানের গ্র্যান্ড সিড়িঃ এখন এটি মেক্সিকো শহরের ধ্বংস স্তুপ।

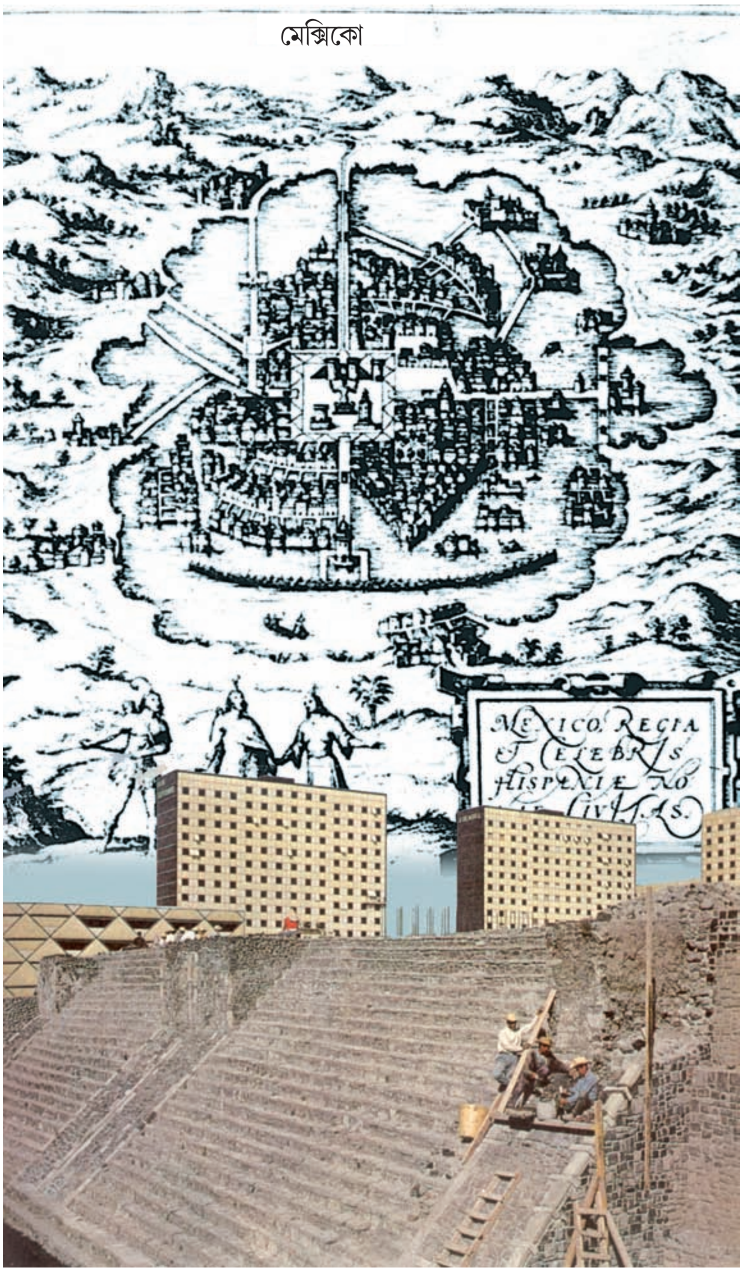

পিজারো এবং ইনকাস (Pizarro and the Incas)

পেরুতে একটি মহিলার স্বর্ণমূর্তি ; এটি একটি কবরে পাওয়া যায় যা স্প্যানিশরা খুঁজে পায়নি এবং তাই এটি গলে যায় নি।

যখন পিজারো সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন, তখন তিনি কোর্টিসের তুলনায় অশিক্ষিত এবং দরিদ্র ছিলেন। ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কেরিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছাবার পথ খুঁজে পেলেন। ইনকা রাজ্য সম্পর্কে তিনি গল্প শুনেছিলেন যে দেশটি ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্যের দেশ এল-ডার-আড়া। তিনি পুনঃপুন চেষ্টা করতেন প্রশান্ত মহাসাগর থেকে এখানে পৌঁছানোর জন্য। ভ্রমণ থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিনি স্পেনীয় রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে ইনকার সুন্দর কারুকার্যময় স্বর্ণের ভান্ত দেখান। এতে রাজার লোভ অতিরিক্ত বেড়ে যায় এবং তিনি পিজারোকে প্রতিশ্রুতি দেন যে যদি পিজারো ইনকা জয় করতে পারে, তবে তাকে ইনকার রাজ্যপালের পদ দেওয়া হবে। পিজারো পরিকল্পনা করলেন কোর্টিসের পদ্ধতি অনুসরণ করতে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে ইনকা সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি একেবারে পৃথক ছিল।

একটি গৃহযুদ্ধের পর ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে আতাহুয়ালপা ইনকা সাম্রাজ্যের সিংহাসন লাভ করলেন। পিজারো ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে একটি ফাঁদ পেতে রাজাকে বন্দী করলেন। রাজা তার মুক্তির জন্য ঘরভরা সোনা মুক্তিপণ দিতে রাজী হলেন। কিন্তু পিজারো তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। তিনি রাজার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন এবং তার অনুগামীরা লুঠতরাজ ও হৈ হল্লা চালিয়েছিল। এর ফলে দেশটি অধিকৃত হল। বিজয়ীদের নিষ্ঠুরতা ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে একটি বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিল যা দুই বছর পর্যন্ত চলছিল এবং এই সময়ের মধ্যেই যুদ্ধ ও মহামারির জন্য সহস্র লোকের মৃত্যু হয়।

এর পরের পাঁচ বছর স্পেনীয়রা বিরাট রৌপ্য খনি খুঁজে বের করল পটসিতে (উচ্চতর পেরু, আধুনিক বলিভিয়া) এবং এগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য তারা ইনকার জনগণকে দাসে পরিণত করল।

কেব্রাল এবং ব্রাজিল (Cabral and Brazil)

পর্তুগিজদের ব্রাজিল অধিকার ঘটেছিল আকস্মিকভাবে। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে জাহাজের একটি বৃহৎ মিছিল ভারতের উদ্দেশ্যে পর্তুগাল থেকে যাত্রা করেছিল যার প্রধান নেতৃত্বে ছিল পেড্রো আলভারেস কেব্রাল। ঝটিকা সংকুল সমুদ্র এড়াবার জন্য তিনি পশ্চিম আফ্রিকার চারদিকে একটি বিস্তৃত যাত্রাপথ তৈরি করলেন। তিনি বিস্ময়াভূত হলেন যে, তিনি বর্তমান কালের ব্রাজিল উপকূলে পৌঁছে গিয়েছেন। এই ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বাংশ ছিল মানচিত্র অনুসারে পোপ কর্তৃক পর্তুগালের। সুতরাং তারা এই অংশ নিশ্চিতভাবে তাদেরই বলে গণ্য করল।

পর্তুগিজরা ব্রাজিলের চেয়ে পশ্চিম ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াবার জন্য অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। যদিও ব্রাজিলে স্বর্ণের ভাণ্ডার ছিল না। কিন্তু সেখানে একটি প্রাকৃতিক সম্পদের অস্তিত্ব ছিল, যা তারা হরন করেছিল—তা ছিল কাঠ। ব্রাজিলউড্ গাছ, যা থেকে ইউরোপীয়রা এই অঞ্চলের নাম দিয়েছিলেন এবং উৎপন্ন করেছিল একটি সুন্দর লাল রং। স্থানীয়রা গাছ কাটতে শুরু করল এবং কাঠের লগগুলো জাহাজের জন্য নিয়ে গেল লোহার ছুরি ও করাতের বিনিময়ে, যাদের তারা গণ্য করত মার্বেল হিসাবে। (এক কাস্তে, ছুরি বা চিরুনির সাথে তারা বহন করে এনেছিল মুরগি, বানর, তোতাপাখি, মদ্য, মোম, তুলো, সুতো এবং যা কিছু এই দরিদ্র মানুষদের ছিল)

এক জন স্থানীয় ব্যক্তি ফরাসী যাজককে প্রশ্ন করেছিল "কেন ফরাসী ও পর্তুগীজরা এত দূর দেশ থেকে কাঠের সন্ধানে এখানে এসেছে? তোমাদের দেশে কী কোন কাঠ নেই?" তাদের আলাপ আলোচনার শেষে সে বলেছিল " আমি তোমাদের বড়ো পাগল মানুষ বলে মনে করি। তোমরা সমুদ্র অতিক্রম করে, অনেক অসুবিধা ভোগ করে কঠোর পরিশ্রম করেছ তোমাদের শিশুদের সম্পদ সংগ্রহের জন্য। তাদের খাওয়াবার জন্য তোমাদের দেশ কি স্বয়ং সম্পূর্ন নয়? আমাদের পিতা মাতা ও শিশু-সন্তানরা আছে, যাদের আমরা ভালবাসি। কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে আমাদের মৃত্যুর পর যে দেশ আমাদের লালন পালন করত সেই দেশই তাদের খাওয়াবে। আমরা এজন্য অতিরিক্ত যত্নের কথা না ভেবে বিশ্রাম করি।"

কাঠের এই ব্যবসা এক হিংস্র বিপ্লবের সৃষ্টি করল পর্তুগিজ এ ফরাসী বণিকদের মধ্যে। পর্তুগিজরা জয়লাভ করল কারণ তারা স্থির করেছিল উপকূল বা কলোনিতে বন্দোবস্ত তথা বসতি স্থাপনের। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের রাজা ব্রাজিলের উপকূলকে ১৮টি উত্তরাধিকারী কাপ্তেনের পদে ভাগ করেন। পর্তুগিজদের মধ্যে যারা সেখানে বসবাস করতে চাইত তাদের জমির মালিকানার অধিকার দেওয়া হত এবং স্থানীয় লোকদের দাসে পরিণত করার অধিকার দেওয়া হত। অনেক পর্তুগিজ বসবাসকারীরা ভারতে গোয়া যুদ্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এবং স্থানীয় লোকদের প্রতি নির্দয় ছিলেন। ১৫৪০ এর দশকে পর্তুগিজরা আখের চাষ আবাদ শুরু করল বড় আকারে, যাতে প্রচুর পরিমাণে আখ উৎপন্ন হয়। চিনি সংগ্রহের জন্য তারা মিল তৈরি করল, যা তখন ইউরোপে বিক্রি করা হত। অত্যন্ত গরম ও আর্দ্র জলবায়ুতে তারা স্থানীয় লোকদের উপর নির্ভর করত চিনির মিলে কাজের জন্য। যখন স্থানীয় লোকেরা এই ধরনের কাজ করতে অস্বীকার করল তখন মিলের মালিকরা তাদের হরণ করে দাস হিসাবে কাজ করাত।

স্থানীয় লোকেরা জঙ্গালে পালিয়ে যেতে লাগল দাস ব্যবসায়ীদের হাত থেকে মুক্তি পেতে। এভাবে সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে উপকূলবর্তী অঞ্চলে খুব কমই গ্রাম ছিল। এর পরিবর্তে সেখানে দেখা গেল বড়ো বড়ো সুপ্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয়দের নগর। আবাদযোগ্য জমির মালিকরা তখনও বাধ্য হল অন্য উপায়ে দাস সংগ্রহ করতে। সেটা হল পশ্চিম আফ্রিকা। এটি স্পেনীয় উপনিবেশের থেকে পৃথক ছিল। ইনকা এবং অ্যাজটেক সাম্রাজ্যের জনসংখ্যার একটা বড় অংশকে খনি এবং মাঠের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেইজন্য স্পেনীয়দের তাদের দাসে পরিণত করার অথবা অন্যত্র দাসের সন্ধান করা প্রয়োজন ছিল না।

১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজ রাজার অধীনে একটি রীতিসিদ্ধ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার রাজধানী ছিল বাহিয়া / সেলভাডোর। এই সময় থেকে জেসুইটরা ব্রাজিলে যেতে আরম্ভ করেছিল। ইউরোপীয় বসবাসকারীরা তাদের পছন্দ করত না, কারণ তারা যুক্তি দেখাত স্থানীয়দের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপের, বনে অভিযান চালাত গ্রামে বাস করার জন্য এবং তাদের খিস্টধর্মের শিক্ষা দিত আনন্দদায়ক ধর্ম হিসাবে। সর্বোপরি জেসুইটরা কঠোরভাবে দাস প্রথার সমালোচনা করত।

কার্যাবলি-৪

দক্ষিণ আমেরিকার মূল অধিবাসীদের উপর ইউরোপীয়দের সম্পর্কের কী প্রভাব পড়েছে? বর্ণনা করো। ইউরোপ থেকে এসে দক্ষিণ আমেরিকায় বসবাস কারী লোক এবং জেসুইট পাদরীদের প্রতি প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করো।

রাজ্যজয়, উপনিবেশ এবং দাস-ব্যবসা

ইউরোপের অনিশ্চিত সমুদ্র যাত্রাগুলোর স্থায়ী পরিণতি হিসাবে ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকায় কী শুরু হয়েছিল? যদিও ইউরোপীয়দের সমুদ্র যাত্রাগুলো অনিশ্চয়তায় ভরপুর ছিল, তথাপি কালক্রমে এই অভিযানগুলো ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশগুলোতে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপীয় সামুদ্রিক পরিকল্পনা সৃষ্টি করেছিল সাগর থেকে সাগরে ধারাবাহিক সমুদ্রপথের জ্ঞান। তার আগে এই পথগুলোর অধিকাংশই ইউরোপীয়দের কাছে অজানা ছিল। কিছু আবার অন্য কারো কাছেই জানা ছিল না। কোনো জাহাজই প্রবেশ করতে পারেনি ক্যারেবিয়ান অথবা আমেরিকায়। দক্ষিণ আটলান্টিক পুরোপুরিভাবে অনাবিষ্কৃত ছিল। কোনো সমুদ্রগামী জাহাজ আটলান্টিকের জলে প্রবেশ করেনি। খুব কম জাহাজই একে অতিক্রম করেছে অথবা এখান থেকে প্রশান্ত অথবা ভারত মহাসাগরে যাত্রা করেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই সকল কার্যাদি সম্পাদিত হয়েছিল।

ইউরোপের জন্য আমেরিকার আবিষ্কারগুলোর ফলাফল প্রাথমিক যাত্রীদের পাশাপাশি

"ঘর বা পরিবারের উপর এর থেকে বড় অভিশাপ আর কিছু নেই যে তার ভরণপোষণ অন্য কারোর রক্তজল করা উপার্জনে হয়।"

"যে ব্যক্তি অন্যের স্বাধীনতা হরণ করে এবং সেই স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ফিরিয়ে দেয় না, সে অবশ্যই মহাপাপের ভাগী হয়।"

— এই বিচার ব্রাজিলে ১৬৪০ এর দশকে থাকা জেসুইট পাদরি এন্টনি বাইরা।

অন্যদের জন্যও বহন করে এনেছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অন্তঃপ্রবাহ বা আগমন শিল্পায়ণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সাহায্য করেছিল। ১৫৬০ এবং ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার খনি থেকে স্পেনে একশত জাহাজ প্রতি বছর রৌপ্য বহন করত। কিন্তু স্পেন ও পর্তুগালের এতে কোনো উপকার হয়নি। তারা তাদের প্রচুর আয় অতিরিক্ত বাণিজ্যে বিনিয়োগ করেনি অথবা বাণিজ্যিক নৌবাহিনী তথা নৌবিভাগ তৈরি করেনি। এর পরিবর্তে আটলান্টিকের সীমান্তবর্তী দেশগুলো বিশেষ করে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং হল্যান্ড এই আবিষ্কারের সুবিধা নিয়েছিল। সে দেশের বণিকরা গঠন করেছিল যৌথ সংঘ এবং বাণিজ্যিক অভিযান পাঠিয়েছিল, উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং নতুন বিশ্বের উৎপাদিত সামগ্রীর সঙ্গে ইউরোপীয়দের পরিচয় করে দিয়েছিল। সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তামাক, আলু, চিনি, কোকো এবং রাবার। ইউরোপ আমেরিকার নতুন শস্যের সঙ্গে পরিচিত হল বিশেষ করে আলু ও লঙ্কার। এগুলো পরে ইউরোপীয়গণ অন্যান্য দেশে নিয়ে যেত, যেমন ভারতে।

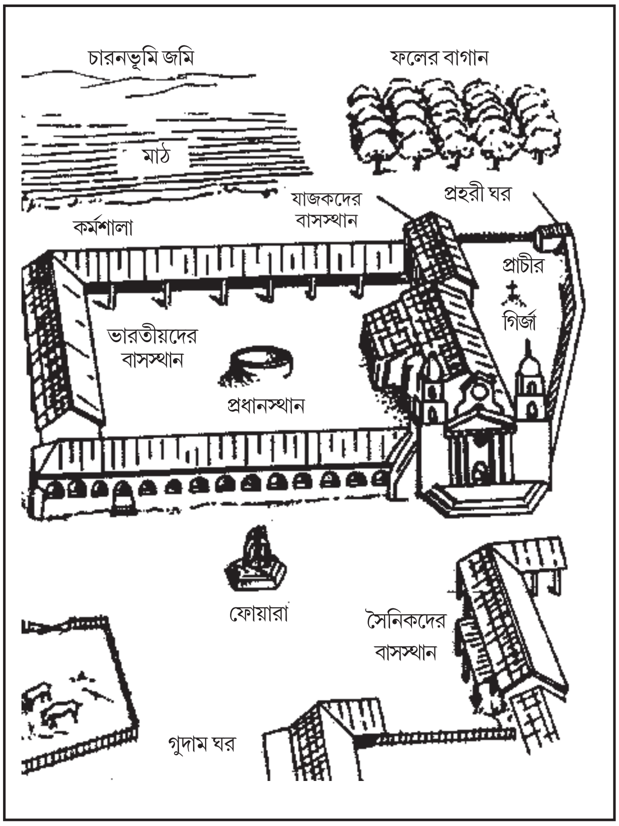

দক্ষিণ আমেরিকায় একটি সাধারণ স্প্যানিশ শহরের স্কেচ

আমেরিকার স্থানীয় লোকদের জন্য এর তাৎক্ষণিক ফলাফল ছিল বাহ্যিকভাবে স্থানীয় জনসংখ্যার ধ্বংস সাধন, তাদের জীবনধারার ধ্বংস এবং কারখানা ও খনিতে নিযুক্তদের দাসত্বের ধ্বংস সাধন।

মোটামুটিভাবে এটা ইঙ্গিত দেয় যে মেক্সিকো বিজয়ের প্রাক্‌কালে জনসংখ্যা ছিল ৩০ থেকে ৩৭.৫ মিলিয়নের মধ্যে। এনডিয়ান অঞ্চলেও অনুরূপ সংখ্যা ছিল। যেখানে মধ্য আমেরিকায় ছিল ১০ থেকে ১৩ মিলিয়নের মধ্যে। ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে স্থানীয়দের সংখ্যা ছিল ৭০ মিলিয়ন। সার্ধশতাব্দী পরে তাদের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৩.৫ মিলিয়ন। যুদ্ধকালীন অবস্থা এবং রোগ বা ব্যাধি ছিল প্রাথমিকভাবে এর জন্য দায়ী।

অকস্মাৎ আমেরিকার অ্যাজটেক এবং ইনকা নামে দুটি প্রধান সভ্যতার ধ্বংস সাধন সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেছিল এই দুটি সভ্যতার সংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পার্থক্যগুলি। অ্যাজটেক এবং ইনকা উভয়ের ক্ষেত্রেই যুদ্ধ বা সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে স্থানীয় জনগনকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল। এই প্রতিযোগিতা মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্যও প্রকাশ করে স্বর্ণ এবং রৌপের জন্য স্পেনীয়দের অতিরিক্ত ধনলিপ্সা স্থানীয়দের নিকট ছিল ধারণা শক্তির অতীত।

উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি এমন হয়, যেখানে উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষমতা ব্যক্তি অথবা নিগমের হাতে থাকে আর সেখানে খোলা বাজারে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

জনসংখ্যার ক্রীতদাসত্ব ছিল একটি সুস্পষ্ট স্মারক বস্তু যা শত্রুপক্ষের নিষ্ঠুরতাকে মনে করিয়ে দেয়। দাসত্ব কোনো নতুন ধারণা ছিল না। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অভিজ্ঞতা এই অর্থে নতুন ছিল যে এর সাথে যুক্ত হয়েছিল আবির্ভূত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপাদন। কাজ করার অবস্থা ছিল ভীতিজনক। কিন্তু স্পেনীয়রা তাদের অর্থনৈতিক লাভের জন্য শোষণকে প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করত।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ প্রকাশ্য ভাবে অস্বাভাবিক বা জবরদস্তি মূলক শ্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। কিন্তু এর ধারাহিকতা বজায় রাখার জন্য একটি গোপন বিধানের ব্যবস্থা

> ১৫৫০ এর দশকে পেরুর রৌপ্য খনির কাজ চালু হওয়ার পর সন্ন্যাসী ডোমিনিগো-ডি-সেন্টো টমাস ইন্ডিজের পরিষদে বলেছিলেন যে পোটোসি নরকের মুখে যা প্রতিবছর হাজার হাজার সংখ্যায় ভারতীয়দের গিলে ফেলতো আর সেখানের লোভী এবং নির্দয় খনির মালিক ওদের সঙ্গে বেওয়ারিশ পশুর মতো ব্যবহার করত।

করলেন। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে এক আইন দ্বারা স্থানীয় লোকদের, খ্রিস্টান এবং যারা খ্রিস্টান নয় তাদেরও পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দান করা হল। ইউরোপীয় উপনিবেশবাসীরা ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং দুবছরের মধ্যে তারা রাজাকে বাধ্য করল এই আইন বাতিল করতে এবং পুনরায় ক্রীতদাসত্ব বজায় রাখতে অনুমতি দেওয়া হল।

১৭০০ খ্রিস্টাব্দে স্বর্ণ আবিষ্কারের পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নতুন ক্রিয়াকর্ম শুরু হল- সেটা হল গবাদি গৃহপালিত পশুর দ্বারা চাষের কাজ, জঙ্গল পরিষ্কার এবং খনির কাজ করা হতে লাগল। এসমস্ত কাজের জন্য সস্তায় শ্রমিকের দাবি উঠতে লাগল। এটা সুস্পষ্ট যে স্থানীয় লোকেরা ক্রীতদাসত্বের প্রতিরোধ করবে। এর বিকল্প ব্যবস্থা ছিল আফ্রিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। ১৫৫০ খ্রি. থেকে ১৮৮০ খ্রি. (যখন দাসত্ব ব্রাজিলে বিলোপ হয়েছিল) ৩৬,০০,০০০ এর উপর আফ্রিকার ক্রীতদাস ব্রাজিলে আমদানি করা হয়েছিল। এটি ছিল প্রায় আফ্রিকার ক্রীতদাসদের মোট সংখ্যার অর্ধেক যাহা আমেরিকায় আমদানি করা হয়েছিল। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই সহস্র ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন।

প্রথম দিকে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের ক্রীতদাস নিষিদ্ধকরণের উপর যে সব বিতর্ক হয়েছিল, এর মধ্যে কিছু ছিল যারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে দাসত্ব প্রথা আফ্রিকাতে বিদ্যমান ছিল ইউরোপীয়দের প্রবেশের আগেই। বাস্তবিক পক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আফ্রিকায় যে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল, সেখানে দাসেরা ছিল শ্রমিক শক্তির একটা বিরাট অংশ। তারা আরও দেখিয়েছিলেন যে, ইউরোপীয় বণিকরা আফ্রিকানদের দ্বারা সাহায্য পেত। যারা সাহায্য করত কম বয়সের ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে দাস হিসাবে বিক্রয় করত, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শস্য আমদানির বিনিময়ে (যেমন-ভুট্টা, বাজরা এবং কাসাভা-প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হত)। উলাউডা ইকুইয়ানো তাঁর আত্মজীবনীতে (১৭৮৯ খ্রিঃ) মুক্ত দাসত্ব সম্পর্কে এই যুক্তিগুলির উত্তর দিয়েছিলেন এই বলে যে, আফ্রিকার ক্রীতদাসকে পরিবারের অংশ বলে গণ্য করা হয়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে এরিক উইলিয়ামস যিনি প্রথম আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে একজন, তিনি তাঁর 'ধনতন্ত্রবাদ ও দাসত্ব'- পুস্তকে আফ্রিকার ক্রীতদাসদের দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতার পুর্ণর্বিবেচনা করার প্রয়াস আরম্ভ করেন।

মানচিত্র ৩- আফ্রিকান অঞ্চল যেখানে ক্রীতদাসদের বন্দী করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

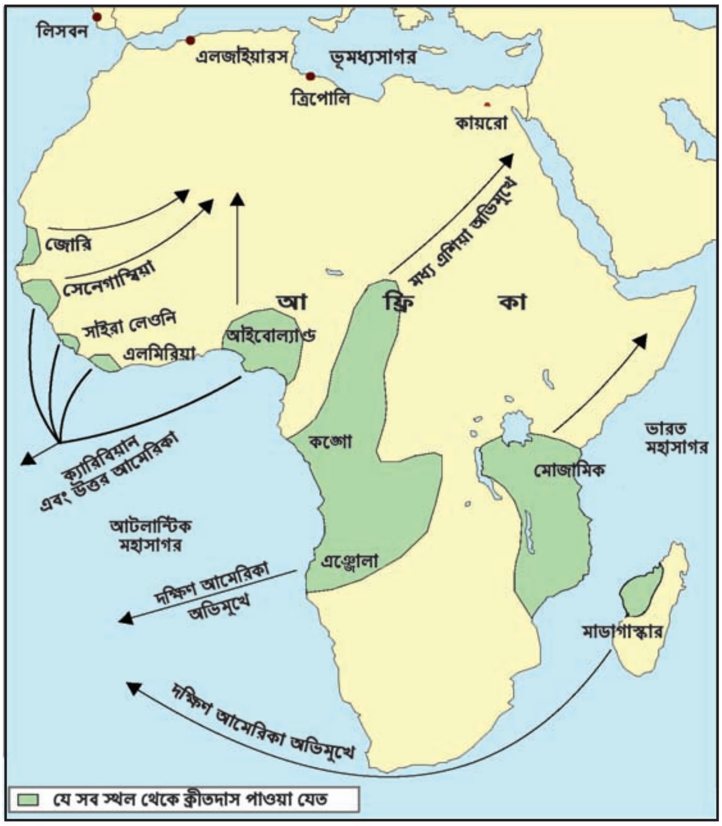

এপিলগ (Epilogue) : উপসংহার

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপীয় উপনিবেশবাসীরা দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে স্পেন ও পর্তুগালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তারা স্বাধীন দেশে পরিণত হয়। ঠিক যেমন ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে।

দক্ষিণ আমেরিকাকে বর্তমানে বলা হয় ল্যাটিন আমেরিকা। এর কারন হল এই মহাদেশের প্রধান দুটি ভাষা স্পেনিস এবং পর্তুগিজ, ল্যাটিন ভাষা পরিবারের অংশ। অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল স্থানীয় ইউরোপীয়ান (বলা হত ক্রেওল)। উৎপত্তির দিকে থেকে এরা ছিলেন ইউরোপীয় এবং আফ্রিকান। তাদের অধিকাংশ ছিলেন ক্যাথলিক। তাদের সংস্কৃতির অনেক স্থানীয় ঐতিহ্যগত উপাদান ইউরোপীয় সংস্কৃতির সাথে মিশে রয়েছে।

অনুশীলনী (Exercises)

সংক্ষেপে উত্তর

১। অ্যাজটেক সভ্যতাকে মেসোপটেমিয় সভ্যতার সাথে তুলনা করো।

২। পঞ্চদশ শতকে কী কী নতুন বিকাশ ঘটে যা ইউরোপীয় নৌচালন-বিদ্যাকে সাহায্য করেছিল ?

৩। কারণ দেখাও, কেন স্পেন ও পর্তুগাল পঞ্চদশ শতকে আটলান্টিক অতিক্রম করতে প্রথম চেস্টা করেছিল ?

৪। কী কী নতুন খাদ্য সামগ্রী দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বিশ্বের অন্যান্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত রচনধর্মী প্রশ্নের উত্তর

৫। ১৭ বছরের আফ্রিকার একটি যুবকের ভ্রমণের বিবরণ দাও যাকে বন্দী করে দাস হিসাবে ব্রাজিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

৬ দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কার কীভাবে ইউরোপীয় উপনিবেশকবাদ বিকাশে প্রেরণা দিয়েছিল ?

IV

আধুনিকতার অভিমুখে

শিল্প বিপ্লব

দেশীয় অধিবাসীদের বিতাড়ন

আধুনিকতার পথে

আধুনিকতার অভিমুখে

TOWARDS MODERNISATION

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে তোমরা মধ্যযুগের এবং প্রাক-আধুনিক বিশ্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়ে অধ্যয়ন করেছ - সামতন্ত্রবাদ, ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ এবং ইউরোপ তথা আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক অথবা লড়াই। তোমরা উপলব্ধি করতে পেরেছ যে আধুনিক বিশ্বকে তৈরি করার জন্য যে সমস্ত ঘটনা অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল, তা প্রধানত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল। বিশ্ব ইতিহাসের দুটি অন্য পরিবর্তন এধরনের জমি তৈরি করেছিল যাকে আধুনিকীকরণ বলা যায়। সেগুলো হল শিল্প বিপ্লব এবং ক্রমাগত রাজনৈতিক বিপ্লবের লড়াই যেখানে নাগরিকদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল। এই আমেরিকার বিপ্লব (১৭৭৬—৮১) এবং ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯—৯৪) থেকে এই পরিবর্তনগুলোর সূচনা হয়েছিল।

ব্রিটেনকে বিশ্বের সর্বপ্রথম শিল্পোন্নত দেশের মান্যতা দেওয়া হয়। এই বইটির বিষয়ে নবম অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানুষ এটাই বিশ্বাস করত যে ব্রিটেনের শিল্পায়ন অন্যান্য দেশের শিল্পায়নের জন্য একটি আর্দশ নমুনা ছিল। নবম অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়বস্তু পড়ে তোমরা জানতে পারবে কীভাবে ঐতিহাসিকরা শিল্পায়ন সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন করতে শুরু করেন। প্রত্যেক দেশ অন্যান্য দেশগুলো থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্পায়নের নীতি অন্য কোনো দেশ থেকে অনুকরণ করেনি। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটেনে কয়লা এবং সুতি কাপড়ের শিল্পের বিকাশ হচ্ছে শিল্পায়নের প্রথম পর্যায়। আর রেলপথের আবিষ্কারের ফলে শিল্পায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু হয়। কিন্তু রাশিয়াতে শিল্পায়নের উদ্যেগ অনেক পরে শুরু হয়েছিল (উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে)। সেখানে প্রথম থেকেই রেলপথ এবং অন্যান্য ভারী শিল্পের বিকাশ হয়। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রাজ্য এবং ব্যাংকের ভূমিকা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। নবম অধ্যায়ে যেভাবে ব্রিটেনের শিল্পায়নের চর্চা করা হয়েছে তাতে অন্য শিল্পোন্নত দেশ যেমন আমেরিকা এবং জার্মানীর শক্তিশালী শিল্পোন্নত দেশ সম্পর্কে তোমাদের কৌতূহল সৃষ্টি হবে। নবম অধ্যায়ে এই বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে ব্রিটেনে শিল্পায়নের ফলে মানবীয় এবং উপাদানগত মূল্য কীভাবে দিতে হয়েছে— দরিদ্র শ্রমিকদের দুরবস্থা, বিশেষ করে শিশুদের অবস্থা, পরিবেশের অবনতির ফলে কলেরা এবং ত্বকের রোগ মহামারির আকার ধারণ করে। একইভাবে একাদশ অধ্যায়ে তোমরা জাপানের ক্যাডমিয়াম এবং পারদের বিষ ছড়ানোর ফলে যে পরিবেশ দূষণ হয়েছিল সে বিষয়ে অধ্যয়ন করবে, যার ফলে সেখানকার মানুষ নির্বিচারে শিল্পায়ণ করার বিরুদ্ধে গণ -আন্দোলন সংঘঠিত করেছিলেন।

সমগ্র বিশ্বকে যুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯২৭ সালে পঁচিশ বছর বয়সি চার্লস লিন্ডবার্গ এক ইঞ্জিনের একটি এরোপ্লেন দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস যাত্রা করে।

ইউরোপীয় শক্তি শিল্প-বিপ্লবের অনেক আগে থেকেই আমেরিকা, এশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় তাদের উপনিবেশ স্থাপন শুরু করে দিয়েছিল। দশম অধ্যায়ের বিষয়বস্ত থেকে তোমরা

জানতে পারবে যে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার মূল অধিবাসীদের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করত। ঔপনিবেশিকদের বুর্জোয়া মানসিকতা তাদের জমি এবং জল সহ সব কিছু কিনতে এবং বিক্রি করতে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু মূল অধিবাসী, যাদের ইউরোপীয় এবং আমেরিকানরা অসভ্য জাতি বলত, জিজ্ঞাসা করল 'যদি তোমরা বাতাসের বিশুদ্ধতা এবং জলের স্ফুলিঙ্গায়নের মালিক নও, তাহলে এটাকে কেউ কীভাবে কিনতে পারবে?' মূল অধিবাসীরা জমি, মাছ এবং প্রাণীদের উপর আধিপত্য জাহির করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। তাদের এই জিনিসগুলো বিক্রি করার এবং কেনার কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল না। যদি কোনো বস্তুর আদান-প্রদানের প্রয়োজন হত, তখন সহজেই তা উপহার হিসেবে দেওয়া যেত। স্পষ্টতই মূল নিবাসী এবং ইউরোপীয়রা সভ্যতার প্রতিযোগিতামূলক ধারনার প্রতিনিধিত্ব করছিল। যদিও বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকার ও কানাডার সরকারের অভিলাষ ছিল যে মূল অধিবাসীরা 'মূল ধারায়' যুক্ত হোক। মূল অধিবাসীরা কিন্তু ইউরোপীয় প্লাবনের জোয়ারে নিজেদের সংস্কৃতিকে ভেসে যেতে দেয়নি। একই সময়ে অস্ট্রেলিয়ার শাসকগোষ্ঠী তাদের পরম্পরা এবং সংস্কৃতিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, মূল 'ধারা'র মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে? আর্থিক এবং রাজনৈতিক শক্তি কীভাবে 'মূলধারার সংস্কৃতি' নির্মাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

সমগ্র বিশ্বকে সংযুক্ত করা। জে লিপিচস ফিগার নামে একটি মূর্তি যা তিনি ১৯২০ এর দশকে তৈরি করেছিলেন। তাতে মধ্য আফ্রিকার মূর্তিকলার প্রভাব পড়েছে।

পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রবাদ— বাণিজ্যিক, শিল্প, আর্থিক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাপানি পুঁজিবাদ তৃতীয় বিশ্বের অনেক জায়গায় তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। তাদের মধ্যে অনেকে আবার স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করে। অপরদিকে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন হচ্ছে সরাসরি সাম্রাজ্য স্থাপন করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চিনা সাম্রাজ্যবাদ হল তৃতীয় ধরনের সাম্রাজ্যবাদের উদাহরণ। এখানে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, আমেরিকা এবং জাপান সরাসরি রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ না করে চিনের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করত। তারা নিজেদের সুবিধার জন্য দেশের সম্পদকে যথেচ্ছভাবে শোষণ করে। এভাবে চিনা সার্বভৌমত্বের সাথে আপোস করার ফলে চিন একটি আধা -উপনিবেশ অবস্থায় পরিণত হয়।

সমগ্র বিশ্বকে সংযুক্ত করা, জাপানের জেন চিত্রকলা। পাশ্চাত্যের শিল্পীরা এরকম প্রশংসা করতেন। ১৯২০ র দশকে আমেরিকাতে 'বিমূর্ত অভিব্যক্তি' রীতি র চিত্রকলাতে জেন চিত্রকলার প্রভাব পড়েছিল

অধিকাংশ দেশেই, শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীরা ঔপনিবেশিক শোষণে আপত্তি জানায়। কিন্তু কিছু কিছু দেশ, যেমন জাপানে, ঔপনিবেশিক শোষণ ছাড়াই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠে। সব ধরনের জাতীয়তাবাদই জনপ্রিয় সার্বভৌম তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। যে কোনো রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এটা বিশ্বাস করত যে রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণকে নির্ভর করে গড়ে ওঠা উচিত এবং এই কারণেই জাতীয়তাবাদের আধুনিক ধাবণার সৃষ্টি হয়। নাগরিক রাষ্ট্রবাদ ভাষা, ধর্ম, জাতি, লিঙ্গাকে গুরুত্ব না দিয়ে সবার জন্য একই শাসনব্যবস্থা ন্যস্ত করে। এটি সবসময় অধিকার-সচেতন নাগরিক সম্প্রদায় তৈরি করার চেষ্টা করে এবং জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং নাগরিকত্বের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদকে সংজ্ঞায়িত করে। জাতিগত এবং ধর্মীয় রাষ্ট্রবাদ রাষ্ট্রীয় একতার জন্য কোনো ভাষা , ধর্ম বা কোন ঐতিহ্য কে কেন্দ্র করে জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। সেখানে কেবলমাত্র জাতিগতভাবে মানুষকে সংজ্ঞায়িত করা হয় কিন্তু সাধারণ নাগরিকত্বের শর্তাবলীতে সংজ্ঞায়িত করা হয় না। যে সমস্ত দেশে নানা ধরনের জাতির মানুষ বসবাস করে, সেখানে জাতিগত জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে সার্বভৌম ক্ষমতা কেবলমাত্র কিছু নির্বাচিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, যাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়। বর্তমান যুগে অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশ সাধারণ জাতিগত সত্তার উপর নির্ভর না করে নাগরিকত্বের শর্তাবলিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদকে সংজ্ঞায়িত করে। তবে জার্মানি এর একটি ব্যতিক্রম, কারণ সেখানে জাতিগত জাতীয়তাবাদের একটি সুদীর্ঘ এবং কষ্টকর ইতিহাস পরিলক্ষিত

হয়। জার্মানির এই জাতিগত জাতীয়তাবাদ মূলত ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে সেই দেশের ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিবাদের রূপ ছিল। নাগরিক জাতীয়তাবাদের মতাদর্শ সারা বিশ্বে জাতীয় এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল এবং এই ধরনের ঘটনাবলি আধুনিক ভারত, চিন ও জাপানেও পরিলক্ষিত হয়।

শিল্পায়নের মতো আধুনিকীকরণেরও বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। বিভিন্ন সমাজ আধুনিকীকরণে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। জাপানি ও চিনা ঘটনাবলি থেকে এই বিষয়ে অনেক কিছু বোঝা যায়। জাপান ঔপনিবেশিকতা নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে স্বাধীন থাকতে সর্মথ হয় এবং বিংশ শতাব্দীতে সেখানে দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক ও শিল্পায়নের অগ্রগতি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অপমানজনক পরাজয়ের পর জাপানি অর্থব্যবস্থার পুনর্নির্মাণকে নিছক যুদ্ধের পরবর্তীকালের অলৌকিক ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত নয়। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাপানে যে শিল্পোন্নতি শুরু হয়েছিল তারই ফলাফল স্বরূপ বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে এই উন্নতি হয়। উদাহরণস্বরূপ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার জন্য খুব কম টাকার প্রয়োজন ছিল। কোনো কোনো শিশু টাকা ছাড়াই বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারত। সেই সময় শিশুদের স্কুলে ভর্তি হওয়া আবশ্যিক ছিল। অন্য দেশগুলোর মতো জাপানি আধুনিকীকরণেও নিজস্ব কিছু টানাপোড়েন, যেমন 'গণতন্ত্র ও সামরিকবাদ', 'জাতিগত জাতীয়তাবাদ ও নাগরিক রাষ্ট্রবাদ', 'পরম্পরা ও পাশ্চাত্যকরণ' ইত্যাদি ছিল।

কৃষক বিদ্রোহ, সংস্কার এবং বিপ্লবের মাধ্যমে চিনারা ঔপনিবেশিক শোষণ এবং তাদের নিজস্ব জমিকে আমলাদের দখল করার হাত থেকে প্রতিরোধ করেছিল। ১৯৩০ এর দশকের প্রারম্ভিক বছর গুলোতে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি, যা কৃষকদের দ্বারা শক্তিশালী হয়েছিল, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে সাথে দেশের প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয়তাবাদীদের সম্মুখীন হতে শুরু করল। তারা তাদের দলের আদর্শ দেশের কিছু নির্বাচিত অংশে বাস্তবায়ন করতে শুরু করে। তাদের সমতার মতাদর্শ, জমি সংস্কারের জন্য চাপ দেওয়া এবং মহিলাদের সমস্যাগুলোর প্রতি সচেতনতা ইত্যাদি ১৯৪৯ সালে বিদেশি উপনিবেশবাদ এবং জাতীয়তাবাদীদের উৎপাটিত করতে সাহায্য করে। ক্ষমতায় আসার পর তারা সমাজের বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষার প্রসার ঘটাতে এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সফল হয়। তথাপি একপার্টি কাঠামো এবং রাজ্যের দ্বারা দমন পীড়ন- এই দুই কারণে ১৯৬০ এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ের পরবর্তীকালে রাজনৈতিক অসন্তোষের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু চিনা কমিনিস্ট পার্টি অনেক দিন পর্যন্ত দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ বাজারের কিছু বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করে তারা নিজেদের পুনরাবিষ্কার করে চিনের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছিল।

বিভিন্ন দেশ আধুনিকতাকে বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করতে এবং বিভিন্নভাবে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক দেশ নিজের পরিস্থিতি ও ধারণা অনুযায়ী এ কাজ করে। এই অধ্যায় এসব গল্পের কিছু দিক সম্পর্কে তোমাদের পরিচয় করাবে।

সময় তালিকা-৪
১৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

এই সময়রেখাটি তোমাদের গত তিন শতাব্দীতে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে কী ঘটেছে এবং আধুনিক বিশ্ব গড়ে তুলতে বিভিন্ন দেশের মানুষ কী অবদান রেখেছে সে সম্পর্কে ধারণা দেবে। এই সময়রেখা থেকে তোমরা আফ্রিকার ক্রীতদাস বাণিজ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শাসন, ইউরোপের সামাজিক আন্দোলন এবং জাতীয় রাজ্য গঠন সম্পর্কে, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ক্ষমতা বিস্তার এবং উপনিবেশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে এবং গণতান্ত্রিক ও উপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবে যা গত শতাব্দীতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত রয়েছে। এই অধ্যায়ে এমন সব আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা আধুনিক যুগের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্য সব সময়রেখার মতো এই সময়রেখা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিনের উপর আলোকপাত করেছে। এছাড়া আরও কিছু আছে যা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যখন তোমরা এই সময়রেখায় কিছু বিশেষ দিনের তালিকা দেখবে, তখন এটা ভাববে না যে তোমাদের কেবল এই দিন বা তারিখগুলোর সম্পর্কেই জানতে হবে। তোমরা এটা ও খুঁজে বের করো যে কেন বিভিন্ন সময়রেখা বিভিন্ন প্রকার দিবসের উপর আলোকপাত করে, এবং এই দিনগুলো আমাদেরকে কী বলছে?

তারিখ	আফ্রিকা	ইউরোপ
১৭২০-৩০	পশ্চিম আফ্রিকার দাহময়ের রাজা আগাজা (১৭২৪-৩৪) খ্রিস্টাব্দে দাস বাণিজ্যের অবসান করেন। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় এই দাস বাণিজ্য চালু হয়।	
১৭৩০-৪০		উদ্ভিদ এবং প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ করার জন্য কারোলাস লিনিয়াস একধরনের শ্রেণিবিন্যাস প্রথার আবিষ্কার করে (১৭৩৫)
১৭৪০-৫০		
১৭৫০-৬০	দক্ষিন আফ্রিকার কেপটাউনে প্রথম বার গুটিবসন্ত মহামারির আকার ধারণ করেছিল যা নাবিকদের মাধ্যমে ছড়িয়েছিল। (১৭৫৫)	
১৭৬০-৭০		
১৭৭০-৮০	আন্তর্জাতিক দাস বাণিজ্যের চরম প্রসার হয়েছিল,। সব ঔপনিবেশিক শক্তি দাস বাণিজ্য করেছিল। প্রত্যেক বছর প্রচুর হাজার হাজার আফ্রিকার লোকদের আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়া হত। যার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ লোকের সমুদ্রযাত্রার সময়েই মৃত্যু হত।	রাশিয়াতে ইমিলিয়ান পগাচেভ (Emelian Pugachev) কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
১৭৮০-৯০		ফরাসি বিপ্লবের প্রারম্ভ (১৭৮৯)
১৭৯০-১৮০০		
১৮০০-১৮১০	মহম্মদ আলি মিশরের শাসক ছিলেন (১৮০৫-৪৮) মিশর আটামান সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল।	
১৮১০-১৮২০		
১৮২০-৩০	পশ্চিম আফ্রিকায় লিবেরিয়ার স্থাপন (১৮২২) যা স্বাধীন দাসদের দেশ ছিল।	লুই ব্রেল (Louis Braille) আঙুলের সাহায্যে পড়ার প্রণালীকে আরো বিকশিত করেছিলেন (১৮২৩); ইংল্যান্ডে যাত্রীবাহী রেলগাড়ির প্রচলন শুরু হয় (১৮২৫)
১৮৩০-৪০	ফরাসিদের আলজেরিয়াতে বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে আব্দুল কাদির আন্দোলন করেছিলেন।	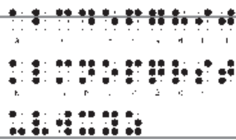
১৮৪০-৫০		ইউরোপের অনেক দেশেই উদারনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল (১৮৪৮)
১৮৫০-৬০		

তারিখ	আফ্রিকা	EUROPE
১৮৬০-৭০	বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ সুয়েজ খাল বাণিজ্যের জন্য খুলে দেওয়া হয়।	রাশিয়ার কৃষি কাজে নিয়োজিত দাসরা স্বাধীন হয়। (১৮৬১)
১৮৭০-৮০		জার্মানি এবং ইতালি একটি সমন্বিত রাষ্ট্র রাজ্য রূপে আর্বিভূত হয়।
১৮৮০-৯০	ইউরোপীয়ানরা আফ্রিকার জন্য সংঘর্ষ শুরু করে।	
১৮৯০-১৯০০		প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ (১৮৯৫) প্রথমবার এথেন্সে আধুনিক ওলিম্পিকের আয়োজন করা হয় (১৮৯৬)
১৯০০-১৯১০	মহাত্মা গান্ধি বর্ণবাদী আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের ওকালতি করেছিলেন(১৯০৬)	
১৯১০-১৯২০	দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ লোকেদের জন্য ৮৭ শতাংশ জমি সংরক্ষণ করার জন্য আইন তৈরি করা হয় (১৯১৩)	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয় (১৯১৪-১৯১৮) ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লব হয়েছিল।
১৯২০-৩০		মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়(১৯২৩)
১৯৩০-৪০	আঙ্গোলা থেকে মোজাম্বিক পর্যন্ত প্রথম ট্রান্স আফ্রিকান রেলপথের কাজ সম্পন্ন হয় (১৯৩১)।	জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতা দখল (১৯৩৩); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয় (১৯৩৯-৪৫)
১৯৪০-৫০	দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকার জাতীয় দলের (Afrikaner National party) বিজয় (১৯৪৮)। বর্ণবাদী নীতির প্রতিষ্ঠা	ব্রিটেন আইরিশদের স্বাধীনতার মান্যতা দেয়। (১৯৪৯)
১৯৫০-৬০	উপ-সাহারা আফ্রিকা অঞ্চলে ঘানা সর্বপ্রথম স্বাধীন হয়েছিল (১৯৫৭)	ডি এন এ এর আবিষ্কার; রাশিয়া মহাকাশযান স্পুটনিক উৎক্ষেপণ করেছিল। (১৯৫৭)
১৯৬০-৭০	আফ্রিকী একতা সংগঠন প্রতিষ্ঠা(১৯৬৩)	ইউরোপে বিরোধী আন্দোলন(১৯৬৮)
১৯৭০-৮০		
১৯৮০-৯০		মিখাইল গর্ভাচব সোভিয়েত রাশিয়ার নেতা হয়েছিলেন (১৯৮৫) সম্পূর্ণ বিশ্বে উদারিকরনের প্রারম্ভ (১৯৮৯)
১৯৯০-২০০০	দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দেওয়া হয় (১৯৯০) বর্ণভেদ প্রথা পরিসমাপ্তি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।	বৈজ্ঞানিকরা ক্লোন ভেড়া ডলি বানিয়েছিল যার ফলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নতুন বিতর্কের শুরু হয়। (১৯৯৭)

তারিখ	এশিয়া	দক্ষিণ এশিয়া
১৭২০-৩০	চিনের মঞ্চু শাসক কাঙ্গাক্সি 'গুজিন টুশু জিচেঙ্গা' নামক বিশাল বিশ্বকোষ ছাপিয়েছিলেন	
১৭৩০-৪০		
১৭৪০-৫০		মারাঠারা উত্তর ভারতে তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে।
১৭৫০-৬০	ত্রয়োকি কন্যো নামে এক জাপানি পণ্ডিত ব্যক্তি ডাচ-জাপানী শব্দকোশের সংকলন তৈরি করেছিলেন। (১৭৫৮)	রবার্ট ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কে পরাজিত করেন। (১৭৫৭)
১৭৬০-৭০		
১৭৭০-৮০		
১৭৮০-৯০	ইংরেজদের দ্বারা ভারত থেকে চিনে আফিম রপ্তানি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।	
১৭৯০- ১৮০০		রণজিৎ সিং পাঞ্জাবে শিখ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। (১৭৯৯)
১৮০০- ১০		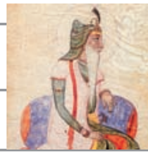
১৮১০-২০		
১৮২০-৩০	ডাচদের বিরুদ্ধে জাপানিদের আন্দোলন (১৮২৫-৩০)	'সতী' প্রথা বেআইনি বলে ঘোষিত হয় (১৮২৯)
১৮৩০-৪০	অটোমান সুলতান আব্দুল মাজিদ আধুনিকীকরণ করার প্রক্রিয়া শুরু করেন।	
১৮৪০-৫০		
১৮৫০-৬০	থাইল্যান্ডে চতুর্থ রামার শাসন, নিজের দেশকে বিদেশি বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করেন।	রেল ও টেলিগ্রাফ লাইনের প্রসার শুরু (১৮৫৩); মহাবিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭)
১৮৬০-৭০	ফ্রান্স ইন্দো-চিনে (দক্ষিণ এশিয়া) আধিপত্য স্থাপন করে (১৮৬২)	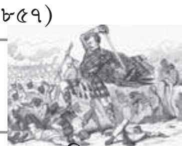
১৮৭০-৮০	জাপানে টোকিও থেকে ইয়াকুহামা পর্যন্ত রেল পরিসেবা চালু হয় (১৮৭২)	দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ (১৮৭৬-৭৮); ফলে দক্ষিণ ভারতে পঞ্চাশ লাখ লোকের মৃত্যু হয়।
১৮৮০-৯০	ব্রিটেন বার্মায় (মায়ানমার) অধিকার প্রতিষ্ঠা করে (১৮৮৫-৮৬)	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)
১৮৯০-১৯০০		The First Indian National Congress, 1885

তারিখ	এশিয়া	দক্ষিণ এশিয়া
১৯০০-১০	জাপানের নৌবাহিনী রাশিয়ার নৌবহরকে পরাজিত করেছিল (১৯০৫)	
১৯১০-২০	বালফোর ঘোষণাপত্রের দ্বারা প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের বসতি স্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় (১৯১৭)	
১৯২০-৩০		মহাত্মা গান্ধি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন (১৯২১) রামস্বামী নায়ক তামিলনাড়ুতে আত্ম-সম্মান আন্দোলন শুরু করেন (১৯২৫)
১৯৩০-৪০	ইরাক থেকে সিরিয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ তেল পাইপলাইন স্থাপিত হয় (১৯৩৪)	আদর্শীর ইরানি দ্বারা 'আলম আরা' প্রথম ভারতীয় সবাক চলচিত্র নির্মাণ (১৯৩১)। বাগদাদ এবং ইস্তানবুলের মধ্যে যোগাযোগস্থাপন করার লক্ষ্যে বার্লিন-বাগদাদ রেলপথের যাত্রা শুরু (১৯৪০)
১৯৪০-৫০	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করে যার ফলে প্রায় ১, ২০,০০০ মানুষ প্রাণ হারায় (১৯৪৬)। বিকিরণের প্রভাবে পরবর্তীকালেও বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। চিনে জন-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৯)	ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২); ভারত এবং পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে (১৯৪৭)
১৯৫০-৬০	বান্দুজ সম্মেলন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিল। (১৯৫৫)	ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় (১৯৫০)
১৯৬০-৭০	প্যালেস্টাইনের শরণার্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আরব নেতারা প্যালেস্টাইন মুক্তি মোর্চা প্রতিষ্ঠা করেন (১৯৬৪); ভিয়েতনামে যুদ্ধ (১৯৬৫-৭৩)	সিরিমাভো বন্দরনায়েক বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন (১৯৬০)
১৯৭০-৮০	ইরানে শাহ এর শাসনের অবসান হয় (১৯৭৯)	বাংলাদেশ একটি স্বাধীনরাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে (১৯৭১)।
১৯৮০-৯০	চিনের বেজিং-এর তিয়ানেনমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রের জন্য বিশাল প্রদর্শন হয়। (১৯৮৯)	ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইড পেস্টিসাইড প্ল্যান্টে গ্যাস দুর্ঘটনা (১৯৮৪)। এটি ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শিল্প দুর্ঘটনা যার ফলে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।
১৯৯০-২০০০	ইরাক, কুয়েত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উপসাগরীয় যুদ্ধ।	ভারত এবং পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তি পরীক্ষা করে (১৯৯৮)

তারিখ	আমেরিকা	অস্ট্রেলিয়া
১৭২০-৩০	পর্তুগিজরা ব্রাজিলে কফি চাষের প্রচলন করে। (১৭২৭)	ডাচ নাবিক রোগেবীন সমোয়া দ্বীপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বদিকের দ্বীপে পৌঁছান (১৭২২)
১৭৩০-৪০	একজন শিক্ষিত দাস জেমি স্টোনো দাস বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন(১৭৩৯)।	
১৭৪০-৫০	জুয়ান সেনটোস, যিনি দ্বিতীয় আতাহুয়াল্লা নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি পেরুর মূল আমেরিকান জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের বিদ্রোহ অসফল হয়েছিল। (১৭৪২)	
১৭৫০-৬০		
১৭৬০-৭০	ওটাবা প্রদেশের উপজাতিদের নেতা পন্টিয়াক ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রদর্শন করে(১৭৬৩)।	ক্যাপ্টেন কুক্-এর তিনটে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্রযাত্রার প্রথম যাত্রা (১৯৬৮-৭১)
১৭৭০-৮০	আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (১৭৭৬)	
১৭৮০-৯০	আমেরিকার সংবিধান তৈরি হয়। আমেরিকার মুদ্রা হিসেবে প্রথমবার ডলার ব্যবহৃত হয়। (১৭৮৭)	প্রথম ব্রিটিশ অপরাধীদের অস্ট্রেলিয়ার 'বোটানি বে' তে পাঠানো হয়।
১৭৯০- ১৮০০		
১৮০০- ১০		ম্যাথিউ ফ্লিন্ডার্স পরিক্রমা করার সময় অস্ট্রেলিয়ার নামকরণ করেছিলেন যার অর্থ 'দক্ষিণী'। (১৮০১-০৩)
১৮১০-২০		
১৮২০-৩০	সাইমন বলিভারের নেতৃত্বে ভেনেজুয়েলা স্বাধীনতা লাভ করে(১৮২১)	
১৮৩০-৪০	আমেরিকাতে 'ট্রেইল অব টিয়ার্স' সংগঠিত হয়, এতে কয়েক হাজার আমেরিকার পূর্বাঞ্চলের মূল জনগোষ্ঠীর মানুষকে জোর করে পশ্চিম দিকে পাঠানো হয়েছিল। এতে অনেকের যাত্রাপথেই মৃত্যু হয়।	চার্লস ডারউইন প্রশান্ত মহাসাগেরের গলাপগোস দ্বীপের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন যার ফলস্বরূপ বিবর্তন তত্ত্বের উন্নতিসাধন হয়েছিল। (১৮৩১)
১৮৪০-৫০	নিউইয়র্ক এর সেনেকা ফল্‌স এর বৈঠকে আমেরিকার মহিলাদের সমান অধিকারের আহ্বান করা হয়েছিল। (১৮৪৮)	ব্রিটিশ এবং মায়োরিসরা নিউজিল্যান্ড এ ওয়াইটাঙ্গী সন্ধিতে সাক্ষর করেছিল (১৮৪০)। এরপর মায়োরিসরা প্রচুর বিদ্রোহ করেছিল (১৮৪৪-৮৮)
১৮৫০-৬০		অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রথমবার বাষ্পচালিত জলযান নিয়মিতভাবে শুরু হয় (১৮৫৬)

তারিখ	আমেরিকা	অস্ট্রেলিয়া/প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জ
১৮৬০-৭০	আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫) সংশোধনের মাধ্যমে দাস প্রথার অবসান ।	ব্রিটেন থেকে অস্ট্রেলিয়ার বন্দিদের পাঠানোর ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা (১৮৬৮)
১৮৭০-৮০	টেলিফোন, রেকর্ড-প্লেয়ার, বিদ্যুৎ চালিত বাল্বের আবিষ্কার	
১৮৮০-৯০	কোকা-কোলার আবিষ্কার (১৮৮৬)	
১৮৯০-১৯০০		নিউজিল্যান্ডে মহিলারা ভোটাধিকার লাভ করে (১৮৯৩)
১৯০০-১০	রাইট-ব্রাদার্সরা উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেন (১৯০৩)	
১৯১০-২০	হেনরি ফোর্ড গাড়ি উৎপাদন করতে শুরু করেন (১৯১৩); আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযুক্তকারী পানামাখাল উন্মুক্ত করা হয়। (১৯১৪)	পশ্চিম সামোয়ার জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশের ইনফুয়েঞ্জায় মৃত্যু।
১৯২০-৩০	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালস্ট্রিট স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার পতন (১৯২৯)। বিশ্বব্যাপী মহামন্দা শুরু, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১ কোটি মানুষ বেকার হয়ে যায়।	নিউজিল্যান্ড সরকারের বিরুদ্ধে সামোয়ার মাউ জনগোষ্ঠীর লোকেরা বিদ্রোহ শুরু করে (১৯২৯)
১৯৩০-৪০		
১৯৪০-৫০	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে।	
১৯৫০-৬০	কিউবা বিপ্লবের পর ফিদেল কাস্ত্রো ক্ষমতায় আসীন হন (১৯৫৮)।	
১৯৬০-৭০	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলন (১৯৬৩); আমেরিকার নাগরিক অধিকার আইনের (১৯৬৪) ফলে জাতিগত বৈষম্য দূর হয়েছিল। নাগরিক অধিকারের নেতা মার্টিন লুথার কিং এর হত্যা (১৯৬৮); আমেরিকার মহাকাশযানচারী প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রাখে (১৯৬৯)।	
১৯৭০-৮০	মহিলাদের আন্দোলনের ফলে আমেরিকার কংগ্রেস সমান অধিকার আইন পাশ করে। (১৯৭২)	টংগা এবং ফিজি ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে (১৯৭০); পাপুয়া নিউগিনি অস্ট্রেলিয়ার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে (১৯৭৫)
১৯৮০-৯০		নিউজিল্যান্ডকে পরমাণু মুক্ত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয় (১৯৮৪)। রারোটোধার সন্ধির দ্বারা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে পরমাণু মুক্ত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়।
১৯৯০-২০০০		

কার্যক্রম

যদি তুমি এই বইয়ের চারটি সময়রেখাকে তুলনা কর তাহলে তুমি বাঁদিকের দিনলিপির স্তম্ভের সাথে কালক্রমে বিভিন্নতা দেখতে পাবে। এর পেছনে কী কারণ তা কি তুমি বলতে পারবে? তুমি নিজে একটি সময়রেখা তৈরি করার চেষ্টা করো এবং এই ঘটনাবলিকে নির্বাচন করার পেছনে কারণগুলো বলো।

বিষয়

৯

শিল্পবিপ্লব

(THE INDUSTRIAL REVOLUTI)

** দ্বিতীয় পর্যায়ে শিল্পবিপ্লব ১৮৫০ খ্রি. পর শুরু হয়, এতে বিদ্যুৎ এবং রাসায়নিক শিল্পের বিকাশ ঘটে। এই সময়ে ব্রিটেন শিল্পক্ষেত্রে তার প্রথম স্থান ধরে রাখতে পারেনি এবং তার স্থান দখল করে জার্মানি এবং আমেরিকা।*

১৭৮০খ্রি. থেকে ১৮৫০ খ্রি. মধ্যবর্তী সময়ে ব্রিটেনে শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, তা শিল্পবিপ্লব নামে পরিচিত। ব্রিটেনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যেও একই পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এই সমস্ত দেশগুলোর সমাজ ও অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে এবং অবশিষ্ট বিশ্বেও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

নতুন প্রযুক্তি ও কলকারখানা এই পর্যায়ে সম্মিলিতভাবে ব্রিটেনের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছিল। এর ফলে হস্ত ও তাঁত শিল্পের তুলনায় কলকারখানায় প্রচুর পরিমাণ শিল্প সামগ্রী উৎপাদন সম্ভব হয়। এই অধ্যায় লৌহ এবং তাঁত শিল্পে পরিবর্তনের রূপরেখা নির্দেশ করবে। শক্তির একটি প্রধান উৎস বাষ্প। ব্রিটিশ শিল্পক্ষেত্রে এর ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু হয়। রেল ও জাহাজে এই শক্তির প্রয়োগ করে পরিবহন ব্যবস্থাকে দ্রুততর করা হয়। যেসব আবিষ্কারক বা ব্যবসায়ীরা এই পরিবর্তন এনেছিলেন এর মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে সম্পদশালী ছিলেন না, বা মৌলিক বিজ্ঞান যেমন রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় তাদের শিক্ষাগত ভিত্তিও ততটা ছিলনা। এদের মধ্যে অনেকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা লক্ষ করলেই তা সহজে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

শিল্পবিপ্লব কিছু মানুষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। তবে প্রারম্ভিক ধাপে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষদের অস্বচ্ছল জীবনযাপন এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে এবং সরকারকে কাজের পরিস্থিতি তৈরি করতে আইন পাশ করতে হয়।

‘শিল্প বিপ্লব’ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ইউরোপীয় পন্ডিত ফ্রান্সের জর্জ মিসলেট এবং জার্মানির ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। আরনল্ড টয়েনবী (১৮৫২—৫৩) ১৭৬০ থেকে ১৮২০ খ্রি. মধ্যে বৃটেনে শিল্পের যে বিকাশ ঘটে তার পরিবর্তন নিয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। বৃটেনের রাজা তৃতীয় জর্জের শাসনকালে টয়েনবী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধারাবাহিকভাবে এই বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন। তার অকাল মৃত্যুর পর ১৮৮৪ খ্রি. তাঁর বক্তৃতাগুলো পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় যার নাম ছিল—Lectures on the Industrial Revolution in England : Popular Addresses, Notes and other Fragments.

পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক T S Ashton, Paul Mantoux এবং Hobsbawn দৃঢ়ভাবে টয়েনবীর মতকে সমর্থন করেন। ১৭৮০ থেকে ১৮২০ খ্রি. মধ্যে লৌহ ও কার্পাস শিল্প, কয়লা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল তৈরি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লক্ষনীয় বিকাশ ঘটে। অ্যাশটন্ (১৮৮৯—১৯৬৮) শিল্পবিপ্লবকে উৎসব হিসেবে পালন করেন, যখন ছোটো ছোটো যন্ত্রের জোয়ারে ইংল্যান্ড প্লাবিত হয়ে পড়েছিল।

ব্রিটেন কেন?

ব্রিটেন হল প্রথম আধুনিক শিল্প অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেশ। এটি সপ্তদশ শতক থেকে রাজনৈতিকভাবে সুদৃঢ় ছিল এবং এর তিনটি অংশ—ইংল্যান্ড, ওয়েলস্ এবং স্কটল্যান্ড এ এক রাজতন্ত্র অর্থাৎ সম্রাটের একচ্ছত্র শাসন ব্যবস্থা ছিল। এর অর্থ হল সমগ্র রাজ্যে একই আইন ব্যবস্থা একই মুদ্রা ব্যবস্থা এবং বাজার ব্যবস্থা ছিল। এই বাজার ব্যবস্থায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন হস্তক্ষেপ ছিল না। স্থানীয় অঞ্চল দিয়ে কোনো সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার সময় তারা কোনো অতিরিক্ত কর ধার্য করতে পারত না। কারণ এতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার ব্যাপক প্রসার ঘটে। জনগনের একটা বিশাল অংশ আয় হিসেবে জিনিসের পরিবর্তে মজুরী ও বেতন পেতে লাগল। ফলে মানুষ তার অর্জিত আয় বিকল্প পথে খরচের সুযোগ পায় এবং জিনিসপত্র বিক্রির জন্য বাজারের সম্প্রসারণ ঘটে।

অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডের অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, যা পরবর্তীকালে 'কৃষি বিপ্লব' নামে পরিচিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় বড়ো বড়ো জমির মালিক নিজের সম্পত্তির আশে পাশে ছোটো ছোটো জমি কিনে নেয় এবং গ্রামের সর্বসাধারণের জমি ঘেরাও করে ফেলে। এই ভাবে বিশাল সম্পত্তি তৈরি করার ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় জমি হারানো কৃষকদের ও জমিতে পশুচারকদের অন্যত্র কাজের সন্ধান করতে হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশ নিকটবর্তী শহরে চলে যায়।

শহর, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজস্ব

অষ্টাদশ শতক থেকে ইউরোপের বিভিন্ন শহরের এলাকা ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। ইউরোপের ১৯টি শহরের জনসংখ্যা ১৭৫০ খি. থেকে ১৮০০ খ্রি. মধ্যে দ্বিগুণবৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে ১১টি হল ব্রিটেনের। এই ১১টি শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল লন্ডন যা দেশের বাজারের প্রধান কেন্দ্র ছিল। অন্য বড় বড় শহরও লন্ডনের আশে পাশেই ছিল।

সমগ্র বিশ্বে লন্ডন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ শতকে বিশ্বব্যাপী ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ইতালী ও ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর থেকে হল্যান্ড ও ব্রিটেনের আটলান্টিক বন্দরে স্থানান্তরিত হয়। এরপর লন্ডন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান উৎস হিসেবে আমস্টার্ডামের স্থান দখন করে। এর সাথে ইংল্যান্ড, আফ্রিকা এবং ওয়েস্টইন্ডিজের মধ্যে যে যে ত্রিকোণ ব্যবসা বাণিজ্য চলছিল লন্ডল তার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এশিয়া ও আমেরিকাতে যেসব কোম্পানি ব্যবসা বাণিজ্য করছিল, তারাও তাদের দপ্তর ইংল্যন্ডে স্থাপন করে। ইংল্যান্ডে বিভিন্ন বাজারের মধ্যে পণ্যসামগ্রী পরিবহন প্রধানত নদীপথে এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে জাহাজের মাধ্যমেই করা হত। রেলপথ সম্প্রসারণের পূর্ব পর্যন্ত সড়কপথের তুলনায় জলপথে পণ্য পরিবহন ছিল অনেক সস্তা ও কম সময় সাপেক্ষ। ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ইংল্যান্ডে ১,১৬০ মাইল পর্যন্ত পথ নৌ চলাচলের যোগ্য ছিল। এছাড়া পাহাড়ী অঞ্চল বাদ দিয়ে দেশের অধিকাংশ জায়গাকে নদীর প্রায় ১৫ মাইলের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। যেহেতু ইংল্যান্ডের নদীগুলোর নাব্যতা সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেহেতু জাহাজে করে পণ্যসম্ভার উপকুলবর্তী জাহাজে, যাকে 'উপকুলবাহী পোত' বলে, যেখানে সহজেই স্থানান্তরিত করা যেত। ১৮০০ খ্রি. পর্যন্ত 'উপকুলবাহী পোত' গুলোতে কর্মরত নাবিকের সংখ্যা ১,০০,০০০ এ পৌঁছে গিয়েছিল।

ইংরেজীর সুপ্রশিদ্ধ লেখক অলিভার গোল্ড স্মিথ (১৭২৮-৭৪) খ্রিঃ তার কবিতা The Deserted village বা নির্জন গ্রাম কবিতায় বর্ণনা করেছেন,

সেই বৈভব ও গর্বের মানুষ
যার সমস্ত সরবরাহ করে গরীব মানুষ
সেই স্থান যেখানে তার হ্রদ তৈরি হয়,
সেই জমি যেখানে বাগানের আগে
বর্ধিত সীমা আছে
সেই জায়গায় তার ঘোড়া বাঁধা হয়,
থাকে সাজ সরঞ্জাম তার শিকারী কুকুর,
সেই রেশমী আলস্য যার দ্বারা
তার শরীর আবৃত হয়েছিল,
তা হয়তো পাশ্ববর্তী খেতের অর্ধেক শোষণ
করে তৈরি হয়েছিল।

কার্যাবলি-১
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড এবং বিশ্বের অন্যপ্রান্তে যে সব পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটে তা আলোচনা কর যার দ্বারা ইংল্যান্ড শিল্পবিপ্লবে উৎসাহিত হয়।

ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (১৯৬৪ খ্রিঃ স্থাপিত) ছিল দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলকেন্দ্র। ১৭৮৪ খ্রি. ইংলন্ডে ১০০টিরও বেশি আঞ্চলিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী ১০ বছরে তা তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৮২০ খ্রি. বিভিন্ন প্রান্তে ৬০০ এর উপর ব্যাংক ছিল। এর মধ্যে লন্ডনেই ১০০ এর বেশি ব্যাংক ছিল। বড় বড় শিল্পস্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান এই ব্যাংকগুলো থেকেই দেওয়া হত।

১৭৮০ খ্রি. থেকে ১৮৫০ খ্রি. মধ্যে ব্রিট্রেনে যে শিল্পোদ্যোগ হয়েছিল তা উপরে উল্লেখিত ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে গ্রাম থেকে আসা অনেক গরীব মানুষ শহরে কাজের জন্য আগ্রহী ছিল। বড় বড় শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান ব্যাংকগুলো থেকে সহজেই পাওয়া যেত। এছাড়া ছিল উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দুটি উপাদান আলোচনা করা হবে— প্রযুক্তিগত পরিবর্তন যা উৎপাদন আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি করে এবং নতুন যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে রেললাইনের সূচনা করে। এই দুই বিকাশের ক্ষেত্রে যদি সময়কে ভালোভাবে লক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে বিকাশের পর্যায় ও তার প্রয়োগের মধ্যে কিছু দশকের জন্য একটা শূন্যতা ছিল। তার এইজন্য এটা ভাবা ঠিক নয় যে, প্রযুক্তিগত কোন আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথেই তার প্রয়োগ শুরু হয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ২৬,০০০ আবিষ্কার নথিভুক্ত হয়। যার মধ্যে ১৭৮২ খ্রি. থেকে ১৮০০ খ্রি. মধ্যে প্রায় অর্ধেকের বেশী আবিষ্কার হয়েছিল। এই সব আবিস্কারের ফলে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সব আবিষ্কারের মধ্যে আমরা প্রধান চারটি পরিবর্তন অথাৎ- লৌহ শিল্পের রূপান্তর, বয়ন শিল্প, বাষ্পচালিত শক্তি ও রেললাইনের সূচনা নিয়ে আলোচনা করব।

কয়লা এবং লোহা

ইংল্যান্ড সৌভাগ্যশালী ছিল যে কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা ও লোহা ইংল্যান্ডে সহজলভ্য ছিল এছাড়া অন্যান্য খনিজ পদার্থ যেমন সীসা, তামা, টিন প্রভৃতিও ইংল্যান্ডে প্রচুর পরিমানে পাওয়া যেত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবহারযোগ্য লোহা দুস্পাপ্য ছিল। ধাতু বিগলন পদ্ধতির মাধ্যমে আকরিক লোহাকে তরলে পরিণত করে বিশুদ্ধ করা হত। কাঠ কয়লা ব্যবহার করে লোহা গলানো হত। কিন্তু এতেও সমস্যা ছিল। কাঠ কয়লা দূরবর্তী স্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় ভেঙ্গে যেত এবং এর দ্বারা উন্নত মানের লোহা

কোলব্রুকডেল এর চিত্র:- বিস্ফোরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গা (বাঁদিকে এবং মাঝে) এবং কাঠ কয়লার চুল্লী (ডানে) চিত্রকার- F.Vivares, 1758.

উৎপাদন হতনা। এর যোগানেরও সমস্যা ছিল কারণ কাঠের জন্য বন ধ্বংস করা হচ্ছিল এবং উচ্চতাপ উৎপাদনও সম্ভব ছিল না।

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম উইলিয়ামসের আঁকা কাস্ট আয়রন নির্মিত সেতু যা কোলব্রুকাডল এর কাছে অবস্থিত

* পরবর্তীকালে এই অঞ্চলটির নামকরণ করা হয় আয়রনব্রিজ

অনেক বছর পর এই সমস্যার সমাধান হয় ডাবির শ্রপসায়ার পরিবার দ্বারা, যারা নিজেরা লৌহ উৎপাদক ছিল। অর্ধশতাব্দী ধরে তিন পুরুষ (দাদু , পিতা ও ছেলে যারা সবাই আব্রাহাম ডার্বি নামে পরিচিত ছিল) ধাতু শিল্পে বিপ্লব এনে দিয়েছিল। এই বিপ্লবের শুরু হয়েছিল ১৭০৯খ্রি. প্রথম আব্রাহাম ডার্বির আবিষ্কারের দ্বারা ।এটা ছিল বিস্ফোরিত চুল্লি যেখানে প্রথম কোক কয়লা ব্যবহার করা হয়েছিল, যা উচ্চ তাপমাত্রা উৎপন্ন করতে পারত আর কয়লা থেকে সালকার ও অপরিশোধিত পদার্থ অপসারণ করে কোক তৈরি হত।এই আবিষ্কারের ফলে চুল্লি আর কাঠ কয়লার উপর নির্ভর রইল না। এই চুল্লিগুলো থেকে যে লোহা পাওয়া যেত, তা পূর্বাপেক্ষা নিখুঁত ও লম্বা ঢালাই যুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে আরও আবিষ্কারের পর এই পদ্ধতি পরিমার্জিত হয়। দ্বিতীয় ডার্বির সময় (১৭১১-৬৮) কাঁচা লোহা থেকে পেটা লোহা তৈরী হয় যা কম ভঙ্গুর ছিল। হেনরি কোর্ট(১৭৪০-১৮২৩) কর্দমাক্ত চুল্লি(যেখানে গলিত লোহাকে শোধন করা হত) এবং ঢালাই কারখানা আবিষ্কার করেন যেখানে পরিশোধিত লোহা থেকে লৌহদন্ড তৈরী করার জন্য বাষ্পশক্তি ব্যবহার করা হত। এর ফলে বিভিন্ন প্রকার লৌহদ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হয়। লোহার স্থায়িত্ব কাঠের তুলনায় অনেক বেশি ছিল বলে মেশিন ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরিতে লোহার ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে লাগল। কাঠ পুড়ে যেতে পারে বা ফেটে টুকরো হয়ে যেতে পারে, কিন্তু লোহার ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ১৭৭০ খ্রী. জন উইলকিন্‌সন্ (১৭২৮-১৮০৮) প্রথম লৌহ চেয়ার, মদের জন্য চৌবাচ্চা এবং বিভিন্ন আকারের পাইপ তৈরি করেন। ১৭৭৯ খ্রী. তৃতীয় ডার্বি(১৭৫০-৯১) সেভর্ন নদীর উপর কোলব্রুকডেলএ পৃথিবীর প্রথম লৌহসেতু নির্মাণ করেন। উইলকিন্‌সন্ প্রথম জলের পাইপ তৈরি করার জন্য (প্যারিস থেকে জল সরবরাহের জন্য ৮০ মাইল লম্বা) ঢালাই লোহা ব্যবহার করেন।

মানচিত্র ১ : ব্রিটেন : লৌহ শিল্পকেন্দ্র

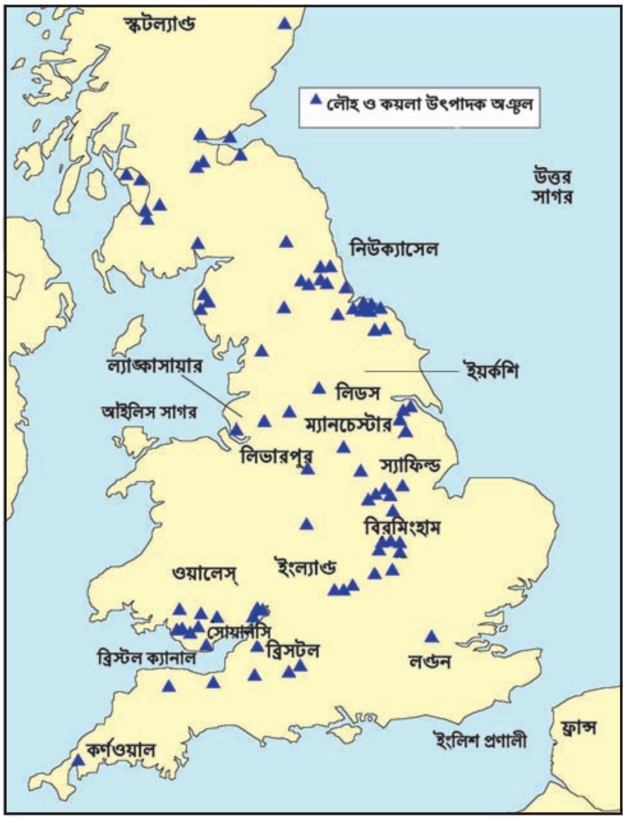

এর কিছু সময় পর লৌহকারখানা কয়লা খনন ও লোহা বিগলনের জন্য একটি নিদিষ্ট জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়। ব্রিটেনের সৌভাগ্য ছিল এর একই অববাহিকায় রান্নার কয়লা ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন লৌহ আকরিক পাওয়া যেত। এই অববাহিকা বন্দরের নিকটই ছিল, সেখানে এমন পাঁচটি উপকূলীয় কয়লাক্ষেত্র ছিল যেখানে উৎপাদিত সামগ্রী সরাসরি জাহাজে নিয়ে যাওয়া সহজ ছিল। যেহেতু কয়লা ক্ষেত্রগুলি বন্দরের কাছাকাছি হওয়ায় জাহাজ নির্মান কারখানা ও নৌপরিহন বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় তাই উৎপাদিত সামগ্রী ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ছিল। ১৮০০ খ্রি. থেকে ১৮৩০ খ্রি. মধ্যে ব্রিটেনের উৎপাদন চর্তুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৮২০ খ্রী. এক টন ঢালাই লোহা তৈরিতে ৮ টন কয়লার প্রয়োজন হত, কিন্তু ১৮৫০ খ্রি. নাগাদ মাত্র ২টন কয়লাতেই তা করা সম্ভব হতে লাগল। ১৮৪৮ খ্রি.

নাগাদ ব্রিটেনে গলিত লোহার পরিমান সারা বিশ্বে তৈরি করা গলিত লোহার পরিমান থেকেও বেশি ছিল।

কার্যাবলি-২

লৌহসেতু জর্জ বর্তমানে উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্যবাহী স্থান-কেন ? মতামত দাও।

কার্পাস তুলো কাটা ও বুনন

ব্রিটেন সবসময় ওল ও শন (লিনেন তৈরি করার জন্য) দিয়ে কাপড় তৈরি করত যা সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইংল্যান্ড ভারত থেকে রাশি রাশি সুতি কাপড় আমদানি করতে থাকে। কিন্তু যখন থেকে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়, তখন থেকে ইংল্যান্ড কাপড়ের সাথে সাথে কাঁচা তুলোও আমদানি করতে থাকে যা ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে কাটা হত ও কাপড় তৈরি করা হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুতো কাটার কাজ এমনই ধীরগতি সম্পন্ন ও কষ্টসাধ্য ছিল যে দশজন সুতো কাটার লোক (প্রধানত মহিলারা, যাদের স্পিনস্টার বলা যেতে পারে)একজন বয়নশিল্পীকে সুতোর যোগান দিতে হত। তাই সুতো কাটার লোকেরা সুতো কাটত আর বয়নশিল্পী সুতোর জন্য অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করত। কিন্তু প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের ফলে তুলো থেকে সুতো কাটা এবং কাপড় বানানোর মধ্যে যে ফাঁক ছিল তা দূর হয়। এই কাজকে আরও দক্ষতার সাথে করার জন্য উৎপাদনের কাজ ধীরে ধীরে সুতো কাটার কারিগর ও বুনন শিল্পীর ঘর থেকে কারখানাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৭৮০খ্রি. থেকে বস্ত্রশিল্পকেই ইংল্যান্ডের শিল্পায়নের প্রতীক মানা হয়। এই শিল্পের দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্য শিল্পের ক্ষেত্রে ও লক্ষ করা যায়।

কাঁচা তুলো পুরোপুরি ভাবে আমদানি করা হতে লাগল আর উৎপাদিত বস্ত্র রপ্তানী হতে লাগল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল উপনিবেশের, যার দ্বারা ব্রিটেন কাঁচামাল ও উৎপাদিত বস্ত্রের বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারত।

ছবিতে এক নারীকে পায়ের দ্বারা ট্রেডমিল চালাতে দেখা যাচ্ছে।

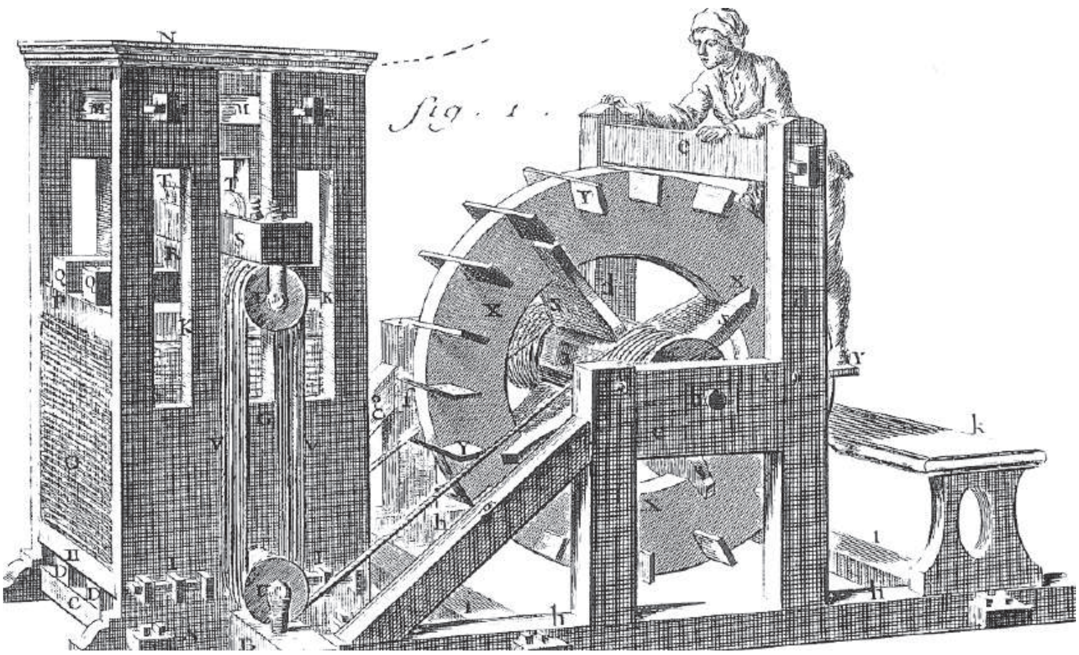

১. উড়ন্ত তুরি তাঁত(The Flying Shuttle loom) আবিষ্কার করেন জন কে (১৭০৪—৬৪) ১৭৩৩ খ্রি.। এর দ্বারা অল্প সময়ে চওড়া কাপড় তৈরি করা সম্ভব হয়। ফলে প্রচুর সুতোর প্রয়োজন হয়।

২. কাটার মেশিন (Spinning Jenny) আবিষ্কার করেন জেমস্ হারগ্রেভস (১৭২০—৭৮) ১৭৬৫ খ্রি. যার দ্বারা একজন ব্যক্তি এক সাথে প্রচুর সুতো কাটতে পারত। ফলে বুনন শিল্পী সহজেই তার প্রয়োজনীয় সুতো পেতে লাগল।

৩. ওয়াটার ফ্রেম (Water frame) আবিষ্কার করেন রিচার্ড আর্করাইট (১৭৩২—৯২) ১৭৬৯ খ্রি.। এই মেশিনে শক্ত সুতো তৈরি করা যেত। এতে সুতি, লিনেন সুতো মিশিয়ে কাপড় বানানোর পরিবর্তে খাঁটি সুতির তৈরি কাপড় বানানো সম্ভব হয়।

৪. মিউল (Mule) ১৭৭৯ খ্রি. স্যামুয়েল ক্রম্পটন এই মেশিন তৈরি করেন যার দ্বারা মজবুত ও উন্নতমানের সুতা তৈরি সম্ভব হয়।

৫. বস্ত্র উৎপাদনে যেসব মেশিন এর আবিষ্কার সুতা কাটা ও বুননের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেছিল, এন্ডমন্ড কাটরাইট (১৭৪৩—১৮২৩) ১৭৮৭ খ্রি. পাওয়ারলুম আবিষ্কারের ফলে তার সমাপ্তি ঘটে। পাওয়ারলুম ব্যবহার অনেক বেশি সহজ ছিল। সুতো কেটে গেলে মেশিন নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যেত। ১৮৩০ খ্রি. পর বস্ত্র শিল্পের জন্য নতুন নতুন মেশিন বানানোর পরিবর্তে উৎপাদনের উপর বেশি জোর দেওয়া হতে লাগল।

ম্যাপ ২ ঃ বস্ত্র শিল্পকেন্দ্র

কল-কারখানায় নিযুক্ত স্ত্রীলোক ও শিশুদের কাজের উপর শিল্প নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এতে শিল্পায়নের প্রারম্ভিক সময়ের কদর্যরূপ সামনে আসে। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া রয়েছে।

বাষ্পীয় শক্তি

যখন উপলব্ধিতে এল যে, বাষ্প অসাধারণ ক্ষমতা উৎপন্ন করতে পারে তখন শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তা পর্যাপ্তভাবে প্রয়োগ হতে লাগল। জল হল এমন শক্তি যা কয়েক শতাব্দী ধরে শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাও নির্দিষ্ট

কিছু অঞ্চল, ঋতু এবং জল প্রবাহের গতির মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল। এরপর বিভিন্ন ভাবে এই জলশক্তি প্রয়োগ হতে থাকে। বাষ্পশক্তি উচ্চ তাপমাত্রার চাপ তৈরি করতে পারে যার সাহায্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চালানো সম্ভব হয়। এর অর্থ বাষ্পীয় শক্তি এমন একটি বিশ্বস্ত ও স্বল্প খরচসম্পন্ন শক্তির উৎস যা যন্ত্রপাতি তৈরি করার জন্য পর্যাপ্ত ছিল।

ওয়াটের আবিষ্কার শুধু বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ক্ষেত্রেই সীমাবন্ধ ছিল না, তিনি কাগজপত্র নকল করার জন্য এক ধরনের রাসায়নিকও আবিষ্কার করেন। এছাড়াও তিনি আগের মহাজাগতিক শক্তির উৎস, ঘোড়ার সাথে যান্ত্রীক ক্ষমতার তুলনা করার উপর ভিত্তি করে পরিমাপের একটি একক সৃষ্টি করেছেন। ওয়াটের পরিমাপের একক অশ্বশক্তি, একটি ঘোড়া শক্তির সমতুল্য যা এক মিনিটে ৩৩০০ পাউন্ড (১৪৯৬৯ কেজি), এক ফুট (০.৩মি.) উত্তোলন করতে সক্ষম। অশ্বশক্তিই যান্ত্রিক শক্তির সার্বজনীন সূচক।

বাষ্পীয় শক্তি প্রথম ব্যবহৃত হয় খনি শিল্পে। কয়লা ও ধাতুর চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খনির আরও গভীর থেকে তা প্রাপ্ত করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। খনিতে জল জমে যাওয়া এক মারাত্মক সমস্যা ছিল। থমাস সার্ভে (১৬৫০—১৭১৫) ১৬৯৮ খ্রি. মাইন্‌স্ ফ্রেন্ড নামে খনি থেকে জল বের করার জন্য এক বাষ্প চালিত ইঞ্জিনের মডেল বানিয়েছিলেন। এই ইঞ্জিন অগভীর খনিতে খুব ধীরে ধীরে কাজ করত এবং অধিক চাপে এর বয়লার ফেটে যেত।

বাষ্পচালিত অপর এক ইঞ্জিন ১৭১২ খ্রি. থমসে নিউকামেন (১৬৩৩—১৭২৯) তৈরি করেছিলেন। এই যন্ত্রটির প্রধান ত্রুটি ছিল একটানা ঘনীভূত সিলিন্ডার ঠান্ডা হতে হতে এর শক্তি হ্রাস পেত।

১৭৬৯ খ্রি. জেমস্ ওয়াট (১৭৩৬—১৮১৯) যতদিন তার বাষ্পীয় যন্ত্রের আধুনিকীকরণ করেননি, ততদিন বাষ্পীয় ইঞ্জিন শুধুমাত্র কয়লা খনিতেই ব্যবহৃত হতে লাগল। ওয়াট এমন এক ইঞ্জিনের বিকাশ ঘটান যা শুধু সাধারণ পাম্প হিসাবেই নয়, প্রধান চালকযন্ত্র (প্রাইম মুভার) হিসেবে কাজ করতে থাকে যার দ্বারা কারখানার মেশিনে শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

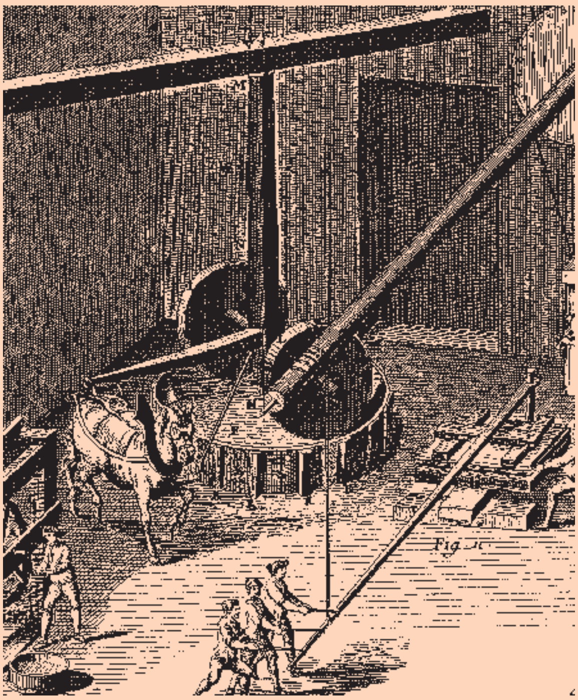

১৭৭৫ খ্রি. মেথিও বোলটন্ (১৭২৪—১৮০৯) নামক এক ধনী কারখানার মালিকের সহায়তায় ওয়াট বার্মিংহাম এ সোহো ফাউন্ড্রি (ঢালাই এর কারখানা) নির্মাণ করেন। এই কারখানা থেকে ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় উৎপাদিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওয়াটের ইঞ্জিন বিদ্যুৎশক্তিতে প্রতিস্থাপিত হতে শুরু করে।

১৮০০ খ্রি. পরে বাষ্পীয় ইঞ্জিন-প্রযুক্তি হালকা ও শক্তিশালী ধাতুর ব্যবহার দ্বারা, যথাযথ যন্ত্রপাতি, মেশিন এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদির দ্বারা উন্নত হচ্ছিল। ১৮৪০ খ্রি. নাগাদ বৃটেনে সমগ্র ইউরোপের প্রয়োজনীয় শক্তির ৭০% এর বেশি বাষ্পীয় শক্তি উৎপাদিত হতে থাকে।

চাকা ঘুরিয়ে ধাতুচূর্ণ করার জন্য ঘোড়া ব্যবহার করা হত। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে মানবশক্তি ও অশ্বশক্তির উপর নির্ভরশীলতা কমে যায়।

খাল ও রেলপথ

প্রাথমিকভাবে খাল সাধারণত শহরে কয়লা পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হত। এর কারণ ছিল ভারী ও বেশি পরিমান কয়লা সড়কপথে পরিবহনের সময় ও খরচ দুইই বেশি ছিল। অন্যদিকে মালবাহী নৌকাতে তা অনেক সহজসাধ্য ছিল। শিল্পে শক্তির উৎস হিসেবে এবং বাড়ী ঘরে তাপ ও আলোর জন্য কয়লার চাহিদা দিন দিন বাড়ছিল। ইংল্যন্ডে প্রথম ক্যানেল 'ওরসলি ক্যানেল' তৈরি করেন জেমস্ ব্রিন্ডলি (১৭১৬—৭২) ১৭৬১ খ্রি. এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ওরসলি (ম্যাঞ্চেস্টারের কাছে) কয়লাখনি থেকে শহরে কয়লা পরিবহন করা। এই খাল সম্পূর্ণ হওয়ার পর কয়লার দাম কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়।

খাল সাধারণত বড়ো বড়ো জমিদারদের দ্বারা খনি বা বনভূমির মূল্য বৃদ্ধির জন্য তৈরি হত। খালগুলোর সঙ্গমস্থলে নতুন শহরগুলোতে বিপণনকেন্দ্র তৈরি হতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বার্মিংহাম শহরের দ্রুত উন্নতির কারণ ছিল লন্ডন, ব্রিস্টল চ্যানেল মার্সে এবং হাম্বার নদীর সাথে যুক্ত খাল এর মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থান। ১৭৬০ থেকে ১৭৯০ খ্রি. মধ্যে ২৫টি খাল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ১৭৮৮ থেকে ১৭৯৬ খ্রি. পর্যন্ত সময় 'ক্যানেল ম্যানিয়া' বা খাল-উন্মাদ-সময় নামে পরিচিত হতে থাকে। কারণ এই সময়ের মধ্যে ৪৬ টি নতুন খাল পরিকল্পনা করা হয় এবং এর পরবর্তী ৬০ বছরের মধ্যে আরও ৪,০০০ মাইল খাল নির্মিত হয়।

প্রথম বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন স্টিফেনসন্স রকেট ১৮১৪ খ্রি. তৈরি হয়। রেলওয়ের আবির্ভাবের ফলে পরিবহন ব্যবস্থা সহজ হয়। দ্রুত ও সস্তায় যাত্রী ও দ্রব্যসামগ্রী পরিবহন সহজসাধ্য হয়। এই ব্যবস্থায় দুটি আবিষ্কারের উদ্ভাবন হয়, যার দ্বারা ১৭৬০ এর দশকে কাঠের রেলের পাটাতনের স্থান দখল করে লোহার রেলের পাটাতন এবং এর উপর বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন চালানো হয়।

রেলপথের আবিষ্কারের সাথে সাথে শিল্পায়নের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। ১৮০১ খ্রি. রিচার্ড ট্রেভিথিক এক নতুন ইঞ্জিন তৈরি করে তার নামকরণ করেন 'পাফিং ডেভিল' বা ফুঁ দেওয়া দানব, যাকে কর্ণওয়াল এর সেই খনির চারদিকে চালানো হতে থাকে যেখানে রিচার্ড কাজ করতেন। ১৮১৪ খ্রি. রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার জর্জ স্টিফেনসন 'দ্য ব্লুচার' নামে এক রেলইঞ্জিন তৈরি করেন। এই ইঞ্জিন ৪ মাইল প্রতি ঘন্টা বেগে ৩০ টন ওজন সহজেই পাহাড়ে উঠাতে পারত। ১৮২৫ খ্রি. সর্বপ্রথম রেললাইনযুক্ত হয় স্টকহোম ও ডারলিংটনের মধ্যে, ৯ মাইল দূরত্ব ২৪ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা (১৫ মাইল প্রতি ঘণ্টা) বেগে ২ ঘণ্টায় সম্পন্ন করা হয়। এর পর লিভারপুল ও ম্যাঞ্চেস্টার ১৮৩০ খ্রিঃ রেললাইন দ্বারা যুক্ত হয়। ২০ বছরের মধ্যে ৩০ থেকে ৫০ মাইল গতিতে রেল ইঞ্জিনের যাত্রা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের সময়কালে খালের মাধ্যমে পরিবহনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা তৈরি হয়। খালের কোনো কোনো স্থানে অত্যধিক জলযানের কারণে চলাচলের গতি মন্থর হয়ে আসে। এছাড়া তুষারপাত, বন্যা অথবা অনাবৃষ্টির জন্য জলযান ব্যবহারের সময়ও সীমিত হয়ে আসে। রেললাইনই পরিবহনের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক বিকল্প বলে মনে হয়। ১৮৩০ খ্রি. থেকে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটেনে ৬০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ তৈরি হয়। ১৮৩৩—৩৭ খ্রিঃ 'লিটল রেলওয়ে ম্যানিয়া' তে ১৪০০ মাইল রেললাইন তৈরি হয় এবং ১৮৪৪—৪৭ খ্রি. মধ্যে 'বিগার ম্যানিয়া' তে ৯৫০০ মাইল রেলপথ তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়। এই কাজ সম্পন্ন করতে প্রচুর পরিমানে কয়লা ও লোহার ব্যবহার করা হয়। প্রচুর পরিমানে শ্রমিক নিযুক্ত করার ফলে নির্মাণ ও সহকারী পূর্ত শিল্পের কার্যকলাপের গতি বৃদ্ধি পায়। ১৮৫০ খ্রি. মধ্যে ইংল্যন্ডের অধিকাংশ অঞ্চল রেললাইনের সাথে যুক্ত হয়েছিল।

আবিষ্কারক কারা ?

এটা খুবই কৌতুহলোদ্দীপক যে যারা এই পরিবর্তন এনেছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানী। উনবিংশ শতকের আগে শিক্ষার বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যার মৌলিক জ্ঞান খুব সীমিত ছিল, আর পূর্বে বর্ণিত প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ততদিনে সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।এই সমস্ত আবিষ্কার সম্পন্ন করার জন্য পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিষয়ে পূর্ব জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তাই বুদ্ধিদীপ্ত, স্বজ্ঞাত ও অধ্যবসায়ী চিন্তাবিদ্‌দের দ্বারা তা করা হয়েছিল। এই তথ্যও তাদের সাহায্য করেছিল যে, ইংল্যান্ডের এমন উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর ছিল না। ১৭৬০ থেকে ১৮০০ খ্রি. মধ্যে ডজন ডজন বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণাপত্র ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়। ছোট ছোট শহরেও জ্ঞানের জন্য ব্যাপক তৃষ্ণা ছিল। এই জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটানো হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে শিল্পকলার দ্বারা(১৭৫৪ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত), ভ্রাম্যমান প্রভাষকদের আলোচনা বা কফি হাউস এর আলোচনার মধ্য দিয়ে।

অধিকাংশ আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ অপেক্ষা দ্রব্য তৈরির সংকল্প , আগ্রহ, কৌতুহল এমনকি ভাগ্যের উপর নির্ভর করে হয়। বস্ত্র শিল্পের কিছু আবিষ্কারক যেমন জন কে এবং জন হারগ্রিভ্‌স বুনন শিল্প ও ছুতোরের কাজে দক্ষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রিচার্ড আর্করাইট ছিলেন নাপিত ও পরচুলা প্রস্তুতকারক , স্যামুয়েল ক্রম্পটনের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ছিল না, এডমণ্ড কাটরাইট সাহিত্য, ভেষজ শাস্ত্র ও কৃষি নিয়ে অধ্যয়ন করেন, প্রাথমিকভাবে তিনি পাদরি হতে চেয়েছিলেন এবং যান্ত্রিক বিষয় সম্পর্কে তার ধারণা কম ছিল।

বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়, থমাস সেভারী একজন সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন, থমাস নিউকামেন একজন কর্মকার ও তালার মিস্ত্রি ছিলেন এবং জেমস ওয়াট্‌ যান্ত্রিক বিষয়ে খুব আগ্রহী ছিলেন। প্রত্যেকেরই নিজেদের আবিষ্কারের সঙ্গো যুক্ত বিষয়ে জ্ঞান ছিল। সড়ক নির্মাতা জন মেট্‌কাফ যিনি ব্যক্তিগতভাবে রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা এবং সমীক্ষার সঙ্গো যুক্ত ছিলেন- তিনি অন্ধ ছিলেন। খাল প্রস্তুতকারক জেমস্‌ ব্রিন্ডলে প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। তিনি বানানের ক্ষেত্রে এত দুর্বল ছিলেন যে কখনো 'নেভিগেশন' শব্দ সঠিক ভাবে বানান করতে পারেন নি। কিন্তু তার ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং মনোযোগ।

জীবনধারায় পরিবর্তন :

এই সময়ের মধ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের দ্বারা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভবপর হয়েছিল। এছাড়া কিছু ধনী ব্যক্তিরা ছিলেন যারা অধিক মুনাফার জন্য এবং তাদের মূলধন দ্বিগুণ করার জন্য ঝুঁকি নিয়ে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলধন অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। আয়, সেবা, জ্ঞান ও উৎপাদন-দক্ষতার জন্য সম্পদের নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি ঘটে। একই সময়ে একটি নেতিবাচক দিক ছিল মানুষের মূল্য বোধের হ্রাস। এর ফলে পরিবার ভেঙ্গো যায়, ঠিকানা পরিবর্তন হয়, শহরের অধঃপতন ঘটে এবং কলকারখানায় কাজের পরিবেশ আতঙ্কজনক হয়ে ওঠে। ১৭৫০ খ্রি. যেখানে ইংল্যন্ডে ৫০,০০০ এর অধিক লোকসংখ্যাজনিত শহর ছিল দুটি, সেখানে ১৮৫০ খ্রি. পর্যন্ত তা বাড়তে বাড়তে ২৯ এ গিয়ে দাঁড়ায়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গো বাড়িঘর, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও পরিশ্রুত জলের পরিমাণ সঙ্গাতিপূর্ণ ছিল না।

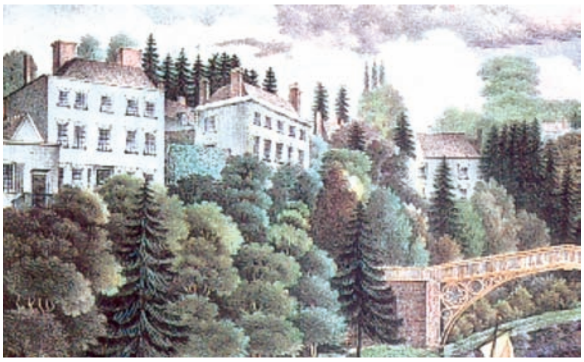

একেবারে বাঁ দিকে: কোলব্রুকডেল এ শ্রমিকদের জন্য কোম্পানির দ্বারা ১৭৮৩ খ্রি. তৈরি ছুতোরের সারিবদ্ধ কুটির

বাঁদিকে : ডার্বি পরিবারের বাড়ি। উইলিয়াম ওয়েস্টউড এর চিত্র, ১৮৩৫ খ্রি.

নবাগতদের কারখানার আশেপাশে জনাকীর্ণ ঘিঞ্জি বস্তিতে থাকতে হয়েছিল অথচ ধনী ব্যক্তিরা কোলাহলপূর্ণ শহর ছেড়ে শহরতলিতে থাকতে শুরু করল যেখানে পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, বায়ু স্বাস্থ্যকর ও পানীয়জল পরিস্কার ও নিরাপদ ছিল।

এডওয়ার্ড কার্পেন্টার ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ 'ইন অ্যা ম্যানুফেকচারিং টাউন'- এ (উৎপাদনকারী একটি শহরে) এই অবস্থার বর্ণনা করেছেন।

যখন আমি উদাস শহরে অস্থির ও হতাশ হয়ে ঘুরছিলাম,
তখন আমি সেখানে ক্লান্তহীন আগ্রহী মানুষদের দেখলাম
দেখে মনে হয়,
নরকের দ্বার দিয়ে আসা যাওয়া করছিল।
আমি দেখেছি লম্বা চিমনির ভিড়, ধোঁয়া উঠছে উপরে,
ঢেকে দিচ্ছে সূর্য, ঢেকে দিচ্ছে পৃথিবী নিজের বোঝা দিয়ে,
আর দেখেছি বিপুল আবর্জনার স্তূপ,
যার উপরে উঠে নাচছিল অবোধ শিশুরা,
আর ছিল বীভৎস অর্ধ ছাউনিযুক্ত ধোঁয়ার কালো ঘর,
আর দেখেছি কালো নদীর স্রোত,
যখন আমি এইসব দেখছিলাম, নজর পড়ে,
দূরে যেখানে পুঁজিপতিদের ঘর,
যেখানে, উদ্যানবাটি, উঁচু উঁচু প্রাচীর ঘেরা বাগান,
সুদূর সজ্জিত যান,
আর তারাই মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের থেকে
যাদের কারণে তারা ছিল সমৃদ্ধ।
—এই সব দেখে আমার হৃদয় কম্পিত হয়ে উঠে।

শ্রমিক :

১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, সমাজের অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর তুলনায় শহরের বেতনভোগী শ্রমিকদের জীবনকালের মেয়াদ অনেক কম ছিল বার্মিংহামে ১৫ বছর ম্যাঞ্চেস্টারে ১৭ বছর এবং ডার্বিতে ২১ বছর নতুন শিল্প শহরগুলোতে গ্রামের থেকে আসা মানুষরা গ্রামের মানুষদের তুলনায় অনেক অল্প বয়সে মারা যেত। এই সব অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করা শিশুদের মধ্যে অর্ধেক হয়তো পাঁচ বছর বয়সের আগেই মারা যেত। শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ওই স্থানে বসবাসকারী পরিবারের শিশু জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে হয়নি, বরং শহরে আগত অধিবাসীদের জন্য হয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল জলদূষণ জনিত মহামারী যেমন কলেরা, টাইফয়েড

এবং বায়ু দূষণজনিত মহামারী যেমন যক্ষ্মা। ১৮৩২ খ্রি. প্রায় ৩১,০০০ লোক কলেরা রোগে মারা যায়। উনবিংশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত পৌর কর্তৃপক্ষ মানব জীবনের এই ভয়ঙ্কর অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করেনি এবং এইসব রোগের কারণ এবং চিকিৎসা বিষয়ক কোনো জ্ঞানও তখন অজানা ছিল।

মহিলা শিশু ও শিল্প বিপ্লব

শিল্প বিপ্লবের ফলে মহিলা ও শিশুদের কাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। গ্রামের গরিব শিশুরা বাড়ীতে বা ফার্মে তাদের পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনের নজরদারিতে দিনের বেলা বা ঋতু অনুসারে বিভিন্ন রকমের কাজ করত। সেইরূপ মহিলারাও সক্রিয়ভাবে খামারের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারা পশু লালনপালন করত, রান্নার জন্য কাঠ সংগ্রহ করত এবং চরকায় সুতো তৈরি করত।

কলকারখানার কাজ সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের ছিল, যেখানে দীর্ঘ সময় বিরামহীন কঠোর শৃঙ্খলা ও শাস্তির ভয়ের মধ্যে কাজ করতে হত। পুরুষদের কম মজুরি পাওয়ার ফলে অভাব পূরণের জন্য মহিলা ও শিশুদেরও উপার্জন করতে হত। যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের প্রয়োজন কমতে লাগল। শিল্পপতিরা পুরুষদের তুলনায় মহিলা ও শিশুদের বেশি কাজে লাগানোর চেষ্টা করত। কারণ তাদের মজুরি ছিল পুরুষদের তুলনায় কম এবং তারা কাজের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্পর্কে কম বিক্ষোভ দেখাত।

ল্যাঙ্কাশায়ার ও ইয়র্কশায়ার শহরে সুতি বস্ত্রের কারখানায় এদের প্রচুর পরিমানে কাজে লাগানো হত। রেশম, ফিতা তৈরি ও বুননকার্যে মহিলারাই ছিল প্রধানত শ্রমিক বার্মিংহাম- এ ধাতু তৈরির কারখানাতে (শিশু সহ) মহিলাদের শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হত।

বার্মিংহাম এ গিল্ট বোতাম কারখানায় মহিলা ঃ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বোতাম তৈরি ও ব্যবসায় নিযুক্ত মোটশ্রমিকের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল মহিলা ও শিশু। প্রতি সপ্তাহে কাজের জন্য পুরুষদের ২৫ শিলিং মজুরি দেওয়া হত। একই কাজের জন্য শিশুরা পেত ১ শিলিং এবং মহিলাদের দেওয়া হত ৭ শিলিং।

বিভিন্ন যন্ত্রপাতির যেমন কার্পাস কাটার স্পিনিং জেনি মেশিন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, শিশুরা তাদের শরীরের ছোটো আকারের জন্য এবং ছোটো ছোটো আঙুলের দ্বারা সহজেই এতে কাজ করতে পারত। বস্ত্র শিল্পের কারখানায় শিশুদের শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা ছিল। কারণ তারা সহজেই ঠাসাঠাসি করে রাখা যন্ত্রপাতির মধ্য দিয়ে যাওয়া আসা করতে পারত। রবিবারেও তাদের মেশিন পরিষ্কার করতে হত। ফলে তারা মুক্ত বায়ু কমই পেত এবং শরীরচর্চা কখনো করতে পারত না। শিশুদের চুল মেশিনে আটকে যেত, কখনো হাত থেতলে যেত, কখনো কাজ করতে করতে তারা এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়ত যে ঘুমিয়ে পড়ত আর মেশিনের উপর পড়ে তাদের মৃত্যু ঘটত।

কয়লাখনিতে কাজ করা অনেক বেশি বিপজ্জনক ছিল। ছাদ ভেঙে পড়া, আকস্মিক বিস্ফোরণ এবং আঘাত পাওয়া ছিল নিয়মিত ঘটনা। খনির মালিকরা খনির অনেক গভীরে যেখানে পরিণত বয়স্ক লোকদের পৌঁছাতে অসুবিধা হত, সেখানে শিশুদের পাঠাত। ছোটো শিশুরা ট্রেপার (trappers) হিসাবেও কাজ করত। যখন কয়লাবাহী গাড়িগুলো চলাফেরা করত, তখন তারা প্রয়োজন মত দরজা খোলা ও বন্ধ করার কাজ করত। কখনো তারা কয়লা-বাহক হিসাবেও পিঠে করে কয়লা পরিবহন করত।

লন্ডন এর গরিব এলাকার এক রাস্তা। ফ্রান্সের চিত্রকার ডোরের আঁকা চিত্র, ১৮৭৬ খ্রি.

কারখানার মালিকরা শিশু-শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ মনে করত, কারণ তারা ছোটোবেলা থেকে প্রশিক্ষিত হতে হতে ভবিষ্যতে ভালো শ্রমিক হতে পারত। ব্রিটিশ কারখানার তথ্য অনুসারে কারখানায় কর্মরত অর্ধেকের বেশি শ্রমিক তাদের দশ বছর বয়সের পূর্বে এবং ২৮ শতাংশ শ্রমিক চোদ্দ বছর বয়সের পূর্বেই শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করে। মজুরি পাওয়ার ফলে মহিলাদের স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান বেড়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর লাভের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর ছিল অপমানজনক পরিস্থিতিতে কাজ করা। অনেক সময় জন্মের পরেই বা শৈশবাবস্থায় তাদের সন্তানদের মৃত্যু হত এবং তাদের শিল্পক্ষেত্রে কাজের তাগিদে বাধ্য হয়ে নোংরা বস্তিতে থাকতে হত।

শিল্পবিপ্লবের পরিণাম স্বরূপ গরিবদের যে ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সম্ভবত সেই সময়ে এর সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন চার্লস ডিকেন্স (১৮১২—৭০)। তিনি তার উপন্যাস 'হার্ড টাইমস্' এ কোকটাউন নামে একটি কাল্পনিক শিল্প-শহরের বর্ণনা করেছেন। এটি লাল ইটের তৈরি একটি শহর ছিল, কিন্তু এটি লাল থাকতে পারত যদি ধোঁয়া ও ছাই একে লাল থাকতে দিত। কিন্তু এটি অস্বাভাবিক লাল কালো রঙের চেহারার মত ছিল। এটি যন্ত্রপাতি এবং গগনচুম্বী চিমনির শহর ছিল, যেখানে ধোঁয়া কুণ্ডলীর মত না হয়ে কুণ্ডলীহীন সোজাভাবে ক্রমাগত বেরোত। এই শহরে একটি কালো খাল ছিল এবং একটি বেগুনী রঙের দুর্গন্ধযুক্ত নদী ছিল। সেখানে অনেক ইমারত ছিল যেগুলোর ভেতরে চলমান মেশিনের জন্য এর জানালা সবসময় ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ করত এবং কাঁপতে থাকত। সেখানে একটি বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের পিস্টন একঘেয়েভাবে উঠানামা করত। দেখে মনে হত একটি হাতি তার হতাশার দুঃখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কার্যাবলি-৩

ব্রিটিশ শহর ও গ্রামের উপর প্রারম্ভিক শিল্পায়নের প্রভাব আলোচনা কর এবং ভারতের অনুরূপ পরিস্থিতির সাথে তুলনা কর।

ব্রিটেনের প্রবন্ধকার এবং ঔপন্যাসিক ডি. এইচ লরেন্স (১৮৮৫—১৯৩০) চার্লস ডিকেন্সের ৯০ বছর পর কয়লা খনির কাছে এক গ্রামের পরিবর্তনের বর্ণনা করেছেন যা তিনি তার নিজের অভিজ্ঞতার থেকে লেখেনি, বরং বয়স্কদের মুখে শুনে লিখেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইস্টউড— একটি ছোটো গ্রাম ছিল, যেখানে ছোটো ছোটো কুঁড়ে ঘর ছিল। খনির শ্রমিকদের চার কামরার ছোটো ছোটো ভগ্ন ঘর ছিল এবং পুরোনো খনি মালিকদের ঘর ছিল। কিন্তু ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের আশেপাশে কোম্পানি প্রথম বড় খাদন শুরু করে এবং কয়লা উৎপাদনের জন্য প্রথম যন্ত্রপাতি স্থাপন করে। শ্রমিকদের থাকার ছোটো ছোটো ঘরগুলো ভেঙ্গে দেওয়া হয়, নাট্টিংহাম রোডের পাশে ছোটো ছোটো দোকান ঘর তৈরি হয়। আর নিচের ঢালে কোম্পানী কিছু ইমারত তৈরি করে যেগুলোকে আজও 'নতুন ইমারত' নামে অভিহিত করা হয়। ভয়ানক ফাঁকা রাস্তায় চার কামরার ছোটো ছোটো ঘর ছিল যার পেছনে নির্জন জায়গা ছিল, ব্যারাকের মতো সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল—খুব অদ্ভুত ব্যাপার ছিল।

প্রতিবাদী আন্দোলন :

শিল্পবিপ্লবের গোড়ার দিকে ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯—৯৪) উদ্ভূত নতুন নতুন রাজনৈতিক ধ্যানধারণার প্রসার ঘটে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন প্রমাণ করেছে যে, সংঘবন্ধ আন্দোলন সম্ভব। যার দ্বারা ১৭৯০ খ্রিঃ ফ্রান্স সংসদীয় পরিষদ এর মত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় এবং রুটির মত প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণ করে যুদ্ধের মত কঠিন পরিস্থিতিকেও প্রতিহত করা যায়।

ইংল্যন্ডের কারখানায় কাজের কঠোর পরিস্থিতির বিরুদ্ধে কর্মরত শ্রমিকদের রাজনৈতিক আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং শ্রমজীবী মানুষ ভোটের অধিকারের জন্য আন্দোলন করছিল। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সরকার দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে এবং আইনপ্রণয়ন করে মানুষের প্রতিবাদের অধিকার খর্ব করে।

১৭৯২ খ্রি. থেকে ১৮১৫ খ্রি. পর্যন্ত ইংল্যান্ড ফ্রান্সের সঙ্গো যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ইংল্যন্ড ও ইউরোপের মধ্যে যে বাণিজ্য চলছিল যা বিপর্যস্ত হয়ে, কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন মাংস রুটি ইত্যাদির দাম মানুষের উপার্জন ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেড়ে যায়।

১৭৯৫ খ্রি. ব্রিটেনের সংসদ দুটি আইন পাশ করে যার দ্বারা কোনো ভাষণ বা লেখা দ্বারা সম্রাট, সংবিধান, বা সরকারের বিরুদ্ধে কোনো ঘৃণা পোষণ বা অপমান করার জন্য মানুষদের উত্তেজিত করা অবৈধ বলে ঘোষিত হয় এবং ৫০ জন এর বেশি লোকের বিনা অনুমতিতে সভা করা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু আগের দুনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত ছিল। 'পুরানো দুর্নীতি বলতে রাজতন্ত্র ও সংসদের বিশেষ সুবিধা ভোগকে বোঝানো হত। সংসদের সদস্য বিশেষ করে — জমিদার, উৎপাদক, ব্যবসায়ীরা শ্রমজীবী মানুষদের ভোটদানের বিরোধী ছিল। তারা 'কর্নল' ('Corn Laws') বা শস্য আইনকে সমর্থন করে, যার দ্বারা সস্তায় খাদ্য আমদানি রোধ করা হয়েছিল, যতদিন পর্যন্ত না বৃটেনে খাদ্যশস্যের দাম একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বেড়ে গেল।

যখন শহর এবং কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল, তারা প্রতিবাদের মাধ্যমে তাদের

রাগ ও হতাশা প্রকাশ করতে লাগল। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে সারা দেশে রুটি বা খাদ্যদ্রব্যের জন্য দাঙ্গা হতে থাকে। রুটি ছিল দরিদ্রদের প্রধান খাদ্য এবং এর দামের উপরই এদের জীবনধারা নির্ভর করত।

তারা রুটির মজুত ভাণ্ডার কব্জা করে এবং তা নির্ধারিত মূল্যের অনেক কম মূল্যে বিক্রি করা শুরু করে, যা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ছিল এবং যা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সঠিক ছিল। ১৭৯৫ খ্রি. এই দাঙ্গা বার বার হতে থাকে আর তা অব্যাহত থাকে ১৮৪০ খ্রি. পর্যন্ত।

সমস্যার অন্য একটি কারণ ছিল বেষ্টনী পদ্ধতি, যার দ্বারা ১৭৭০ খ্রি. শত শত ছোটো ছোটো জমি শক্তিশালী জমিদারদের কোনো বড় ফার্মের মধ্যে যুক্ত করে দেওয়া হয়। গরিব গ্রামীণ মানুষেরা এর দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তারা শিল্পক্ষেত্রে কাজের অন্বেষণ করতে লাগল। কিন্তু বস্ত্রশিল্পে যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে হাজার হাজার হস্তচাঁত উৎপাদনকারী শ্রমিককে কারখানা থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং দারিদ্রতার গহ্বরে ঠেলে দেওয়া হয়। কারণ শ্রমের প্রতিযোগিতায় মেশিনের তুলনায় তারা ধীর গতি ছিল। ১৭৯০ খ্রি. বয়নশিল্পের কর্মরত শ্রমিকরা ন্যূনতম বৈধ বেতন দাবি করে যা সংসদ কর্তৃক প্রত্যাহৃত হয়। যখন শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে তখন শক্তি দ্বারা তাদের দমন করা হয়। শ্রমিকরা হতাশ হয়ে ল্যাঙ্কাশায়ার এ বৈদ্যুতিক তাঁতের মেশিন নষ্ট করে দেয়, কারণ তারা মনে করে, এটিই তাদের জীবিকা ধ্বংস করেছিল। নটিংহাম এ উল বুনন কারখানায়ও প্রতিরোধ শুরু হয় লিসেস্টার শায়ার ও ডার্বিশায়ার এও প্রতিরোধ শুরু হয়।

ইয়র্কশায়ারএ লোম উৎপাদনকারী খাঁচাগুলো ভাগচাষিরা ভেঙে ফেলে, যারা পরম্পরাগতভাবে হাতে ভেড়ার লোম কাটত। ১৮৩০ খ্রি. দাঙ্গায় শস্য খোসা ছাড়ানোর কল (প্রেসিং মেশিন) যেগুলো শ্রমিকদের চাকুরি চলে যাওয়ার কারণ ছিল সেগুলো তারা ভেঙে দিল। এই ঘটনায় ৯ জন শ্রমিককে ফাঁসি দেওয়া হয় আর ৪৫০ জনকে বন্দির মত অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন জেনারেল নেড লুড এর নেতৃত্বে লুডিজম (১৮১১—১৭) নামে অন্য আন্দোলনের শুরু হয়। লুডিজম মেশিন ভাঙাকে সমর্থন করে না, বরং ন্যূনতম মজুরি, শিশু ও মহিলাদের শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ, যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে বেকারদের জন্য কাজ এবং আইনগতভাবে তাদের দাবিদাওয়া পেশ করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করার দাবি করে।

শিল্পায়নের গোড়ার দিকে শ্রমজীবী মানুষদের কাছে তাদের জীবনধারাকে তছনছ করে দেওয়া পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তাদের বিক্ষোভ জাহির করার জন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া ছিল না তাদের ভোটদানের অধিকারও ছিল না। ১৮১৯ খ্রি. আগস্ট মাসে ৮০,০০০ লোক তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্থাৎ রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করা, সমিতি করা এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দাবি করার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে ম্যাঞ্চেস্টারের সেন্ট পিটার্স ময়দানে মিলিত হয়। কিন্তু বর্বরতার সঙ্গে তাদের দমন করা হয়, যা পিটারলু হত্যাকান্ড নামে পরিচিত। তারা যে অধিকার দাবি করেছিল, ষষ্ঠ আইন দ্বারা সেই বছরই তা বাতিল করা হয়। এই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল ১৭৯৫ খ্রি. দুটি সমন্বিত আইনের দ্বারা। এর দ্বারা কিছু লাভও হয়েছিল। পিটারলু ঘটনার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ 'হাউজ অব কমন্স' কে প্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উদারনৈতিক রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ১৮২৪—২৫ খ্রি. ১৭৯৫ খ্রি. দুটি সমন্বিত আইনকে নাকচ করা হয়।

*এই শব্দটি ওয়াটারলু শব্দের সঙ্গে মিল করে রাখা হয়েছিল, ১৮১৫ খ্রি. ওয়াটারলুতে ফরাসি সেনারা পরাজিত হয়েছিল।

আইন দ্বারা সংস্কার

সরকার মহিলা ও শিশুদের কাজের অবস্থার প্রতি কতটা যত্নবান ছিল? ১৮১৯ খ্রি. কিছু আইন তৈরি করা হয় যার দ্বারা ৯ বছর বয়সের কম শিশুদের কারখানায় কাজ করানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপিত হয় এবং ৯ থেকে ১৬ বছর বছর বয়স পর্যন্ত শিশু শ্রমিককে ১২ ঘন্টা কাজের সময় সীমিত করা হয়। কিন্তু আইন বলবৎ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়নি। উত্তর ইংল্যান্ডে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হলে ১৮৩৩ খ্রি. এক আইন তৈরি করা হয় যার দ্বারা ৯ বছর বয়সের কম শিশুদের শুধু রেশম এর কারখানায় শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হয়। বয়সে বড়ো শিশুদের কাজের সময় সীমিত করা হয় এবং কিছু কারখানা-পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয় যারা আইন সঠিক ভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতেন। শেষপর্যন্ত ৩০ বছরেরও বেশি সময়ের আন্দোলনের পর ১৮৪৭ খ্রি. দশ ঘন্টা কাজের সময় এর বিল পাশ হয়। এই আইন দ্বারা মহিলা ও শিশুদের কাজের সময় সীমিত করা হয় এবং পুরুষদের কাজের সময় ১০ ঘণ্টা নির্ধারণ করা হয়।

কার্যাবলি-৪

শিল্পক্ষেত্রে কাজের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী আইন কানুনের পক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা কর।

এই আইন বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও খনি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিলনা। ১৯৪২ খ্রি. সরকার দ্বারা গঠিত খনি কমিশন এর মতে, খনি শিল্পে কাজের অবস্থা ১৮৩৩ খ্রিঃ আইন চালু হওয়ার আগে আরও বেশি খারাপ ছিল। কারণ প্রথম থেকেই কয়লা খনিতে প্রচুর শিশুদের শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৪২ খ্রি. খনি এবং কয়লাখনি আইন দ্বারা ১০ বছর বয়সের কম শিশুদের এবং স্ত্রীলোকদের খনির ভুগর্ভে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। 'ফিল্ডার্স ফ্যাক্টরি' আইন দ্বারা ১৮ বছর বয়সের কম শিশু এবং স্ত্রীলোকদের কাজের সময় নির্ধারণ করা হয় ১০ ঘন্টা। এই আইন সঠিকভাবে জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয় কারখানা-পরিদর্শকদের উপর। কিন্তু এটি সহজসাধ্য ছিল না। এর একটি কারণ ছিল কারখানা-পরিদর্শকদের বেতন ছিল খুব কম, আর কারখানার ম্যানেজার খুব সহজেই ঘুষ দিয়ে তাদের প্রতিহত করতেন। অন্যদিকে পিতামাতারাও শিশুদের প্রকৃত বয়স কমিয়ে পরিবারে আর্থিক সহযোগিতার জন্য শিশুদের কাজে লাগিয়ে দিতেন।

শিল্প-বিপ্লব সম্পর্কে বিতর্ক

১৭৮০ খ্রি. থেকে ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটেনে শিল্পের যে বিকাশ হয় তা বিচার করে ঐতিহাসিকরা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'শিল্প বিপ্লব' কথাটি ব্যবহার করেছেন। এরপর থেকে এই শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া এত ধীরগতিতে হয় যে, একে বিপ্লব বলা যায় না। শুধুমাত্র ইতিমধ্যে বিদ্যমান প্রক্রিয়াকে নতুন মাত্রা দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে তুলনামূলকভাবে কারখানাগুলোতে শ্রমিক সমাবেশ বৃদ্ধি পায় এবং অর্থের প্রয়োগ ও ব্যাপক ভাবে হতে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দী শুরুর অনেক পর পর্যন্তও ইংল্যান্ডের বড় বড় অঞ্চল কারখানা বা খনি থেকে দূরে অবস্থান করছিল। এই কারণে শিল্প বিপ্লব শব্দটি যথার্থ নয়। ইংল্যান্ডে পরিবর্তন আঞ্চলিকভাবে হয়েছিল। সারা দেশে নয়, লণ্ডন, ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম অথবা নিউক্যাসেল শহরে হয়েছিল।

১৭৮০ থেকে ১৮২০ খ্রি. পর্যন্ত বস্ত্র বা লৌহ শিল্পের বিকাশ বা বৈদেশিক বাণিজ্যকে কি বৈপ্লবিক বলা যায়? নতুন যন্ত্রপাতির দ্বারা সুতিবস্ত্র শিল্পে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। এরজন্য কাঁচামাল ও ব্রিটেনের

বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল এবং উৎপন্ন দ্রব্যও অন্যান্য দেশে (বিশেষত ভারতে) বিক্রি করা হত। ধাতুর তৈরি মেশিন এভং বাষ্পশক্তিও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত খুব স্বল্প পরিমাণে ছিল। ১৭৮০ খ্রি. পর্যন্ত ব্রিটেনের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে যে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল, তার প্রধান কারণ ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম বাধাগ্রস্ত হওয়ার উত্তর আমেরিকার সাথে বাণিজ্য ক্ষেত্রের অসুবিধা দূর হয় এবং পুনরায় বাণিজ্য - সম্পর্ক শুরু হয়। আর বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধিকে তীব্র বলে দেখানো হয়েছিল কারণ এটি একেবারে নিম্ন বিন্দু থেকে শুরু হয়েছিল।

আর্থিক পরিবর্তনের সূচক থেকে দেখা যায়, উল্লেখ করার মত শিল্পায়ন ১৮১৫—২০ খ্রি. আগে নয়, বরং পরে শুরু হয়েছিল। ১৭৯৩ খ্রি. পরবর্তী সময়ে শিল্পায়নের উপর ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ানের যুদ্ধের ফলে যে সংহতিনাশক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাব পড়ে। শিল্পায়নকে দেশের সম্পদ ও পুঁজি গঠনের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের সঙ্গো, নির্মাণকাজ বা নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করার সঙ্গো, এই সব সুযোগ সুবিধা দক্ষভাবে ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতার সঙ্গো যুক্ত করা হয়। ১৮২০ খ্রি. পরে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো বিনিয়োগের মাত্রাও বাড়তে থাকে। ১৮৪০ খ্রি. পর্যন্ত তুলা, লোহা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে অর্ধেকের চেয়েও কম দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন হত। প্রযুক্তির উন্নতি এই সব শাখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং কৃষিপ্রক্রিয়া অথবা মাটির পাত্র তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে।

ব্রিটেনের শিল্পবিকাশ ১৮১৫ খ্রি. আগের তুলনায় পরে কেন বেশি হয়েছে এর উত্তরে ঐতিহাসিকগণ সেই তথ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন যে, ১৭৬০ থেকে ১৮১৫ খ্রি. পর্যন্ত ব্রিটেন একসাথে দুটি কাজে যুক্ত ছিল—প্রথমত শিল্পায়ন, দ্বিতীয়ত ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং ভারতের সাথে যুদ্ধ। আর এর ফলে ইংল্যান্ড একটি কাজে অসফল হয়। ১৭৬০ খ্রি. পর ৬০ বছরের মধ্যে ৩৬ বছর পর্যন্ত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। ঋণ করা মূলধন বিনিয়োগ করার পরিবর্তে যুদ্ধের জন্য ব্যয়িত হতে থাকে। এমনকি যুদ্ধের ৩৫% খরচ মানুষের আয়কর থেকে মেটানো হত। শ্রমিকদের কারখানা ও জমি থেকে সরিয়ে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করা হত। খাদ্যদ্রব্যের দাম এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করারও ক্ষমতা ছিলনা। নেপোলিয়ানের প্রতিরোধ নীতি এবং ব্রিটেনের পাল্টা অবরোধ নীতির ফলে ইউরোপে বাণিজ্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এতে ব্রিটেনের ব্যবসায়ীদের কাছে অর্ধেকেরও বেশি রপ্তানি করার স্থান হস্তচ্যুত হয়।

বিপ্লবের সঙ্গো ব্যবহৃত শিল্প শব্দটি অর্থের দিক থেকে খুব সীমিত। এই সময় যে পরিবর্তন হয়, তা শুধু অর্থ বা শিল্পের ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না, বরং এর প্রভাব সমাজের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে সমাজে দুটি শ্রেণির উদ্ভব হয়—বুর্জোয়া এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী সর্বহারা শ্রেণি।

১৮৫১ খ্রি. লন্ডনে বিশেষ ভাবে তৈরি এক ক্রিস্টেল প্যালেস এ ব্রিটিশ শিল্পের সাফল্য পর্যবেক্ষণের জন্য এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল যা দেখার জন্য বহু সংখ্যার দর্শক উপস্থিত হয়। সেই সময় দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা শহরে বাস করত। কিন্তু শহরে বসবাসকারী শ্রমিকদের মধ্যে বেশিরভাগ হস্তশিল্পের কারখানায় কাজ করত। ১৮৫০ খ্রি. থেকে শহরে বসবাসকারী মানুষের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে অধিকাংশ শ্রমিক শিল্পক্ষেত্রে কাজ করত। ব্রিটেনের শ্রমিকদের মাত্র ২০% সেই সময় গ্রামে বাস করত। শিল্পায়নের এই গতি ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইংল্যান্ডে বেশি ছিল।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের বিশেষ প্রদর্শনীতে সমস্ত রাষ্ট্রের শিল্পায়নের অবস্থান বিশেষ করে ব্রিটেনের আকর্ষনীয় অগ্রগতি প্রদর্শিত হয়। এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা লন্ডনের হাইড পার্ক এর ক্রিস্টল প্যালেসে এ করা হয়েছে যা বার্মিংহামে উৎপন্ন লৌহ ফলক এর উপর কাঁচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।

ব্রিটিশ শিল্পায়ন সম্পর্কে বিস্তৃত অধ্যয়ন করে ঐতিহাসিক এইমসন্ বলেন যে, ১৮৫০—১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে যখন শিল্পবিপ্লব সত্যিই ব্যাপক মাত্রায় ঘটেছিল, তখন তার একটি সঠিক ভিত্তি ছিল। এর দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থা এবং সমাজের এত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যা পূর্ববর্তী পরিবর্তনের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১। ১৭৯৩ থেকে ১৮১৫ খ্রি. পর্যন্ত ব্রিটেন বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, ব্রিটেনের শিল্পায়নের উপর এর কি প্রভাব পড়ে?

২। খাল ও রেল পরিবহনের আপেক্ষিক সুবিধা কি ছিল?

৩। এই সময়ের আবিষ্কারের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

৪। কিভাবে কাঁচামালের সরবরাহ ব্রিটিশ শিল্পায়নের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা কর।

সংক্ষেপে প্রবন্ধ লিখো ঃ

৫। ব্রিটেনের বিভিন্ন শ্রেণির মহিলাদের জীবনযাত্রা শিল্পবিপ্লব দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল?

৬। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উপর রেললাইনের বিস্তারে কি প্রভাব পড়েছিল তার তুলনামূলক আলোচনা কর।

বিষয়
১০

দেশীয় অধিবাসীদের বিতাড়ন
(DISPLACING INDIGENOUS PEOPLES)

এই অধ্যায়ে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ইতিহাসের কিছু লক্ষণীয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগালের উপনিবেশিকতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অংশ তথা মধ্য, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড-এ ইউরোপ থেকে প্রবাসীরা এসে বসতি স্থাপন করে। এর ফলে স্থানীয় নাগরিকদের উপর অন্য এলাকায় যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি হতে থাকে, ইউরোপীয় লোকদের এই ধরনের বসতি 'কলোনি' নামে (উপনিবেশ) পরিচিত ছিল। যখন ইউরোপীয় দেশের অধিবাসীরা মাতৃদেশ ইউরোপ থেকে স্বাধীন হয়ে যায় তখন এই কলোনিগুলো অন্য দেশ বা রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ এই সব দেশে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার লোকজন এইসব দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায়। আর ওই স্থানের মূল অধিবাসীরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। শহরে তাদের খুব কমই দেখা যেত এবং মানুষ ভুলেই গিয়েছিল যে একদা তারা এই দেশের অধিকাংশ এলাকা অধিকার করেছিল। বিভিন্ন নদী, শহর ইত্যাদির নাম স্থানীয় নামের সঙ্গে মিল রেখে রাখা হয়েছিল। (যেমন— আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও, মিসিসিপি এবং সিয়েটল্; কানাডার সস্কেতশেওয়ান্ এবং অস্ট্রেলিয়ার ওলংগঙ্গা এবং প্যারামট্টা।)

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে আলোচিত হয়েছে, কীভাবে ইউরোপীয়রা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা তথা অস্ট্রেলিয়ায় অনুসন্ধান করেছিল। তারা দেশীয় লোকদের সম্পর্কে খুব কমই আলোচনা করছেন। যতটুকুই আলোচনা করেছেন এর মধ্যে শুধু ইউরোপীয় লোকদের প্রতি তাদের শত্রুতাপূর্ণ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৮৪০ খ্রি. থেকে আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদরা এদের সম্পর্কে গবেষণা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই অঞ্চলের মূল আদিবাসীদের নিজেদের ইতিহাস লিখতে ও বলতে উৎসাহিত করা হয়।

বর্তমানে স্থানীয় লোকদের দ্বারা রচিত ইতিহাস বা গল্পকাহিনি পাঠ করা সম্ভব হয়েছে। যাদুঘরে দর্শকরা দেখবে স্থানীয় শিল্প কলার গ্যালারি এবং বিশেষ যাদুঘরে দেখা যাবে আদিম অধিবাসীদের জীবনধারা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের নতুন জাতীয় জাদুঘর যত্ন সহকারে তত্ত্বাবধান করেছে আমেরিকান ইন্ডিয়ানরাই।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ

সপ্তদশ শতাব্দীর পর আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগালের সাম্রাজ্যবাদ আর বিস্তৃত হয়নি। সেই সময় থেকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং হল্যান্ড সহ অন্যান্য দেশ আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়াতে তাদের বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় এবং উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে। আয়ারল্যান্ডও বস্তুত ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল, কারণ সেখানকার বসবাসকারী বেশিরভাগ জমিদার ইংরেজ ঔপনিবেশিক ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুনাফার জন্যই বিভিন্ন দেশগুলো তাদের উপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের উপনিবেশ স্থাপনের প্রকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ তারতম্য ছিল। দক্ষিণ এশিয়াতে বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো যেমন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করে, স্থানীয় শাসকদের পরাজিত করে এবং বিভিন্ন অঞ্চল আত্মসাৎ করে। তারা ওই অঞ্চলগুলোর পুরোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা বজায় রাখে এবং জমিদারদের থেকে কর আদায় করতে থাকে। পরবর্তী সময়ে বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য তারা রেলপথ স্থাপন করে, খনি খনন করে এবং বড়ো বড়ো বাগিচা তৈরি করে।

ইউরোপীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আফ্রিকার সমস্ত উপকূলেই ব্যবসা করতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে তারা আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশের উদ্যোগ নেয়। এরপর কিছু ইউরোপীয় দেশ একটি চুক্তিতে এসেছিল যে তাদের নিজেদের জন্য আফ্রিকাকে উপনিবেশ হিসাবে ভাগ করা হবে।

'সেট্‌লার' (Settler) বা উপনিবেশবাসী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাচদের সম্পর্কে, আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার ব্রিটিশদের সম্পর্কে এবং আমেরিকায় ইউরোপীয়দের সম্পর্কে। এইসব উপনিবেশগুলোর সরকারি ভাষা ছিল ইংরেজি (একমাত্র কানাডা ছাড়া সেখানে সরকারি ভাষা হিসাবে ফরাসিও ছিল।)

নতুন বিশ্বের দেশগুলোকে ইউরোপীয়দের দেওয়া নাম

'আমেরিকা'	আমেরিকা ভেসপুচির (১৪৫১-১৫১২) ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশনার পর প্রথম ব্যবহৃত হয়।
'কানাডা'	কানাটা শব্দ থেকে উৎপত্তি। (১৮৩৫খ্রি. অনুসন্ধানকারী জ্যাক কার্টিয়ার এর পাওয়া তথ্য অনুসারে হিউরোন ইরোকুইস ভাষায় কানাটা শব্দের অর্থ 'গ্রাম'।)
'অস্ট্রেলিয়া'	ষোড়শ শতাব্দীতে বৃহত্তর দক্ষিণ মহাসাগরে অবস্থিত ভূমির জন্য দেওয়া নাম (লাতিন শব্দ অনুসারে 'অস্ট্রাল' কথাটির অর্থ হল দক্ষিণ)
'নিউজিল্যান্ড'	হল্যান্ড এর তাসমান প্রদত্ত নাম, যিনি ১৬৪২ খ্রি. প্রথম এই দ্বীপকে দেখেন। (ডাচ ভাষায় সমুদ্রকে 'জি' বলা হত।)

[জিওগ্রাফিক্যাল অভিধানে (পৃঃ ৮০৫-৮২২) আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার এমন একশোটিরও বেশি স্থানের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে, যা নিউ থেকে শুরু হয়]

উত্তর আমেরিকা

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ সুমেরুবৃত্ত থেকে কর্কটক্রান্তিরেখা পর্যন্ত এবং প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। রকি পর্বতের পশ্চিম পাদদেশে অ্যারিজোনা ও নেভাডা মরুভূমি অবস্থিত। আরও কিছু পশ্চিমে সিয়েরা নেভাডা পর্বত অবস্থিত। পূর্বে রয়েছে বিশাল সমভূমি, বিশাল হ্রদ, মিসিসিপি, ওহিও উপত্যকা ও অ্যাপালেচিয়ান পর্বত। দক্ষিণে মেক্সিকো অবস্থিত। কানাডার ৪০ শতাংশ অঞ্চল বনভূমিতে আবৃত। কোনো কোনো অঞ্চলে খনিজ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় যার সাহায্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে বড়ো বড়ো শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠে। বর্তমানে এই অঞ্চলে গম, ভুট্টা ও ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং মৎস্য শিল্প কানাডার গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে পরিণত হয়েছে।

২০০ বছর ধরে খনন, শিল্প এবং ব্যাপক হারে কৃষির বিকাশ প্রবাসী ইউরোপীয়দের দ্বারাই হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপীয়রা এই স্থান আবিষ্কার করার কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ উত্তর আমেরিকায় বসবাস করে আসছে।

স্থানীয় জনজাতি

উত্তর আমেরিকার আদি বাসিন্দারা ৩০,০০০ বছর আগে এশিয়া থেকে বেরিং স্টেটস এর সংযোজক সংকীর্ণ ভূখন্ড দিয়ে আসে এবং ১০,০০০ বছর আগে হিমযুগের শেষদিকে তারা দক্ষিণ দিকে সরে আসতে শুরু করে। আমেরিকাতে পাওয়া প্রাচীনতম হস্তনির্মিত বস্তু—তিরের ফলা, ১১,০০০ বছর পুরোনো। প্রায় ৫,০০০ বছর আগে যখন জলবায়ু স্থিতাবস্থায় আসে তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

‘আদিবাসী’ বলতে তাদের বোঝায় যেখানে তারা জন্ম গ্রহণ করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপীয়রা এই শব্দটি ব্যবহার করে, যে সমস্ত দেশে তাদের উপনিবেশ ছিল সেই সমস্ত দেশের অধিবাসীদের বর্ণনা করার জন্য।

আমেরিকা নাম হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত (অর্থাৎ যখন ইউরোপীয় লোকেরা এই মহাদ্বীপের আমেরিকা নামকরণ করে) বৈচিত্র্য সর্বত্র বিরাজমান ছিল। মানুষেরা একশোটিরও বেশি ভাষায় কথা বলত। তারা শিকার, মৎস্য শিকার, উদ্যানবিদ্যা ইত্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। মাটির উর্বরতা এবং পরিচর্যার উপর তাদের জীবনধারণ নির্ভর করত। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রবণতা অন্যান্য বিষয়গুলো নির্ধারণ করত। উদ্বৃত্ত মাছ, শস্য, গাছপালা, মাংস যা শক্তিশালী সমাজ গঠনে সহায়ক, সেখানে তা ছিল না। কোনো কোনো সংস্কৃতি সহস্রাব্দ পর্যন্ত কায়েম ছিল। [*উইলিয়াম মেকলিস, ‘The Day before America’*]

এই লোকেরা নদী উপত্যকার মধ্যে দলবদ্ধভাবে বাস করত। তারা মাছ ও মাংস খেত এবং বজি ও ভুট্টা চাষ করত। তারা প্রায়ই মাংস অন্বেষণে দীর্ঘ যাত্রায় বেরোত এবং তৃণভূমিতে বিচরণকারী পশু, বিশেষ করে বাইসন, বন্য মহিষ এর অনুসন্ধান করত (এটি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সহজ হয়ে যায় যখন মূল অধিবাসীরা অশ্বারোহণ শুরু করে তারা স্পেনীয় লোকদের থেকে ঘোড়া ক্রয় করত) কিন্তু তারা তাদের জন্য প্রয়োজনমতোই পশু শিকার করত, প্রয়োজনের বেশি নয়।

তারা অধিক পরিমাণে চাষবাস করার চেষ্টা করেনি। যেহেতু তারা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত

উৎপাদন করত না, তাই মধ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো তারা সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটায়নি। এলাকা নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদের নজির থাকলেও জমির উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিশেষ কোনও সমস্যা ছিল না। তারা জমির উপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে জমি থেকে পাওয়া খাদ্য ও আশ্রয় পেয়ে সন্তুষ্ট ছিল। তবে তারা জমির মালিক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করত না। তাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল রীতিসিদ্ধ চুক্তি করা এবং বন্ধুত্ব করা এবং উপহার আদান প্রদান করা। তারা জিনিসপত্র ক্রয়ের পরিবর্তে সেগুলো উপহার বা দান হিসেবেই লাভ করত।

রঙিন ঝিনুক একসাথে গেঁথে ওয়ামপাম বেল্ট তৈরি করা হত, যা স্থানীয় উপজাতিদের মধ্যে কোনো চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর এর আদান প্রদান হত।

উত্তর আমেরিকাতে অনেক ভাষা প্রচলিত ছিল, কিন্তু লিখিত ছিল না। তারা বিশ্বাস করত সময়ের গতি চক্রাকারে চলতে থাকে। প্রত্যেক উপজাতিদেরই উৎপত্তি এবং পূর্বের ইতিহাস ছিল, যা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়েছিল। তারা দক্ষ হস্তশিল্পকার ছিল এবং সুন্দর বস্ত্র তৈরি করত। তারা ভূমি সম্পর্কে বুঝতে পারত, জলবায়ু সম্পর্কে বুঝতে পারত এবং স্থলভাগের দৃশ্যও বুঝতে পারত। শিক্ষিত লোকদের মতো তারা লিখিত পুস্তক পড়তে পারত।

ইউরোপীয়দের সাথে লড়াই

স্থানীয় উপজাতিদের নাম এমন সব জিনিসকে দেওয়া হয় যা তাদের সাথে সম্পর্কিত ছিল না। ডাকোটা- উড়োজাহাজ চিরোকি—জিপ পন্টিয়াক-গাড়ি (মোহাক-এক প্রকার কেশকর্তন)

বিভিন্ন শব্দ ইংরেজিতে ব্যবহৃত হয়েছে নতুন বিশ্বের স্থানীয় জনগণের জন্য।

aborigine (অ্যাবরিজিন)— অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় অধিবাসী (ল্যাটিন শব্দ ab=from, origin-begining) এব-হতে, অরিজিন-শুরু।

aboriginal (অ্যাবরিজিনাল)— বিশেষণ প্রায়ই বিশেষ্য হিসেবে ভুল করে ব্যবহৃত হয়।

আমেরিকান ইন্ডিয়ান / আমেরিন্দ / আমেরিনডিয়ান— উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা এবং ক্যারেবিয়ান এর মূল অধিবাসী

ফার্স্ট নেশন্স পিপল্স্ — কানাডার সরকার স্বীকৃত সংগঠিত অধিবাসী (১৮৭৬ খ্রি. ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট এ 'ব্যান্ডস' শব্দ প্রয়োগ হয়েছিল।

কিন্তু ১৯৮০ খ্রি. থেকে 'নেশন' শব্দটি প্রয়োজন হয়)

দেশীয় মানুষ — (Indigenous People)— নির্দিষ্ট স্থানের সর্বদা বসবাসকারী লোক

নেটিভ আমেরিকান— আমেরিকার দেশীয় মানুষ (এটি এখন বহুল প্রচলিত শব্দ)

রেড ইন্ডিয়ান — বাদামি রং এর মানুষ যাদের স্থানকে কলম্বাস ভুলবশত ভারত মনে করেন।

উইস্কন্সিন এর ইউনিবাগো উপজাতি সম্প্রদায়ের এক মহিলা, ১৮৬০ এর দশকে এই উপজাতি লোকদের নেব্রাস্কাতে সরানো হয়।

প্রস্তর খণ্ডে খোদিত ছিল যে হোপিরা বিশ্বাস করত তাদের প্রথম ভাই, বোন কচ্ছপের রূপে তাদের কাছে ফিরে আসবে। তারা মানুষ হবে কিন্তু আসবে কচ্ছপের রূপে। এইজন্য যখন সময় হল তখন হোপি মানুষরা প্রত্যাশিত সমস্ত কচ্ছপদের স্বাগত জানানোর জন্য এক বিশেষ গ্রামে দলবদ্ধ হয়। তারা ভোরবেলা উঠে সূর্যোদয় দেখে, তারা মরুভূমির দিকে তাকাল এবং স্পেনীয় দখলদারদের দেখল, যারা বর্ম পরিহিত অবস্থায় কচ্ছপের মতো দেখাচ্ছিল, তারা মনে করল যার জন্য তারা অপেক্ষা করছে তারা এসে গেছে, তারা স্পেনীয় লোকদের কাছে গেল, করমর্দনের জন্য হাত বাড়াল, কিন্তু স্পেনীয়রা তাদের হাতে দিল হাতকড়া, এরপর সম্পূর্ণ উত্তর আমেরিকাতে এ কথা প্রচারিত হয় যে, খুব কঠিন সময় আসছে, কিছু ভাই-বোন পবিত্রতা ভুলে গেছে। এর ফলে পৃথিবীর সব মানুষকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে।

— লি ব্রাউন এর বক্তব্য থেকে নেওয়া, ১৯৮৬

হোপীরা বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার নিকটে বসবাসকারী আদিবাসী শ্রেণি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দুই মাসের কঠিন সমুদ্র অভিযানের পর যখন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা উত্তর আমেরিকার উত্তর উপকূলে পৌঁছায় তখন সেখানকার স্থানীয় লোকদের বন্ধুত্বপূর্ণ ও স্বাগত পূর্ণ ব্যবহার দেখে তারা মুগ্ধ হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় অভিযানরত স্পেনীয়রা যারা সেখানকার স্বর্ণের প্রাচুর্যে অভীভূত হয়ে গিয়েছিল, তাদের তুলনায় এই ব্যবসায়ীরা মাছ ও পশমের ব্যবসা শুরু করে এবং এই কাজে তারা শিকারে পারদর্শী আদিবাসীদের সহায়তা পেয়েছিল।

দক্ষিণে মিসিসিপি নদী বরাবর দেশীয় লোকেরা বিভিন্ন হস্ত শিল্পের জিনিস, যেগুলো বিশেষ শ্রেণিভুক্ত উপজাতিরাই তৈরি করত, অথবা কোন খাদ্য পদার্থ যা নির্দিষ্ট এলাকাতেই শুধুমাত্র তৈরি হয়, এই সব জিনিসের আদান প্রদানের জন্য নিয়মিতভাবে একত্রিত হত। স্থানীয় উৎপাদনের বিনিময়ে ইউরোপীয়রা উপজাতিদের কম্বল, লোহার বাসন (যা কখনো মাটির বাসনের পরিবর্তে ব্যবহার করা হত) বন্দুক (যা পশু শিকারের জন্য তির ধনুক থেকে সুবিধাজনক ছিল) এবং মদ সরবরাহ করত। ওই এলাকার লোকদের এর আগে মদের সাথে পরিচয় ছিল না। অতি সত্বরই এরা মদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এটা ইউরোপীয়দের জন্য ভালো হয়। কারণ এর দ্বারা ইউরোপীয়দের পক্ষে তাদের ব্যবসার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সুবিধাজনক শর্ত আদায় করা সহজ হয় (ইউরোপীয়রাও ওই স্থানের আদিবাসীদের থেকে তামাক খাওয়ার অভ্যাস রপ্ত করে)।

ক্যুবেক	আমেরিকার উপনিবেশ
১৪৯৭ খ্রি. জন ক্যাবোট নিউফাউন্ডল্যান্ড এ যান।	১৫০৭ খ্রি. **আমেরিগো** দি ভেসপুচির ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়।
১৫৩৪ খ্রি. জ্যাক কার্টিয়ার সেন্ট লরেন্স নদীর আশে পাশে ভ্রমণ করেন এবং উৎসব স্থানের মূল আদিবাসীদের সঙ্গো সাক্ষাৎ করেন।	
১৬০৮ খ্রি. ফ্রান্স ক্যুবেক উপনিবেশের খোঁজ পায়	১৬০২ খ্রি. ব্রিটিশরা ভার্জিনিয়ার খোঁজ করে।
	১৬০২ খ্রি. ব্রিটিশরা প্লাইমাউথ (ম্যাসাচুসেট্স এ) এর খোঁজ পায়।

পারস্পরিক ধারণা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা সাক্ষরতা, সংগঠিত ধর্ম এবং নগরায়ণ এর উপর নির্ভর করে 'সভ্য' কথাটির ব্যাখ্যা করে, তারা আমেরিকার মূল অধিবাসীদের 'অসভ্য' বলে মনে করত। ফরাসি দার্শনিক জাঁ জ্যাক রুশোর মতো কিছু ইউরোপীয়দের কাছে এই ধরনের লোকেরা প্রশংসার যোগ্য ছিল, কারণ তারা সভ্যতার দুর্নীতি থেকে অনেক দূরে ছিল। এর জন্য একটি জনপ্রিয় পরিভাষা হল 'The noble savage' (উন্নত চরিত্রের বর্বর)। ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা একটি কবিতার কিছু লাইন অন্য দৃষ্টিকোণ নির্দেশ করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা রুশো কারোরই আমেরিকার মূল অধিবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ এদের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তারা জঙ্গলে থাকে, যেখানে কল্পনাশক্তির কাছে তাদের ভাবসম্পন্ন করা, উল্লসিত করা, বা শোধন করার সুযোগ কম ছিল, এর অর্থ হল প্রকৃতির কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষের কল্পনা এবং আবেগের ক্ষমতা ছিল সীমিত।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সমসাময়িক থমাস জেফারসন, মূল অধিবাসীদের সম্পর্কে এমন মন্তব্য করেন, যে শব্দ আজও প্রকাশ্যে শোরগোল ফেলে দেবে। 'এই দুর্ভাগা জাতি, যাদের সভ্য করার জন্য আমরা অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, এই উন্মূলনকে ন্যায্য প্রমাণিত করেছে'।

এটা খুব কৌতুহলো উদ্দীপক যে, অন্য এক লেখক, ওয়াশিংটন ইরভিং যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে বয়সে অনেক ছোটো ছিল এবং যিনি আদিবাসীদের দেখেছেন, তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে এদের বর্ণনা করেন। 'এটি খুবই সত্য যে, কোম্পানির শ্বেতাঙ্গ লোকের সুনাম তারা অবিশ্বাস করে এবং ভাষা বুঝতে পারে না, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ লোকটিও সমান পরিস্থিতিতে হয়তো একই আচরণ করত। যখন ইন্ডিয়ানরা খুব সুন্দরভাবে শ্বেতাঙ্গা লোকদের নকল করে চিত্তবিনোদন করত তখন শ্বেতাঙ্গ লোকেরা মনে করত তারা ভারতীয়দেরও তাদের সভ্যতা ও গৌরবের প্রতি প্রভাবিত করতে পেরেছে। .... শ্বেতাঙ্গ লোকেরা গরিব ইন্ডিয়ানদের সাথে এমন ব্যবহার করত (আমি এর সাক্ষী) যেমন পশু আর এদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই।'

স্থানীয়রা যে সমস্ত জিনিস ইউরোপীয়দের সাথে আদান প্রদান করেছিল তা ছিল বন্ধুত্বের উপহার। অন্যদিকে ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখা ইউরোপীয়দের প্রধান পণ্য ছিল মাছ ও পশম যা তারা মুনাফার জন্য ইউরোপে বিক্রয় করত। এই সব জিনিসের দাম বিভিন্ন বছর বিভিন্ন প্রকার হত এবং তা জিনিসের সরবরাহের উপর নির্ভর করত। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের সুদূর ইউরোপের বাজার সম্পর্ক কোন ধারণা ছিল না, তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ত যখন তাদের জিনিসের বিনিময়ে ইউরোপীয়রা কখনো বেশি আবার কখনো কম জিনিস সরবরাহ করত। তারা ইউরোপীয় লোকদের অতি লোভ দেখেও মর্মাহত হত। প্রচুর পরিমাণে পশম পাওয়ার জন্য তারা শত শত বীবর (Beaver) পশু হত্যা করে যা দেখে স্থানীয় অধিবাসীরা বিচলিত হয়ে পড়ে এই ভেবে যে, এই সব পশু তাদের ধ্বংসের জন্য প্রতিশোধ নেবে।

*মূল অধিবাসীদের অনেক লোকগাথায় ইউরোপীয়দের উপহাস করে এবং তাদের লোভী ও শঠ বলে বর্ণনা করে কিন্তু এগুলো যে গল্প, ইউরোপীয়রা অনেক পরে তা বুঝতে পারে।

প্রথমদিকে ইউরোপীয়রা যারা ব্যবসায়ী হিসেবে এসেছিল তাদের অনুসরণকারীরা আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় লোকদের একটা অংশ খ্রিস্টানদের একটা ভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ার অপরাধে অত্যাচারিত হচ্ছিল (ক্যাথলিকভুক্ত দেশে বসবাসকারী প্রোটোস্টান্টরা অথবা প্রোটেস্টান্ট ভুক্ত দেশে ক্যাথলিকরা)। এদের মধ্যে অনেকে ইউরোপ ছেড়ে নতুন জীবন শুরু করার জন্য আমেরিকা চলে যায়। যতদিন সেখানে বসতি ছিল না ততদিন কোনো সমস্যা হয়নি, কিন্তু ধীরে ধীরে এই বহিরাগতরা আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসীদের গ্রামের দিকে বসতি স্থাপন করতে থাকে। বনভূমি পরিষ্কার করার জন্য এবং কৃষি কাজের জন্য তারা লোহার তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে থাকে। স্থানীয় অধিবাসী

ও ইউরোপীয়দের বনভূমি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা সেই সব পথ চিহ্নিত করতে পারত, যা ইউরোপীয়দের কাছে অদৃশ্য ছিল। ইউরোপীয়রা কল্পনা করত পরিষ্কার করা বনভূমিকে শস্যক্ষেত্রে পরিণত করার। জেফারসনের স্বপ্ন ছিল ক্ষুদ্র খামার যুক্ত ইউরোপীয়দের একটি দেশ। অধিবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনের জন্য ফসল উৎপাদন করত। বিক্রয় বা মুনাফা অর্জন করার জন্য ফসল উৎপাদন করত না। আর যারা জমির মালিক হওয়াকে অন্যায় মনে করত তারা এই ব্যাপারটিকে বুঝতে পারত না। জেফারসনের দৃষ্টিতে এটাই তাদের অসভ্য করে তুলেছে।

কার্যাবলি-১

ইউরোপীয় ও নেটিভ আমেরিকানদের পরস্পর সম্পর্কে ধারণা এবং প্রকৃতিকে দেখার ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করো।

কানাডা		আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	
১৭০১খ্রি.	ক্যুবেক এর স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে ফ্রান্সের চুক্তি	১৭৮১খ্রি.	ব্রিটেন আমেরিকাকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
১৭৬৩	ক্যুবেকের উপর ব্রিটিশদের জয়	১৭৮৩ খ্রি.	বৃটিশরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে মিড ওয়েস্ট বা মধ্য-পশ্চিম অঞ্চল ছেড়ে দেয়।
১৭৭৪	ক্যুবেক অ্যাক্ট		
১৭৯১	কানাডা সাংবিধানিক আইন		

মানচিত্র-১: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তার

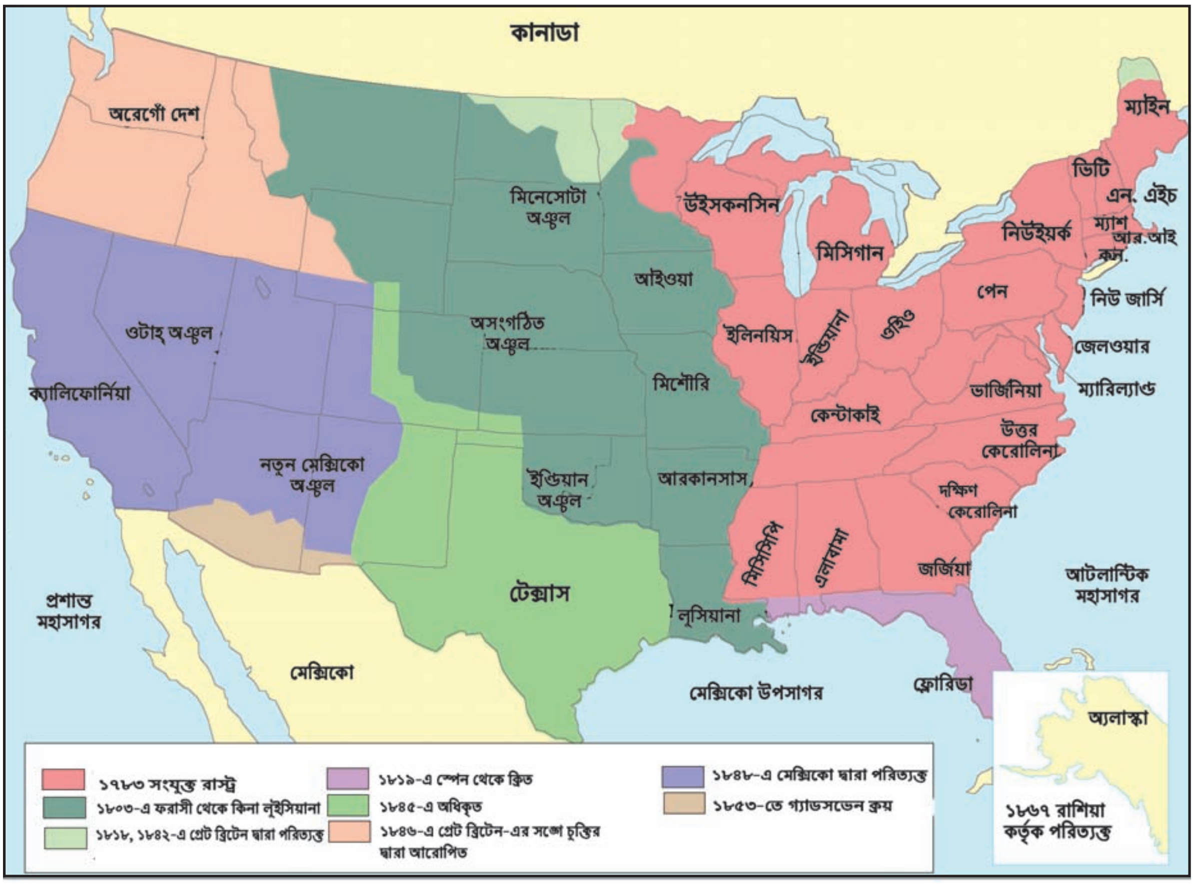

যে দেশগুলো কানাডা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নামে পরিচিত, তাদের অস্তিত্ব শুরু হয়েছিল অস্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। বর্তমান ভূমির এক ছোটো অংশই সেই সময় তাদের অধিকারে ছিল। পরবর্তী একশো বছর ধরে তারা তাদের বর্তমান আকারে বা রূপে পৌঁছানোর জন্য আরও বেশি এলাকা জুড়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অনেক বড়ো বড়ো অঞ্চল ক্রয় করে তারা দক্ষিণে ফ্রান্স (লুসিয়ান) ও রাশিয়া (আলাস্কা) থেকে ভূমি ক্রয় করে। পাশাপাশি তারা যুদ্ধের দ্বারাও অনেক ভূমি লাভ করে। দক্ষিণ আমেরিকার বেশীরভাগ অঞ্চল মেক্সিকো থেকে জয় করা। এটা কারোর ধারণায় আসেনি যে ওই সব এলাকার বসবাসকারী স্থানীয় ব্যক্তিদেরও সম্মতি চাওয়া প্রয়োজন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম সীমা পরিবর্তিত হচ্ছিল। সীমানা যতই পরিবর্তিত হতে থাকে, ওই স্থানের স্থানীয় অধিবাসীরা ততই পেছনে যেতে বাধ্য হয়।

কানাডা	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (ইউ এস এ)
	১৮০৩ খ্রি. ফ্রান্স থেকে লুসিয়ানা ক্রয়
	১৮২৫-৫৮ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মূল অধিবাসীরা সংরক্ষিত অঞ্চলে সরে যায়।
১৮৩৭ ফ্রান্স-কানাডা বিদ্রোহ ।	১৮৩২ বিচারক মার্শাল এর বিচার
১৮৪০ উচ্চ ও নিম্ন কানাডা ইউনিয়ন ।	১৮৪৯ আমেরিকার গোল্ড রাশ
১৮৫৯ কানাডা গোল্ড রাশ ।	১৮৬১-৬৫ আমেরিকার গৃহযুদ্ধ
১৮৬৭ কানাডা মহাসংঘ ।	১৮৬৫-৯০ আমেরিকা-ইন্ডিয়ান যুদ্ধ
১৮৬৯-৮৫ কানাডার মেটিসদের দ্বারা রেড রিভার বিদ্রোহ ।	১৮৭০ আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথ
১৮৭৬ কানাডা-ইন্ডিয়ান আইন ।	১৮৯০ বাইসন নির্মূলকরণ
১৮৮৫ পূর্ব-পশ্চিম উপকূল সংযোগকারী আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথ।	১৮৯২ আমেরিকার সীমান্ত সম্প্রসারেনের অবসান

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার ভূমির আয়তন বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়। ভূমির প্রতি ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি মূল অধিবাসীদের থেকে আলাদা ছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স থেকে আসা অনেক প্রবাসী, এমন ছিল যারা ছোটো ছেলে হওয়ার কারণে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতেন না এবং তারা আমেরিকায় জমির মালিক হতে চাইছিলেন। পরে জার্মানি, সুইডেন, এবং ইতালি ইত্যাদি দেশ থেকে অনেক প্রবাসী আসে যাদের জমি বড়ো বড়ো কৃষকদের হাতে চলে যায় এবং এরা নিজেরা জমির মালিক হতে চাইছিল। পোল্যান্ড থেকে আসা মানুষেরাও এই তৃণভূমির চারণক্ষেত্রে কাজ করতে আগ্রহী ছিল, যা তাদের স্বদেশের স্টেপিজের কথা মনে করিয়ে দিত। আর এই স্থানে অল্প দামে প্রচুর পরিমাণে সম্পত্তি ক্রয় করা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। তারা বনভূমি পরিষ্কার করে কৃষির বিকাশ ঘটায়, ফসল উৎপাদন (ধান এবং কার্পাস) করে, যা ইউরোপে উৎপাদিত হত না, ফলে সেখানে এইসব দ্রব্য বিক্রি করে তারা অধিক মুনাফা অর্জন করত। নিজেদের বিশাল জমিকে বন্য পশু যেমন নেকড়ে এবং বন্য সিংহ থেকে রক্ষা করার জন্য শিকার করে এদের অস্তিত্ব বিনাশ করে। ১৮৭৩ খ্রি. কাঁটাতারের আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করে।

দক্ষিণাঞ্চলের জলবায়ু ইউরোপীয়দের কাছে এত গরম ছিল যে তাদের পক্ষে বাইরে কাজ করা

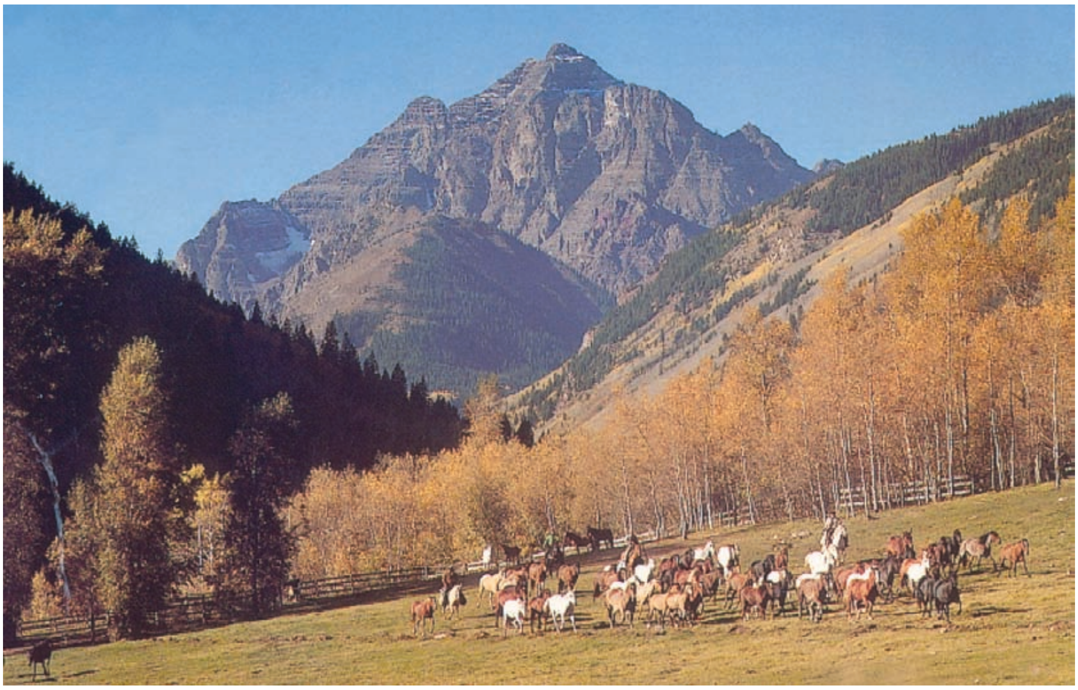

কলোরাডো এক পশুফার্ম

খুব কষ্টকর ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলোতে আদিবাসী, যাদের দাস বানানো হয়েছিল তারা অধিক সংখ্যায় মারা যায়। এই জন্য জমির মালিকরা আফ্রিকা থেকে দাস ক্রয় করে। দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের বিরোধের ফলে দাস-ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হলেও আমেরিকায় যে আফ্রিকানরা ছিল তারা ও তাদের সন্তানরা দাস হয়েই থাকল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরের রাজ্যগুলো যেখানে অর্থনীতি চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল ছিল না (এর ফলে দাস প্রথার উপর নির্ভরশীল ছিল) তারা দাসপ্রথাকে অমানবিক বলে উল্লেখ করে এবং তা নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত দেয়। ১৮৬১-৬৫ খ্রি. দাসপ্রথার সপক্ষ ও বিপক্ষ দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। দাসপ্রথার বিরোধীরা জয়ী হয়। দাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়, যদিও বিংশ শতাব্দীতেই প্রথমবার আফ্রিকান-আমেরিকানরা নাগরিক স্বাধীনতার লড়াইয়ে জয়লাভ করে এবং বিদ্যালয় ও সরকারি পরিবহন ব্যবস্থায় শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গ মানুষের মধ্যে বৈষম্যের অবসান হয়।

দেশীয় লোকদের সমস্যা থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা কানাডা সরকারের সামনে ছিল, যা দীর্ঘদিন সমাধান করা সম্ভব হয়নি। ১৭৬৩ খ্রি. ব্রিটিশরা ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধের দ্বারা কানাডা লাভ করে। ফরাসি বসবাসকারীরা বারবার স্বশাসিত রাজনৈতিক মর্যাদা দাবি করে। ১৮৬৭ খ্রি. কানাডাকে একটি স্বশাসিত রাষ্ট্রের সংঘ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে সমস্যার সমাধান করা হয়।

স্থানীয় লোকদের জমি বেদখল

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে স্থানীয়দের তাদের জমি বিক্রি বা স্থানান্তর করতে বাধ্য করা হয়। মূল্য দেওয়া হয়েছিল খুবই কম। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে

আমেরিকানরা (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের জন্য ব্যবহৃত উক্তি) প্রতারণা করে বেশি ভূমি দখল করে আর প্রতিশ্রুতির চেয়ে অনেক কম মূল্য দেয়। এমনকি, উচ্চ কর্মকর্তারাও স্থানীয় অধিবাসীদের এই জমি থেকে উচ্ছেদ করাকে সঠিক বলে মনে করত। আমেরিকার রাজ্য জর্জিয়াতে এই ঘটনা দেখা যায়। কর্মকর্তারা যুক্তি দেখাল যে, চিরোকি উপজাতিরা রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা শাসিত হত কিন্তু তারা নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারত না। (লক্ষণীয় বিষয় হল আদিবাসীদের মধ্যে চিরোকিরাই প্রথম ইংরেজি শিক্ষা এবং আমেরিকার জীবন প্রনালী জানা ও শেখার চেস্টা করে, কিন্তু তবুও এদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়নি।

১৮৩২ খ্রি. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি জন মার্শালকে গুরুত্বপূর্ণ রায় শোনান। তিনি বলেন, চিরোকি উপজাতি এক বিশেষ সম্প্রদায়, তাদের অধিকৃত এলাকায় জর্জিয়ার আইন চলবে না এবং কোন কেনো ব্যাপারে এদের সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এন্ড্রু জ্যাকসন যার আর্থিক ও রাজনৈতিক সুবিধাভোগীদের বিরোধিতার জন্য সুখ্যাতি ছিল কিন্তু ভারতীয়দের ক্ষেত্রে তার এই ভূমিকা পাল্টে যায়। তিনি প্রধান বিচারপতির রায় মানতে অস্বীকার করেন এবং চিরোকি উপজাতিদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে আমেরিকার মরুভূমির দিকে তাড়িয়ে দিতে সেনা পাঠান। ১৫০০০ জনকে সেখান থেকে তাড়ানো হয়েছিল তার এক চতুর্থাংশ ট্রায়াল অব টিয়ার্স (Trial of Tears) অভিযানে মারা যায়।

যারা উপজাতিদের জমি দখল করেছিল তারা নিজেদের কাজকে এই বলে সমর্থন করে যে, উপজাতিরা কোনোদিন জমির সঠিক ব্যবহার করেননি, তাই জমি তাদের দখলে থাকা উচিত নয়। তারা সমালোচনা করে আরও বলে যে উপজাতি লোকেরা আলসে ছিল বেং বাজারের জন্য জিনিস উৎপাদন করতে তাদের শিল্প কৌশলকে কাজে লাগায় নি। তাদের ইংরেজী শিক্ষা এবং সঠিকভাবে পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও কোন আগ্রহ ছিল না (ইউরোপীয়দের মত), তাই এই সব উপজাতিরা লুপ্ত হওয়ারই যোগ্য। চাষের জমি তৈরি করার জন্য তৃণভূমি পরিষ্কার করা হয় এবং বন্য বাইসন মেরে ফেলা হয়। ফ্রান্সের এক আগন্তুক লিখেছেন, আদিম জন্তুদের সাথে সাথে আদিম মানুষও লুপ্ত হয়ে যাবে।

কার্যাবলি-২

এই দুই প্রকার জনসংখ্যা তথ্যের উপর আলোচনা করো

	ইউ. এস. এ-১৮২০	স্পেনীয় আমেরিকা-১৮০০
মূল অধিবাসী	০.৬ মিলিয়ন	৭.৫ মিলিয়ন
শ্বেতাঙ্গ	৯.০ মিলিয়ন	৩.৩ মিলিয়ন
মিশ্র ইউরোপীয়	০.১ মিলিয়ন	৫.৩ মিলিয়ন
অশ্বেতাঙ্গ	১.৯ মিলিয়ন	০.৮ মিলিয়ন
মোট	**১১.৬ মিলিয়ন**	**১৬.৯ মিলিয়ন**

এর মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের পশ্চিমে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাদের স্থায়ী জমি দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু যখন তাদের জমিতে সীসা, সোনা ও তেল এর মত মূল্যবান খনিজের খোঁজ পাওয়া যেত, তখন প্রায়ই এইসব স্থান থেকে তাদের আবার উচ্ছেদ করে দেওয়া হত। অনেক উপজাতিদের কোনো নির্দিস্ট উপজাতির জমি ভাগ করে দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ বাধে। স্থানীয় অধিবাসীদের ছোটো ছোটো

এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যা 'সংরক্ষিত' নামে পরিচিত ছিল, আর যেসব স্থান তাদের দেওয়া হতে লাগল, এর সাথে তাদের পূর্বে কোনো যোগাযোগ ছিল না। তবে তারা নিজেদের জমি বিনা লড়াইয়ে ছেড়ে দেয়নি। ১৮৬৫-১৮৯০ খ্রি. পর্যন্ত চলতে থাকা বিদ্রোহকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা দমন করে। কানাডাতে ১৮৬৯-১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মেটিসরা (ইউরোপের স্থানীয় অধিবাসীদের উত্তরাধিকারী) সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। কিন্তু বিদ্রোহে তারা পরাজিত হয়।

১৮৫৪ খ্রি. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মূল অধিবাসীদের নেতা, চিফ্ সিয়েটেল এর তরফ থেকে এক চিঠি পান। রাষ্ট্রপতি, সিয়েটেল এর প্রধানকে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বলেছিলেন যার দ্বারা তাদের জমির এক বড়ো অংশ আমেরিকা সরকারকে দেওয়ার কথা বলা হয়। প্রধানের উত্তর ছিল—

আপনি কীভাবে আকাশ বা ভূমির উষ্ণতা ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারেন? এই ভাবনাও আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়। যদি আপনি বাতাসের স্নিগ্ধতা এবং জলের ঝিকিমিকির মালিক না হন তবে আপনি তা কীভাবে ক্রয় করতে পারেন? পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস আমাদের মানুষদের কাছে পবিত্র। পাইন-সূচ এর চকমক, বালুকাময় তট, ঘন বনের কুয়াশা, সাফাই করা বা গুন গুন করা প্রত্যেক কীট পতঙ্গ আমার জনগণের কাছে পবিত্র এবং স্মরণীয়। বৃক্ষের মধ্যে প্রবাহিত প্রাণরস 'রেড ম্যান' এর স্মৃতি বহন করে। ....

তাই ওয়াশিংটন এর মহান নেতা যখন এই সংবাদ পাঠান যে, তিনি আমাদের জমি ক্রয় করতে চান, তখন এটা আমাদের কাছে অনেক বেশি প্রত্যাশার ছিল মহান নেতার প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা সংরক্ষিত করে দেবেন যেখানে আমরা সুখে থাকতে পারি। তিনি আমাদের পিতা হবেন, আর আমরা তার সন্তান হব। তাই আমরা আমাদের জমি ক্রয় করার জন্য আপনার প্রস্তাব বিবেচনা করব। কিন্তু এটা খুব সহজ হবে না কারণ এই জমি আমাদের জন্য পবিত্রভূমি। নদ নদীতে যে স্রোত বয়ে চলে তা শুধু জল নয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্ত। যদি আমরা আপনাদের এই ভূমি বিক্রয় করি, তাহলে আপনাদের মনে রাখতে হবে এটা পবিত্র এবং আপনাদের সন্তানদেরও বোঝাতে হবে যে এই ভূমি পবিত্র এবং এটাও মনে রাখতে হবে যে হ্রদের পরিষ্কার জলে প্রতিফলিত সব অলৌকিক প্রতিবিম্ব, আমার জনগণের জীবনের ঘটনাবলি ও স্মৃতির কথা বলছে। জলের কলকল শব্দ যেন আমার পূর্বপুরুষদের কণ্ঠস্বর..... ।

দ্রুতগতিতে স্বর্ণের সন্ধান এবং শিল্পের বিকাশ

উত্তর আমেরিকায় স্বর্ণ-সম্পদ ছিল বলে সব সময় আশা করা হত। ১৮৪০ খ্রি. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে সোনার সন্ধান পাওয়া যায়। এটি গোল্ড রাশ এর জন্ম দেয়, যখন হাজারো উৎসুক ইউরোপীয়রা দ্রুত সৌভাগ্য লাভের আশায় আমেরিকা ছুটে যায়। মহাদেশ জুড়ে রেললাইন নির্মাণ শুরু হয় যার জন্য হাজার হাজার চিনের শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়। ১৮৭০ খ্রি. আমেরিকায় এবং ১৮৮৫ খ্রি. কানাডাতে রেলপথ নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়।

নৃতত্ত্ববিদ্যা

এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই সময় (১৮৪০ এর দশকে) উত্তর আমেরিকাতে নৃতত্ত্ববিদ্যা (ফ্রান্সে যার বিকাশ ঘটে) এর সূত্রপাত হয়। কৌতূহল ছিল স্থানীয় আদিম সম্প্রদায় এবং ইউরোপের সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য অধ্যয়ন করা। কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিদ বলেন যে, যেভাবে ইউরোপে কোনো আদিম মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি আমেরিকার মূল অধিবাসীও শেষ হয়ে যাবে।

মূল অধিবাসীদের ঘর, ১৮৬২ খ্রিঃ পুরাতত্ত্ববিদগণ এটিকে পাহাড় থেকে সরিয়ে ইয়মিং মিউজিয়ামে রাখার ব্যবস্থা করে।

গোল্ড রাশ তথা স্বর্ণের সন্ধানে ক্যালিফোর্নিয়াতে যাওয়া মানুষদের একটি আলোকচিত্র।

এন্ড্রিয়ো কার্নেগি যিনি স্কটল্যান্ড থেকে আসা একজন গরিব অভিবাসী ছিলেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কোটিপতি শিল্পপতি ছিলেন, তিনি বলেন যে, " পুরোনো রাষ্ট্রগুলো শম্বুকের গতিতে, অথচ গণতন্ত্র খুব দ্রুতগতিতে দৌড়াচ্ছে'।

ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব এক বিশেষ সময়ে শুরু হওয়ার একটি কারণ ছিল, ছোটো কৃষকরা নিজেদের জমি বড় কৃষকদের কাছে বিক্রয় করে কারখানার চাকরির দিকে ঝুঁকে পড়ে (নবম অধ্যায় দেখো)। উত্তর আমেরিকাতে শিল্পোদ্যোগ বিভিন্ন কারণে শুরু হয়- রেল এর সাজসরঞ্জাম তৈরি করা যার দ্বারা দূর দূরান্তের স্থানগুলোকে দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা এবং এমন যন্ত্রপাতি তৈরি করা যার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে কৃষি উৎপাদনকে সহজতর করা যায়। আমেরিকা এবং কানাডা দুই অঞ্চলেই শিল্পনগরের বিকাশ ঘটে এবং অধিক সংখ্যায় কারখানা তৈরি হয়। ১৮৬০ খ্রি. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অনুন্নত অর্থনীতির দেশ ছিল, কিন্তু ১৮৯০ খ্রি. এই দেশ বিশ্বের প্রধান শিল্পশক্তিতে পরিণত হয়।

সেখানে অধিকমাত্রায় কৃষিরও সম্প্রসারণ ঘটে। বিশাল অঞ্চল পরিষ্কার করা হয় এবং ছোটো ছোটো খামারে বিভক্ত করা হয়। ১৮৯০ খ্রি. পর্যন্ত শিকার করে বন্য বাইসন প্রায় নিঃশেষ করা হয়। এর সাথে শত শত বছর ধরে চলে আসা স্থানীয় অধিবাসীদের শিকারিজীবনেরও সমাপ্তি হয়। ১৮৯২ খ্রি. নাগাদ আমেরিকার মহাদেশীয় সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয়। প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিভক্ত হয়। অনেক দশক পর্যন্ত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের পশ্চিমে আকর্ষিত করে এমন আর কোনো সীমান্তবর্তী স্থান রইল না। কয়েক বছরের মধ্যেই আমেরিকা হাওয়াই এবং ফিলিপাইন্স এ উপনিবেশ স্থাপন করে এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়।

উপরে আমেরিকার দ্বারা, অপ্রবাসীদের স্বাগত, রঙিন ছবি ১৯০৯

নীচে — প্রেয়রী (বৃক্ষহীন তৃণভূমি) তে পশুখামার, যা ইউরোপীয় অপ্রবাসীদের স্বপ্ন ছিল। আলোকচিত্র।

সাংবিধানিক অধিকার :

১৭৭০ এর দশকে ঔপনিবেশিকরা তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'গণতান্ত্রিক চেতনা'কে সংহত করেছিল, সেটিই পরবর্তীকালে পুরোনো পৃথিবীর রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে আমেরিকার পরিচয় নির্ধারণ করে। তাদের জন্য এটাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তাদের সংবিধানে ব্যক্তির 'সম্পত্তির অধিকার' যুক্ত করা হয়েছিল, বা বাতিল করার অধিকার রাজ্যগুলোর ছিল না।

কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার (রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার) এবং সম্পত্তির অধিকার-এই দুই প্রকার অধিকার শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্য ছিল। কানাডার স্থানীয় অধিবাসী ড্যানিয়েল পল ২০০০ এ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসি বিপ্লবের সময় গণতন্ত্রের সমর্থক থমাস পেইন বলেছেন, 'কীভাবে সংগঠিত সমাজ তৈরি করার ক্ষেত্রে, মডেল হিসেবে ইন্ডিয়ানস্‌দের ব্যবহার করা হয়।' তিনি এই যুক্তি দিয়ে বোঝাতেন চেয়েছেন যে, অদিবাসী আমেরিকানরা, তাদের দৃষ্টান্ত বা আদর্শ দ্বারা ইউরোপীয়দের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বীজ বপন করে। ('উই আর নট দ্য সেভেজ' পৃঃ ৩৩৩)

> জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩) আমেরিকার ফ্রন্টিয়ারকে, শেষ ধনাত্মক পুঁজিবাদী কল্পরাজ্যে... সীমাহীন প্রকৃতি ও স্থান, মুনাফার জন্য সীমাহীন তৃষ্ণার সাথে অভিযোজন করে বলে বর্ণনা করেন।
>
> —'বস্তিয়াত এন্ড ক্যারির গ্রোন্দরিসে।

পরিবর্তনের হাওয়া:

১৯২০ খ্রি. পর্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মূল অধিবাসীদের কোনো উন্নতি হয়নি। ১৯২৮ খ্রি. *দ্য প্রবলেম অব ইন্ডিয়ান এডমিনিস্ট্রেশন* নামে এক সমাজবিজ্ঞানী লুইস মেরিয়াম কর্তৃক একটি জরিপ পত্র প্রকাশিত হয় এর কয়েক বছর পর যখন আমেরিকা অর্থনৈতিক মহামন্দার কবলে পড়ে তা সকল স্তরের মানুষকে প্রভাবিত করে। স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়।

শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের সেই সব স্থানীয়দের প্রতি সহানুভূতি ছিল যারা তাদের সংস্কৃতির অনুশীলন ও একই সাথে নাগরিকত্বের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এর ফলে আমেরিকায় এক যুগান্তকারী আইন তৈরি হয়। এই যুগান্তকারী আইনের নাম হল ' ইন্ডিয়ান রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট' ১৯৩৪ খ্রি. এই আইন দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীরা জমি কেনা ও ঋণ গ্রহণের অধিকার লাভ করে।

১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে আমেরিকা ও কানাডার সরকার মূল অধিবাসীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা বন্ধ করার চিন্তা ভাবনা করে এই উদ্দেশ্যে যে, এর ফলে তারা মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবে। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা তা চাইনি। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় অধিবাসীরা ডিক্লারেশন অব ইন্ডিয়ান রাইটস্ নামে এক আইন প্রস্তুত করে। এই আইনের দ্বারা কিছু সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসী আমেরিকার নাগরিকত্ব স্বীকার করেছিল এই শর্তে যে তাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও ঐতিহ্যের উপর সরকার হস্তক্ষেপ করবে না। কানাডাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ১৯৬৯ খ্রি. সরকার ঘোষণা করে যে, তারা আদিবাসীদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে না। স্থানীয়রা সুসংগঠিত হয়ে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে সাংবিধানিক আইন দ্বারা আদিবাসীদের বিদ্যমান ও চুক্তির ভিত্তিতে দেওয়া অধিকার স্বীকার না করা পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হয় নি। অনেক ছোটো ছোটো উদ্ভাবন এখনো বাকী রয়েছে। এটা খুব পরিষ্কার যে,অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায় নিজেদের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাওয়ার পরেও দুই দেশের অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অধিকার বিশেষ করে কানাডাতে নিজেদের পবিত্র ভূমিতে তাদের অধিকার জাহির করতে সক্ষম হয়েছে, যেভাবে১৮৮০ খ্রি. তাদের পূর্বসূরীরাও করতে পারে নি।

কার্যাবলি-৩

আমেরিকান ঐতিহাসিক হোবার্ড স্পোডেক এর নিম্নলিখিত বিবৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করো: আমেরিকা বিপ্লবের যে প্রভাব ঔপনিবেশিকদের উপর পড়েছিল তার বিপরীত প্রভাব পড়ে মূল অধিবাসীদের উপর— সাম্রাজ্য বিস্তার সংকুচিত হয়ে পড়ে, গণতন্ত্র স্বৈরশাসনে পরিণত হয়, প্রগতি দারিদ্র্যে পরিণত হয়, আর স্বাধীনতা বন্দিদশায় পরিণত হয়।

ব্রিটিশ শাসনধীনে ইন্ডিয়ানরা	রাজস্ব আদায় হত যথেচ্ছভাবে। সমান মর্যাদা দেওয়া হত না। (যুক্তি :- প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত ছিল না)
আমেরিকার স্থানীয় জনসাধারণ	নাগরিক হিসেবে দেখা হত না। অসাম্য ছিল অস্ট্রেলিয়াতে। (যুক্তি :- ভবিষ্যতের কোন চিন্তা ভাবনা ছিল না। আদিম মানুষদের কোন স্থায়ী কৃষিকাজ ছিল না, কোনো শহর ছিল না।)
আমেরিকাতে আফ্রিকার দাসরা	ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল না। সমান অধিকার ছিল না। (যুক্তি:- দাস প্রথা তাদের সামাজিক ব্যবস্থার একটি অংশ। কালো মানুষরা ছিল নিকৃষ্ট)।

অস্ট্রেলিয়া

আমেরিকার মত অস্ট্রেলিয়াতেও মানবজাতির বসবাস নিয়ে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আদিম অধিবাসীরা (বিভিন্ন সমাজের ক্ষেত্রে দেওয়া এক সাধারণ নাম) এই মহাদেশে আসতে শুরু করে প্রায় ৪০,০০০ বছর আগে (সম্ভবত আরও আগে)। তারা নিউগিনিয়া থেকে এসেছিল, যা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সংযোগ সংকীর্ণ ভূখণ্ড দ্বারা যুক্ত ছিল। স্থানীয় ঐতিহ্যে তারা অস্ট্রেলিয়াতে আসেনি, কিন্তু তারা সব সময়েই সেখানে ছিল। বিগত শতাব্দীগুলোকে বলা হত 'স্বপ্নকাল' বা 'স্বপ্নসময়'—যদিও ইউরোপীয়দের বোঝার ক্ষেত্রে তা অসুবিধাজনক ছিল, কারণ অতীত ও বর্তমানের মধ্যে পার্থক্য ছিল অস্পষ্ট।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে অস্ট্রেলিয়ার মূল অধিবাসীদের ৩৫০ থেকে ৭৫০ সংখ্যক সম্প্রদায় ছিল, যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা ছিল (এখনও ২০০ ভাষার প্রচলন রয়েছে)। দেশীয় লোকদের আর একটি বড়ো সম্প্রদায় উত্তরে বসবাস করত, যাদের টরেস প্রণালীর দ্বীপবাসী বলা হত। 'আদিম অধিবাসী' শব্দটি এই অর্থে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যে, তারা অন্য স্থান থেকে এসেছে এবং বিভিন্ন জাতির অন্তর্গত।২০০৫ খ্রি. তারা অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার ২.৪ শতাংশ ছিল।

অস্ট্রেলিয়া জনবিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল। এমনকি এখনও পর্যন্ত বেশিরভাগ শহর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত (যেখানে ১৭৭০ খ্রি. ব্রিটিশরা প্রথম উপস্থিত হয়েছিল) কারণ অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী স্থান শুষ্ক মরুভূমি অঞ্চল।

ইউরোপীয়দের অস্ট্রেলিয়ায় আগমন	
১৬০৬	ডাচ যাত্রীদের অস্ট্রেলিয়া পরিদর্শন।
১৬৪২	তাসমান এই দ্বীপে প্রবেশ করেন, পরবর্তী সময় যে দ্বীপের নাম হয় তাসমানিয়া।
১৭৭০	জেমস্ কুক বোটানি উপসাগরে পৌঁছান, যার নামকরণ হয় নিউ সাউথ ওয়েল্স।
১৭৮৮	ব্রিটিশদের পেনাল লোনি স্থাপন, সিডনির প্রতিষ্ঠা।

মানচিত্র ২
অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়াতে, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক, স্থানীয় অধিবাসী এবং অস্ট্রেলিয়ার ভূমির পারস্পরিক সম্পর্কের ঘটনার সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ঘটনার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল, যদিও ৩০০ বছর পর তা শুরু হয়। ক্যাপ্টেন কুক্ ও তার নাবিকদলের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা অনুসারে স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে উৎসাহী ছিল। কিন্তু যখন কুক অস্ট্রেলিয়াতে নয়, হাওয়াই এ এক স্থানীয় অধিবাসীর হাতে নিহত হন, তখন থেকে তাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। এই ধরনের ঘটনা প্রায়শই হয়, কিন্তু এই একটি ঘটনা উপনিবেশবাসীদের পরবর্তীকালে জনসাধারণের প্রতি সহিংস কার্যাবলি সমর্থন করতে উৎসাহ জোগায়।

১৭৯০ খ্রি. সিডনি অঞ্চলের একটি বিবরণ

ব্রিটিশদের উপস্থিতি আদিম মানুষদের উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষের উপস্থিতি, পরবর্তীকালে তাদের অনুসরণ করে আরও হাজার হাজার মানুষের আগমন স্থানীয় খাদ্য সম্পদের উপর নজিরবিহীন চাপ সৃষ্টি করে।

দারুক লোকেরা এই বিষয়ে কী ভাবল ? পবিত্র স্থানের এই বিশাল ধ্বংস এবং তাদের ভূমির প্রতি বিচিত্র ও হিংসাত্মক আচরণ তাদের কাছে ব্যাখ্যাতীত মনে হল। নতুন আগন্তুকরা বিনা প্রয়োজনে গাছ কাটত, কিন্তু নৌকা তৈরি করত না, বন্য মধুও সংগ্রহ করত না বা পশুদেরও ধরত না। পাথর সরিয়ে স্তূপীকৃত করা হত, মাটি খুঁড়ে এগুলোকে আকার দেওয়া হত এবং পোড়ানো হত। জমিতে গত করা হত এবং বিশাল কাঠামো তৈরি হত। প্রথমে তারা এই কাজকে হয়তো একটি পবিত্র আনুষ্ঠানিক ভূমি তৈরির সমকক্ষরূপে বর্ণনা করে .... সম্ভবত তারা ভেবেছিল একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশাল সমাবেশ হবে এবং একে বিপজ্জনক ভেবে তাদের উচিত হবে এই সমাবেশ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এরপর থেকে দারুক লোকেরা ওইসব বাসিন্দাদের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে এবং একমাত্র সরকারি আইনি অপহরণই তাদের ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ ছিল।

(পি. গ্রিমশ, এম লেক, এ ম্যাক গ্রথ, এম কোয়ার্টলি ক্রিয়েটিং এ নেশন)

তারা অনুমান করতে পারেনি যে, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে তাদের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, জমি ও সম্পদ হস্তচ্যুত হয়ে এবং ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মারা যাবে। পর্তুগিজ অপরাধীদের নিয়ে ব্রাজিলে উপনিবেশ স্থাপনের পরীক্ষা নিরীক্ষা বর্জিত হয় যখন তাদের উগ্র ব্যবহার স্থানীয়দের প্রতিশোধ গ্রহণে উত্তেজিত করেছিল। ব্রিটিশরা আমেরিকা উপনিবেশে একই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন যতদিন না তারা স্বাধীন হয়েছিল এবং অস্ট্রেলিয়াতেও তারা একই পদ্ধতি গ্রহণ করে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দিকের ঔপনিবেশিকরা বেশিরভাগ ইংল্যান্ড থেকে নির্বাসিত হয়ে এসেছিল এবং তাদের কারাবাস শেষ হলে তারা ইংল্যান্ড ফিরে যাবে না, এই শর্তে তাদের অস্ট্রেলিয়াতে স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাদের নিজস্ব অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের অঞ্চলে কোনো আশ্রয় বা অবলম্বন ছাড়া তাদের জীবন শুরু করার জন্য, চাষবাস করার জন্য, মূলত স্থানীয়দের জমি থেকে উচ্ছেদ করতেও তারা দ্বিধা করেনি।

অস্ট্রেলিয়ার বিকাশ	
১৮৫০	অস্ট্রেলিয়ার উপনিবেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর।
১৮৫১	চিনা কুলিদের অভিবাসন, ১৮৫৫ খ্রি. আইনদ্বারা স্থগিত।
১৮৫১-১৯৬১	গোল্ড রাশ
১৯০১	৬টি রাষ্ট্র নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা।
১৯১১	রাজধানী হিসেবে ক্যানবেরার প্রতিষ্ঠা।
১৯৪৮-৭৫	দুই মিলিয়ন ইউরোপীয়দের অস্ট্রেলিয়ায় স্থানান্তর।

কার্যাবলি-৪

১৯১১ খ্রি. ঘোষণা করা হয় যে, নতুন দিল্লি এবং ক্যানবেরাকে যথাক্রমে ব্রিটিশ ভারত ও অস্ট্রেলিয়া রাষ্ট্রমণ্ডল-এর রাজধানী করা হবে। সেই সময়ে এই দেশগুলোর মূল অধিবাসীদের রাজনৈতিক পরিস্থিতির তুলনামূলক আলোচনা করো।

ইউরোপীয় উপনিবেশের অধীনে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ আমেরিকার মত বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল না। দীর্ঘ সময় ও কঠোর শ্রমের দ্বারা বৃহৎ জাহাজ কারখানা ও খনি তৈরি করা হয়। এরপর আঙ্গুর চাষ ও গম চাষ শুরু হয়। এগুলোই দেশের সমৃদ্ধির ভিত্তি গঠন করে। যখন রাজ্যগুলো সংযুক্ত হয় তখন অস্ট্রেলিয়ার জন্য একটি নতুন রাজধানী হিসাবে ওলহুইট গোল্ড এর নাম প্রস্তাব করা হয়, তবে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় একটি শব্দ 'ক্যামবেরা' (যার স্থানীয় অর্থ সভাস্থল) অনুসারে এর নামকরণ হয় ক্যানবেরা।

কিছু কিছু স্থানীয় অধিবাসী কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু সেইসব কাজের ক্ষেত্রে এমন কষ্টকর পরিবেশ বিদ্যমান ছিল যে ওই কাজের সঙ্গে দাসপ্রথার পার্থক্যও খুব বেশি ছিল না। পরবর্তী সময়ে চিনের অভিবাসীরা ক্যালিফোর্নিয়ার মতো এখানেও সস্তায় শ্রম সরবরাহ করে। কিন্তু অশ্বেতাঙ্গ (Non-white) লোকদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা তৈরি হওয়ার ফলে দুই দেশের সরকারই চিনা অভিবাসীদের শ্রমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৭৪ খ্রি. পর্যন্ত মানুষের মনে আশঙ্কা হয় যে, দক্ষিণ এশিয়া অথবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে অশ্বেতাঙ্গ লোকদের অস্ট্রেলিয়ায় আগমন ঘটতে পারে আর এইজন্য সরকার অশ্বেতাঙ্গ লোকদের প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি নীতি গ্রহণ করে।

পরিবর্তনের হাওয়া

১৯৬৮ খ্রি. নৃতত্ত্ববিদ ডব্লিও. ই . এইচ স্টেনার এর এক বক্তৃতায় জনগণ উত্তেজিত হয়েছিল।

বক্তৃতার নামকরণ ছিল 'দ্য গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান সাইলেন্স'— আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের নিস্তব্ধতা। ১৯৭০ এর দশক থেকে উত্তর আমেরিকার অনুকরণে স্থানীয় অধিবাসীদের নতুনভাবে জানার চেষ্টা চলে। শুধুমাত্র নৃতাত্ত্বিক আগ্রহের জন্য নয়, বরং বিশিষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন সম্প্রদায় হিসেবে বোঝার জন্য, জলবায়ু ও প্রকৃতিকে বোঝার অনন্য উপায় হিসাবে জানার জন্য। এই সম্প্রদায়ের গল্প, চিত্রকলা, হস্তশিল্প, খোদাই দক্ষতা যা সম্মানযোগ্য এবং নথিভুক্ত করার যোগ্য ছিল, তা অনুসন্ধানের চেষ্টা চলে। একটি অন্তর্নিহিত জরুরি প্রশ্ন ছিল যা হেনরি রেয়নোল্ড তার উল্লেখযোগ্য বইয়ে তুলে ধরেন যার নাম— 'আমাদের কেন বলা হয়নি?' ('Why weren't we told?') এই বইয়ে তিনি অস্ট্রেলীয় ইতিহাস লেখার নিন্দা করেন, যদিও এটা শুরু হয়েছিল ক্যাপ্টেন কুক এর আবিষ্কারের সময় থেকে।

এরপর মূল অধিবাসীদের সংস্কৃতির অধ্যয়ন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। আর্ট গ্যালারিতে দেশীয় লোকদের শিল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেশীয় সংস্কৃতিকে মূর্ত ও কল্পনাপ্রবণ করে প্রদর্শন করার জন্য মিউজিয়ামকে সম্প্রসারিত করা হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীরাও নিজেদের ইতিহাস লেখা শুরু করে। এটি একটি আশ্চর্যজনক প্রচেষ্টা ছিল। এই কাজ একটি জটিল সময়ে শুরু হয় কারণ এই সময়ও যদি স্থানীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করা হত তাহলে এই সংস্কৃতির অনেক উপাদানই মানুষ ভুলে যেত। ১৯৭৪ খ্রি. থেকে অস্ট্রেলিয়া সরকারের স্বীকৃত নীতি ছিল বহুসংস্কৃতিবাদে বিশ্বাস, যার ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের সংস্কৃতি এবং এশিয়া ও ইউরোপ থেকে আসা বিভিন্ন সংস্কৃতিকেও সমান মর্যাদা দেওয়া হয়।

ভগ্নহৃদয় নিয়ে ক্যাথি আমার বোন
কীভাবে ধন্যবাদ জানাবো তোমাকে ভাবি অনুক্ষণ
মলাটে লেখা আছে সুখ দুঃখ যত
স্বপ্নে দেখ তুমি জীবনভর অবিরত
গায়ের রং কালো এমন একজন শিশু ছিলে তুমি
নিষেধ ছিল তাই তোমার সাথে খেলতে পারিনি
নদীর তীরে বাস তোমাদের গায়ের রং আমাদের মতো নয়
তোমাকে সাদা করতে পারবো না বলে আমার বড়ো দুঃখ হয়।
অনেক দেরিতে হলো — তোমার সাথে দেখা
তোমাকে জানতে দেরি করে ফেললাম ভাবি একা একা
যে দেশকে আমি খুব ভালোবাসি— বলেনি আমায় তারা
তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বিদেশি লুঠেরা।।

জুডিথ রাইট
(১৯১৫-২০০০)

একজন অস্ট্রেলীয় লেখিকা, যিনি অস্ট্রেলিয়ার মূল অধিবাসীদের অধিকার নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তিনি শ্বেতাঙ্গ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের বিচ্ছিন্ন রাখার ফলে যে ক্ষতি হয়েছিল তা নিয়ে তিনি অনেক সময়-উপযোগী কবিতা লেখেন।

১৯৭০ এর দশক থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার বৈঠকে 'মানব অধিকার' শব্দটি শোনা যাচ্ছিল। অস্ট্রেলিয়ার জনগণ এটা উপলব্ধি করে আতঙ্কিত হয়, কারণ আমেরিকা, কানাডা এবং নিউজিল্যান্ডের মতো অস্ট্রেলিয়াতে দেশীয় লোকদের থেকে ভূমি অধিগ্রহণকে বিধিবদ্ধ করার জন্য ইউরোপীয় লোকেরা কোনো চুক্তিপত্র করেনি। অস্ট্রেলিয়ায় ভূমির ক্ষেত্রে সরকার সবসময় টেরা নুলিয়াস (Terra Nullius) শব্দটি ব্যবহার করত যার অর্থ কারও অধিকারে নয়'। এর সাথে স্থানীয় আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং বলপূর্বক আটক করা মিশ্র রক্তের (স্থানীয়-ইউরোপীয়) শিশুদের একটি দীর্ঘ ও মানসিক যন্ত্রণাদায়ক ইতিহাসও ছিল।

এইসব সমস্যার ফলে সৃষ্ট আন্দোলনের অনুসন্ধান করা হয় এবং দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক— এটা স্বীকার করা হয় যে, স্থানীয় অধিবাসীদের ভূমির সাথে (যাকে তারা পবিত্র মনে করত), এক শক্তিশালী ঐতিহাসিক বন্ধন ছিল এবং তাকে সম্মান করা উচিত; দুই— অতীতের কার্যাবলিগুলো বর্তমানে পূর্বাবস্থায় ফেরানো সম্ভব নয়, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গ লোকদের পৃথক করার ব্যবস্থা করে শিশুদের সাথে যে অন্যায় করা হয়েছে, এর জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

১৯৭৪	'শ্বেতাঙ্গ অস্ট্রেলিয়া' নীতির অবসান। এশিয়ার অভিবাসীদের প্রবেশের অনুমতি।
১৯৯২	অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট ঘোষণা করে (মেবো কেস এ) টেরা নুলিয়াস (Terra Nullius) আইনত অবৈধ এবং ১৭৭০ খ্রি. পূর্বের জমির উপর মূল অধিবাসীদের দাবিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়।
১৯৯৫	আদিবাসী এবং টরেস প্রণালীর দ্বীপবাসী শিশুদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করার ঘটনার জাতীয় অনুসন্ধান।
১৯৯৯	১৮২০ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া শিশুদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অঙ্গ হিসেবে 'জাতীয় অনুশোচনা দিবস' পালন (২৬ মে)।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১। দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যে কোনো বিষয়ে পার্থক্য দেখাও।

২। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় ইংরেজির ব্যবহার ছাড়াও ইংরেজদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করো।

৩। আমেরিকানরা 'সীমান্ত' বলতে কী বুঝত?

৪। ইতিহাস বইয়ে অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় অধিবাসীদের ইতিহাস কেন অবহেলিত ছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ :

১। মানুষের সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় জাদুঘরের গ্যালারিতে প্রদর্শিত বস্তু কতটা সহায়ক? একটি জাদুঘর পরিদর্শনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ দাও।

২। কল্পনা করো, ১৮৮০ খ্রি. ক্যালিফোর্নিয়ায় চারজন লোকের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। একজন আফ্রিকার প্রাক্তন দাস, একজন চিনা শ্রমিক, গোল্ড রাশের সন্ধানে বের হওয়া একজন জার্মান এবং একজন হোপি উপজাতির লোক— তাদের কথোপকথন বর্ণনা করো।

বিষয় ১১

আধুনিকতার পথে
(PATHS TO MODERNISATION)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পূর্ব এশিয়া চিনের প্রভুত্ব ছিল। দীর্ঘ পরম্পরার উত্তরসূরি হিসাবে চিং (কুইং) রাজবংশের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন ছিল, অন্যদিকে ছোটো দ্বীপ-রাষ্ট্র জাপান যেন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। কিন্তু কয়েক দশকের মধ্যে চিন অশান্তির জালে জড়িয়ে পড়ল এবং ঔপনিবেশিকতার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হল। কার্যকরী সংস্কারে ব্যর্থ হয়ে চিং রাজতন্ত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলল এবং সমগ্র দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হল। অন্যদিকে জাপান শিল্প সমৃদ্ধ অর্থনীতির মাধ্যমে সফল রাষ্ট্র গঠন করল এবং তাইওয়ান (১৮৯৫) ও কোরিয়া (১৯১০) সহকারে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনে কৃতকার্য হল। ১৮৯৪ সালে জাপান তার সংস্কৃতি ও আদর্শের স্রোতভূমি চিনকে পরাজিত করল এবং ১৯০৫ সালে রাশিয়ার মত ইউরোপীয় শক্তিকে পরাজিত করতে সমর্থ হল।

চিনাদের প্রতিক্রিয়া ধীরগতিসম্পন্ন ছিল যার ফলে তাদের বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে তারা নিজস্ব সংস্কৃতির নবরূপদানে সচেষ্ট হয়, এমনকি রাষ্ট্রশক্তির পুনর্নির্মাণ দ্বারা পাশ্চাত্যের ও জাপানের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হল। তারা বুঝতে পারল একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই দ্বৈত উদ্দেশ্য অসাম্য দূরীকরণ ও রাষ্ট্রশক্তির পুনর্নির্মাণ সম্ভব। ১৯৪৯ সালে চিনের সাম্যবাদী পার্টি গৃহযুদ্ধে বিজয়ী হল। যদিও ১৯৭০ এর দশকের শেষদিকের নেতৃবৃন্দ ভাবতে শুরু করলে যে চিনের প্রচলিত ভাবাদর্শ তার অর্থনৈতিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তাই অর্থব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হল। যদিও পুঁজিবাদ এবং মুক্ত অর্থনীতির পুনরাগমন হল কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা সাম্যবাদী পার্টির হাতেই রইল।

জাপান শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশে পরিণত হল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের লালসা তাকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করল। ১৯৪৫ সালে ইঙ্গ-আমেরিকান যৌথশক্তির হাতে তাকে পরাস্ত হতে হল। আমেরিকার আধিপত্যে অধিকতর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হল এবং ১৯৭০ এর দশকে অর্থব্যবস্থার পুর্নির্মাণ করে এক সমৃদ্ধ আর্থিক শক্তিতে পরিণত হল।

পুঁজিবাদী সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে জাপানের আধুনিকীকরণের সূত্রপাত হয় এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের জগতে প্রতিস্থাপিত হয়। পশ্চিমি আধিপত্যের বিরোধিতা ও এশিয়ার মুক্তির পথিকৃত হিসাবে অন্যান্য দেশে জাপানের আধিপত্য স্বীকৃত হল। জাপানের দ্রুত উন্নতি মূলত তাদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক শক্তি, শিখন ক্ষমতা এবং জাতীয়তাবোধকেই প্রদর্শিত করে।

চিন এবং জাপানে ইতিহাস রচনার দীর্ঘ পরম্পরা লক্ষ করা যায়, কারণ ইতিহাস শাসকবর্গের নিকট পথপ্রদর্শকের কাজ করে। শাসকদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিচারের মানদণ্ড হল ইতিহাস। এজন্য শাসকবর্গ অভিলেখসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও রাজবংশের ইতিহাস রচনার জন্য সরকারি দপ্তর স্থাপন করেছিলেন। সিমা চিয়ান (১৪৫-৯০ খ্রি. পূ.) ছিলেন প্রাচীন চিনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। চিনের ভাবধারায় প্রভাবিত হওয়ার ফলে জাপানেও

ইতিহাস রচনা বিশেষ গুরুত্বলাভ করে। মেইজি সরকার প্রাথমিক পর্বে ১৮৬৯ সালে এক বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যাদের কাজ ছিল অভিলেখসমূহ সংগ্রহ করা। এর আরেক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিজেতা হিসাবে মেইজি বংশের পুনঃস্থাপনা। লিখিত শব্দের বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং সাহিত্যিক দক্ষতার অসামান্য কদর ছিল। এর ফলস্বরূপ বিভিন্ন ধারার লেখন সামগ্রী, যেমন—সরকারি ইতিহাস, বিদগ্ধ রচনা, লোকপ্রিয় সাহিত্য এবং ধর্মীয় পরচা প্রভৃতি পাওয়া যায়। মুদ্রণ এবং প্রকাশনা পূর্ব-আধুনিক যুগের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল এবং এজন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন এবং জাপানের কোনো বইয়ের বিতরণের নিদর্শন পাওয়া সম্ভব। আধুনিক যুগের বিদ্বানেরা এসব সামগ্রীকে নবরূপে এবং বিভিন্নভাবে কাজে লাগান।

আধুনিক পণ্ডিতেরা লিয়াং ছিচাও নামক চিনা (চৈনিক) পণ্ডিত এবং কুমে কুনিতাকে (১৮৩৯-১৯৩১), যিনি জাপানের আধুনিক ইতিহাসের পথিকৃত হিসাবে স্বীকৃত, তাদের কর্মপ্রয়াসকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়া প্রাচীন কালের ইউরোপীয় ভ্রমণকারী যেমন ইতালির মার্কোপোলো (১২৫৪-১৩২৪), যিনি ১২৭৪ থেকে ১২৯০ সাল পর্যন্ত চিনে বসবাস করতেন। মেটিও রিক্কি নামক জেস্যুট পাদ্রি (১৫৫২-১৬১০), যিনি চিন ভ্রমণ করেন, জাপান ভ্রমণকারী লুই ফ্রইস প্রমুখদের রচনাসমূহকেও সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা সবাই নিজেদের ভ্রমণরত দেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর খ্রিস্টান মিশনারিদের রচনাবলিও যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে, যাদের রচনা থেকে উপর্যুক্ত দেশসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সামগ্রী উপলব্ধ হয়।

ইংরেজিতে চিন-জাপানের ইতিহাস সম্পর্কিত উন্নততর রচনার বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। চিন সভ্যতার বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কিত জোসেফ নিডম্ এর সমৃদ্ধশালী রচনা এবং জাপানের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কিত জর্জ সেন্সম্ এর রচনায় এই ধারার সূত্রপাত ঘটে। বর্তমানকালে চিন এবং জাপানের পণ্ডিতদের রচনাসমূহ ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে বিদেশে পড়াতেন এবং ইংরেজিতে লিখতেন। ১৯৮০ সাল থেকে অনেক চৈনিক পণ্ডিত জাপানে কাজ করতেন এবং জাপানি ভাষায় লিখতেন। মূলকথা হল, আমাদের নিকট বিশ্বের বিভিন্ন অংশের উন্নত রচনাসমূহ রয়েছে যার দ্বারা আমরা সেসব দেশ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে পারি।

নাইতো কোনান (১৮৬৬-১৯৩৪)

ইনি চিনদেশে কার্যরত একজন প্রখ্যাত জাপানি পণ্ডিত ছিলেন, যার রচনাসমূহ অন্যান্য জাপানি লেখকদের প্রভাবিত করেছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ জাপানে চিন সম্পর্কিত অধ্যয়নের পরম্পরা ছিল। নাইতো তাঁর রচনায় পশ্চিমি ইতিহাস রচনার নব্য দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন। তিনি ১৯০৭ সালে কেয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য আলাদা বিভাগ নির্মাণে সহায়তা করেন। তিনি তার 'শিনারন' (Shinaron, ১৯১৪- on China) রচনায় যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে সুঙ্গ রাজবংশের কাল থেকে চলে আসা অভিজাতবর্গের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চিনকে মুক্ত করা সম্ভব। তার মতে স্থানীয় সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করার, চিনকে আধুনিক এবং গণতান্ত্রিকরূপে গড়ে তোলার ক্ষমতা রয়েছে চিনের ইতিহাসের মধ্যে। তার মতে জাপান চিনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু তিনি চিনা জাতীয়তাবাদের সঠিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন।

* জাপানে বংশগত নাম ব্যক্তি-নামের আগে বসে।

সূচনা

চিন এবং জাপানের ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে বিস্তার ব্যাবধান রয়েছে। চিন এক বিশালাকায় মহাদেশীয় দেশ যেখানে বিভিন্ন প্রকারের জলবায়ু অঞ্চল রয়েছে ঃ মধ্যভূমি-দেশের মধ্যাংশে রয়েছে তিনটি প্রধান নদী — পীত নদী (হোয়াংহো), ইয়াংসি নদী (ইয়াং-সিকিয়াং পৃথিবীর তৃতীয় দীর্ঘতম নদী) এবং পার্ল নদী। দেশের বিস্তীর্ণ অংশ পর্বতময়।

মানচিত্র ১ : পূর্ব এশিয়া

সবচেয়ে প্রভাবশালী জাতিগোষ্ঠী হল হান এবং প্রধান ভাষা হল চিনা (পুতংগুয়া) কিন্তু এছাড়াও বহু জাতিগোষ্ঠী রয়েছে যেমন — উইঘুর, হুই, মাঞ্চু এবং তিব্বতি। স্থানীয় ভাষা যেমন কেন্টনিজ (উত্র) এবং সাংহাইনিজ (উয়ুবু) ছাড়াও কিছু কিছু অন্যান্য অল্পসংখ্যক ভাষাগোষ্ঠীর লোকও রয়েছে।

চিনদেশীয়দের খাদ্যভ্যাসেও বহুবিধ বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয় এবং কমপক্ষে চারপ্রকার খাদ্যাভ্যাস প্রচলিত রয়েছে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রন্ধনপ্রণালী হল দক্ষিণাঞ্চল বা ক্যান্টনিজ যা কেন্টন এবং তার অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে প্রচলিত। বিদেশে বসবাসকারী বেশিরভাগ চিনারাই ক্যান্টন অঞ্চলের এবং তা থেকে এই প্রসিদ্ধি অনুমেয়। বিখ্যাত ডিম সাম্ (আক্ষরিক অর্থ Touch Your Heart) খাদ্যটি এই অঞ্চলে যা ময়দার ময়ানে সবজির পুরভরা এক প্রকার সেদ্ধ খাবার। উত্তরাঞ্চলের প্রধান খাদ্য হল গম, অন্যদিকে যেচুয়ান অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ দ্বারা আনীত মশলা এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেশম পথ (Silk Route) দ্বারা পর্তুগালের ব্যবসায়ীদের দ্বারা আনীত মরিচের প্রচলনের দরুন উগ্রঝালযুক্ত খাবার প্রচলিত রয়েছে। চিনের পূর্বাঞ্চলে চাল এবং গম উভয়প্রকার খাদ্যদ্রব্যের প্রচলন রয়েছে।

অন্যদিকে জাপান এক দ্বীপময় বা দ্বীপশৃঙ্খল বিশেষ, যার চারটি বৃহত্তম দ্বীপ হল—হনসু, কিউসু, সিককু এবং হোক্কাইডো। সর্বদক্ষিণ দ্বীপশৃঙ্খলটি হল ওকিনওয়ান শঙ্খল যা বাহামার সাথে প্রায় একই অক্ষাংশে অবস্থিত। প্রধান দ্বীপগুলোর প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ অঞ্চল পর্বতময়। জাপান দেশটি অত্যন্ত ভূকম্প প্রবন অঞ্চলে অবস্থিত। এরূপ ভৌগোলিক পরিস্থিতি এখানকার গৃহনির্মাণশৈলীকে প্রভাবিত করেছে। অধিকাংশ জনগণ জাপানি হলেও অল্পসংখ্যক আইনু (Ainu) প্রজাতির এবং কিছুসংখ্যক কোরিয়ান এখানে বসবাস করে যাদের শ্রমিক হিসাবে জাপানে আনা হয়েছিল যখন কোরিয়া জাপানের উপনিবেশ ছিল।

জাপানে পশুপালনের প্রথা প্রচলিত নয়। ধান অন্যতম প্রধান ফসল এবং প্রোটিনের মুখ্য উৎস হল মাছ। কাঁচা মাছ সাশিশি বা সুশি সমগ্র বিশ্বে বিশেষ জনপ্রিয়, কারণ এটি বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য।

জাপান

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

এক সময় জাপানে কেয়োটোর রাজার শাসন প্রচলিত ছিল কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে সৌগুনদের (সৌগুন — জাপানের সেনাবাহিনীর বংশানুক্রমিক সর্বাধিনায়ক)হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল, যারা নামে মাত্র রাজার নামে শাসন চালাত। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত তোকুগাওয়া বংশের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তগত হল। সমগ্র দেশ ২৫০টিরও বেশি ভাগে বিভক্ত ছিল এভং দৈমিও শাসনকার্য চালাতেন। সৌগুন দোমিওর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। দীর্ঘসময় যাবৎ এদা (বর্তমান চৌকিও) তে থাকার আদেশ করতেন যাতে তাদের পক্ষ থেকে কোনো ঝুঁকি না থাকে। সৌগুন বড়ো শহর এবং খনিসমূহের উপরও নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। সামুরাই (যোদ্ধা)গণ শাসন ব্যবস্থায় কুলীন ছিলেন এবং সৌগুন ও দোমিওর জন্য কাজ করতেন।

যোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে তিনটি পরিবর্তন ভবিষ্যতের উন্নতির সোপান তৈরি করেছিল। প্রথমত, কৃষকদের নিরস্ত্র করা হয়েছিল এবং তখন থেকে কেবলমাত্র সামুরাইরা (যোদ্ধা) তলোয়ার রাখতে পারত। তার ফলে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল, যেখানে এর আগের শতাব্দীতে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। দ্বিতীয়ত, তাদের রাজধানীতে দৈম্যদের বসবাস করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের ব্যাপকভাবে সায়ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয়ত, জমির মালিক এবং করদাতাদের পরিচয় নির্ধারণ করা হত জমি জরিপ করার মাধ্যমে এবং জমির উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে একটি স্থিতিশীল রাজস্ব নিশ্চিত করা হত।

দৈম্যর রাজধানীসমূহের সম্প্রসারণ ঘটে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দো জাপানের সর্বাধিক জনসংখ্যা সম্পন্ন শহরে পরিণত হয়। এছাড়া ওসাকা এবং কেয়োটোও বড় শহর হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কমপক্ষে ছয়টি এমন বড় দুর্গ-শহর ছিল যাদের জনসংখ্যা ৫০,০০০ এর বেশি ছিল। সেই তুলনায় তৎকালীন ইউরোপীয় দেশসমূহে কেবলমাত্র একটি বড়ো শহর ছিল। এর ফলে বাণিজ্যিক অর্থব্যবস্থার সম্প্রসারণ হল এবং অর্থ ও ঋণ প্রদান প্রণালী স্থাপিত হয়। ব্যক্তির গুণ তার পদের তুলনায় অধিকতর মূল্যবান হিসাবে পরিগণিত হয়। শহরগুলোতে স্পন্দনশীল সংস্কৃতির বিকাশ শুরু হয় এবং দ্রুত উন্নয়নশীল ব্যবসায়ীবর্গ নাটক এবং কলার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যেহেতু মানুষেরা পড়তে ভালোবাসতেন তাই লেখকরা

** ছাপার কাজ কাঠের ব্লকের দ্বারা হত। জাপানিরা ইউরোপের ছাপা পদ্ধতি পছন্দ করতেন না।*

কেবলমাত্র তাদের লেখনীর দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতে সমর্থ ছিল। এদো শহরে লোকেরা একবাটি নুডুলের সমান মূল্যের বিনিময়ে বই ধার নিতে পারত। এর দ্বারা সহজেই বোঝা যায় যে ছাপার কাজ কত অধিক পরিমাণে চলত এবং পড়াশোনা কতটা জনপ্রিয় ছিল।

জাপান এক উন্নত (ধনী) দেশ হিসাবে পরিগণিত হত। কারণ এইদেশ চিন থেকে রেশম এবং ভারত থেকে কাপড় ইত্যাদি বিলাসী দ্রব্য আমদানি করত। এরজন্য সোনা ও রুপোয় মূল্য দিতে হত বলে অর্থব্যবস্থায় প্রভাব পড়েছিল এবং এজন্যই চৌকুগাওয়া মূল্যবান ধাতু রপ্তানির উপর বাধানিষেধ আরোপ করেন। তিনি কেয়োটোর নিশিজিনে রেশম শিল্প বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন যাতে রেশমের আমদানি কমানো যায়। নিশিজিনের রেশম সমগ্র বিশ্বে উন্নত রেশম হিসাবে পরিচিতি পায়। মুদ্রার বহুল ব্যবহার এবং চালের শেয়ার বাজার নির্মাণ ইত্যাদি প্রমাণ করে যে অর্থব্যবস্থা এক নব দিশায় ধাবিত হচ্ছিল।

সামাজিক ও বৌদ্ধিক বিবর্তন—যেমন প্রাচীন জাপানি সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে জাপানীদের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগ্রত হল যে জাপানের উপর চিনের প্রভাব কতখানি এবং জাপানি হওয়ার প্রমাণ চিনের সাথে সংযোগ হওয়ার বহু পূর্বের ঘটনা। উন্নত প্রাচীন সাহিত্য তথা পৌরাণিক কাহিনি যেমন 'Tale of the Genji' তে কথিত আছে যে দ্বীপসমূহ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং এদের সম্রাট ছিলেন সূর্যদেবীর উত্তরাধিকারী। (জাপানবাসীগণ সূর্যকে স্ত্রী-দেবতা হিসেবে গণ্য করেন)।

নিশিজিন কেয়োটোর এক বস্তি বিশেষ। ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে ৩১ টি পরিবার নিয়ে তাঁতীদের এক সংঘ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এখানে প্রায় ৭০,০০০ লোক ছিল। ১৭১৩ সালে শুধুমাত্র দেশীয় সুতো ব্যবহারের নির্দেশ জারি হল এবং এর ফলে এই শিল্প আরও উৎসাহ পায়। নিশিজিনে শুধুমাত্র এক বিশেষ প্রকারের মূল্যবান সুতো উৎপাদিত হত। রেশম উৎপাদনে স্থানীয় উদ্যোগীগণ এতই উন্নত হন যে এরা পরবর্তী সময়ে তকুগাওয়া ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন। ১৮৫৯ সালে বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়, জাপান থেকে রেশম রপ্তানি এক লাভদায়ক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়, যখন জাপানি অর্থব্যবস্থা পশ্চিমী দ্রব্যাদির সাথে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

গেঞ্জির গল্প

মুরাসাকি শিকিবু (Murasaki Shikibu) রচিত হেয়ান (Heian) রাজদরবার সম্পর্কিত কাল্পনিক ডাইরি 'দি টেল অব দি গেঞ্জি' জাপানের এক অন্যতম প্রধান উপন্যাস-সাহিত্য। তৎকালীন সময়ে মুরাসাকির মতো অনেক লেখিকারা জাপানি লিপির ব্যাবহার করেন এবং পুরুষ লেখকরা চিনা লিপির ব্যবহার করতেন। চিনা লিপির ব্যবহার শিক্ষা এবং সরকারি কাজে হত। এই উপন্যাসে রাজ কুমার গেঞ্জির রোমাঞ্চকর জীবন দর্শিত হয়েছে এবং হেয়ান রাজদরবারের অভিজাত বাতাবরণের জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে। নারীদের নিজেদের পতি নির্বাচন এবং স্বাধীন জীবন যাপনের বর্ণনাও এই উপন্যাসে পাওয়া যায়।

মেজি বংশের পুনর্প্রতিষ্ঠা

(১৮৬৭-৬৮ সালে মেজি বংশের নেতৃত্বে চৌকুগাওয়া বংশের শাসনব্যবস্থা সমাপ্ত হল। মেজি বংশের পুনর্প্রতিষ্ঠার পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল।) সমগ্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছিল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্কের দাবি উঠছিল। এর মধ্যে ১৮৫৩ সালে আমেরিকা কমোডোর ম্যাথু পেরি (১৭৯৪-১৮৫৮) কে জাপান সরকারের সাথে এমন এক চুক্তিতে স্বাক্ষরের জন্য প্রেরণ করে যার দ্বারা দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়। পরের বছর জাপান এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। চিন আমেরিকাকে এক বৃহৎ বাজার হিসাবে বিবেচনা করত এবং তার সাথে যোগাযোগের পথেই ছিল জাপান। এছাড়াও প্রশান্ত মহাসাগরে তিমি শিকারকারী আমেরিকার জাহাজগুলোর জ্বালানি সংগ্রহের জন্য জায়গার প্রয়োজন ছিল। সেই সময় একটি মাত্র পশ্চিমি দেশ যেটি জাপানের সাথে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল তা হল ইংল্যান্ড।

পেরির আগমনের কালে জাপানের রাজনৈতিক জীবনে গভীর প্রভাব পড়ে। সম্রাট, যার রাজনৈতিক গুরুত্ব এতদিন অত্যন্ত নগণ্য ছিল, তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করলেন। ১৮৬৮ সালে এক আন্দোলনের দ্বারা সৌগুনকে ক্ষমতাচ্যুত করা হল এবং মেজি সম্রাটকে এদোতে নিয়ে আসা হল। এদো রাজধানী হিসাবে ঘোষিত হল এবং এর নতুন নামকরণ করা হল টোকিও—যার অর্থ হল 'পূর্ব রাজধানী'।

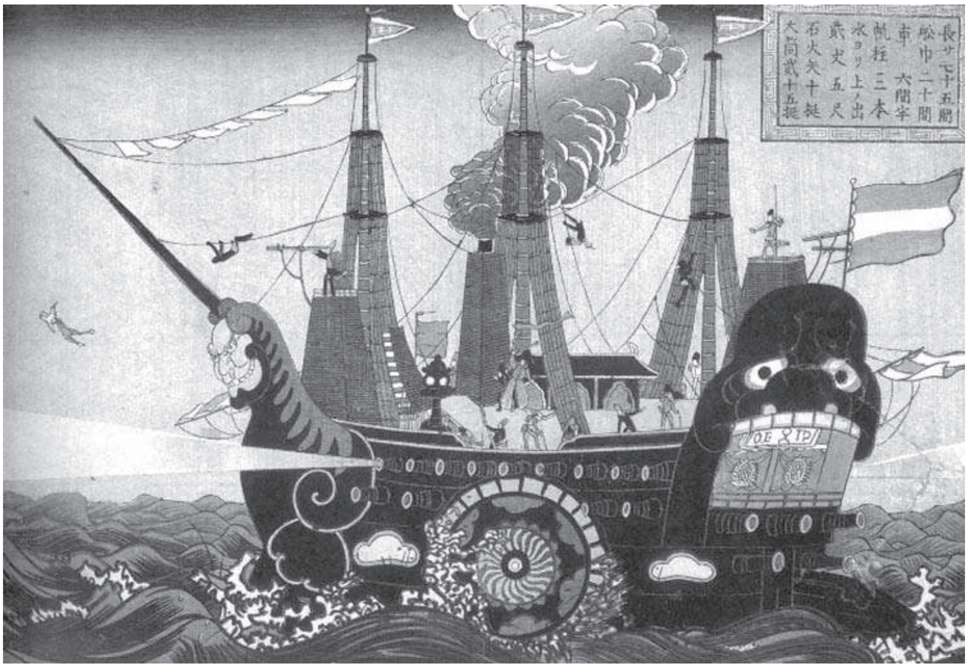

পেরির জাহাজ : কাঠের ফলক দ্বারা জাপানী ছাপা চিত্র

জাপানিরা যাকে ‘কালোজাহাজ’ (আলকাতরা দ্বারা কাঠের জোড়াগুলো জল নিরুদ্ধ কার হত।) বলতেন সেখানে বিভিন্ন ছবি ও কার্টুনে এক অদ্ভুত বিদেশি ও তাদের অভ্যাস সম্পর্কে বর্ণর্না রয়েছে। এই চিত্র জাপানের উন্মুক্ততার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। (বর্তমানে পণ্ডিতেরা বলেন যে জাপান কখনই ‘বন্ধ’ ছিলনা কারণ তারা পূর্ব এশিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত এবং ডাচ ও চিনাদের মাধ্যমে বৃহত্তর জগত সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করত।)

সরকারি আধিকারিকগণ এবং সাধারণ মানুষেরা জানতেন যে কিছু কিছু ইউরোপীয় দেশ ভারত ও অন্যান্য জায়গায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন করে চলেছে। ব্রিটিশদের হাতে চিনের পরাজয় (২৪৪ পৃ. দেখ) এর খবর ছড়িয়ে পড়ছিল এবং এই ঘটনা বিভিন্ন জনপ্রিয় নাটকে প্রদর্শিত হচ্ছিল। ফলে মানুষের মধ্যে এই ভয় জাগ্রত হচ্ছিল যে জাপানেও উপনিবেশ তৈরি হতে পারে। অনেক পণ্ডিত ইউরোপীয় নতুন চিন্তাধারাকে উপেক্ষা না করে বরং তাদের থেকে শিখতে চেষ্টা করছিলেন যেমনটা চিন করছিল। অন্যদিকে আরেকটি গোষ্ঠী ইউরোপীয়দের বাদ দিয়ে তাদের প্রযুক্তিকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। আবার কেউ কেউ বহির্বিশ্বের নিকট ধীরে ধীরে অল্পবিস্তার জাপানকে উন্মুক্ত করার কথাও ভাবছিলেন।

জাপানিদের দৃষ্টিতে কমোডোর পেরী

সরকার এক নতুন নীতি ঘোষণা করলেন যার স্লোগান ছিল ফুকোকু কিউহো (rich country, strong army) (উন্নত দেশ, শক্তিশালী সেনা)। সরকার বুঝেছিল যে দেশের অর্থ-ব্যবস্থার বিকাশ এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করতে হবে নতুবা জাপানও ভারতের মতো পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। এজন্য জনগণের মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা এবং প্রজাদের নাগরিকের মর্যাদা দানের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

কার্যাবলি-১

ইউরোপীয়দের সাথে জাপানি এবং অ্যাজটেক্‌দের যে সংঘর্ষ হয়েছিল, তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ কর।

একই সময়ে নতুন সরকার ‘সম্রাট ব্যবস্থা’র পুনর্নির্মানের কাজ শুরু করেন। (জাপানি পণ্ডিতদের পক্ষে-‘সম্রাট ব্যবস্থা’ হল এমন এক ব্যবস্থা যেখানে সম্রাট, কর্মচারী এবং সেনা ঐক্যবদ্ধ ভাবে শাসন চালাবে এবং কর্মচারী ও সেনাগণ সম্রাটের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে)। কিছু কিছু আধিকারিকদের ইউরোপে পাঠানো হল সেখানকার রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভের জন্য। সম্রাটকে সূর্যদেবীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসাবে মান্যতা দেওয়া হল, একই সাথে তাঁকে পশ্চিমিকরণের নেতা হিসাবেও গণ্য করা হল। সম্রাটের জন্মদিন হল রাষ্ট্রীয় ছুটির দিন, তিনি পশ্চিমি কায়দায় সৈনিকদের পোশাক পরিধান করতে আরম্ভ করলেন। আধুনিক সংস্থাগুলোকে তাঁর নামে স্থাপন করার নির্দেশ জারি হল।১৮৯০ সালে শিক্ষাসম্বন্ধীয় রাজার নির্দেশনামায় জনগণকে পড়াশোনা বিষয়ে জনকল্যাণ মূলক কাজে এবং সর্বজনীন স্বার্থরক্ষায় উৎসাহিত করল।১৮৭০ এর দশক থেকে নতুন বিদ্যালয় ব্যবস্থার নির্মাণ শুরু হল। ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া

বাধ্যতামূলক করা হল, ১৯১০ সালের মধ্যে তা সর্বজনীন হল। পড়ার ফি অত্যন্ত কম ছিল। শুরুতে পশ্চিমি ধাঁচে পাঠদান শুরু হলেও ১৮৭০ এর দশক থেকে আধুনিক চিন্তাধারার প্রতি গুরুত্বদানের সাথে সাথে দেশের প্রতি নিষ্ঠা এবং জাপানের ইতিহাস পাঠের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হল। শিক্ষাদপ্তর পঠন পাঠন, পুস্তক নির্বাচন এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের তদারকি করত। নীতিশিক্ষা, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্গত করা হল।

জাপানি লিখন শৈলী: কাঞ্জি (চিনের চিত্রিত অক্ষর—লাল; কাতাকানা— নীল; হিরাগানা— সবুজ।

ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে জাপানিরা যে লিপির ব্যবহার করত, তা চিন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। যা ষষ্ঠ শতাব্দীতে চিনাদের থেকে সংগ্রহ করা। যেহেতু তাদের ভাষা চিনাদের থেকে অনেক আলাদা, তাই তারা দুই ধরনের ধ্বনির বর্ণমালা বিকাশ করেন— হিরাগানা ও কাতাকানা। হিরা গানাকে স্ত্রীবাচক মনে করা হয় কারণ হেওয়ান যুগে বহু লেখিকা এর ব্যবহার করতেন- যেমন মুরাসাকি। এটি চিনের চিত্রসম্বন্ধীয় চিহ্ন এবং ধ্বনিবাচক অক্ষরসমূহ (হিরা গানা বা কাতাকানা) এদের সমন্বয়ে লিখিত হয়। শব্দের মূল অংশটি কাঞ্জি চিহ্ন দ্বারা লিখিত হয়। আর বাকী অংশ হিরাগানাতে।

ধ্বনিবাচক বা শব্দবোধক বর্ণমালা থাকার দরুন জ্ঞানচর্চা অভিজাতবর্গ থেকে দ্রুত সমাজের অন্যান্য অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৮০ এর দশকে প্রস্তাবিত হল, জাপান সম্পূর্ণ শব্দবোধক বর্ণমালার বিকাশ করুক অথবা কোনো ইউরোপীয় ভাষা গ্রহণ করুক। কিন্তু বাস্তবে কোনোটাই হল না।

রাষ্ট্রকে ঐক্যবন্ধ করার উদ্দেশ্যে মেজি সরকার পুরোনো গ্রামসমূহ এবং আঞ্চলিক সীমার পরিবর্তন করে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করলেন। প্রশাসনিক ইউনিটসমূহের স্থানীয় বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ইত্যাদি পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত রাজস্বের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া প্রশাসনিক ইউনিটসমূহ সৈন্যবাহিনীতে ভর্তির দপ্তর হিসাবেও কাজ করত। বিশ বছরের উর্ধ্বে যুবকদের জন্য কিছুদিন সৈন্যবাহিনীতে কাজ করা বাধ্যতামূলক করা হল। এক আধুনিক সৈন্যদল গঠন করা হল। রাজনৈতিক দল গঠন, জনসভা বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ এবং কঠোর নির্বাচন (Censorship) ব্যবস্থা সম্পর্কিত নতুন আইন প্রচলিত হল। এসকল বিষয়ে সরকারকে বিশেষ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সৈন্যবাহিনী এবং আমলাদের সরাসরি সম্রাটের নির্দেশাধীনে আনা হল। এর অর্থ হল সংবিধান থাকা সত্ত্বেও এই দুই সংস্থা সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।

গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং আধুনিক সৈন্যবাহিনী —এই দুই ভিন্ন আদর্শের গুরুত্ব দেওয়ার সুদূরপ্রসারী পরিণতি হল, সৈন্যবাহিনী আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করার জন্য এবং কঠোর বিদেশ নীতি প্রণয়নের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। ফলশ্রুতি হিসাবে চিন এবং রাশিয়ার সাথে জাপানের যুদ্ধ হল এবং উভয়ক্ষেত্রেই জাপান বিজয়ী হল। সরকারের এসব আগ্রাসী নীতির পরিবর্তে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য গণদাবি উঠতে লাগল। জাপান দ্রুত আর্থিক বিকাশের পথে এগোতে লাগল এবং এক ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠন করল। নিজ দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করা হল এবং ঔপনিবেশিক দেশসমূহের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ল।

অর্থব্যবস্থার আধুনিকীকরণ

মেজি সংস্কারের আরেক দিক হল অর্থব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। এজন্য কৃষির উপর করের ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের আয়োজন হল। জাপানের প্রথম রেললাইন ১৮৭০-৭২ সালে টোকিও এবং ইয়োকো হামা বন্দরের মধ্যে স্থাপিত হল। বস্ত্র শিল্পের জন্য ইউরোপ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করা হল। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশি কারিগরদের আমন্ত্রণ করা হল, একই সাথে তাদের জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদানের জন্য নিযুক্ত করা হল। জাপানের শিক্ষার্থীদের বিদেশে পড়াশোনার জন্য পাঠানো হল। ১৮৭২ সালে আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা হয়। মিৎসুবিসি এবং সুমিতোমো ইত্যাদি কোম্পানিকে সরকারি সাহায্য এবং করপ্রদানে আংশিক ছাড়দানের মাধ্যমে বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ শিল্পে উন্নতি ঘটে। এর ফলে জাপানের বাণিজ্য জাপানি জাহাজের মাধ্যমে চলতে লাগল। জায়বাস্তু (zaibastu-বিশিষ্ট পরিবার বর্গের নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ ব্যবসায়ী সংস্থা) এর প্রভুত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবতী পর্যায় পর্যন্ত জাপানের অর্থ ব্যবস্থায় কায়েম ছিল।

১৮৭২ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩৫০ কোটি যা ১৯২০ সালে বেড়ে ৫৫০ কোটিতে দাঁড়ালো। জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করার জন্য সরকার অভিপ্রয়াণ (migration) বা বিদেশগমনকে উৎসাহিত করতে লাগল, প্রথমে উত্তরে অবস্থিত হোক্কাইডো দ্বীপ, যা প্রায় স্বাধীন অঞ্চল ছিল এবং যেখানে আইনু জনগোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করত, পরবর্তী সময়ে হাওয়াই ও ব্রাজিল হয়ে জাপানের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের দিকে। শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে মানুষ শহরের দিকে ধাবিত হল। ১৯২৫ সালের মধ্যে ২১% জনসংখ্যা শহরে বাস করত। ১৯৩৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩২% হয়ে গেল (২ কোটি ২৫ লক্ষ)।

শিল্প শ্রমিক

শিল্প শ্রমিকদের সংখ্যা ১৮৭০ সালে ৭,০০,০০০ থেকে বেড়ে ১৯১৩ সালে ৪০ লক্ষতে পৌঁছে গেল। বেশিরভাগ শ্রমিকেরা এমন ইউনিটে কাজ করত যেখানে ৫ জনের কম লোক ছিল এবং মেশিন বা বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার ছিল না। আধুনিক কারখানায় যারা কাজ করতেন তাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি শ্রমিক ছিলেন মহিলা। ১৮৮৬ সালে প্রথম মহিলা শ্রমিকরাই আধুনিক হরতালের আয়োজন করেন। ১৯০০ সালের পর থেকে কারখানায় পুরুষ শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে শুরু করে কিন্তু ১৯৩০ এর দশকে এসে পুরুষ শ্রমিকদের সংখ্যা মহিলা শ্রমিকদের থেকে বেশি হয়।

একটি বস্ত্র কারখানার মধ্যে শ্রমিক

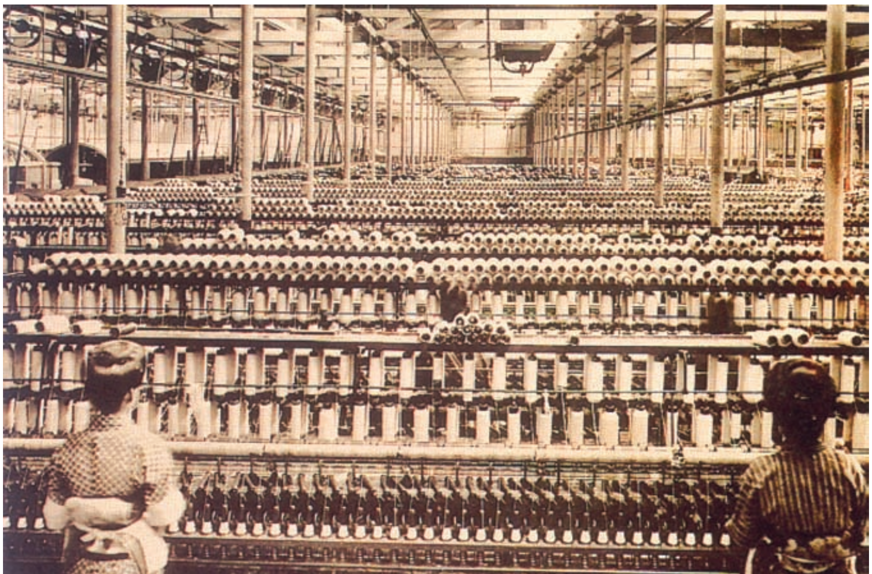

কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে লাগল। ১০০ জনের বেশি শ্রমিক আছে এমন কারখানার সংখ্যা ১৯০৯ সালে ছিল ১০০০টি। ১৯২০ সালের মধ্যে তা ২০০০ এর বেশি হয়ে গেল এবং ১৯৩০ এর দশকে সংখ্যাটি হল ৪০০০। তৎসত্ত্বেও ১৯৪০ সালে ৫,৫০,০০০ কারখানায় ৫ জনের কম শ্রমিক কাজ করতেন। এর ফলে পরিবার

কেন্দ্রিক চিন্তাধারা চলতে লাগল, যেমনভাবে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা সুদৃঢ়ভাবে সম্রাটের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলছিল, যেখানে সম্রাট ছিলেন পিতৃস্থানীয় তথা পরিবারের পিতার মত।

দ্রুত এবং অনিয়ন্ত্রিত শিল্পবিস্তারের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন কাঠের অত্যধিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে। ১৮৯৭ সালে তানাকা সজো, যিনি ‘হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ’ এর প্রথম নির্বাচিত সদস্য ছিলেন, তিনি ৮০০ গ্রামবাসী সহ গণপ্রতিবাদ জানান শিল্পপ্রসারজনিত দূষণের বিরুদ্ধে এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেন।

তানাকা সুজো (১৮৪১-১৯১৩) এক কৃষকের স্ব-শিক্ষিত সন্তান, যিনি বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিগণিত হন। তিনি ১৮৮০ এর দশকে ‘পপুলার রাইটস্ মুভমেন্ট’ এ সাংবিধানিক সরকারের দাবি উত্থাপন করেন। তিনি প্রথম সংসদ ‘ডায়েট’ এর নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। তাঁর মতে, শিল্প সম্প্রসারণের জন্য সাধারণ মানুষের ক্ষতি করা যায় না। আসিও খনি থেকে ওয়াটারাসে নদী দূষিত হচ্ছিল যাতে ১০০ বর্গ মাইল কৃষিজমি নষ্ট হচ্ছিল এবং হাজার হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। আন্দোলনের ফলে কোম্পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে, ফলে ১৯০৪ সালের মধ্যে ফসল উৎপাদন স্বাভাবিক হয়।

উগ্র জাতীয়তাবাদ

মেইজি সংবিধান নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকার নীতির উপর ভিত্তি করে যে ডায়েট তৈরি করেছিলেন তার অধিকারও সীমিত ছিল। (জাপানিরা সংসদ হিসাবে ‘ডায়েট’ শব্দটি চয়ন করেছিলেন, যা একটি জার্মান শব্দ, কারণ তাদের আইনসংক্রান্ত চিন্তাধারা জার্মানদের দ্বারা প্রভাবিত।) যিনি রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার নায়ক ছিলেন তিনি তার ক্ষমতাবলে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯১৮ থেকে ১৯৩১ এর মধ্যবর্তী সময়ে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীগণ মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন। কিন্তু তারা ক্ষমতা হারান রাষ্ট্রীয় একতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে, যা গঠিত হয়েছিল পার্টিগত বিভেদ ভুলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে। সম্রাট ছিলেন সৈন্যদলের অধিনায়ক এবং ১৮৯০ সাল থেকে স্থলসেনা ও নৌসেনারা নিয়ন্ত্রণ আলাদা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। ১৮৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, কেবলমাত্র কর্মরত জেনারেল এবং এডমিরালরাই মন্ত্রী হতে পারবেন। এভাবে সৈন্যবল বৃদ্ধির সাথে জাপানের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণের পেছনে যে ভয়টি কাজ করছিল তা হল — জাপান পশ্চিমি শক্তির দয়ার উপর নির্ভরশীল। এই ভয় সেসব প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার কাজে ব্যবহৃত হয় যারা সৈন্য সম্প্রসারণ এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য অতিরিক্ত কর আদায়ের বিরোধিতা করতেন।

একটি ম্যাগাজিনের কভার পেজ ঃ যুবকদের দেশের জন্য যুদ্ধ করতে পাঠানোর চিত্র। শিক্ষানবিশ সৈনিকদের চিত্র।

পশ্চিমিকরণ ও পরম্পরা

জাপানের সাথে অন্য দেশের সম্পর্ক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জাপানি বুদ্ধিজীবিদের ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে, আমেরিকা এবং পশ্চিমি ইউরোপীয় দেশসমূহ সভ্যতার উচ্চশিখরে ছিল, যে স্তরে জাপানের পৌঁছানোর আকাঙ্খা ছিল। ফুকোজাবা ইউকিচি ছিলেন মেইজি শাসনকালের একজন অন্যতম বুদ্ধিজীবী। তাঁর মতে, জাপানের উচিত নিজের মধ্য থেকে 'এশিয়ার ভাবধারা' কে ছেঁটে ফেলা। তিনি বলতে চেয়েছেন, জাপান যেন নিজের মধ্যে বিদ্যমান এশিয়ার লক্ষণসমূহ পরিত্যাগ করে পশ্চিমি দুনিয়ার অংশ হিসেবে নিজেকে পরিগণিত করে।

ফুকুজাওয়া ইউকিচি (Fukuzawa Yukichi) (১৮৩৫-১৯০১)
তাঁর জন্ম হয়েছিল এক গরিব সামুরাই পরিবারে। তিনি নাগাসাকি এবং ওসাকাতে পড়াশোনা করেন। ইনি ডাচ এবং পশ্চিমি বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তী পর্বে ইংরেজিও অধ্যয়ন করেন। ১৮৬০ সালে তিনি আমেরিকার জাপানি দূতাবাসে প্রথম অনুবাদক হিসাবে নিযুক্ত হন। এজন্য তিনি পশ্চিমি জগৎ সম্পর্কে পুস্তক রচনার বহু উপাদান সহজেই পেয়ে যান। তিনি ক্লাসিক স্টাইলে না লিখে কথ্য ভাষায় রচনা করেন যা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। তিনি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, তা বর্তমানে কেইও বিশ্ববিদ্যালয় (Keio University) নামে পরিচিত। তিনি মেরোকুসা (Meirokusha) সংস্থার এক অন্যতম সদস্য ছিলেন, যে সংস্থার কাজ ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার করা।

তার রচিত একটি পুস্তকে 'The Encouragement to Learning' (১৮৭২-৭৬) তিনি জাপানি শিক্ষার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি লিখেছেন, "জাপানের নিকট প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্পর্কে গর্ব করা ছাড়া আর কিছুই নেই।" তিনি আধুনিক শিল্প এবং সংস্থার পাশাপাশি পশ্চিমি সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, যা তাঁর মতে সভ্যতার আত্মা। এর দ্বারা এক নতুন নাগরিক তৈরি হবে। তার নীতি ছিল : "স্বর্গ মানুষকে মানুষের উপর বা মানুষের নীচের অবস্থানে সৃষ্টি করেনি।"

নতুন প্রজন্ম সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমি ভাবধারাকে গ্রহণের বিষয়ে প্রশ্ন তোলে এবং তাদের মতে রাষ্ট্রীয় গর্ব মূলত দেশীয় মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। দার্শনিক মিয়াকে সেসুরেই-এর মতে (১৮৬০-১৯৪৫), বিশ্ব সভ্যতার কল্যাণার্থে সকল দেশের উচিত নিজস্ব বিশেষ দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। "নিজেকে নিজের দেশের জন্য সমর্পিত করার অর্থ হল নিজেকে বিশ্বের জন্য সমর্পিত করা।" কিন্তু অন্যদিকে বহু বুদ্ধিজীবী পশ্চিমি উদারনীতিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাদের মতে জাপানের মূল ভিত্তি হওয়া উচিত সৈন্যবল নয় বরং গণতন্ত্র। ওএকি এমোরি (Ueki Emori) (১৮৫৭-১৮৯২) যিনি 'পপুলার রাইটস্ মুভমেন্ট' এর একজন নেতা ছিলেন, যিনি সাংবিধানিক সরকারের জন্য দাবি উত্থাপন করেন এবং ফরাসী বিপ্লবের বিখ্যাত 'মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার' এবং জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের সমর্থণ ছিলেন। তিনি এমন এক শিক্ষা বাবস্থার বিষয়ে কথা বলেন, যা হবে উন্মুক্ত এবং যার দ্বারা প্রত্যেকে তার উন্নতি করতে পারবে। তিনি বলেন ঃ "শাসনব্যবস্থার চেয়ে স্বাধীনতা বেশি মূল্যবান।" অন্যেরা মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবি তোলেন। এর ফলে সরকার বাধ্য হয় একটি সংবিধান ঘোষণা করতে।

প্রাত্যহিক জীবন

জাপানের আধুনিক সমাজে রূপান্তর প্রাত্যহিক জীবনের পরিবর্তনের মধ্যে দেখা যায়। বহুযুগ ধরে একত্রে বসবাসের মাধ্যমে পরিবার-প্রধানদের নিয়ন্ত্রণাধীন পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা গঠিত হল। কিন্তু যখন আরও বেশি লোক সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে তখন পরিবারের নতুন ধারণা বিস্তার লাভ করে। নতুন বাড়ি (হোমু— যেমন জাপানিরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের দ্বারা বলে) ছিল অণু (ছোটো) পরিবার যেখানে স্বামী ও স্ত্রী বাস করত পরিবারের জীবিকা উপার্জনকারী ও গৃহ প্রস্তুতকারী হিসাবে। পারিবারিক জীবনের এই নতুন ধারণা পর্যায়ক্রমে উৎপন্ন করে নতুন ধরনের গৃহস্থালি জিনিসপত্রের চাহিদা, নতুন ধরনের পারিবারিক আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা এবং নতুন ধরনের গৃহনির্মাণ। ১৯২০ এর দশকে নির্মাণ সংক্রান্ত কোম্পানিগুলো সস্তায় গৃহনির্মাণ কাজকে সহজলভ্য করে দিল ২০০ ইয়েন ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় দশ বছরের জন্য মাসিক কিস্তি ছিল ১২ ইয়েন (জাপানের মুদ্রা) করে। এইটি একসাথে দিতে হত, যখন একজন ব্যাংক কর্মীর বেতন (উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন এক ব্যক্তি) প্রতিমাসে ৪০ ইয়েন ছিল।

বৈদ্যুতিক পণ্যের নতুনত্ব: একটি রাইস কুকার, একটি আমেরিকান গ্রিল, একটি টোস্টার।

গাড়ি ক্লাব

মোগা:- 'আধুনিক মেয়ে' কে বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হত। এটা বিংশ শতাব্দীতে লিঙ্গ ভেদাভেদ, বিশ্বজনীন সংস্কৃতি আর উন্নত অর্থ ব্যবস্থার পরিকল্পনাকে একসাথে আনার সূচনার প্রতিনিধিত্ব করে। নতুন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো ভ্রমণ এবং মনোরঞ্জনের জন্য নতুন পদ্ধতির গঠন করে। বৈদ্যুতিক ট্রাম চলাচলের মাধ্যমে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে জনগণের জন্য পার্ক, বড়ো দোকান এবং ডিপার্টমেন্ট স্টোর বানানো শুরু হয়েছিল। টোকিওতে 'গিঞ্জা' শব্দটি গিনবুরার জন্য ব্যবহৃত হতে লাগল। গিনবুরা শব্দটি গিঞ্জা এবং বুরবুরা এই দুটি শব্দ মিলে হয়েছে বুরবুরা শব্দের অর্থ হল 'উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো'। ১৯২৫ সালে প্রথম বেতার কেন্দ্র খোলা হয়। অভিনেত্রী মাতসুই সুমাকো, ইবসন এর নাটক 'এক পুতুলের ঘর' এ নোরার চরিত্রে অভিনয় করে জাতীয় স্তরের তারকা হয়ে গেলেন। ১৮৯৯ সালে সিনেমা তৈরি হতে লাগল এবং খুব শীঘ্রই এক ডজন কোম্পানি শতাধিক সিনেমা তৈরি করতে লাগল। এই সময়টা ছিল প্রচুর জীবনীশক্তিতে ভরপুর। তাই এই সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক আচরণের ঐতিহ্যগত মানদণ্ডের উপর প্রশ্ন উঠেছিল।

মহিলাদের গাড়ি পুল

আধুনিকত্ব জয় করা (Overcoming Modernity)

রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেল ১৯৩০ এর দশকে ও ১৯৪০ এর দশকে যখন জাপান তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য চিন এবং এশিয়ার অন্যান্য অংশে যুদ্ধ শুরু করেছিল। জাপানের আমেরিকার পার্ল হারবার আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে মিশে গিয়েছিল। এই সময়কালে সমাজের উপর বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ দেখা গিয়েছিল। ভিন্নমত পোষণকারীদের দমন করার জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হল। স্বদেশ প্রেমিক সমিতি গঠন করা হল। মহিলা সংগঠনগুলোর অনেকেই যুদ্ধকে সমর্থন করেছিল।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'আধুনিকত্ব জয় করা'র উপর বিভিন্ন মতামত সংগ্রহ করে একটি জোরদার বিতর্ক সভা হয়েছিল, যা ছিল জাপানের নিকট উভয় সংকট। প্রশ্ন উঠেছিল, আধুনিক হলে কীভাবে পশ্চিমের (পাশ্চাত্য) সঙ্গে যুদ্ধ করবে? মরই সাবুরো নামে একজন সঙ্গীতজ্ঞ প্রশ্ন তুলেছিল কীভাবে সঙ্গীতকে আজ্ঞাবহ উত্তেজনার শিল্প থেকে রক্ষা করবে এবং জীবনীশক্তি শিল্পে পুনঃস্থাপন করবে। তিনি পাশ্চাত্যের সঙ্গীত ত্যাগ করেননি। কিন্তু তিনি একটি পথ খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন যাতে পাশ্চাত্যের যন্ত্রে জাপানের সঙ্গীতকে বাজানো যায়। দার্শনিক নিশিতানি কেইজি 'আধুনিক' এর সংজ্ঞা দিয়েছেন পাশ্চাত্য চিন্তার তিনটি ধারার মধ্যে ঐক্য— যথা নবজাগরণ, প্রতিবাদী ধর্মসংস্কার এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উত্থান। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে জাপানের 'নৈতিক শক্তি' কে (জার্মান দার্শনিক র‍্যাঙ্কের থেকে নেওয়া একটি শব্দ) সাহায্য করেছিল ঔপনিবেশিকবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। তাঁর দায়িত্ব ছিল বৃহৎ পূর্ব এশিয়ায় একটা নতুন বিশ্ব সৃষ্টি করা। তার জন্য একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, যা বিজ্ঞান ও ধর্মের মেলবন্ধন গড়ে তুলবে।

কার্যাবলি-২

নিশিতানির 'আধুনিক এর সংজ্ঞার সাথে তুমি কি একমত?

পরাজয়ের পর: বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে পুনরায় আবির্ভাব

(After Defeat : Re-emerging as a Global Economic power) :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির কাছে পরাজয়ের ফলে জাপানের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটল। এইরূপ যুক্তি দেখানো হল যে যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যরা চিন্তা করেছিল যে এর ফলে যে অপূরণীয় ধ্বংস ও দুঃখকষ্টের সৃষ্টি হয়েছিল তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের চালিত শক্তির অধীনে জাপানের সামরিক শক্তি ভেঙে দেওয়া হল এবং জাপানে একটি নতুন সংবিধান চালু করা হল। এই সংবিধানের ৯টি অনুচ্ছেদ ছিল। এতে তথাকথিত কোনো যুদ্ধ শর্ত ছিল না, যা রাষ্ট্র নীতির যন্ত্র হিসাবে যুদ্ধের মানসিকতা পরিত্যাগ করেছিল। এতে ছিল কৃষি সংস্কার, ট্রেড ইউনিয়নের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জাইবাৎসুর মতো প্রতিষ্ঠান ভাঙার চেষ্টা অথবা একচেটিয়া বড় প্রতিষ্ঠানগুলো যেগুলো জাপানের অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল—এগুলোও চালিয়ে যেতে লাগল। রাজনৈতিক দলগুলোকে পুনর্জীবিত করা হয়েছিল এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যুদ্ধোত্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে মহিলারা প্রথমবারের মতো ভোট দেয়।

জাপানের পরাজয়ের পর তার অর্থনীতির দ্রুত পুনর্গঠনকে বলা হত একটি যুদ্ধোত্তর অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু তা ছিল এর চেয়েও বেশি। এটা সুদৃঢ়ভাবে নিহিত ছিল তার দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে। একমাত্র সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করা হল। কিন্তু জাপানিদের জনপ্রিয় দ্বন্দ্বের একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রয়েছে এবং এর সাথে আছে বুদ্ধিদীপ্ত অঙ্গীকার কীভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে বিস্তৃত করা যায়। যুদ্ধপূর্ব সময়ের সামাজিক সংযোগ শক্তিশালী করা হল এবং সরকার, আমলাতন্ত্র এবং শিল্প—এই তিনটির মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন এবং কোরিয়া ও ভিয়েৎনামি যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট দাবি জাপানের অর্থনীতিকে সাহায্য করেছিল।

১৯৬৪ খিস্টাব্দে টোকিওতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক একটি প্রতীকরূপে ব্যবহৃত যুগের আগমনকে চিহ্নিত করে। একইভাবে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ডগতি সম্পন্ন সিনকানসেন বা বুলেট ট্রেনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এর গতি ছিল প্রতি ঘন্টায় ২০০ মাইল (এখন এটি হয়েছে প্রতি ঘন্টা ৩০০ মাইল)। এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে, প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাপান কতটা এগিয়ে। এটা আরও প্রমাণ করে জাপানের উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে এবং কতটা ভাল ও সস্তায় জিনিস উৎপাদন করতে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং পরে টোকিও শহরের ছবি।

১৯৬০ এর দশকে অসামরিক সামাজিক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। শিল্পায়নকে অবজ্ঞা করা হয়েছিল। আর এর ফলাফল স্বাস্থ্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর পড়ে। টিনের মত ধাতু বিশেষের বিষ, যার ফলে কষ্টদায়ক রোগের সৃষ্টি হত। এটি ছিল প্রথমদিকের নির্দর্শক, এরপর ১৯৬০ এর দশকে মিনামাটায় পারদের বিষক্রিয়ার ফলে এবং ১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিকে বায়ু দূষণের কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হল। গোড়ার দিকের (তৃণমূল স্তরের) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এই সমস্ত সমস্যাগুলো সনাক্তকরণের দাবি করতে আরম্ভ করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দানের কথা বলে। সরকারের হস্তক্ষেপ এবং নতুন আইনগত বিধিবিধান অবস্থার উন্নতির জন্য সাহায্য করেছিল। ১৯৮০ এর দশকের মধ্যভাগ থেকে পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে মানুষের আগ্রহ কমতে শুরু করে, কারণ জাপানে বিশ্ব পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কিছু কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে একটি উন্নত দেশ হিসাবে বিশ্বে নিজের অবস্থান বজায় রাখার জন্য তার রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত ক্ষমতার ব্যবহারের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

চিন

আধুনিক চিনের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে যে প্রশ্নকে নিয়ে সেটি হল কিভাবে সার্বভৌমত্ব পুনরায় লাভ করা যায়, বিদেশি পেশার অবসান করা যায় এবং কীভাবে সমতা এবং বিকাশ ঘটানো যায়। চিনের বিতর্কগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে তিনটি শ্রেণির অভিমতানুসারে। প্রথম দিকের সংস্কারকরা যেমন কাং ইউওয়েই (১৮৫৮-১৯২৭) অথবা লিয়াং কি চাও (১৮৭৩-১৯২৯) চেষ্টা করেছিলেন ঐতিহ্যগত ধারনাকে নতুন ভাবে ব্যবহার করতে এবং বিভিন্ন উপায়ে পাশ্চাত্য দেশ কর্তৃক প্রদর্শিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে। দ্বিতীয়ত, প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবীরা যেমন, চিন প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি সানইয়াৎ সেন, জাপান এবং পাশ্চাত্যের ধারনার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তৃতীয়ত, চিনের কমিউনিস্ট পার্টি (সি.সি.পি) চেয়েছিল দীর্ঘকালের অসমতা দূর করে বিদেশিদের চিন থেকে বহিষ্কার করতে।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই চিনে আধুনিকতার সূচনা হয়, যখন জেসুইট মিশনারিরা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান যেমন জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিত শাস্ত্র প্রবর্তন করে ছিলেন। যদিও তার তাৎক্ষণিক প্রভাব ছিল সীমিত। ইহা গতিশীল ঘটনার সৃষ্টি করেছিল যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে গতিশীল বস্তুর ভরবেগ অর্জন করেছিল। আবার ব্রিটেন শক্তি প্রয়োগ করে তার লাভবান আফিং এর ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে চেয়েচিল। আর এর থেকেই শুরু হয়েছিল প্রথম আফিং এর যুদ্ধ (১৮৩৯-১৮৪২)।

এটি শাসনরত কুইং রাজবংশকে দুর্বল করে দিয়ে পরিবর্তন এবং সংস্কারের জন্য চাহিদাকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল,

আফিম এর যুদ্ধ একটি ইউরোপীয় চিত্র

আফিম বাণিজ্য

চিনে উৎপাদিত বস্তু যথা চা, রেশম, চিনা মাটির বাসন ইত্যাদি দ্রব্যের চাহিদার জন্য ব্যবসাতে অসামঞ্জস্যতা খুব বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিনের বাজারেপাশ্চাত্য দ্রব্যসমূহের স্থান মেলেনি। যার জন্য বেচাকেনা রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে করতে হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নতুন একটি বিকল্প পথ খুঁজে পেয়েছিল, যা হল আফিম। এটি ভারতের অনেকস্থানে খুব সহজেই উৎপন্ন হত। চিন আফিম বিক্রয় করার মাধ্যমে তারা রৌপ্যমুদ্রা উপার্জন করে ক্যান্টনে ঋণপত্রের পরিবর্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিদের প্রেরণ করত। এইভাবে কোম্পানি রুপা দিয়ে ব্রিটেনের জন্য চা, রেশম এবং চিনামাটির বাসন কিনত। এটা ছিল ব্রিটেন, ভারত এবং চিনের মধ্যে এই উৎপাদিত দ্রব্যের 'ত্রিকোণীয় ব্যবসা'।

কার্যাবলি৩

এই চিত্র কি তোমাকে আফিম যুদ্ধের তাৎপর্যের স্পষ্ট ধারণা দেয়?

কুইং সংস্কারকরা যেমন কাং ইউওয়েট এবং লিয়াং কি চাও প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এই ব্যবস্থাকে শক্তি শালী করে তুলতে। তাই তাঁরা সূত্রপাত করল সেই নীতিগুলোকে যার দ্বারা তৈরি করতে চেয়েছিল আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। একটি নতুন সামরিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করা হল। শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় সভা স্থাপন করা হয়েছিল। তারা চিনকে ঔপনিবেশিকবাদ থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করল।

ঔপনিবেশিক দেশগুলোর নেতিবাচক উদাহরণ চিনের চিন্তাবিদদের উপর গভীর ভাবে কাজ করল। অস্টাদশ শতাব্দীতে পোল্যান্ড-ব্যবচ্ছেদ একটি বহু আলোচিত বিষয় ছিল। এত বেশি আলোচিত বিষয় ছিল যে ১৮৯০ এর দশকের শেষদিকে এটি ক্রিয়াপদ (verb) হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন 'পোল্যান্ড আমাদের' (to poland us) (বোলান ও-bloan wo)। এই ধরনের আরেকটি উদাহরণ ছিল 'ভারত'। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে চিন্তাবিদ লিয়াং কুইচাউ যিনি বিশ্বাস করতেন যে, শুধুমাত্র চিনা জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমেই তারা পশ্চিমি প্রভাবকে প্রতিহত করতে পারবে। তিনি লিখেছে, ভারত একটি দেশ ছিল। এটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তিনি নিজের দেশের লোকদের প্রতি নিষ্ঠুর ও ব্রিটিশদের

প্রতি আনুগত থাকার জন্য ভারতীয়দের সমালোচনা করেছিলেন। এই ধরনের যুক্তি একটি শক্তিশালী আবেদন বহন করেছিল। যেমন সাধারণ চিনারা দেখল যে ইঙ্গ চিন (ইংল্যান্ড ও চিন) যুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা ভারতীয় সৈন্য ব্যবহার করেছিল।

সর্বোপরি অনেকেই মনে করেন যে, ঐতিহ্যগত চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করতে হবে। কনফুসিয়াস (৫৫১-৮৭৯ খ্রি. পূর্ব) এবং তাঁর শিষ্যদের শিক্ষাদান থেকে কনফুসীয় ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল। কনফুসীয় ধর্মের মূল নীতি ছিল ভাল ব্যবহার, প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং যথার্থ সামাজিক সম্পর্কগুলো যা জীবনের প্রতি চিনাদের মনোভাবকে প্রভাবিত করেছে, সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে এবং রাজনৈতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তি স্থাপন করেছে। বর্তমানে এটিকে নতুন ধারণা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান প্রতিবন্ধক বা বাধা হিসাবে গণ্য করা হয়।

আধুনিক বিষয়ে জনগণকে প্রশিক্ষণ দিতে চিনের ছাত্রদের জাপান, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সে পড়তে পাঠানো হত। সেখান থেকে ছাত্ররা নতুন ধারণা নিয়ে ফিরে আসত। ১৮৯০ এর দশকে অনেক চিনা ছাত্র জাপানে গিয়েছিল। তারা শুধুমাত্র নতুন ধারণাই নিয়ে আসেনি, তাদের মধ্যে অনেকে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের নেতৃত্ব দেয়। যেহেতু চিন এবং জাপান ভাষার ক্ষেত্রে একই চিত্রলিপি ব্যবহার করত, তাই চিন ইউরোপীয় শব্দ যেমন ন্যায় বিচার, অধিকার ও বিপ্লব প্রভৃতি জাপানি অনুবাদ থেকে অনুকরণ করে, এটি একটি ঐতিহ্যগত সম্পর্কে প্রত্যাবর্তন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধের পর (চিনের মাটিতে এবং চিনের অঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল) চিনের শতাব্দী পুরাতন পরীক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষার্থীদের অভিজাত শাসক গোষ্ঠীতে প্রবেশের অধিকার দিত, তার অবসান হল।

পরীক্ষা পদ্ধতি

অভিজাত শাসক শ্রেণিতে প্রবেশ (১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১.১ লক্ষ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরীক্ষার মাধ্যমে হত। ৮ ভাগ যুক্ত রচনা নির্ধারিত থাকত। (পা-কুয়েন)। নির্ধারিত রচনা চিনের স্থানীয় ভাষায় লিখতে হত। এই পরীক্ষা বিভিন্ন স্তরে প্রতি তিন বছরে ২ (দুই) বার নেওয়া হত। প্রথম স্তরের পরীক্ষায় শুধুমাত্র ১% বা ২ % পরীক্ষার্থী সাধারণত ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত পরীক্ষায় পাস করতে পারত। তারা সুন্দর প্রতিভার অধিকারী হত। এই ডিগ্রী পাওয়ার পর তাদের কুলীন শ্রেণিতে প্রবেশ মিলত। ১৮৫০ সালের আগে কোনো এক সময় প্রায় ৫,২৬,৮৬৯ নাগরিক, এবং ২,১২,৩৩০ প্রান্তীয় সৈনিক (শেঞ্জ হুয়ান) ডিগ্রীধারী সারা দেশে মজুত ছিল। দেশে শুধু ২,৭০০ সরকারি পদ ছিল। অনেক নীচু ডিগ্রীধারী লোকদের কোনও চাকরি ছিল না। এই পরীক্ষা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতিতে প্রতিবন্ধকতার কাজ করে, কারণ এখানে শুধু সাহিত্যিক দক্ষতার চাহিদা ছিল। শাস্ত্রীয় চিনা ভাষা শিক্ষার মূল ভিত্তি ছিল দক্ষতা, যা আধুনিক বিশ্বে এর কোনো প্রাসঙ্গিকতা দেখা যেত না। তাই ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এই বিষয়টিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

মাঞ্চু সরকারকে উৎখাত করে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সান ইয়াৎ সেনের (১৮৬৬-১৯২৫) নেতৃত্বে চিনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। তিনি ছিলেন আধুনিক চিনের প্রতিষ্ঠাতা। চিনের এক দরিদ্র পরিবার থেকে সান ইয়াৎ সেন এসেছিলেন এবং মিশনারী স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। সেখানে গণতন্ত্র এবং খ্রিস্ট ধর্মের সাথে তাঁর পরিচয় হল। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়শোনা করলেও, চিনের ভাগ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা তিনটি নীতির (সান মিন চুই) উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল। এগুলো ছিল 'জাতীয়তাবাদের' দ্বারা

মাঞ্চু যাদেরকে বিদেশি বলে মনে করা হত তাদের উচ্ছেদ সাধন করা এবং একইভাবে চিন সাম্রাজ্য থেকে অন্যান্য বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধন। 'গণতন্ত্র' অথবা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং 'সমাজতন্ত্র বাদ' - এর অর্থ মূলধন নিয়ন্ত্রণ করা এবং জমির পরিমাণের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি চলতে লাগল অস্থির চিত্তভাবে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মে এক বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বেজিং এ যুদ্ধোত্তর শান্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলোর প্রতিবাদ করতে। ব্রিটেন কর্তৃক চালিত বিজয়ী দলের মিত্র হওয়া সত্ত্বেও চিন, তার নিকট থেকে অধিকৃত রাজ্যগুলো ফিরে পায়নি। ফলে প্রতিবাদটি একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। এটি সমস্ত প্রজন্মের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত করে ঐতিহ্যকে আক্রমণ করতে এবং আধুনিক বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে চিনকে রক্ষা করার জন্য। বিপ্লবীদের ডাক ছিল বিদেশিদের তাড়াবার জন্য যারা দেশের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করছিল। তারা অসাম্যকে দূর করার এবং দারিদ্রতাকে হ্রাস করারও ডাক দিয়েছিল। তারা সংস্কারের ঘোষণা করে। যেমন—লেখার ক্ষেত্রে সাধারণ ভাষার ব্যবহার, ফুট বাঁধাই করার অবলুপ্তি ঘটানো, নারীদের অধীনতা উঠিয়ে দেওয়া, বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা এবং দারিদ্র্য দূর করতে অর্থনৈতিক বিকাশ বা উন্নতি ইত্যাদি। প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের পর দেশ একটি হাঙ্গামার যুগে প্রবেশ করল। দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং স্থিরতা আনার জন্য প্রধান শক্তি হিসাবে গুয়োমিনডাং (ন্যাশানেল পিউপিলস পার্টি) এবং সি সি পি-র আবির্ভাব ঘটল।

গুয়োমিনডাং এর রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল সান-ইয়াৎ সেনের ধারণা। তারা 'চারটি বড়ো চাহিদা' সনাক্ত করেণ, যথা— বস্ত্র, খাদ্য, বাসস্থান এবং পরিবহণ। সানের মৃত্যুর পর চিয়াং কাইসেক (১৮৮৯-১৯৭৫) গুয়োমিনডং এর নেতা হিসাবে আবির্ভূত হলেন। চিনা গৃহযুদ্ধে সামরিক নেতাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি সামরিক অভিযান শুরু করেন। আঞ্চলিক নেতারা যারা অন্যায়ভাবে কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছেন, তাদের এবং কমিউনিস্টদের অপসারণ করেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এবং যুক্তিসঙ্গত কনফুসিয়াসের দার্শনিক মতবাদের পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু এর সাথে জাতিকে সৈনিকের উপযোগী করে তোলার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন যে মানুষ ঐক্যবদ্ধ আচরণের জন্য অভ্যাস এবং প্রবৃত্তির বিকাশ আবশ্যক। তিনি মহিলাদের চারটি গুণের চর্চা করতে উৎসাহ দেন। যেমন-সতীত্ব (চারিত্রিক সততা), রূপ রং (চেহারা আকৃতি প্রকৃতি), বক্তৃতা এবং কাজ (বাক্ শক্তি) এবং পরিবারে তাদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করা। এমনকি মহিলাদের কাপড়ের পাড় কতটুকু লম্বা হবে এরও প্রস্তাব দিয়েছেন। গুয়োমিনডং এর সামাজিক ভিত্তি ছিল শহরাঞ্চলে। শিল্পের বিকাশ ছিল মন্থর এবং সীমিত। শহরাঞ্চলগুলো যেমন সাংহাই যেটি আধুনিক বিকাশের কেন্দ্র হয়েছিল, সেখানে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে এক শিল্প-শ্রমিক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটল যাদের সংখ্যা ছিল ৫,০০,০০০। সেই যাই হউক, এদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি অংশ আধুনিক শিল্পে যেমন জাহাজ নির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত হয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল ক্ষুদ্র 'আরবানার', ব্যবসায়ী এবং দোকানদার। শহরের শ্রমিকরা বিশেষ করে মহিলারা খুব কম মজুরি পেত। কাজের সময় ছিল দীর্ঘ এবং কাজের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধির সাথে সাথে মেয়েদের অধিকার নিয়ে একটা উদ্বেগ দেখা দিল। এর সাথে ছিল পরিবার গঠনের পথ এবং প্রেম ও রোমান্স সম্পর্কে আলোচনা।

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহিত করেছিল (১৯০২ খ্রিস্টাব্দে পিকিং বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন হয়েছিল)। সাংবাদিকতায় এই নতুন চিন্তার ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ প্রতিফলিত হয়। জনপ্রিয় পত্রিকা 'সাপ্তাহিক জীবন' (Life weekly) এর সম্পাদক জাও তাওফেন (১৮৯৫-১৯৪৪) এই নতুন ধারার প্রতিনিধি ছিলেন। এটি পাঠকদের নতুন ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে

দেয়, একই ভাবে নেতাদের সাথেও যেমন মহাত্মা গান্ধী এবং আধুনিক তুরস্কের নেতা কামাল আতাতুর্ক। এর প্রচার দ্রুতগতিতে বেড়ে গিয়েছিল। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে এই পত্রিকার সংখ্যা ছিল ২,০০০ তা বেড়ে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে হল ২,০০,০০০ কপি।

কার্যাবলি-৪
কীভাবে একটি বৈষম্যের ধারণা মানুষকে একত্রিত করে?

সাংহাই, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ : বক ক্লেটন, সাংহাই এর এক কালো আমেরিকান ঢাক বাদক, নিজের অর্কেস্ট্রার সাথে বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত প্রবাসী হয়ে বাস করছিল। কিন্তু সে কালো ছিল। তাই একবার কিছু সাদা চামড়ার আমেরিকানরা তাকে এবং তার বাজনাদার সদস্যদের সঙ্গে মারপিট করে তাদের গান বাজনা করার হোটেল থেকে বের করে দিল। সে আমেরিকান হওয়া সত্ত্বেও জাতিগত বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। তাই দুঃখ কষ্ট জর্জরিত চিনাদের প্রতি তার অনেক সহানুভূতি ছিল। সাদা চামড়ার আমেরিকানদের সঙ্গে হওয়া নিজের লড়াইয়ে সে জিতে গেল। সে লিখেছে "চিনা প্রত্যক্ষদর্শীরা এমন আচরণ করল যেন আমি তাদের কোনো অভিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেছি যেটি তারা সবসময় করতে চাইত। আর ঘরে পৌঁছানো পর্যন্ত সারা রাস্তায় কোনো বিজয়ী ফুটবল দলের মতো আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল।"

চিনাদের দারিদ্র এবং কঠোর জীবনযাপন সম্পর্কে ক্লেটন লিখেছেন " আমি কখনো কখনো দেখতাম যে বিশ বা ত্রিশ জন কুলি মিলে কোনও বড়ো ভারী ঠেলাকে টানছে, যা কিনা আমেরিকায় কোনও লরি বা ঘোড়া দিয়ে টানা হয়। এই লোকগুলো-মানুষ ঘোড়ার থেকে কিছু ভিন্ন লাগত এবং সম্পূর্ণ কাজ করার পর তাদের এত সামান্য মজুরি মিলত যে কোনও রকমে পেট ভরে ভাত ও শোয়ার জন্য একটু জায়গা করে নিত। আমি জানিনা তারা কীভাবে নিজের কাজ চালাত।

রিক্সাচালক, ন্যান জিয়া দ্বারা কাঠ কাটা। 'রিক্সা' উপন্যাস দ্বারা লাও সি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠেন।

গুয়োমিনডাগণ দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিল কারণ এর সামাজিক ভিত্তি ছিল সংকীর্ণ এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল সীমিত। সান-ইয়াৎ সেনের প্রধান মূলধন নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং জমির সমতা বিধান করা কোনো সময় কার্যকরি হয়নি। কারণ দল কৃষকদের সাথে সাথে উদীয়মান সামাজিক অসমতা গুলোকেও অবজ্ঞা করল। জনগণের বাস্তব সমস্যাগুলো সমাধান না করে বরং সামরিক আদেশ চাপিয়ে দেওয়া হল।

মূল্যবৃদ্ধির গল্প

সময়রেখা

জাপান		চিন	
১৬০৩	টোকুগাওয়া ইয়োয়াসু স্থাপন করেন ইডো সোগুনাট	১৬৪৪-১৯১১	কুইং রাজবংশ
১৬৩০	জাপান পাশ্চাত্য শক্তির নিকট যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। একমাত্র ডাচ্‌দের সাথে সীমিত বাণিজ্য চলে।	১৮৩৯-৬০	দুইটি আফিং এর যুদ্ধ
১৮৬৮	জাপান ও আমেরিকার মধ্যে শান্তি চুক্তি; জাপানের নিঃসঙ্গতা শেষ।		
১৮৭২	মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা		
১৮৮৯	বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা। প্রথমে রেল লাইন টোকিও এবং ইয়ো কোহামার মধ্যে।		
১৮৯৪-৯৫	মেইজি সংবিধান সংশোধন।		
১৯০৪-০৫	জাপান ও চিনের যুদ্ধ		
১৯১০	জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ	১৯১২	সান-ইয়েৎ সেন কর্তৃক গুয়োমিনটং স্থাপন।
১৯১৪-১৮	কোরিয়া সংযোজন, ১৯৪৫ পর্যন্ত উপনিবেশ	১৯১৯	মে ফোর্থ আন্দোলন (৪ঠা মে আন্দোলন)
১৯২৫	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	১৯২১	সি সি পি প্রতিষ্ঠা
১৯৩১	পুরুষদের সর্বজনীন ভোটাধিকার	১৯২৬-৪৯	চিনের গৃহযুদ্ধ
১৯৪১-৪৫	জাপানের মহাসাগরীয় যুদ্ধ	১৯৩৪	দীর্ঘ পদযাত্রা (Long March)
১৯৪৫	হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে বোমা বিস্ফোরণ।	১৯৪৫	
১৯৪৬-৫২	যুক্তরাষ্ট্রের জাপান দখল, গণতান্ত্রিক সংস্কার, জাপানের বেসামরিকীকরণ।	১৯৪৯	চিনের গণপ্রজাতন্ত্র, চিয়াং কাই সেক কর্তৃক তাইওয়ানে চিনের প্রজাতন্ত্র স্থাপন
১৯৫৬	জাপানের রাষ্ট্রসংঘের সদস্য পদ লাভ। টোকিওতে অলিম্পিক খেলা এশিয়াতে	১৯৬২	সীমান্ত বিরোধ নিয়ে চিনের ভারত আক্রমণ।
১৯৬৪	প্রথমবার।	১৯৬৬	সাংস্কৃতিক বিপ্লব
		১৯৭৬	মাও সেতুং এবং চৌ এন লাই এর মৃত্যু।
		১৯১৭	ব্রিটেনের কাছ থেকে চিনের হংকং পুনরুদ্ধার

চিনে কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান (The rise of the Communist party of China)

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জাপান যখন চিন আক্রমণ করে, তখন গোয়েমিনডাং পশ্চাদপসরণ করে। দীর্ঘকালীন এবং ক্লান্তিকর যুদ্ধ চিনকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চিনে প্রতি মাসে দ্রব্য মূল্য বেড়ে গিয়েছিল ৩০ শতাংশ এবং সাধারণ মানুষের জীবন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। গ্রামীণ চিন দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথমত বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত-যার সাথে ছিল ভূমিক্ষয়, অরণ্য-বিনাশ এবং বন্যা আর দ্বিতীয়টি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংক্রান্ত, যা সৃষ্টি হয়েছিল শোষণমূলক জমি রায়তি স্বত্ব ব্যবস্থা ঋণগ্রস্ততা, আদিম প্রযুক্তি বিদ্যা এবং দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি (সি.সি.পি) প্রতিষ্ঠিত হয়, ঠিক রুশ বিপ্লবের পর। রাশিয়ার জয়লাভ সারা বিশ্বে এক শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিল। নেতাদের মধ্যে যেমন লেনিন এবং ট্রটস্কি কমিনটার্ন প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছিলেন অথবা ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠন করেন। এর সাহায্যে বিশ্ব থেকে শোষণের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। কমিনটার্ন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বজোড়া কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করেছিল। কিন্ত তারা কাজ করল ঐতিহ্যগত মার্ক্সীয় বুদ্ধি বা জ্ঞানের মধ্যে। তারা এটা বুঝেছিলেন যে শ্রমিক শ্রেণির দ্বারা শহরে বিপ্লব ঘটানো যাবে। এর প্রাথমিক আবেদন জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে। কিন্তু এটি শীঘ্রই সোভিয়েত স্বার্থে একটি যন্ত্রে পরিণত হল। তাই ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে এটি ভেঙ্গে দেওয়া হল। মাও সেতুং (১৮৯৩-১৯৭৬) যার আবির্ভাব ঘটেছিল সি.সি.পি-র প্রধান নেতা হিসাবে, তিনি একটি পৃথক পথ নিয়েছিলেন কৃষক সম্প্রদায়ের উপর তার বিপ্লবাত্মক পরিকল্পনা স্থাপন করে। তার সফলতা সি. সি. পি. কে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিনত করেছিল যা শেষ পর্যন্ত গোয়েমিনডাং এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল।

মাও সেতুং এর মৌলিক আবেদন পার্বত্য অঞ্চলের জিয়াংসিতে দেখা যায়, যেখানে ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শিবির করেছিল এবং ইহা গোয়েমিনডাং এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিল। একটি শক্তিশালী কৃষক কাউন্সিল (সোভিয়েত) গঠিত হয়েছিল, যা জমির পুনর্বণ্টন এবং বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মাও অন্যান্য নেতাদের মত স্বাধীন সরকার এবং সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি মহিলাদের সমস্যা সর্ম্পকে সচেতন হয়েছিলেন। গ্রামীণ মহিলাদের সংঘ বা সমিতিকে সমর্থন করেছিলেন। এক নতুন বিবাহ আইন প্রচলন করেন। এই আইনে বন্দোবস্তের বিবাহ এবং বিবাহ চুক্তি নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। ক্রয় ও বিক্রয় বন্ধ করে দেওয়া হল এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সরলীকরণ করা হল।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জুনবুতে মাও সে তুং সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর যেমন লবণ, সয়াবিন, স্থানীয় সংগঠনের দৃঢ়তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর, কামার, পতিতা—এই সবকিছুর উপরই একটা সমীক্ষা করেছেন, যাতে শোষণের ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলোকে বোঝা যায়। তিনি কৃষকদের এমন এক পরিসংখ্যান দিয়েছেন, যা থেকে জানা যায় যে কতজন কৃষক নিজের সন্তানের বিক্রয় করেছে আর এর জন্য সে কত পয়সা পেয়েছে। ছেলেদেরকে ১০০-২০০ য়ুয়ানে বিক্রয় করত। কিন্তু মেয়েদের বিক্রয়ের কোনো উদাহরণ মেলেনি। কারণ মেয়েদের প্রয়োজন ছিল কঠোর শ্রমের জন্য, কোনো যৌনশোষণের জন্য নয়। এই ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে তিনি সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রতিকার করার ব্যবস্থা করেছেন।

মানচিত্র ২ : দীর্ঘ পথযাত্রা

কমিউনিস্ট সোভিয়েত এর গোয়েমিনডাং অবরোধ, পার্টিকে বাধ্য করল আরেকটি ভূমি অনুসন্ধান করতে। এটি তাদের অভিযান চালিয়ে যেতে প্রেরণা দিয়েছিল, যা লং মার্চ নামে পরিচিত (১৯৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দ)। এই অভিযানে সমস্যাসংকুল ৬০০০ মাইল অতিক্রম করে তারা সানস্কিতে পৌঁছায়, এখানে তাদের নতুন ভূমি হল ইয়ানান। সামরিক নেতৃত্বের অবসান ঘটানোর জন্য তারা তাদের পরিকল্পনাকে আরও উন্নত করে। তারা জমি সংক্রান্ত সংস্কার চালিয়ে গেল এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। এর ফলে তারা একটি শক্তিশালী সামাজিক ভিত্তি লাভ করল। যুদ্ধের কঠিন বছরগুলোতেও কমিউনিস্টরা এবং গোয়েমিনডাং একসাথে কাজ করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষে কমিউনিস্টরা নিজেদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে এবং গোয়েমিনডাং পরাজিত হয়।

দীর্ঘ পদযাত্রা সৈনিকদের পতিত জমি পুনরুদ্ধার করার ফটো। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ।

নতুন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা : ১৯৪৯-৬৫ (Establishing the New Democracy : 1949-65)

এই শব্দটা কার্লমার্কস এর দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল যে, ধনী শ্রেণির উৎপীড়নকারী সরকারকে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী সরকার পরিবর্তন করবে এবং বর্তমান অভিজ্ঞতায় এটি কখনো একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচারী হবে না।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এটি নতুন গণতন্ত্রের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শোষিতদের একনায়কত্বের মতো সমস্ত সামাজিক শ্রেণিগুলো এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বলত 'এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'। অর্থনীতির জটিল এলাকাগুলো সরকারি নিয়ন্ত্রণের অধীনে স্থাপন করা হল। বেসরকারী উদ্যোগ এবং বেসরকারি জমির মালিকানা স্বত্ব ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেল। এই পরিকল্পনা স্থায়ী হল ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যখন সরকার ঘোষণা করেছিল যে একটি সমাজতন্ত্রবাদী রূপান্তরের পরিকল্পনা শুরু করবে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড' আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এটি ছিল দেশকে রাংঝালাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুতগতিতে শিল্পাঞ্চলে পরিণত করার নীতি। জনগণকে উৎসাহিত করা হল বাড়ির পিছনে স্টিলের চুল্লি স্থাপন করতে। গ্রামাঞ্চলে জনগনের কমিউনগুলো (যেখানে জমির মালিকানা

ও চাষবাস করা হত যৌথ ভাবে) এটি শুরু করেছিল। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে, ২৬,০০০ কমিউন ছিল যার অধীনে ফার্মের জনসংখ্যা ৯৮% ছিল।

মাও জনগণকে সমবেত করতে সমর্থ হয়েছিলেন পার্টি কর্তৃক স্থাপিত লক্ষ্য অর্জনে। তিনি একজন সমাজতন্ত্রী মানুষ তৈরির ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যিনি পাঁচটি জিনিসকে ভালোবাসতেন। এগুলো হল— পিতৃভূমি, জনগণ, শ্রম বা শ্রমিক, বিজ্ঞান এবং জনগণের সম্পত্তি। গণসংগঠন তৈরি হয়েছিল কৃষক, মহিলা, ছাত্র এবং অন্যান্য দলের মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ 'সর্ব চিন গণতান্ত্রিক মহিলা রাষ্ট্রসংঘ' এর সদস্য ছিল ৭৬ মিলিয়ন। 'সর্ব চিন ছাত্র সংঘের সদস্য ছিল ৩.২৯ মিলিয়ন। এইসব উদ্দেশ্যগুলো এবং পদ্ধতিগুলো দলের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। ১৯৫৩-৪৫ খ্রিস্টাব্দে কেউ কেউ শিল্প সংগঠন এবং অর্থনৈতিক বিকাশের উপর অধিক মনোযোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিল। লিউ সাউচি (১৮৯৬-১৯৬৯) এবং ডেং জিয়ায়োপিং (১৯০৪-৯৭) চেষ্টা করেছিলেন কমিউন ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করতে, যেহেতু এটি যোগ্যতার সাথে কাজ করছিল না। চুল্লীতে উৎপাদিত স্টল, শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহার যোগ্য ছিল না।

পরস্পর বিরোধী দর্শনশক্তি ১৯৬৫-৭৮ (Conflicting Visions)

'সমাজতান্ত্রিক মানুষ' তৈরি করার ক্ষেত্রে মাওয়ের সমর্থকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। এই দ্বন্দ্ব চরমসীমায় পৌঁছে যখন কেউ তাঁর আদর্শবাদের বিরোধিতা করে বিশেষ মূল্যায়নের পরিবর্তে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মাও 'বিখ্যাত শোষিতদের সাংস্কৃতিক বিপ্লব' শুরু করেন তার সমালোচকদের বিরুদ্ধাচরণ করতে। পুরাতন সংস্কৃতি, পুরাতন রীতিনীতি এবং পুরাতন অভ্যাসের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য লাল প্রহরী বিশেষত ছাত্র এবং সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করা হল। ছাত্র এবং পেশাদারীদের পল্লী অঞ্চলে পাঠানো হল জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা লাভের জন্য। পেশাদারি জ্ঞান অপেক্ষা আদর্শবাদ (কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য) অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রকাশ্যে নিন্দা বা দোষারোপ এবং কোনও দলের বাঁধা বুলি স্থানান্তরিত হয়েছিল যুক্তিসঙ্গত আলোচনায়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব এক অশান্তির যুগ সৃষ্টি করেছিল। এই বিপ্লব দলকে যেমন দুর্বল করে তেমনি অর্থনীতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে বিচ্ছিন্ন করে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে জোয়ার পুনরায় শুরু হল। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে দল পুনরায় জোর দিতে লাগল বৃহৎ সামাজিক শৃঙ্খলার উপর এবং শিল্প অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর, যাতে শতাব্দী শেষ হবার আগেই চিন একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হতে পারে।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে সংস্কার : (Reforms from 1978)

সাংস্কৃতিক বিপ্লব অনুসৃত হয়েছিল একটি রাজনৈতিক রণকৌশলের মাধ্যমে। সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের সময় ডেং জিয়াওপিং শক্তভাবে দলের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখেছিলেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে পার্টি চারটি বিষয়ে আধুনিকীকরণের কথা দলের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করল (যেমন- বিজ্ঞানের উন্নতিতে, শিল্প, কৃষি, প্রতিরক্ষা) পার্টিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগে আলোচনার অনুমতি ছিল।

এই নতুন এবং উদারনৈতিক আবহাওয়া ৬০ বছর পূর্বে মে ফোর্থ আন্দোলনের সময় দেখা গিয়েছিল। মে ফোর্থ আন্দোলনের সময়ও উত্তেজনাপূর্ণ এক নতুন ধারণার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর দেওয়ালের এক প্রাচীর পত্রে উল্লিখিত ছিল পঞ্চম আধুনিকীকরণ দ্বারা প্রচারিত হয়েছে যে, গণতন্ত্র ছাড়া অন্যান্য আধুনিকীকরণগুলো কোনও কাজেই লাগবে না, এটি সি সি পি কে সমালোচনা করতে লাগল দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধান না করার জন্য অথবা যৌন শোষণ বন্ধ না করার জন্য।

১৯৭৮ সালের সংস্কারের পর চিনের জনগণ স্বাধীনভাবে ভোগ্যপন্য কিনতে সমর্থ হয়েছিল।

এমনকি এ ধরনের বদঅভ্যাস বা কুপ্রথার উদাহরণ দলের মধ্য থেকেই দেখানো হয়েছিল।

এই দাবিগুলো দমন করা হল। কিন্তু ১৯৮৯ খ্রিস্টিব্দে মে ফোর্থ আন্দোলনের সপ্তদশ বার্ষিক উৎসবের দিন অনেক বুদ্ধিজীবী বৃহত্তর অকপটতা এবং বিরোধী শক্তির শেষ হওয়ার কথা বলেছিলেন। বেইজিং এর তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে ছাত্র বিক্ষোভকারীদের নির্মমভাবে দমন করা হল। বিশ্বজুড়ে এটি কঠোর ভাবে নিন্দিত হল। সংস্কারোত্তর যুগে বিতর্কের আবির্ভাব ঘটেছে চিনের উন্নতি ঘটাবার জন্য। পার্টি সমর্থিত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অভিমত হল পার্টির ভিত্তি ছিল শক্তিশালী রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদ এবং বিশ্ববাজারের সঙ্গে একত্র করার উপর। সমালোচকরা যুক্তি দেখান যে বর্দ্ধিত অসমতা সামাজিক শ্রেণির মধ্যে, অঞ্চলের মধ্যে এবং পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সামাজিক চাপ সৃষ্টি করেছিল। বাজারের উপরও প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। সর্বশেষে দেখা যায়, প্রথমদিকের তথাকথিত কনফুসীয়দের ঐতিহ্যগত দার্শনিক মতবাদের পুনরায় আবির্ভাব হল এবং এই যুক্তি দেখানো হল যে পাশ্চাত্যকে নকল না করেও নিজের ঐতিহ্য অনুসরণ করে চিন একটি আধুনিক সাম্রাজ্য গঠন করতে পারে।

তাইওয়ানের গল্প (the story of Taiwan)

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে সি.সি.পি দ্বারা পরাজিত হয়ে চিয়াংকাই শেখ ৩০০ মিলিয়নের উপর সংরক্ষিত স্বর্ণ এবং মূল্যবান শিল্পকর্মের ভাণ্ডার সহ তাইওয়ানে পালিয়ে যান। এর পরই চিনের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানের সাথে যুদ্ধের পর চিন তাইওয়ান পরিত্যাগ করে এবং তখন থেকে তাইওয়ান জাপানের উপনিবেশে পরিণত হয়। কায়রো ঘোষণা (১৯৪৩) এবং পটসডাম ঘোষণা (১৯৪৯) চিনের সার্বভৌমত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারিতে বিশাল বিক্ষোভ জি.এম.ডি(GMD)কে প্রেরণা দিয়েছিল সমস্ত প্রজন্মের নেতাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে জি.এম.ডি,চিয়াং কাইশেখের অধীনে একটি দমনমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত চেয়েছিল ।এই সরকার নিষিদ্ধ করেছিল বাক্ স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বিরোধিতা এবং স্থানীয় জনসাধারণকে মর্যাদাপূর্ণ ক্ষমতার আসন থেকে বিতাড়িত করা। যাই হোক তারা ভূমিসংস্কারমূলক কাজ চালিয়ে ছিল যা কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। অর্থনীতিকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছিল। ফলে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাইওয়ানের GNP এশিয়াতে দ্বিতীয় স্থানে ছিল, ঠিক জাপানের পরেই। বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি দৃঢ়ভাবে বিকশিত হচ্ছিল। কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেটা হল ধনী দরিদ্রের ব্যবধান ভীষনভাবে হ্রাস পাচ্ছিল।

এমনকি আর অধিক নাটকীয় বিষয় ছিল তাইওয়ানের গণতন্ত্রের রূপান্তর। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে চিয়াংকাই শেখের মৃত্যুর পর এটি খুব ধীর গতিতে শুরু হয়েছিল। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে যখন সামরিক বিধি তুলে নেওয়া হয় এবং বিরোধী দল গুলোকে আইনগতভাবে অনুমতি দেওয়া হয় তখন থেকে একটি ভারসাম্য গড়ে উঠতে থাকে। প্রথম স্বাধীন নির্বাচন শুরু হয়েছিল স্থানীয় তাইওয়ানবাসীদের ক্ষমতায় আনার প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে। কূটনীতিগতভাবে অধিকাংশ দেশেরই তাইওয়ানে বাণিজ্যিক সমিতি ছিল। গভীর কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং দূতাবাস গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না, যেহেতু তাইওয়ানকে চিনের অংশ বলে গণ্য করা হত। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে পুনরায় ঐক্যবদ্ধকরণের প্রশ্ন বিবাদের বিষয় হিসাবে থেকে গেল। কিন্তু 'ক্রস প্রণালী' নিয়ে চিন ও তাইওয়ানের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হচ্ছিল। তাইওয়ানের মূল ভূখণ্ডে ব্যবসা এবং বিশাল বিনিয়োগ হচ্ছিল এবং ভ্রমণও হল সহজসাধ্য। চিন অর্ধ-স্বায়ত্তশাসিত তাইওয়ানকে মেনে নিতে রাজি ছিল ততদিনই যতদিন না তাইওয়ান স্বাধীনতা লাভের জন্য সমস্ত প্রকার আন্দোলন ত্যাগ করে।

কোরিয়ার গল্প (The Story of Korea)

আধুনিকীকরণের সূচনা : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কোরিয়ার জোসিয়ন রাজবংশ (১৩৯২-১৯১০) অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হল। এর সাথে ছিল ক্রমবর্দ্ধমান চিন, জাপান এবং পাশ্চাত্য দেশগুলোর চাপ। এর মধ্যেও কোরিয়া সরকারি পরিকাঠামোতে, কূটনৈতিক সম্পর্কে এবং সামাজিক সংগঠনে আধুনিকীকরণের সংস্কার করেছিল। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের যুগের পর,১৯১০ খ্রিস্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী জাপান, কোরিয়াকে নিজ উপনিবেশ হিসাবে দখল করে নেয়। ফলে পাঁচশো বছরের দীর্ঘ জোসিয়ান রাজবংশের অবসান ঘটে। যাই হোক কোরিয়ার জনগণ জাপানের প্রতি রাগান্বিত ছিল, কারণ জাপান বলপূর্বক তাদের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেয় এবং গ্রহণ করতে বাধ্য করে। স্বাধীনতা প্রত্যাশী কোরিয়ানরা সমগ্র দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল। একটি অস্থায়ী সরকার স্থাপন করে। বিদেশি নেতাদের কাছে আবেদন করতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন গুলোতে প্রতিনিধি পাঠাল। যেমন কায়রো, ইয়াল্টা এবং পট্সদাম সম্মেলনে।

Koreans celebrate their independence from Japan in 1945.

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হয়। এর সাথে তার ঔপনিবেশিক শাসনেরও সমাপ্তি ঘটে। যাই হোক জাপানের পরাজয়ের পর স্বাধীনতার জন্য কোরিয়ার ভিতরে ও বাইরে সক্রিয় প্রচেষ্টা দেখা দেয় যা কোরিয়ার স্বাধীনতাকে আশ্বস্ত করেছিল। মুক্তিপ্রদান অনুসরণ করে কোরিয়ার উপদ্বীপকে ৩৮° অক্ষরেখায় বিভক্ত করা হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালনা করেছিল উত্তর কোরিয়াকে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U.N) পরিচালনা করেছিল দক্ষিণ কোরিয়াকে। এমনকি এই অঞ্চলে জাপানের সামরিক বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য জাতিগুলোও কাজ করেছিল। যাই হোক, এই বিভাজন স্থায়ী হয়েছিল। কারণ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তর এবং দক্ষিণ কোরিয়াতে পৃথক পৃথক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

একটি যুদ্ধোত্তর জাতি (A Post War Nation)

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের কাছ থেকে এবং উত্তর কোরিয়া কমিউনিস্ট চিনের কাছ থেকে সমথর্ন পেয়েছিল। ঠান্ডা যুদ্ধের যুগে এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব ছায়া যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। তিন বছর পর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে একটি যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির মাধ্যমে

এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু কোরিয়া বিভক্তই থেকে গেল। কোরিয়ার যুদ্ধ কেবল মাত্র বৃহদাকারে জীবন ও সম্পত্তিরই ক্ষতি করেনি, এর ফলে মুক্ত বাজার অর্থনীতির বিকাশ এবং গণতন্ত্রীকরণের কাজ বিলম্ব হয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতির দরুন দ্রব্যমূল্য হঠাৎ বেড়ে গেল। এই মুদ্রাস্ফীতির কারণ ছিল বর্দ্ধিত জাতীয় ব্যয় এবং যুদ্ধের সময় প্রচলিত মুদ্রা। অধিকন্তু শিল্প সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা যেগুলো ঔপনিবেশিক যুগে তৈরি হয়েছিল, তা পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলে দক্ষিণ কোরিয়া বাধ্য হল আমেরিকা কর্তৃক সরবরাহ করা অর্থনৈতিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে।

যদিও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট সিংগম্যান রি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কোরিয়ার যুদ্ধের পর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তার শাসনব্যবস্থা দুবার সম্প্রসারিত করেছিলেন অবৈধ সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নাগরিকরা কারচুপি নির্বাচন যা এপ্রিল বিপ্লব নামে পরিচিত এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সিংগম্যান রি বাধ্য হলেন পদত্যাগ করতে।

সিংগম্যান রির শাসনকালে বৈপ্লবিক তৎপরতার সাথে জনগণের চেতনা বা জীবনীশক্তি দমন করা হয়েছিল। সেগুলোই আবার উৎক্ষিপ্ত হল বিক্ষোভ এবং দাবিদাওয়ার আকারে। যাই হোক, গণতান্ত্রিক দলের শাসনব্যবস্থা যেটি সিংগম্যান রির পদত্যাগের পর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিল সেটি অভ্যন্তরীণ ব্যবচ্ছেদ এবং দ্বন্দ্বের জন্য যথার্থভাবে নাগরিকদের দাবি দাওয়ার উত্তর দিতে পারেনি। ফলে সংস্কারকদের রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব হল এবং ছাত্রদের আন্দোলন গড়ে উঠল এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে। সামরিক কর্তৃপক্ষরা আন্দোলনকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখেননি। ১৯৬১ সালের মে মাসে গণতান্ত্রিক দলের শাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হল এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। এই সামরিক অভ্যুত্থান পরিচালিত হয়েছিল জেনারেল পার্ক চুং-হি এবং অন্যান্য সামরিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে।

শক্তিশালী নেতৃত্বের অধীনে দ্রুত শিল্পায়ন

(Rapid Industrialistion Under Strong Leadership)

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে সামরিক কৌশলী নেতা পার্ক চুং-হি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। অর্থনৈতিক বিকাশ লাভের জন্য পার্ক প্রশাসন গ্রহণ করেছিল একটি রাষ্ট্রচালিত রপ্তানি ভিত্তিক নীতি। সরকারের পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বড়ো কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে সমর্থন করেছিল। জোড়ো দেওয়া হয়েছিল নিযুক্তির সম্প্রসারণের উপর এবং বৃদ্ধি করেছিল কোরিয়ার প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের।

কোরিয়ার অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক বিকাশের হার শুরু হয়েছিল ১৯৬০ এর দশকের প্রথম দিকে যখন শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি আমদানি থেকে রপ্তানির দিকে স্থানান্তরিত হয়েছিল। রপ্তানি ভিত্তিক নীতির অধীনে সরকার সমর্থন করেছিল শ্রম কেন্দ্রিক হাল্কা শিল্প উৎপাদনকে, যেমন—বস্ত্রশিল্প এবং পোশাক পরিচ্ছদ শিল্প। আর এক্ষেত্রে কোরিয়ার অবস্থান তুলনামূলকভাবে সুবিধার ছিল। ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকে এবং ১৯৭০ এর দশকে আবার রাষ্ট্রের মূলনীতি হাল্কা শিল্প থেকে মূল্যযুক্ত ভারী এবং রাসায়নিক শিল্পের দিকে স্থানান্তরিত হল। অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল স্টীল, লৌহহীন ধাতব যন্ত্রপাতি, জাহাজ তৈরি, ইলেকট্রনিক্স এবং রাসায়নিক শিল্পসমূহ।

উৎসাহিত গ্রাম্য জনগণকে চালিত করতে এবং কৃষিক্ষেত্রগুলিকে আধুনিকীকরণ করতে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নতুন গ্রাম্য আন্দোলন(সেইমাউল) প্রবর্তিত হয়েছিল। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল মানুষের উদ্যমশক্তিকে সংস্কার করা যাতে তারা নিষ্ক্রিয় এবং হতাশ না হয়। তারা যাতে সক্রিয় এবং আশান্বিত হয়ে উঠে। গ্রামের জনগণকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তাদের গ্রামের বিকাশে নিজেদের সাহায্য করতে এবং তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জীবন ধারণের অবস্থার উন্নতি করতে। এই আন্দোলন পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত হয়েছিল নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চল এবং শহরাঞ্চল এলাকায় প্রতিবেশীদের সাহায্য করতে। বর্তমানে কোরিয়া এই আন্দোলন থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। তারা সেইমাউল আন্দোলনের নীতিগুলোকে তাদের উন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিল।

কোরিয়া যে বিস্ময়করভাবে অর্থনৈতিক উন্নতিতে সফল হয়েছিল তার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয় শক্তিশালী নেতাদের সংযোগ, সুপ্রশিক্ষিত আমলাতন্ত্র, উদ্যমী শিল্পপতি এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রম-শক্তিকে। রপ্তানি বৃদ্ধি করতে এবং নতুন নতুন শিল্প গড়ে তুলতে আশাবাদী উদ্যোক্তারা সরকারি অনুদানকে ভালভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

কোরিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের শিক্ষাব্যবস্থার অবদান রয়েছে। কোরিয়ার শিল্পোন্নয়নের প্রত্যুষে (ভোরে) কোরিয়ার প্রায় সমস্ত শ্রমিকেরাই শিক্ষিত ছিল এবং সহজেই তারা নতুন দক্ষতা অর্জন করতে পারত। একই সময়ে অন্যান্য দেশ থেকে অধিক উন্নত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রযুক্তি বিদ্যা নিজেদের আয়ত্তে আনতে দেশের উন্মুক্ত অর্থনৈতিক নীতি কাজ করেছিল। বিদেশি বিনিয়োগ এবং কোরিয়ার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের হার ভারী শিল্পাঞ্চল বিকাশে সাহায্য করেছিল। যখন দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশি শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্য করেছিল।

পার্ক প্রশাসনের দীর্ঘকালীন ক্ষমতায় থাকার মূল ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক বিকাশ। পার্ক সংবিধানকে পুনঃপরীক্ষা করেছিলেন যাতে তিনি তৃতীয় বারের মত ক্ষমতায় আসত পারেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনর্নির্বাচিত হলেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পার্ক, ইউসিন সংবিধানের ঘোষণা এবং কার্যকর করলেন। এই ঘোষণা রাষ্ট্রপতির পদকে স্থায়ী করতে সক্ষম হল। ইউসিন সংবিধানের অধীনে আইন প্রণয়নের উপর এবং প্রশাসনের উপর রাষ্ট্রপতির সম্পূর্ণ বৈধ কর্তৃত্ব ছিল। এছাড়াও ছিল একটি সাংবিধানিক অধিকার যার দ্বারা জরুরি ব্যবস্থা হিসাবে যে কোনো আইনকে বাতিল করা যেত।

যেহেতু রাষ্ট্রপতি ছিলেন সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী, তাই অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা বিকাশের জন্য গণতন্ত্রের অগ্রগতিকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। যাই হোক, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'দ্বিতীয় তেল সংকট' অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করেছিল। ফলে ভারী রসায়ন শিল্পে অতিরিক্ত বিনিয়োগ হয়েছিল। অধিকন্তু ছাত্ররা, পণ্ডিতগণ এবং বিরোধী দল অনবরত বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল ইউসিন সংবিধানের বিরুদ্ধে, কারণ পার্ক প্রশাসন জরুরি অবস্থা জারি করে রাজনৈতিক অস্থিরতাকে দমন করেছল। পার্ক প্রশাসনের এই অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অবসান ঘটে যখন ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে পার্ক চুং হিকে হত্যা করা হয়েছিল।

অবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক বিকাশ এবং গণতন্ত্রীকরণের ডাক(Continued Economic Growth and Calls Democratisation)

পার্ক চুং হিকে মৃ ত্যুর পর গণতন্ত্রীকরণের জন্য আকাঙ্খা জেগে উঠল। কিন্তু ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান এই সময় চুন-ডু-হান দ্বারা সংঘটিত হয়। ১৯৮০ সালের মে মাসে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ দেশ জুড়ে প্রধান শহরগুলোতে ছাত্ররা এবং নাগরিকরা আহ্বান করল। তাদের

দাবি ছিল চুন-এর সামরিক দলাদলি পরিবর্তে গণতন্ত্রের। সামরিক দলাদলি সমস্ত দেশ জুড়ে সামরিক বিধি প্রয়োগের মাধ্যমে গণতন্ত্রের জন্য যে আন্দোলন সেটিকে দমন করেছিল। গাংজু শহরে বিশেষভাবে ছাত্ররা এবং নাগরিকরা পিছিয়ে না থেকে সামনে এসে দাবি করেছিল যে, সামরিক আইন বাতিল করতে হবে। এই আন্দোলন গাংজু গণতন্ত্রিকরণের আন্দোলন নামে পরিচিত। যাই হোক চুং এর সামরিক দলাদলি গণতন্ত্রিকরণের জন্য প্রতিবাদকে দমন করেছিল। পরের বছর ইউসিন সংবিধান অনুযায়ী পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি হলেন।

শাসনব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করার জন্য চুন প্রশাসন গণতন্ত্রকরণের প্রভাবকে দমন করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনীতি ফেঁপে উঠার ফলে চুন শাসনব্যবস্থা অর্থনৈতিক বিকাশে সমর্থ হয়েছিল। অর্থনৈতিক বিকাশের হার ১৯৮০তে ছিল ১.৭% তা ১৯৮৩তে বেড়ে হয়েছিল ১৩.২%। তবে মুদ্রাস্ফীতি অস্বাভাবিক ভাবে কমে আসছিল। অর্থনৈতিক উন্নতি নগরায়ণের বিকাশে সাহায্য করেছিল। শিক্ষার স্তর উন্নত হয়েছিল এবং প্রচার মাধ্যমের অগ্রগতি ঘটেছিল। এর ফলে নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা জেগে উঠল। তারা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ (সরাসরি) নির্বাচনের দাবি তুলেছিল।

১৯৮৭ খিস্টাব্দের মে মাসে চুন প্রশাসনের অত্যাচারে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাগরিকরা গণতন্ত্রকরণের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। চুন প্রশাসন এই আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে চেস্টা করে। চুন সরকারের বিরুদ্ধে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তাতে শুধু ছাত্ররাই নয়, মধ্যবিত্তরাও অংশগ্রহণ করেছিল। এই সব প্রচেস্টার ফলে চুন শাসন ব্যবস্থা বাধ্য হল সংবিধানের সংশোধনের জন্য যাতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের অনুমতি থাকে। এইভাবে কোরিয়ায় গণতন্ত্রের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল।

Demonstrators during the June Democracy Movement of 1987.

কোরিয়ান গণতন্ত্র এবং আই এম এফ (IMF) এর সংকট (Korean Democracy and the IMF Crisis)

নতুন সংবিধান অনুসারে ১৯৭১ সাল থেকে প্রথম প্রত্যক্ষ (সরাসরি) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে। কিন্তু বিরোধী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যর্থতার কারণে চুন এর সামরিক দলের মধ্যে রোহ-তাই-উ নামে একজন সামরিক নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে কোরিয়া গণতন্ত্রের পথেই চলছিল। দীর্ঘ সময়ের বিরোধী নেতা কিম-ইয়ং-সাম একটি বড়ো শাসনকারী দল তৈরি করার জন্য ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে রোহর দলের সাথে আপোষ করলেন। রোহর

দলের সাথে আপোস করলেন। কয়েক যুগ সামরিক শাসনের পর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কিম নামে একজন অসামরিক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার নির্বাচনের সাথে সাথে এবং ক্ষমতাসীন সামরিক শক্তি উচ্ছেদের পর গণতান্ত্রিক পথে কোরিয়া এগিয়ে চলে।

নতুন প্রশাসনের রপ্তানি নীতির অধীনে অনেকগুলো কোম্পানি বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য পেতে লাগল। এই রপ্তানি নীতি ১৯৯০ এর প্রথম দিক পর্যন্ত চলছিল। সরকারি সহায়তায় কোরিয়া তার প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করেছিল ব্যবসায়, রাসায়নিক শিল্পে এবং ইলেকট্রনিক শিল্পে। আর সরকার নির্মাণ শিল্প এবং সামাজিক পরিকাঠামোকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

ইতিমধ্যে বাজার সৃষ্টির জন্য ক্রমবর্ধমান চাপ পড়ে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে কিম প্রশাসন অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং বিকাশ সংগঠনে যোগদান করল। কোরিয়ার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বল বন্দোবস্ত, দলিল দ্বারা বেপরোয়াভাবে ব্যবসা পরিচালনা এবং আরও অনেক কারণে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে কোরিয়া এক বিদেশি মুদ্রা সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। এই সংকটের অন্তর্ভুক্ত ছিল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কর্তৃক জরুরি অর্থনৈতিক সাহায্য সরবরাহ করা (IMF)। এর সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক সংস্থানকে উন্নত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, যাতে স্বর্ণ সংগ্রহ অভিযানের মাধ্যমে নাগরিকরা সক্রিয়ভাবে বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে দীর্ঘদিনের বিরোধী নেতা কিম দেই-জুং প্রথমবারের মতো কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল। দ্বিতীয় শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর এসেছিল ২০০৪ সালে যখন প্রগতিশীল রোহ-মো-হাইউন প্রশাসনকে অনুসরণ করে রক্ষণশীল নেতা লি-মায়ুং-বক রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে রক্ষণশীল নেতা পার্ক গুয়েন-হাই প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁর রাষ্ট্রপতিত্বের প্রথমদিকে তিনি, তাঁর পিতা পার্ক চুং-হি'র কাছ থেকে রাজনৈতিক বিষয়ের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। কিন্তু ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে যখন এটা প্রকাশ্যে এল যে, তিনি এক বন্ধুকে সরকারি বিষয় গোপনে বন্দোবস্তের অনুমতি দিয়েছেন, তখন তিনি সমগ্র জাতির প্রতিবাদের সম্মুখীন হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মুন জেই-ইন শান্তি পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে তৃতীয়বারের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন।

বর্তমানে সিউল শহরের রাতের দৃশ্য

২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মোমবাতি প্রতিবাদ আন্দোলন হল। শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের (জনগণদের) দ্বারা এই প্রতিবাদ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। তারা গণতান্ত্রিক আইন ও ব্যবস্থার সীমানার মধ্যে থেকে

শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের জন্য বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। এই থেকে কোরিয়ার গণতন্ত্রের পূর্ণ পরিণতি দেখা যায়। কোরিয়ার গণতন্ত্র অর্থনৈতিক বিকাশের কাছে ঋণী। কিন্তু এটি দেশে প্রজাতন্ত্রকে উৎসাহিত করা জন্য নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনায় উন্নত করেছিল। এটা আবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছিল বর্তমানে ইহা যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থা থেকে আরও অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে।

আধুনিকীকরণের দুইটি পথ (Two Roads to Modernisation)

শিল্প সমিতিগুলো পরস্পরের মতো হওয়ার পরিবর্তে আধুনিক হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছিল। স্বাধীন ও আধুনিক জাতি গঠনের জন্য জাপান এবং চিনের ইতিহাসের সঙ্গে তাইওয়ান ও কোরিয়ার ঘটনা দেখায় কীভাবে পৃথক ঐতিহাসিক অবস্থা বিভিন্ন পথে চালিত করেছিল।

জাপান তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে সফল হয়েছিল এবং ঐতিহ্যগত দক্ষতা ও পদ্ধতি নতুন পথে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে জাপানের অভিজাতদের আধুনিকীকরণ একটা উগ্রজাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল, যা অন্যদের মতামতকে কণ্ঠরোধ করে একটি দমনমূলক শাসন বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল, গণতন্ত্রের জন্য দাবি করল এবং একটি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন করল, যা সেই অঞ্চলে ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করল এবং একইভাবে অভ্যন্তরীণ বিকাশকে ধ্বংস করেছিল।

জাপানের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা এমন একটি পরিবেশে করা হয়েছিল যেখানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রাধান্য ছিল। যখন এটা তাদের অনুকরণ করেছিল, তখন তারা আরও চেস্টা করেছিল তার নিজস্ব সমাধান বের করতে। জাপানের জাতীয়তাবাদ তিনটি পৃথক বাধ্যবাধকতার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। যখন অনেক জাপানি পাশ্চাত্যের প্রাধান্য থেকে এশিয়াকে মুক্ত করতে আশা করেছিল, তখন অন্যদের কাছে এইসব ধারণাগুলো একটি সাম্রাজ্য গঠনকে সমর্থন করেছিল।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর রূপান্তর এবং প্রাত্যহিক জীবনে ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার বা সংরক্ষণের কোনো প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু এদের ব্যবহার করা হত নুতন ভাবে এবং বিভিন্ন উপায়ে। উদাহরণস্বরূপ মেইজি স্কুল ব্যবস্থা ইউরোপ এবং আমেরিকান আদর্শকে (মডেল) অনুসরণ করে নতুন বিষয় প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু পাঠ্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অনুগত নাগরিক তৈরি করা। নীতির উপর একটি কোর্স চালু করা হল, যেখানে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের উপর জোর দেওয়া হয় এবং এটি বাধ্যতামূলক করা হল। অনুরূপভাবে, দৈনন্দিন জীবনের অথবা পারিবারিক জীবনের পরিবর্তন থেকে দেখা যায় কীভাবে বিদেশি এবং দেশীয় ধারণাগুলো একত্রিত হয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করেছিল।।

চিনের ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের পথ ছিল খুবই পৃথক। পশ্চিমা ও জাপান উভয় পক্ষের সাম্রাজ্যবাদ সরকারকে নিয়ন্ত্রণে ঠেকাতে দ্বিধাগ্রস্থ এবং অনিশ্চিত কিং রাজবংশের সাথে একত্রিত হয়ে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার পরিবেশ তৈরি করেছিল। এই অবস্থা চলাকালীন সময়ে বেশিরভাগ লোকদের অনেক দুঃখ-কস্ট সহ্য করতে হয়েছিল। যুদ্ধ সামন্তবাদ, ছিনতাই এবং গৃহযুদ্ধে মানবীয় জীবনের উপর প্রচুর পরিমাণে উপশুল্ক দাবি করেছিল। ফলে বহুলোকের প্রাণনাশ হয়েছিল। যেমন জাপানি আক্রমণের বর্বরতা বহু লোকের প্রাণ নিয়েছিল, তার থেকেও বেশি পরিমাণ লোকের প্রাণ গেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রতিবন্ধকতা।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে গতানুগতিক রীতিকে ত্যাগ করে, জাতীয় ঐক্য ও শক্তি তৈরির জন্য নানা পথের অনুসন্ধান করা হয়। চিনের সাম্যবাদী দল (CPP) এবং তাদের সমর্থকরা গতানুগতিক প্রথা ত্যাগ করার জন্য আন্দোলন শুরু করল। তাদের মনে হয়েছিল যে এইসব রীতিনীতি জনসমাজকে দারিদ্রে আচ্ছন্ন করে, মহিলাদের পরাধীন রাখে আর দেশকে অনুন্নত রাখে। সাম্যবাদী দল জনগণের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এটি একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের সৃষ্টি করল। কমিউনিস্ট কর্মসূচীর সফলতা আশার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু জনগণকে কাজে লাগানোর জন্য যে স্বাধীনতা ও সমতা আদর্শের শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল এর দমনমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সেই আদর্শকে পাল্টে দিয়েছিল। তথাপি এটি দূর করতে পেরেছিল শতাব্দীর প্রাচীন অসমতাকে এবং শিক্ষা বিস্তার করে জনগণের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তুলেছিল।

পার্টি এখন বাজার সংক্রান্ত সংস্কারগুলো সম্পন্ন করছিল এবং চিনকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করে তুলতে সফল হয়েছিল। কিন্তু এটির রাজনৈতিক ব্যবস্থা আটঁসাঁট (কঠোর) ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। সমাজ এখন বর্ধিত বৈষম্যের মুখোমুখি হতে লাগল এবং একইভাবে দীর্ঘদিনের অবদমিত ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটল। এই নতুন পরিস্থিতি পুনরায় প্রশ্ন তুলে কীভাবে চিনের বিকাশ হবে ধারণাকারী ঐতিহ্যকে বজায় রেখে?

অনুশীলনী

সংক্ষেপে উত্তর দাও:

১। মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রধান প্রধান বিকাশগুলো কী ছিল যা জাপানের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল দ্রুত আধুনিক হতে?

২। জাপানের অগ্রগতির সাথে সাথে সেখানকার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কী রকম পরিবর্তন এসেছিল তা আলোচনা করো।

৩। কিং (চিং) রাজবংশ কীভাবে পাশ্চাত্য শক্তির দ্বারা উত্থাপিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছিল?

৪। সান-ইয়াৎ সেনের তিনটি নীতি কী ছিল?

৫। কীভাবে কোরিয়া ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বিদেশী মুদ্রা সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল?

সংক্ষিপ্ত রচনাকারে উত্তর দাও :

৬। জাপানের দ্রুত শিল্পায়ন নীতি কি প্রতিবেশীর সাথে যুদ্ধের সৃষ্টি করেছিল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ধ্বংস করেছিল?

৭। তুমি কি মনে কর মাও সে-তুং এবং চিনের কমিউনিস্ট পার্টি সফল হয়েছিল চিনকে মুক্ত করতে এবং তার সাম্প্রতিক সফলতার ভিত্তি স্থাপন করতে?

৮। দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ কি তার গণতন্ত্রীকরণে অবদান রেখেছিল?

উপসংহার
CONCLUSION

'বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা' এই বইটি তোমাদের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। মানব সভ্যতার বিবর্তন এবং উন্নয়নের কিছু বিশিষ্ট বিষয়ের উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। প্রতিটি বিভাগে নিম্নলিখিত ক্রমবর্ধমান ছোটো ছোটো কালে বিভক্ত করে চর্চা করা হয়েছে।

১. ৬০ লাখ বছর পূর্ব থেকে ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ

২. ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ

৩. ৮০০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ

৪. ১৭০০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

যদিও ইতিহাসবিদ্‌রা প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন, ঐতিহাসিকরা কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং সমস্যার মধ্যে তাদের নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। আমরা প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাকে পরিমার্জিত করার চেষ্টা করেছি, যাতে ইতিহাস কীভাবে লেখা হয় এবং আলোচনা করা হয় তার একটি সর্বজনীন ধারণা প্রকাশ পায়। এর উদ্দেশ্য হল মানব ইতিহাসকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করা যা আমাদের আধুনিক শিকড়ের বাইরেও আরও গভীরভাবে জানতে সাহায্য করে।

এই বইটি থেকে তোমরা আফ্রিকা, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, উওর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ব্রিটেনসহ সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা আভাস পেয়েছো। এই বইটি হয়তো তোমাদের 'কেস স্টাডি' পদ্ধতির সাথে পরিচিত করিয়েছে। এইসব জায়গার ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বোঝার পরিবর্তে নির্দিষ্ট ঘটনাবলির মূল চিত্রগুলোর উদাহরণ অধ্যয়ন করা ভালো হবে।

বিশ্ব ইতিহাসকে অনেকভাবেই লেখা যায়। এগুলোর মধ্যে সম্ভবত একটি প্রাচীনতম পদ্ধতি হল মানব সম্পর্কের উপর নজর দেওয়া যেখানে সং স্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় এবং বিশ্ব ঐতিহাসিক পরিবর্তনের বিভিন্ন বৈচিত্র্য অন্বেষণ করা যায়।

আরেকটি পদ্ধতি হল অপেক্ষাকৃত স্বাবলম্বী আর্থিক বিনিময়ের মাধ্যমগুলোর শনাক্তকরণ। তার কারণ হল এইসব আর্থিক বিনিময়ের সাহায্যে বিশেষ কিছু ধরনের সংস্কৃতি এবং ক্ষমতাকে বজায় রাখা যায়। তৃতীয় পদ্ধতি হল রাষ্ট্র ও অঞ্চলের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করে তাদের স্বতন্ত্র

বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা। এই বইয়ে তোমরা প্রতিটি পদ্ধতির সংকেত খুঁজে পাবে। কিন্তু বিভিন্ন সমাজের (তথা ব্যক্তি) মধ্যে পার্থক্যের সাথে সাথে কিছু সামঞ্জস্যও পরিলক্ষিত হয়। মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মসংযোগ এর সাদৃশ্যতা সর্বদাই বিদ্যমান।

বিশ্বব্যাপী এবং স্থানীয় (বালি কনার পৃথিবী) 'মুখ্য ধারা' এবং 'প্রান্তীয়'

সাধারণ এবং নির্দিষ্টের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে তোমরা এই বই থেকে যা কিছু শিখেছ, তা ইতিহাস গবেষণায় একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টিভঙ্গি।

আমাদের বিবরণ আফ্রিকা,এশিয়া এবং ইউরোপের বিক্ষিপ্ত বসতি থেকে শুরু হয়েছে। সেখান থেকে আমরা মেসোপটেমিয়ার শহর জীবনের দিকে চলে যাই। প্রাথমিক সাম্রাজ্যগুলো মেসোপটেমিয়া, মিশর, চিন এবং ভারতের শহরগুলোর চারপাশে নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে গ্রিক (ম্যাসাডোনিয়া), রোমান, আরব এবং (১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে) মঙ্গোল সাম্রাজ্য এই ভাবেই প্রতিষ্ঠা হয়। এই সাম্রাজ্যেগুলোতে বাণিজ্য ক্রিয়া, প্রযুক্তি এবং সরকার গঠন প্রায়ই অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির হত। প্রায়ই তারা একটি লিখিত ভাষার কার্যকরী ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল ছিল। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে (১৪০০ খ্রিষ্ট্রাব্দ থেকে) পশ্চিমি ইউরোপে সংঘঠিত প্রযুক্তিগত ও সাংগঠনিক পরিবর্তনের ফলে মানব ইতিহাসের একটি যুগের সূত্রপাত হয়। এগুলো রেনেসাঁ বা সভ্যতার পুর্নজন্মের সাথে যুক্ত ছিল, যার প্রাথমিক প্রভাব উত্তর ইতালির শহরগুলোতে অনুভূত হয়, কিন্তু সমগ্র ইউরোপে এর প্রভাব খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই নবজাগরণ ওই অঞ্চলের নগর জীবনের সাথে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মুসলিম অঞ্চল এবং বাইজেন্টাইনদের সাথে পারস্পরিক আদানপ্রদানের ফলে সৃষ্ট হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে,ষোড়শ শতাব্দীতে অনুসন্ধানকারী ও বিজয়ী অভিযাত্রীদের সাথে এই সব ভাবনা এবং আবিষ্কার আমেরিকা পৌঁছে যায়।

বিশ্ব-বাণিজ্য, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে ইউরোপীয় প্রাধান্য তখনও প্রতিষ্ঠা হয়নি। এটি অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য ছিল যখন ব্রিটেনে শিল্প-বিপ্লব হয় এবং এটি সমগ্র ইউরোপের ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, এবং, জার্মানি, আফ্রিকা এবং এশিয়ার কিছু অঞ্চলে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়, যা পুরানো সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক জীবন ও সংস্কৃতি যা একসময় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল, তা বিভিন্ন রূপে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং আধুনিক জীবনের ভিত্তি তৈরি করে।

তোমরা এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে অনেকগুলো উদ্ধৃত অংশ লক্ষ করে থাকবে।

এর মধ্যে কিছু প্রতিলিপি গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলোকে ইতিহাসবিদ্‌রা 'প্রাথমিক উৎস' বলে দাবি করেন। পন্ডিতরা এই সব উপকরণ থেকে তাদের 'তথ্য' অনুসন্ধান করে ইতিহাস রচনা করেন। তারা এই সব উপকরণের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করেন এবং এই সব উপকরণের অস্পষ্টতার দিকে অতন্দ্র দৃষ্টি দেন। ঐতিহাসিকরা একই উৎস-উপাদান প্রয়োগ করে ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মতামত দিতে পারে। অন্যান্য মানব বিজ্ঞানের মতোই ইতিহাস থেকেও বিভিন্ন ধরনের মতামত সৃষ্টি হতে পারে। এই ধরনের ভিন্নমত ইতিহাসবিদ্‌দের যুক্তি এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর মধ্যে জটিল সম্পর্কের কারণে হয়ে থাকে।

তোমরা বিদ্যালয়ের শেষ বছরে ভারতীয় ইতিহাসে (বা দক্ষিণ এশিয়া) হরপ্পা যুগ থেকে আধুনিক ভারতের সংবিধান তৈরির ইতিহাসের দিকগুলো অধ্যয়ন করবে। সেই অধ্যয়ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি সুষম মিশ্রণ হতে হবে, যা তোমাদের 'কেস-স্টাডি' পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত বিষয়ের সাথে যুক্ত করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে। আশা করি, এই বইটি তোমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করবে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল 'ইতিহাস কেন পড়ব?' তোমরা কি জান প্রতিভাবান মধ্যযুগীয় বিশেষজ্ঞ মার্ক ব্লোক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিখাতে বসে লেখা [দ্য হিস্টোরিয়ান্স ক্রাফ্ট্ (Historian's Craft)] বইটি একটি ছোটো ছেলের প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলেন "বাবা,আমাকে বলুন,ইতিহাসের উপকারিতা কী?"

Suggested Reading

Theme One

- Conroy, Glenn C. 1997. *Reconstructing Human Origin: A Modern Synthesis*. Norton. New York.
- Howells, W. W. 1993. *Getting Here: The Story of Human Evolution*. Compass Press. Washington, DC.
- Lewin, Roger, 1992. *Human Evolution: An Illustrated Introduction*. Freeman. New York.
- Wolpoff, Milford. 1996. *Human Evolution*. McGraw-Hill. New York.

Theme Two

- Postgate, J.N. 1994. *Early Mesopotamia: Society and Economy at the Dawn of History*. Routledge. London.
- Mieroop, Marc van de. 1999.*The Ancient Mesopotamian City*. Oxford University Press. London.
- *Scientific American* Vol. 5. No. 1 1994 (New York). Special issue on Ancient Cities.
- Pollock, Susan. 1999. *Ancient Mesopotamia*, Cambridge University Press. Cambridge.

Theme Three

- Millar, Fergus. 1981. *The Roman Empire and Its Neighbours*, London. Duckworth.
- Colin, M. Wells. 1995. *The Roman Empire*, Harvard: University Press. Harvard.
- Wacher, John S. 1987. *The Roman Empire.* London.
- Brown, Peter. 1997. *The World of Late Antiquity A.D. 150-750.* Thames and Hudson. London.

Theme Four

- Kennedy, Hugh. 2004. *The Prophet and the Age of the Caliphates*. Pearson. Longman. England.
- Tyerman, Christopher. 2004. *The Crusades: A Very Short Introduction,* Oxford University Press. Oxford.
- Lapidus, Ira. 2002. *A History of Islamic Societies.* Cambridge University Press. Cambridge.
- Robinson, Francis. (ed) 1996. *The Cambridge Illustrated History of the Islamic World,* Cambridge University Press, Cambridge.

Theme Five

- Arthur, Waley. 1963. *The Secret History of the Mongols and Other Pieces.* Barnes and Noble. New York.
- Latham, R.E. (trans.). 1958. *The Travels of Marco Polo,* Penguin Classics. London.
- Boyle, J.A. (trans.). 1958. *Juvaini's History of the World Conqueror.* Vol. 1, pp. 23-34. Manchester University Press, Manchester.
- Weatherford, Jack. 2004. *Genghis Khan and the Making of the Modern World.* Three Rivers Press. New York.

Theme Six

- Frankforter, Daniel A. 2003. *The Medieval Millennium: An Introduction.* Prentice Hall.
- Duby, Georges. 1998. *Rural Economy and Country Life in the Medieval West.* Philadelphia.
- Postan, M.M. 1975. *The Medieval Economy and Society.* Penguin.
- Cipolla, Carlo M. 1973. *The Fontana Economic History of Europe.* Vol.1: *The Middle Ages.*

Theme Seven

- Burke, Peter. 1987. *The Renaissance.* Macmillan. London.
- Johnson, Paul. 2001. *The Renaissance*, London
- Plumb, John. 2000. *The Penguin Book of the Renaissance.* London and New York.
- Nauert, C.G. Jr. 1995. *Humanism and the Culture of Renaissance Europe*, Cambridge
- Henry, J. 1997. *The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science*, New York.

Theme Eight

- Parry, J.H. 1974. *The Discovery of the Sea.*
- *The Cambridge History of Latin America* Vol. I. 1997.
- Rouse, Irving. *The Tainos.*
- Prescott, William Hickling. *History of the Conquest of Peru.*

Theme Nine

- Hobsbawm, E. J. *Industry and Empire. Volume 3: From 1750 to the Present.* Penguin Books. Harmondsworth.
- -do- *Age of Revolution.*
- Daunton, M.J. 1995. *Progress and Poverty: An Economic and Social History of Britain 1700-1850.* Oxford University Press. Oxford.
- Hudson, Pat.1992. *The Industrial Revolution.* Edward Arnold. London

Theme Ten

- Trigger, Bruce G. and Wilcomb E.Washburn (eds). 1996. *The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas* Vol. 1. North America (in two parts). Cambridge University Press. Cambridge.
- Attwood, Bain. 2005. *Telling the Truth about Aboriginal History.* Allen and Unwin. Australia.
- Reynolds, Henry. 1999. *Why Weren't we told?* Penguin. Australia.

Theme Eleven

- McClain, James L. 2002. *A Modern History of Japan*, New York: W.W.Norton & Co.
- Daikichi, Irokawa. 1995. *The Age of Hirohito: In Search of Modern Japan.* Trans Mikiso Hane and John K. Urda. Free Press, New York.
- Hsu, Immanuel. 1983. *The Rise of Modern China.* Oxford University Press, London
- Spence, Jonathan. 1990. *In Search of Modern China.* Hutchinson, London.
- Kim, In-Geol, 1998. *Lectures on Modern Korean History:1945–1990*, Dolbegae, Seoul.
- Han, Yeong-Wo. 2010. *A Review of Korean History*, Vol.3. Kyongsaewon, Seoul.
- The Association of Korean History Teachers. 2010. *A Korean History for International Readers.* Humanist, Seoul.
- Yoon,Sung-Yi. 2016. *Democracy in South Korea.* National Museum of Korean Contemporary History, Seoul
- Korea University Center for Korean History. 2017. *Korean History.* Saemoonsa, Seoul.

NOTES

NOTES